নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সমগ্র কিশোর সাহিত্য

Ramkrishna Chatterjee
Digitally signed by Ramkrishna Chatterjee
DN: cn=Ramkrishna Chatterjee, c=BD, o=Ayan Softex, email=ayan.00.84@gmail.com
Date: 2010.08.01 00:41:35 +06'00'

www.boiRboi.blogspot.com

সূচীপত্র

আমার কথা	১
গল্প :	
মৎস্য-পুরাণ	৯
অথ নিমন্ত্রণ ভোজন	১৪
দধীচি, পোকা ও বিশ্বকর্মা	১৯
সভাপতি	২৪
খট্টাঙ্গ ও পলান্ন	২৮
ভূতুড়ে	৩৪
ক্যামোফ্লেজ	৩৮
পুলিশের কারবারই আলাদা	৪৩
ঢাউস	৪৭
রোমাঞ্চকর বন্দুক	৫৩
কুট্টিমামার দন্ত-কাহিনী	৫৯
থলে রহস্য	৬৫
দৈত্য-সঙ্গীত	৭১
সাংঘাতিক	৭৪
পেশোয়ার কী আমীর	৭৯
ভালোয়-ভালোয়	৮৫
বনভোজনের ব্যাপার	৯১
প্যাঁচা ও পাঁচুগোপাল	৯৭
পরের উপকার করিও না	১০৩
সেই বইটি	১০৮
চরণামৃত	১১৬
একটি ফুটবল ম্যাচ	১২০
দুরন্ত নৌকা-ভ্রমণ	১২৫
দুর্ধর্ষ মোটর-সাইকেল	১৩২
কুট্টিমামার হাতের কাজ	১৩৭
উপন্যাস :	
অন্ধকারের আগন্তুক	১৪৫
চার মূর্তি	১৮৫
চার মূর্তির অভিযান	২৪৯
কবিতা, ছড়া ও প্রবন্ধ	৩০৭-৩১৬
গ্রন্থ-পরিচয়	৩১৭

আমার কথা

রবীন্দ্রনাথ খুব বড়ো। গল্পে, কবিতায়, উপন্যাসে, ছবিতে, প্রবন্ধে, নাটকে—যেদিকেই তাকাও তিনি সম্রাট। তাঁর কাছাকাছি তোমরা কেউ যেতে পারবে না কোনো-দিন। আমি কিন্তু অন্তত একটা ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মতোই গৌরব অর্জন করে-ছিলুম।

হাসছ নিশ্চয়? কিন্তু শুনে তোমরাই বিচার করো।

রবীন্দ্রনাথের জীবন-স্মৃতি পড়েছ? তিনি তখন একেবারেই শিশু। ইস্কুলে যাওয়ার বয়েস তাঁর মোটেই হয়নি। অথচ বড়দের সঙ্গে ইস্কুলে যাওয়ার জন্যে তিনি দারুণ কান্না জুড়ে দিয়েছিলেন। আর সেই সময় তাঁর বাড়ির মাস্টারমশাই তাঁকে ধাঁ করে এক দারুণ চাঁটি বসিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, এখন স্কুল যাওয়ার জন্যে কাঁদছ, এর পরে না-যাওয়ার জন্যে কাঁদতে হবে।

সেই গুরুবাক্য রবীন্দ্রনাথের জীবনে কী গুরুতরভাবেই ফলে গিয়েছিল!

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এইখানেই আমার দারুণ মিল। আর আমার অভিজ্ঞতাও ঠিক ওই রকম করুণ।

তখন আমি বেজায় ছেলেমানুষ। দিনাজপুর জেলার ভারি সুন্দর একটা জায়গাতে থাকি। বাড়ির নিচ দিয়েই তর-তর করে বয়ে গেছে আত্রাই নদীর নীল জল, বড় বড় মহাজনী নৌকোর সঙ্গে লাল প্রদীপের মতো শিমুলের ফুল ভেসে যায় সে নদী দিয়ে। আমাদের ঠিক সদর দরজার সামনে দুটো কৃষ্ণচূড়োর গাছ—ফুল ধরলে তার তলায় যেন হলুদ লালের একখানা কার্পেট বিছিয়ে দেয় কেউ। একটু এগিয়েই সারি-দেওয়া বকুল—তার গন্ধে বাতাস ভরে থাকে।

আত্রাইয়ের ধারে ধারে বকুল-বনের ছায়ায় আমার দিন কাটত। রাত্রে শুয়ে শুয়ে জানলা দিয়ে দেখতুম অনেক দূরের পদ্মদিঘির ধারে দপ্-দপ্ করে আলেয়া জ্বলছে। ঠাকুরমা বলতেন ওরা 'কন্ধকাটা'—বুকের ওপর একটা রাক্ষুসে চোখের আলো জেবলে নাকি দু-হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে শিকার খুঁজছে। সেই আলেয়া দেখে ভয় পেতে পেতে আর ঠাকুরমার মুখে রূপকথা শুনতে শুনতে কখন টুপ্ করে ঘুমিয়ে পড়তুম।

বেশ সুখেই ছিলুম, সন্দেহ কী! কিন্তু চলতি সেই কথাটা জানো তো—সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়? ইচ্ছে করেই সেই ভূতের কিল আমি টেনে আনলুম পিঠের ওপর।

আমার মেজদা ছিল আমার চাইতে বছর-দেড়েকের বড়। কাজেই আমার আগেই তার হাতে-খড়ি হয়ে গেল। আর মেজদা আমার চোখের সামনে দিব্যি নতুন কাপড় জামা জুতো পরে—চোখে কাজল লাগিয়ে আর স্লেট বই হাতে নিয়ে স্কুলে চলল।

বল তো—এমন হৃদয়-বিদারক দৃশ্য কখনো সহ্য হয়?

প্রথমে বললুম, আমি যাব।

মা বললেন, না—হাতে-খড়ি না হলে ইস্কুলে যেতে নেই। মা সরস্বতী রাগ করবেন।

সরস্বতী রাগ করবেন, তাতে তখন বয়ে গেছে আমার। যে মেজদার সঙ্গে চিরকাল

www.boiRboi.blogspot.com

প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কুলের আচারের ভাগ নিয়ে যার সঙ্গে মারামারি, রাত্রে কোল-বালিশ নিয়ে যার সঙ্গে টানাটানি—সে কিনা এমন করে প্রাণে ব্যথা দিয়ে ট্যাং ট্যাং করে চলে যাচ্ছে! আমি চিৎকার করে বললুম—আমি যাবই! বাড়ির সবাই যত বাধা দেয়, তত আমার জেদ বাড়ে। শেষে ধুলোয় গড়াগড়ি দিয়ে আমি কাঁদতে লাগলুম, আর তারপরে চেঁচাতে লাগলুম : আমি যাবই—আঁ—স্কুলে—আঁ—আঁ! সে চ্যাঁচানিতে বাড়ি শুদ্ধু সকলের মাথা ধরে গেল।

ঠিক তখন একটা ঘটনা ঘটল।

সামনে দিয়ে স্কুলের হেডপণ্ডিত যাচ্ছিলেন। আগুনের আঁচের মতো গনগনে গায়ের রং, মাথায় টিকি, কাঁধে চাদর। নামটা ছিল খুব জবরদস্ত, দ্বিষাম্পতি অধিকারী। দ্বিষাম্পতি মানে জানো? সূর্য। সত্যিই তাই—সূর্যের মতোই একটা অদ্ভুত তেজ ছিল তাঁর শরীরে।

হেডপণ্ডিত মশাইকে জানতুম। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই সত্যনারায়ণের পুজো করতে আসতেন। ভারি ভালবাসতেন আমাকে। পুজো-টুজো হয়ে গেলে নিজেই হয়ত নৈবেদ্য থেকে একটা বড় সন্দেশ কিংবা কলা তুলে দিতেন আমার হাতে। কাজেই বুঝতেই পারছ—ওঁকে আমি একটু বিশেষ রকম ভক্তি করতুম।

পণ্ডিতমশাই দাঁড়িয়ে পড়লেন। জিজ্ঞেস করলেন, কী হয়েছে? নারু কাঁদছে কেন?

উত্তরে আমি বললুম, অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি ইস্কুলে যাব!

পণ্ডিতমশাই হেসে বললেন, বেশ তো, দেবেন ওকে কাল পাঠিয়ে। একটু বসে-টসে থাকবে বই তো নয়! আর সরস্বতী পুজোর সময় হাতে-খড়ি দিয়ে নিলেই হবে, তাতে কোন দোষ নেই।

আমি ভারি খুশি হলুম। ভাবলুম—আহা, এমন না হলে পণ্ডিতমশাই! সাধে কি নৈবেদ্য থেকে বড় সন্দেশটা আমার হাতে তুলে দেন!

সকালে উঠেই আমি তৈরি। চোখমুখ ধোবারও তর সয় না।

—জামা দাও, কাপড় দাও, সেলেট দাও! আমি ইস্কুলে যাব!

বাবা বললেন, শুধু-শুধু ইস্কুলে আসা-যাওয়া করবে, সে কি ভাল হয়? দিই ওকে গোপালের সঙ্গেই ভর্তি করে। আসল হাতে-খড়ি তো ইস্কুলেই হয়।

গোপাল আমার মেজদার নাম। নাচতে নাচতে তার সঙ্গে আমি স্কুলে চললুম। আর ভাবতে লাগলুম, এমন সুখের দিন আমার জীবনে আর কখনো আসেনি। বাবা আমাকে ভর্তি করে দিয়ে চলে গেলেন।

বেঞ্চিতে গিয়ে বসেছি আর সেলেট নিয়ে একটা পাখির ছবি আঁকছি, এমন সময় টিং টিং করে ঘণ্টা পড়ল। আর খাতা নিয়ে ক্লাসে ঢুকলেন এসে হেডপণ্ডিতমশাই। সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরা একেবারে মড়ার মতো নিশ্চুপ। যেন বাঘ দেখেছে, সকলের মুখ-চোখের চেহারা ঠিক এইরকম।

তাই দেখে আমার ভীষণ হাসি পেল। আমাদের পণ্ডিতমশাই, কী ভীষণ ভালো লোক, কিরকম কলা সন্দেশ নারকোল-নাড়ু খেতে দেন—তাঁকে দেখেও ভয় পায়—কী বোকা এরা!

আমি খিলখিল করে হেসে উঠলুম।

আর তখন—

বললে বিশ্বাস করবে না, সেই দারুণ ভাল, ভীষণ ভাল, সেই সন্দেশ খাওয়ানো পণ্ডিতমশাই একখানা হুঙ্কার ছাড়লেন। আর, কী সে হুঙ্কার! তাতে আমার হাত-পা একেবারে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে গেল। আর আমার সামনে এসে পেল্লায় একটি ঘুষি নাকের ডগায় দুলিয়ে বললেন, ভেবেছিস কী—অ্যাঁ? ইস্কুলের ক্লাস তোর

www.boiRboi.blogspot.com

খেলার জায়গা? ফের যদি একটুও নষ্টামি করবি তো এক কিলে তোকে ব্যাঙ বানিয়ে দেব!

ওরে বাবা—এ কী কাণ্ড! বাড়ির ঠাকুরমশাই ইস্কুলে যে এমন বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ান, স্বপ্নেও কে তা ভাবতে পেরেছিল! এমন জানলে কে ইস্কুলে আসত!

কিন্তু আর তখন পালাবার পথ নেই। চিরকালের মতোই রাস্তা বন্ধ। সুখে থাকতে ভূত ডেকে এনে নিজেই কিল খাওয়া শুরু করলুম।

তারপর বড় হয়েছি। স্কুল ছেড়ে কলেজে ভর্তি হয়েছি। তারও পর কলেজ ছেড়ে সব ক'টা পরীক্ষায় পাশ করে নিজেই মাস্টার হয়েছি। কাজেই মাস্টারমশায়কে আর আগের মত ভয় করি না, বরং ভালইবাসি। কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে অবসরের মুহূর্তে গল্প লিখি। সেই গল্প লেখার গল্পই এবার তোমাদের বলবো। শোন—

পেছন দিকে তাকিয়ে যখন নিজের স্বপ্নাতুর কৈশোর জীবনটাকে দেখতে পাই, তখন গল্প লেখার ব্যাপারটা নিজের কাছেই যেমন আকস্মিক, তেমনি বিস্ময়কর মনে হয়।

বাবা ছিলেন পুলিশের দারোগা। আজ নয়, বিশ থেকে ত্রিশ বছর আগে; এবং সে সময়ে ওই সম্প্রদায়টার সঙ্গে যাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল, সে দেবীটি আর যিনিই হোন তিনি যে সরস্বতী নন সে সম্বন্ধে বোধহয় সাক্ষী-প্রমাণ দরকার হবে না। শুনেছি সে যুগে বেশি পড়াশুনো বা ভালো ইংরেজি লেখার ক্ষমতাটা পুলিশ বিভাগে অযোগ্যতার নিদর্শন হিসাবে গৃহীত হত।

কিন্তু বাবা ছিলেন আশ্চর্য ব্যতিক্রম। কলেজে পড়াশুনো করেছিলেন। ভালো ছাত্র হিসেবে খ্যাতিও তাঁর ছিল। মনে পড়ছে ত্রিশ মাইল দূর থেকে ডাকাতের আস্তানায় রেইড করে তিনি ফিরে আসছেন—মাঠের ওপারে সাদা আরবী ঘোড়াটার ওপরে দেখা যাচ্ছে ইউনিফর্ম পরা উজ্জ্বল গৌরবর্ণ একটি পুরো পাঁচ হাত মানুষ। সহিস ছুটে এসে ঘোড়া ধরল, জিনের ওপর থেকে সোজা লাফিয়ে নামলেন মাটিতে। কপালে ঘামের বিন্দু, সারা গায়ে উত্তর বাংলার লাল ধুলো। কিন্তু ঘোড়া থেকে নেমেই তাঁর প্রথম প্রশ্ন : নতুন বইগুলোর ভিঃ পিঃ এসেছে?

বাবার চমৎকার লাইব্রেরী ছিল। মাসে মাসে বই আসত, বাংলা দেশের যত রকম দৈনিক সাপ্তাহিক আর মাসিক পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। শুধু গ্রাহক ছিলেন না, একনিষ্ঠ পাঠকও ছিলেন। আমাদের মত ছোটদের জন্যে আসত অধুনালুপ্ত খোকাখুকু, সন্দেশ, মৌচাক, শিশুসাথী। আজও ভাবতে আশ্চর্য লাগে, ওই লোকটি কেমন করে পুলিশের চাকরীতে সুনাম অর্জন করেছিলেন। পড়াশুনা ছাড়া কোনো নেশা ছিল না, পান-তামাক অস্পৃশ্য বোধ করতেন এবং স্টুয়ার্ট মিল থেকে মিলটন, সেক্সপীয়র, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের নির্ভুল উদ্ধৃতি মৃত্যুর আগেও তাঁর মুখ থেকে শুনেছি।

সাহিত্য সম্বন্ধে আমার যা কিছু আসক্তি বা অনুরক্তি—একান্তভাবে বাবার কাছ থেকেই পেয়েছিলাম। ফলে বর্ণপরিচয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অকালপক্কতাও অর্জন করেছিলাম কিছুটা। খোকাখুকুর পাতায় আর মন বসতো না; চুরি করে ভারতবর্ষের পাতা থেকে পড়তাম "শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী" (গোড়াতে বইটার ওই নামই ছিল), দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের "নারায়ণ" কাগজ থেকে পড়তাম "স্বামী"। কতটুকু বুঝতাম, ঠিক জানি না—কিন্তু আশ্চর্য দোলা লাগত মনে। এখন চোখের সামনে ভেসে উঠছে উত্তর বাংলার একটা নগণ্য গ্রাম। আমাদের বাসার সামনে রক্তমঞ্জরীতে কৃষ্ণচূড়ার কুঞ্জটা আকুল হয়ে আছে—তার ওপারে বয়ে যাচ্ছে আত্রাইয়ের নীলধারা, তারও ওপারে গ্রাম-ছাড়া রাঙা মাটির পথ—ঘন বাঁশ আর আখের বনের ভেতর দিয়ে

কোথায় যে দিক-চিহ্নহীন দিগন্তে মিলিয়ে গেছে জানতাম না। আর সেই আশ্চর্য পটভূমিতে এই আশ্চর্য লেখাগুলো আমাকে যেন আচ্ছন্ন করে রাখতো। মনে হত ওই অজানা পথটা আর এই লেখাগুলোর মধ্যে কী যেন নিবিড় একটা সাদৃশ্য আছে।

প্রথম যখন লিখতে সুরু করি, তখন আমরা মোটামুটিভাবে স্থায়ী বাস্তু বেঁধেছি দিনাজপুরে এসে। ইস্কুলের ছাত্র এবং নীচু ক্লাসের ছাত্র। প্রথম সাহিত্যিকের আসক্তি জ্যামিতিক নিয়মে কাব্য-চর্চার ওপরে গিয়েই পড়ল।

আমি চিরকাল নিরালা মানুষ—কবিতা লেখায় হাত দিয়ে নিজেকে যেন আরো বেশী সংকুচিত করে ফেললাম। লেখা সম্বন্ধে যেমন সংশয় ছিল তেমনি ছিল লজ্জা। অপরাধবোধ তো ছিলই। চোরের মত লিখতাম—ছিঁড়ে ফেলতাম সঙ্গে সঙ্গেই। নিজের লেখার প্রতি একবিন্দু দরদ ছিল না—ভাগ্যক্রমে সেটা আজও নেই।

নিভৃত সাধনার জন্যে নিভৃত জায়গা দরকার। কোথায় পাওয়া যায় সেটা? খুঁজতে খুঁজতে চমৎকার একটা জায়গা বের করলাম—সেরকম সাহিত্য সাধনার রাজাসন পৃথিবীতে কারো জন্যে জুটেছে বলে আমি জানি না।

বাড়ীর একপাশের বারান্দায় ভাঙাচুরো কাঠকুটরো আর কেরোসিন কাঠের প্যাকিং বাক্সের একটা স্তূপ ছিল। শুধু স্তূপ বললে কম হয়, সেটা প্রায় ছাদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। তার নীচে বাগান থেকে সংগৃহীত কাঁঠালের এক পিরামিড, তা থেকে নিঃসারিত হত অপূর্ব সুরভি। বাক্সগুলোর তলায় ইঁদুর স্বেচ্ছাসুখে বিচরণ করত, শব্দে আর গন্ধে বেশ মনোরম একটি পারিপার্শ্বিকতা যে সৃষ্টি হয়েছিল তাতে আর সন্দেহ কী। আমি খাতা আর কালি-কলম নিয়ে সেই স্তূপ শিখরে আরোহণ করলাম। বাড়ীর লোকের নজর সহজে পড়ত না, যদি হঠাৎ কেউ দেখে ফেলত, অনুমান করতো কাঁঠাল খাচ্ছি। কাঁঠাল সম্পর্কে বাড়ীর কারুর কার্পণ্য ছিল না এবং ম্যালেরিয়া আর পেটের অসুখে ছেলেবেলায় এত ভুগতে হয়েছিল যে সকলে আমাকে ঈশ্বরের করুণার ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু কাঁঠালের চাইতেও উঁচুদরের রসের সন্ধান পেয়েছি তখন. কেরোসিন কাঠের বাক্সের গলা অবধি ডুবিয়ে দিয়ে বেদব্যাসের কলম চলছে। কবিতা, গান. রাজকুমার মেঘেন্দ্রজিতের সঙ্গে রাজকন্যা সুবর্ণার প্রেম ও মহাযুদ্ধমূলক কাব্য: একলব্যের গুরুভক্তি অবলম্বনে জ্বালাময়ী নাটক—তার খানিকটা গৈরীশী ছন্দে। নিজে পড়ি, নিজে ছিঁড়ি—, আবার নতুন করে লিখি। রবিনসন্ ক্রুশোর মতো নিজের আবির্ভূত জগতে সীমা সংকীর্ণ হয়ে সৃষ্টি এবং বিষয়ের আনন্দ একাধারে উপভোগ করে যাই।

এর মধ্যে আনন্দ লহরী সিরিজের কতকগুলো রোমাঞ্চকর বই পড়ে ফেলেছিলাম। মাথার মধ্যে ক্রাইম নভেলের একটা নতুন উদ্দীপনা এনে দিলো। আমার একক সাহিত্য-সংসারে এবারে একটা সচিত্র কাগজ বের করে ফেললাম. তার নাম ছিল বোধহয় "চিত্র-বিচিত্র"। কোয়ার্টার ফুলস্ক্যাপ কাগজের আট পৃষ্ঠা—আমিই একাধারে সম্পাদক, শিল্পী, লেখক, মুদ্রাকর ও পাঠক। তিনটে কবিতা, সম্পাদকীয় এবং রহস্য-রোমাঞ্চিত একটি উপন্যাস—প্রথম কিস্তিতেই দুটো ভয়াবহ নরহত্যা ঘটিয়ে দিয়েছিলাম। এই আমার প্রথম গল্প বা উপন্যাস।

আমাদের দিনাজপুরের সেই বাড়িতে—যেখানে ঘন হয়ে আমের ছায়া পড়েছে, খিড়কির ওপার থেকে আসছে বাতাবী ফুলের মিষ্টি গন্ধ. উঠোনে সারি সারি বোয়ামে ছত্রিশ রকমের আচার রোদে শুকোচ্ছে, ইঁদারার পাশে কানে রুপোর মস্ত মস্ত গয়না পরা সাঁওতাল ঝি বুধনি বিকৃত মুখে বাসন মাজছে এবং বাইরে দাদার ঘর থেকে আসছে সঙ্গীত সাধনার কর্ণভেদী কোলাহল, সেই সাধারণ. অতি সাধারণ বাঙালী গৃহস্থের বাড়িতে প্যাকিং বাক্সের দুরারোহ পর্বত শিখরে বসে আমি ফুলস্ক্যাপ

কাগজের আড়াই পৃষ্ঠায় বন্দুক, বোমা, গুপ্তগৃহ আর নৃশংস হত্যাকাণ্ড নিয়ে ব্যতিব্যস্ত—ভাবতে পারেন?—কিন্তু আমি লিখেই চলেছি। "কার সাধ্য রোধে মোর গতি"।

একদিন ধরা পড়ে গেলাম। রিপন কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ স্বর্গীয় রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষের একমাত্র ছেলে সুধীন ঘোষ—ডাকনাম সন্তু—সে ছিল আমার অন্যতম খেলার সঙ্গী। একদিন সে আমাকে ডাকতে এল মার্বেল খেলবার জন্যে। বললে, চল।

আমি বললাম : না, আমি গল্প লিখছি।

—গল্প! সুধীন তো স্তম্ভিত। ঘটনাটা কিছুক্ষণ সে বিশ্বাসই করতে পারলো না। বললে : কই দেখি গল্প।

আমি তাকে 'চিত্র-বিচিত্র' থেকে উপন্যাসটার এক কিস্তি পড়ে শোনালাম। মুহূর্তে ওর একি পরিবর্তন। দেখি সুধীনের চোখমুখ আগ্রহে জ্বলছে। মার্বেল খেলার প্রসঙ্গ ভুলেই গেছে সে। সাগ্রহে বললে—তারপর, তারপর?

সম্পাদকীয় গাম্ভীর্য নিয়ে বললাম, পরের সংখ্যায় বেরুবে।

সুধীন বললে, তোর কাগজের বার্ষিক চাঁদা কত?

বললাম, নিয়মাবলী কাগজের পাতাতেই দেওয়া আছে। বিজ্ঞাপন এক পৃষ্ঠা দু' আনা, আধ পৃষ্ঠা এক আনা, বার্ষিক মূল্য স-ডাক চার পয়সা।

সুধীন তৎক্ষণাৎ প্যান্টের পকেটে হাত পুরে বেন্টনীনের হাড্ডীভাজা খাওয়ার জন্য সঞ্চিত একটা এক আনি বার করে বললে, আমি গ্রাহক হবো।

তারপর থেকে কাগজ বেড়ে গেল। হস্তযন্ত্র থেকে দু' কপি কাগজ মুদ্রিত হতে লাগল। কিন্তু রহস্যোপন্যাসটা আমার গ্রাহককে পাগল করে দিয়েছিল। তিনদিন পরে এসে বলল, নাঃ, বড্ড বেশী দেরী হচ্ছে। তোর কাগজকে সাপ্তাহিক করে দে।

আমি তখন নতুন উৎসাহে দৈনিক দু' সংখ্যা করে বার করতে পারি—সাপ্তাহিক তো কী কথা। আমার প্রথম ভক্ত পাঠকের অনুরোধ উপেক্ষা করা গেল না। "চিত্র-বিচিত্র" সাপ্তাহিক হল।

কাগজ কতদিন চলেছিল কিংবা উপন্যাসটা শেষ হয়েছিল কিনা মনে নেই। কিন্তু সুধীন একদিন কলকাতায় চলে এল বাবার কাছে থেকে লেখাপড়া শিখবে। সেই সঙ্গেই বোধহয় কাগজ আর উপন্যাস বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর আর সুধীনের সঙ্গে দেখা হয়নি—খবরের কাগজে স্পোর্টসম্যান সুধীনের মৃত্যুর খবরও পড়েছি অনেকদিন পরে। কিন্তু আমার সেই প্রথম পাঠকটিকে আজও ভুলিনি—ভুলতেও পারব না কোনদিন। জীবনে বহু বন্ধু পেয়েছি—আমার লেখা ভালবাসেন এমন দু-চারজনও হয়তো আছেন, কিন্তু বাল্যজীবনের সেই মুগ্ধ ভক্তটিকে আর খুঁজে পাবো না কখনো।...

দিন কাটতে লাগলো। কবিখ্যাতি তখন কিছুটা পাড়ার ছেলেদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে। কবিতার পর কবিতা জন্মলাভ করছে—ভরে উঠছে খাতার পর খাতা। এমন সময় দ্বিতীয় গল্পের আবির্ভাব। বেশ নাটকীয় আবির্ভাব। দিনাজপুর মিউনিসিপ্যাল এম-ই স্কুলের একটি ক্লাশে অঙ্ক কষানো হচ্ছে। ক্লাশ নিচ্ছেন বাঘা মাস্টার গোপী রায়—একাধারে অঙ্ক এবং ড্রিল মাস্টার। নামজাদা খেলোয়াড়, প্রহারে প্রচণ্ড, ছাত্ররাজ্যে বিভীষিকা।

অঙ্কে আমি অনবদ্য ছাত্র ছিলাম। তবু কেন জানি না—গোপীবাবু আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। হয়তো একান্ত ক্ষীণজীবী বলেই আমার গায়ে হাত তোলাটা

www.boiRboi.blogspot.com

পুরুষ ব্যাঘ্রের আত্মসম্মানে বাধত। সহপাঠী মেজদা ছিল ক্লাশের এবং অঙ্কের সেরা ছাত্র—তার খাতা থেকেই হোম টাস্ক্ টুকে নিয়ে দিনগত পাপক্ষয় চলত।

গোপীবাবুর পিরিয়ডে পেছনের বেঞ্চে আশ্রয় নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ব্ল্যাকবোর্ড থেকে অঙ্ক টুকবার নাম করে হোম টাস্কের খাতায় একদিন রামপ্রসাদের মতো গল্প লিখে ফেললাম। পাশে বসে ছিল নরেশ চক্রবর্তী—ন্যাড়া মাথা, কানে আংটি। অঙ্কে আমার মতোই পণ্ডিত। সে বোধহয় গোলাপ ফুল আঁকবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু হয়ে উঠেছিল কোলা ব্যাং। হঠাৎ দেখি ঘাড়ের উপর ঝুঁকে পড়ে সে বিমুগ্ধ মনে গল্প পড়ছে।

ক্লাশ শেষ হল। নরেশ বললে : অতি চমৎকার গল্পটা তোর। আমাকে দে, বাঁধিয়ে রাখব।

চমৎকার গল্পকে কি হাতছাড়া করা যায়? দিলাম না। বাড়ীতে নিয়ে এসে ছোট বোনদের সংগ্রহ করে গল্প শোনাতে লেগে গেলাম।

বেশ করুণ গল্প। নামটা মনে আছে : পাশাপাশি। ফুলস্ক্যাপ কাগজের তিন পৃষ্ঠা। বিষয়বস্তু হচ্ছে : পাশাপাশি দুটি বাড়ী, একটিতে বড়লোক আর একটিতে দীন দরিদ্র বাস করে। একদিন বর্ষার সন্ধ্যায় বড়লোকের বাড়ীতে যখন টী পার্টি চলছে তখন গরিবের ছেলেটি বিনা চিকিৎসায় মারা গেল।

ছোট বোনদের চোখ যখন ছলছল করবার উপক্রম, এমন সময় একটা বিরাট অট্টহাসি এবং ছন্দোপতন। কখন যে পিসতুতো ভাই ফুচুদা—অর্থাৎ মহেন্দ্রবাবু এসে জুটেছেন টেরও পাইনি। সাহেবী মেজাজের লোকটি, দার্জিলিং-এ বাস। সুট পরে থাকেন এবং মুখে জ্বলন্ত সিগারেট।

গল্পের মধ্যে এক জায়গায় ছিল মাংসের কচুরি খাওয়ার কথা। শুনে ফুচুদার হাসি আর থামে না—মাংসের কচুরি? তাও কি হয়? নন্‌সেনস্ অ্যান্ড অ্যাবসার্ড। রাবিশ।

মাংসের কচুরি কখনও আমি খাইনি—নামটা কোথাও শুনে থাকব। কাজেই আমি দমে গেলাম—নিদারুণ দমে গেলাম। মনে হল এমন ছলছল করা গল্পটা নিতান্তই প্রহসন হয়ে দাঁড়ালো। খাতা বগলে করে পালিয়ে গেলাম, লেখাটাকে কুচি কুচি করে উড়িয়ে দিলাম হাওয়ায়। অপমানে সেদিন চোখ দিয়ে জলও পড়েছিল। পরে অবশ্য অনেক খেয়েছি আশার হাতে এবং খুব ভালই হয় জেনেছি। কিন্তু সেদিন খুব আঘাত পেয়েছিলাম। কবিতা লিখেছি। 'মাস পয়লা' পত্রিকায় ছোটদের বিভাগে কবিতা লিখে পুরস্কারও পেয়েছিলাম। কবিতাটি ক্ষিতীশ ভট্টাচার্য ও অখিল নিয়োগীর সম্পাদনায় ফাল্গুন ১৩৩৫ সনে প্রকাশিত হয়।

ঘরের কোণে থাকতে বসে
চায়নাকো আর মন
হাতছানি দে' ডাকে আমায়
মাঠ ঘাট, পথ বন।
অনেক দূরের তারার মালা
নীল আকাশের গায়
মিট্‌মিটিয়ে ডাকছে যেন
চোখের ইসারায়
সনসনিয়ে বাতাস যখন
দূরের পথে ধায়

সঙ্গে যেতে আমায় যেন
ডাকটি দিয়ে যায়।
লহর তুলে নদীর বারি
সাগর পানে ধায়
সেও যেন ডাকছে আমায়
"আয় রে ওরে আয়"।
আজ আমারে বিশ্বজগৎ
ডাক দিয়েছে ভাই,
সকল ছেড়ে আজকে আমি
বাইরে ছুটে যাই।

ছোটদের বিভাগে পুরস্কার পেয়ে গর্বে বুক ফুলে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বয়স বাড়লো। সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার পাতায় আমার কাব্য প্রলাপগুলো সাদরে পত্রস্থ হতে লাগলো।

বড়দের জন্যে গল্প লিখছিলাম। হঠাৎ একদিন বিশু মুখোপাধ্যায় এলেন। একটি আশ্চর্যসুন্দর মানুষ—ভালবাসেন সাহিত্যকে, তেমনি ভালবাসেন সাহিত্যিকদের। এসেই ফরমাস করলেন, 'মৌচাকে' গল্প লিখতে হবে ছোটদের জন্যে। ছোটদের গল্প। সে তো দু-একটা লিখেছি কৈশোরে। মফঃস্বলের ছেলে—পাঠিয়েছিলাম কলকাতার দুটো কাগজে। তাঁরা ছেপেও ছিলেন, কিন্তু না পাঠিয়েছেন মনোনয়ন-সংবাদ, না পাঠিয়েছেন কাগজ।

তারপর আরো বড় হয়ে বড়দের পত্রিকায় চলে এসেছি। এখন আবার ছোটদের গল্প! সে মন কোথায় পাব—ছেলেবেলার সেই খুশির জগৎটাকে বা কোথায় পাই। তবু চেষ্টা করা গেল। একটা গম্ভীর গম্ভীর গল্পই লিখলাম। কিন্তু তৃপ্তি এল না।

এর পর বিশুদা শুরু করে দিলেন—আর থামতেও দিলেন না। ফরমাস দিলেন, হাসির গল্প লেখ একটা বার্ষিকীর জন্যে। আরো মুস্কিল। গোমরা মুখ করে মাস্টারি করি—বলতে গেলে ছেলেদের হাসি বন্ধ করাই আমার কাজ, হাসির গল্প কোত্থেকে আসবে।

তখন নিজের ছোটবেলায় ফিরে এলাম। স্মৃতির ভেতর থেকে খুঁজে আনতে লাগলাম সেইসব ঘটনাকে—যাদের কথা ভাবলে এখনো তরল হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণায়। এমনি একটি গল্প দিলাম বিশুদাকে। সেই যে মনের ভেতর হাসির স্রোত বইল আজও তা আর থামল না।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

৩সি পঞ্চাননতলা রোড
গোলপার্ক
কলিকাতা-২৯

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

'তুমি যাও বঙ্গে, কপাল যায় সঙ্গে।'

বঙ্গে আর যাব কোথায়, বঙ্গেই তো আছি—একেবারে ভেজালহীন খাঁটি বঙ্গ-সন্তান। আসলে গিয়েছিলাম 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে'।

সবে দিন সাতেক ম্যালেরিয়ায় ভুগে উঠেছি। এম্‌নিতেই বরাবর আমার খাই-খাইটা একটু বেশি, তার ওপর ম্যালেরিয়া থেকে উঠে খাওয়ার জন্যে প্রাণটা একেবারে হাহি হাহি করে। দিন-রাত্তির শুধু মনে হয় আকাশ খাই, পাতাল খাই, খিদেতে আমার পেটের বত্রিশটা নাড়ি একেবারে গোখরো সাপের মতো পাক খাচ্ছে। শুধু তো পেটের খিদে নয়, একটা ধামার মতো পিলেও জুটেছে সেখানে—আস্তো হিমালয় পাহাড়টাকে আহার করেও বোধহয় সেটার আশ মিটবে না।

সুতরাং 'বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে' বসে গোটা তিনেক ইয়া ইয়া রাজভোগকে কায়দা করবার চেষ্টায় আছে।

'কিন্তু তুমি যাও বঙ্গে—'

হঠাৎ কানের কাছে সিংহনাদ শোনা গেল : এই যে পালা, বেড়ে আছিস্—অ্যাঁ?

আমার পিলেটা ঘোঁৎ করে নেচে উঠেই কোঁৎ করে বসে পড়ল। রাজভোগটায় বেশ জুতসই একটা কামড় বসিয়েছিলাম, সেটা ঠিক তেম্‌নি করে হাত আর দাঁতের মাঝখানে লেগে রইল ত্রিশঙ্কুর মতো। শুধু খানিকটা রস গড়িয়ে আদ্দির পাঞ্জাবিটাকে ভিজিয়ে দিলে।

চেয়ে দেখি—আর কে? পৃথিবীর প্রচণ্ডতম বিভীষিকা—আমাদের পটলডাঙ্গার টেনিদা। পুরো পাঁচ হাত লম্বা খট্‌খটে জোয়ান। গড়ের মাঠে গোরা ঠেঙিয়ে এবং খেলায় মোহনবাগান হারলে রেফারি-পিটিয়ে স্বনামধন্য। আমার মুখে অমন সরস রাজভোগটা কুইনাইনের মতো তেতো লাগল।

টেনিদা বললে, এই সেদিন জ্বর থেকে উঠলি নি? এর ভেতরেই আবার ওসব যা তা খাচ্ছিস্? এবারে তুই নির্ঘাৎ মারা পড়বি।

—মারা পড়ব?—আমি সভয়ে বললাম।

—আলবাৎ! কোন সন্দেহ নেই।—টেনিদা শব্দ-সাড়া করে আমার পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল : তবে আমি তোকে বাঁচাবার একটা চেষ্টা করে দেখতে পারি।

এই বলে, বোধহয় আমাকে বাঁচাবার মহৎ উদ্দেশ্যেই নাকি দুটো রাজভোগ তুলে টেনিদা কপ্-কপ্ করে মুখে পুরে দিলে। তারপর তেমনি সিংহনাদ করে বললে আরো চারটে রাজভোগ।

আমার খাওয়া যা হওয়ার সে তো হল, আমারই পকেটের নগদ সাড়ে তিনটি টাকা খসিয়ে এ যাত্রা আমার প্রাণটা বাঁচিয়ে দিলে টেনিদা। মনে মনে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বেরুলাম দোকান থেকে। ভাবছি এবার হেদোর কোণা দিয়ে সট্ করে ডাফ্ স্ট্রীটের দিকে সট্‌কে পড়ব, কিন্তু টেনিদা কাঁক্ করে আমার কাঁধটা চেপে ধরল। সে তো ধরা নয়, যেন ধারণ। মনে হল কাঁধের ওপর কেউ একটা দেড়মণী বস্তা ধপাস্ করে ফেলে দিয়েছে। যন্ত্রণায় শরীরটা কুঁকড়ে গেল।

—অ্যাই প্যা-লা, পালাচ্ছিস্ কোথায়?

ভয়ে আমার ব্রহ্মতালু অবধি কাঠ। বললাম, ন্-ন্ না, না, পা-পা পালাচ্ছি না তো!

—তবে যে মাণিক দিব্যি কাঠবেড়ালীর মতো গুটি-গুটি পায়ে বেমালুম হাওয়া হয়ে যাচ্ছিলে? চালাকি না চলিষ্যতি। তোকে আমার সঙ্গে যেতে হবে এখন।

—কোথায়?

—দমদমায়।

আমি অবাক হয়ে বললাম, দমদমায় কেন?

টেনিদা চটে উঠল : তুই একটা গাধা।

আমি বললাম, গাধা হবার মতো কী করলাম?

টেনিদা রাঘা গলায় বললে, আর কী করবি? ধোপার মোট বইবি, ধাপার মাঠে কচি কচি ঘাস খাবি, না প্যাঁ-হোঁ প্যাঁ-হোঁ করে চীৎকার করবি? আজ রবিবার, দমদমায় মাছ ধরতে যাব—এটা কেন বুঝিস্ নে উজবুক কোথাকার?

—মাছ ধরতে যাবে তো যাও—আমাকে নিয়ে টানাটানি করছ কেন?

—তুই না গেলে আমার বঁড়শিতে টোপ গেঁথে দেবে কে, শুনি? কেঁচো-টেঁচো বাবা আমি হাত দিয়ে ঘাঁটতে পারব না—সে বলে দিচ্ছি।

—বাঃ, তুমি মাছ মারবে আর কেঁচোর বেলায় আমি?

—নে, রাস্তায় দাঁড়িয়ে এখন আর ফ্যাঁচফ্যাঁচ করতে হবে না। চটপট চল শেয়ালদায়। পনের মিনিটের ভেতরেই একটা ট্রেন আছে।

আমি দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি, টেনিদা একটা হ্যাঁচ্কা মারলে। টানের চোটে হাতটা আমার কাঁধ থেকে উপড়েই এল বোধ হল। 'গেছি গেছি' বলে আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

—যাবি কোথায়? আমার সঙ্গে দমদমায় না গেলে তোকে আর কোথাও যেতে দিচ্ছে কে! চল্ চল্। রেডি—ওয়ান, টু—

কিন্তু থ্রী বলবার আগেই আমি যেন হঠাৎ দুটো পাখনা মেলে হাওয়ায় উড়ে গেলাম। মাথা ঝিম্ঝিম্ করতে লাগল, কানে শব্দ বাজতে লাগল ভোঁ-ভোঁ। খেয়াল হতে দেখি, টেনিদা একটা সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে আমাকে তুলে ফেলেছে।

আমাকে বাজখাঁই গলায় আশ্বাস দিয়ে বললে, যদি মাছ পাই তবে ল্যাজ থেকে কেটে তোকে একটু ভাগ দেব।

কী ছোটলোক! যেন মুড়ো পেটি আমি আর খেতে জানি না! কিন্তু তর্ক করতে সাহস হল না। একটা চাঁটি হাঁকড়ালেই তো মাটি নিতে হবে, তারপরে খাটিয়া চড়ে খাঁটি নিমতলা-যাত্রা! মুখ বুজে বসে রইলাম। মুখ বুজেই শিয়ালদা পৌঁছুলাম। তারপর সেখান থেকে তেমনি মুখ বুজে গিয়ে নামলাম দমদমায় গোরাবাজারে।

রেল-লাইনের ধার দিয়ে বনগাঁর মুখে খানিকটা এগোতেই একটা পুরোনো বাগান-বাড়ি। টেনিদা বললে, চল, ওর ভেতরেই মাছ ধরবার বন্দোবস্ত আছে।

আমি তিন পা পিছিয়ে গেলাম। বললাম, খেপেছ? এর ভেতরে মাছ ধরতে যাবে কী রকম! ওটা নির্ঘাৎ ভূতুড়ে বাড়ি।

টেনিদা হনুমানের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তোর মুণ্ডু! ওটা আমাদের নিজেদের বাগান-বাড়ি, ওর ভেতরে ভূত আসবে কোত্থেকে? আর যদি আসেই তো এক ঘুষিতে ভূতের বত্রিশটা দাঁত উড়িয়ে দোব—হুঁ হুঁ! আয়—আয়—

মনে মনে রামনাম জপতে জপতে আমি টেনিদার পেছনে পেছনে পা বাড়ালাম।

বাগান-বাড়িটা বাইরে থেকে যতটা জংলা মনে হচ্ছিল, ভেতরে তা নয়। একটা মস্ত ফুলের বাগান। এখন অবশ্য ফুলটুল বিশেষ কিছু নেই, কিন্তু পাথরের ন্যাংটা-গুলো মূর্তি এদিকে ওদিকে ছড়ানো রয়েছে। কিছু কিছু ফলের গাছ—আম লিচু,

www.boiRboi.blogspot.com

নারকেল—এইসব। মাঝখানে পুরোনো ধরনের একখানা ছোট বাড়ি। দেওয়ালের চুণ খসে গেছে, ইট ঝরে পড়েছে এদিকে ওদিকে, তবু বেশ সুন্দর বাড়ি। মস্ত বারান্দা, তাতে খান কয়েক বেতের চেয়ার পাতা।

বারান্দায় উঠেই টেনিদা একখানা বোম্বাই হাঁক ছাড়লে, ওরে জগা—

দূর থেকে সাড়া এল, আসুচি।...তারপরেই দ্রুতবেগে এক উড়ে মালীর প্রবেশ। বললে, দাদাবাবু আসিলা?

টেনিদা বললে, হুঁ আসিলাম। এতক্ষণ কোথায় ছিলি ব্যাটা গোভূত? শিগ্গির যা, ভালো দেখে গোটা কয়েক ডাব নিয়ে আয়।

—আনুচি—

বলেই জগা বিদ্যুৎবেগে বানরের মতো সামনের নারকেল গাছটায় চড়ে বসল, তারপর মিনিট খানেক মধ্যেই নেমে এল ডাব নিয়ে। পর পর চারটে ডাব খেয়ে টেনিদা বললে, সব ঠিক আছে জগা?

জগা বললে, হুঁ।

বঁড়শি, টোপ, চার—সব?

জগা বললে, হুঁ।

—চল প্যালা, তা'হলে পুকুরঘাটে যাই।

পুকুরঘাটে এলাম। সত্যিই খাসা পুকুরঘাট। সাদা পাথরে খাসা বাঁধানো। পুকুরে অল্প অল্প শ্যাওলা থাকলেও দিব্যি টলটলে জল। ঘাটটার ওপরে নারকেলপাতার ছায়া ঝির্ঝিরে বাতাসে কাঁপছে। পাখি ডাকছে এদিকে ওদিকে। মাছ ধরবার পক্ষে চমৎকার জায়গা। ঘাটটার ওপরে দুটো বড় বড় হুইল বঁড়শি—বঁড়শি দুটোর চেহারা দেখলে মনে হয় হাঙর-কুমীর ধরবার মতলব আছে।

টেনিদা আবার বললে, চার করেছিস্ জগা?

—হুঁ।

—কেঁচো তুলেছিস্?

—হুঁ।

—তবে যা তুই, আমাদের জন্যে খিচুড়ির ব্যবস্থা করগে। আয় প্যালা, এবার আমরা কাজে লেগে যাই। নে বঁড়শিতে কেঁচো গাঁথ।

আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে বললাম, কেঁচো গাঁথব?

টেনিদা হুঙ্কার ছাড়ল : নইলে কি তোর মুখ দেখতে এখানে এনেছি নাকি? ওই তো বাংলা পাঁচের মতো তোর মুখ, ওমুখে দেখবার মতো কী আছে র‍্যা? মাইরি প্যালা, এখন বেশি বকাস্ নি আমাকে—মাথায় খুন চেপে যাবে। ধর, কেঁচো নে।

কী কুক্ষণেই আজ বাড়ি থেকে বাইরে পা বাড়িয়েছিলাম রে। এখন প্রাণটা নিয়ে ঘরের ছেলে মানে মানে ঘরে ফিরতে পারলে হয়। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে টেনিদার বোধ হয় দয়া হল। বললে, নে নে, মন খারাপ করিস্ নি। আচ্ছা, আচ্ছা—মাছ পেলে আমি মুড়োটা নেব আর সব তোর। ভদ্দর লোকের এক কথা। নে, এখন কেঁচো গাঁথ।

মাছ টেনিদা যা পাবে সে তো জানাই আছে আমার। লাভের মধ্যে আমার খানিক কেঁচো-ঘাঁটাই সার। এরই নাম পোড়া কপাল।

কিন্তু ভদ্দর লোকের এক কথা। সে যে কী সাংঘাতিক কথা সেটা টেনিদা টের পেল একটু পরে।

ছিপ ফেলে দিব্যি বসে আছি।

বসে আছি তো আছিই। জলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে চোখ ব্যথা করতে লাগল।

কিন্তু কা কস্য! জলের ওপর ফাতনাটি একেবারে গড়ের মাঠের মনুমেন্টের মতো খাড়া হয়ে আছে। একেবারে নট্ নড়ন-চড়ন—কিচ্ছু না।

আমি বললাম, টেনিদা, মাছ কই?

টেনিদা বললে [illegible], কথা বলিস্ নি। মাছে ভয় পাবে।

আবার আধঘণ্টা কেটে গেল। বুড়ো আঙুলে কাঁচকলা দেখাবার মতো ফাতনাটি তেমনি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। জলের অল্প অল্প ঢেউয়ে একটু একটু দুলছে, আর কিচ্ছু নেই।

আমি বললাম, ও টেনিদা, মাছ কোথায়?

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, থাম না। কেন বকর-বকর করছিস্ র‍্যা? এসব বাবা দশ-বিশ সেরী কাতলার ব্যাপার—এ কী সহজে আসে? এ তো একেবারে পেল্লায় কাণ্ড। নে এখন মুখে ইস্ক্রুপ্ এঁটে বসে থাক।

ফের চুপচাপ। খানিক পরে আমি আবার কি একটা বলতে যাচ্ছি, কিন্তু টেনিদার দিকে তাকিয়েই থমকে গেলাম। ছিপের ওপরে একেবারে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে, চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে তার।

সত্যিই তো—এ যে দস্তুর মতন অঘটন। চোখকে আর বিশ্বাস করা যায় না; ফাতনা টিপ্-টিপ্ করে নাচছে মাছের ঠোকরে।

আমাদের দু জোড়া চোখ যেন গিলে খাচ্ছে ফাতনাটাকে। দু'হাতে ছিপটাকে আঁকড়ে ধরেছে টেনিদা—আর একটু গেলেই হয়! টিপ্-টিপ্—আমাদের বুকও ঢিপ্-ঢিপ্ করছে সঙ্গে সঙ্গে। আমি চাপা গলায় চেঁচিয়ে উঠলাম, টেনিদা—

—জয় বাবা মেছো পেত্নী, হেঁইয়ো—

ছিপে একটা জগঝম্প টান লাগাল টেনিদা। সপাং-সাঁই করে একটা বেখাপ্পা আওয়াজে বঁড়শি আকাশে উড়ে গেল, মাথার ওপর থেকে ছিঁড়ে পড়ল নারকেলপাতার টুকরো। কিন্তু বঁড়শি! একদম ফাঁকা—মাছ তো দূরে থাক, মাছের একটি আঁশ পর্যন্ত নেই।

টেনিদা বললে, অ্যাঁ, ব্যাটা বেমালুম ফাঁকি দিলে! আচ্ছা, আচ্ছা যাবে কোথায়! আজ ওরই একদিন কি আমারই একদিন। নে প্যালা, আবার কেঁচো গাঁথ—

টান দেখেই বুঝতে পারছি কি রকম মাছ উঠবে! মাছ তো উঠবে না, উঠবে জলহস্তী। কিন্তু বলে আর চাঁটি খেয়ে লাভ কি, কেঁচো গাঁথা কপালে আছে, তাই গেঁথে যাই।

কিন্তু টেনিদার চারে আজ বোধ হয় গণ্ডা গণ্ডা রুই-কাতলা কিল্‌বিল্ করছে। তাই দু' মিনিট না যেতেই এ কী! দু নম্বর ফাতনাতেও এবার টিপ্-টিপ্ শুরু হয়েছে।

বললাম, টেনিদা, এবারে সামাল্।

টেনিদা বললে, আর ফস্কায়? বারে বারে ঘুঘু তুমি—হুঁ হুঁ! কিন্তু কথা বলিস্ নি প্যালা—চুপ! টিপ্-টিপ্-টিপ্। টপ্!

সাঁ করে আবার বঁড়শি আকাশে উঠল, আবার ছিঁড়ে পড়ল নারকেলপাতা। কিন্তু মাছ? হায়, মাছই নেই।

টেনিদা বলেন, এবারেও পালাল? উঃ—জোর বরাত ব্যাটার। আচ্ছা, দেখে নিচ্ছি। কেঁচো গাঁথ প্যালা! আজ এস্পার কি ওস্পার।

তাজ্জব লাগিয়ে দিল বটে। বঁড়শি ফেলবামাত্র ফাতনা ডুবিয়ে নিচ্ছে, অথচ টানলেই ফাঁকা। এ কি ব্যাপার! এমন তো হয় না—হওয়ার কথাও নয়।

টেনিদা মাথা চুলকোতে লাগল। পর পর গোটা আষ্টেক টানের চোটে মাথার

www.boiRboi.blogspot.com

ওপরে নারকেলগাছটাই ন্যাড়ামুড়ো হয়ে গেল, কিন্তু মাছের একটুকরো আঁশও দেখা গেল না।

টেনিদা বললে, এ কিরে, ভুতুড়ে কাণ্ড নাকি?

পেছনে কখন জগা এসে দাঁড়িয়েছে আমরা টেরও পাই নি। হঠাৎ পানে রাঙা একমুখ হেসে জগা বললে, আইজ্ঞা ভুতো নয়, কাঁকোড়া আছে।

—কাঁকোড়া? মানে কাঁকড়া?

—জগা বললে, হুঁ।

—তবে আজ কাঁকড়ার বাপের শ্রাদ্ধ করে আমার শান্তি!...আকাশ কাঁপিয়ে হুংকার ছাড়লে টেনিদা : বসে বসে নিশ্চিন্তে আমার চার আর টোপ খাচ্ছে? খাওয়া বের করে দিচ্ছি। একটা বড় দেখে ডালা কিংবা ধামা নিয়ে আয় তো জগা!

—ডালা! ধামা!—আমি অবাক হয়ে বললাম, তাতে কি হবে?

—তুই চুপ কর প্যালা—বকালেই চাঁটি লাগাব। দৌড়ে যা জগা—ধামা নিয়ে আয়।

আমি সভয়ে ভাবলাম টেনিদার কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? ধামা হাতে করে পুকুরে মাছ ধরতে নামবে এবারে?...কিন্তু—

কিন্তু যা হল তা একটা দেখবার মতো ঘটনা। সাবাস্ একখানা খেল্, একেবারে ভানুমতীর খেল্। এবার ফাতনা ডুবতেই আর হেঁইয়া শব্দে টান দিলে না টেনিদা। আস্তে আস্তে অতি সাবধানে বঁড়শিটাকে ঘাটের দিকে টানতে লাগল। তারপর বঁড়শিটা যখন একেবারে কাছে চলে এসেছে, তখন দেখা গেল মস্ত একটা লাল রঙের কাঁকড়া বঁড়শিটা প্রাণপণে আঁকড়ে আছে। টেনিদা বললে, বঁড়শি জলের ওপর তুললেই ও ব্যাটা ছেড়ে দেবে। বঁড়শি আমি তোলবার আগে ঠিক জলের তলায় ধামাটা পেতে ধরবি, বুঝলি জগা! তারপর দেখা যাবে কে বেশি চালাক—আমি, না ব্যাটাচ্ছেলে কাঁকড়া!

তারপর আরম্ভ হল সত্যিকারের শিকারপর্ব। টেনিদার বুদ্ধির কাছে এবারে কাঁকড়ার দল ঘায়েল। আধঘণ্টার মধ্যে ধামা বোঝাই!

দুটো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হুইলের শিকার দু' কুড়ি কাঁকড়া!

টেনিদা বললে, মন্দ কি! কাঁকড়ার ঝোলও খেতে খারাপ নয়। তোর খিচুড়ি কতদূর জগা?

কিন্তু ভদ্দর লোকের এক কথা। আমি সেটা ভুলি নি।

বললাম, টেনিদা, মুড়োটা তোমার—আর ল্যাজা-পেটি আমার—মনে আছে তো?

টেনিদা আঁতকে বললে, অ্যাঁ!

আমি বললাম, হ্যাঁ।

টেনিদা এক মিনিটে কাঁচুমাচু হয়ে গেল, তাহলে?

—তাহলে মুড়ো, অর্থাৎ কাঁকড়ার দাঁড়া দুটো তোমার, আর বাকি কাঁকড়া আমার।

টেনিদা আর্তনাদ করে বললে, সে কি?

আমি বললাম, ভদ্দর লোকের এক কথা।

—তাহলে কাঁকড়ার কি মুড়ো নেই?

মুড়ো না থাকলেও মুখ আছে, কিন্তু আমি সে চেপে গেলাম। বললাম, ওই দাঁড়াই হল ওদের মুড়ো।

টেনিদা খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে বসে পড়ল। বললে, প্যালা, তোর মনে এই ছিল! ও হো-হো-হো—

তা যা খুশি বলো। বঙ্গেশ্বরী মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে সাড়ে তিন টাকার শোক কি আমি এর মধ্যেই ভুলেছি!

আজ দু'দিন বেশ আরামে কাঁকড়ার ঝোল খাচ্ছি। টেনিদা কাঁকড়ার দাঁড়া কি রকম খাচ্ছে বলতে পারব না, কারণ রাস্তায় সেদিন আমাকে দেখেও ঘাড় গুঁজে গোঁ-গোঁ করে চলে গেল, যেন চিনতেই পারে নি।

অথ নিমন্ত্রণ ভোজন

পিসতুতো ভাই ফুচুদার সবই ভালো, কেবল নেমন্তন্নের নাম শুনলেই তাঁর আর মাথাটা ঠিক থাকে না।

দিব্যি আছেন ভদ্রলোক, খাচ্ছেন দাচ্ছেন, বাঁশি বাজাচ্ছেন। কোনো ঝামেলা নেই। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলেন রাঘব মুখুয্যের বাপের শ্রাদ্ধে নেমন্তন্ন করে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে ফুচুদার ভাবান্তর। দু'দিন আগে থেকে খাওয়া কমিয়ে দিলেন, তারপর শুরু করে দিলেন ডন আর বৈঠ্‌কী। শরীর ভালো করা চাই, খিদেটাকে চাগিয়ে তোলা চাই। পরস্মৈপদী লুচি-পান্তুয়া যত বেশি পেটস্থ করে আনা যায় ততই লাভ!

বর্ণনাটা শুনে মনে হতে পারে লোকটি ইয়া তাগড়া জোয়ান—বুকের ছাতি বুঝি বায়ান্ন ইঞ্চি! কিন্তু ভুল—একদম ভুল। আমি শ্রীমান প্যালারাম বাঁড়ুয্যে—পালাজ্বরে ভুগি, বাসকপাতার রস আর চিরতা খেয়ে প্রাণটাকে ধরে রেখেছি। সুতরাং যারা আমাকে দেখ নি তারাও নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমার চেহারাটা কী রকম। কিন্তু বললে বিশ্বাস করবে না—সেই আমি—স্বয়ং শ্রীমান প্যালারাম—ল্যাং মেরে ফুচুদাকে চিৎপটাং করে দিতে পারি; অর্থাৎ ফুচুদা রোগা একেবারে প্যাকাটির মতো—ঝাঁকড়া চুলওয়ালা মাথাটি দেখতে একটা খেজুরগাছের আগার মতো—আর পিলেতে ঠাসা পেটটা দেখলে মনে হয় কোন্‌দিন সেটা বেলুন হয়ে ভদ্রলোককে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই তো চেহারা—কিন্তু আহারের ক্ষমতাটি অসাধারণ। অত বড় পিলের সাম্রাজ্য পেটে নিয়ে লোকটা লুচি-মণ্ডাগুলো যে কোথায় রাখে এ একটা গুরুতর ভাবনার বিষয়। ক্লাসে অঙ্কের পরীক্ষায় আমি প্রায়ই গোল্লা খাই। তবু অনেক চিন্তা করে আমার মনে হয়েছে ফুচুদার পেটের পরিধি নির্ধারণ করার চাইতে স্কোয়াররুটের অঙ্ক কষাও সোজা।

এই ভদ্রলোকের পাল্লায় পড়ে একবার একটি নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছিলাম।

জীবনে অনেক দুঃখই ভুলেছি। এমন কি গত বছর খেলার মাঠে কাটা-ঘুড়ির পিছনে ছুটবার সময় একটা নেড়ী কুকুর যে আমার বড় সাধের নতুন আলবার্ট জুতো-জোড়া আমসত্ত্ব ভেবে চিবিয়ে খেয়েছিল, তা পর্যন্ত ভুলে যেতে রাজী আছি। কিন্তু

www.boiRboi.blogspot.com

ফুচুদার সঙ্গে নেমন্তন্ন রক্ষা করতে গিয়ে যে সাংঘাতিক দাগা পেয়েছিলাম—মরে গেলেও সে আমি ভুলব না।

থাকি মফস্বল শহর দিনাজপুরে—পড়ি জেলা ইস্কুলে। এমন সময় আমাদের দু'ভাইয়ের পৈতে হল। আমি প্যালা, আর মেজদা ন্যালা কানে বেলকাটার ফুটো নিয়ে নাক টিপে প্রাণায়াম করি আর পঞ্জিকা খুলে খুলে খুঁজি কবে সায়ংসন্ধ্যা নাস্তি!

তোমাদের ভেতরে যাদের পৈতে হয়েছে তারা নিশ্চয় জানো যে এই সময় ব্রাহ্মণ-বটুদের দামটা কী রকম বেড়ে যায়। পাড়ার বুড়ীদের যত ফলদানের ব্রত—সে তো আমাদের বাঁধা! দ্বাদশজন ব্রাহ্মণ ভোজনেও আমাদের ডাক পড়বেই। বেশ সুখেই ছিলাম—সন্দেহ কী।

আমাদের এক আত্মীয় আছেন—নাম শ্যামানন্দ চৌধুরী। থাকেন দিনাজপুরের পরের স্টেশন বিরোলে—সেখানে যেন তাঁর কী একটা ব্যবসা আছে।

হঠাৎ শ্যামানন্দবাবুর শখ হল তিনি তাঁর বাবার বাৎসরিক শ্রাদ্ধে জন কয়েক ব্রাহ্মণ ভোজন করাবেন।

বিরোল জায়গাটি ছোট। একটি বাজার, খান কয়েক দোকান—একটি থানা। অনেক কুড়িয়ে বাড়িয়েও ন'জনের বেশি ব্রাহ্মণের সন্ধান সেখানে পাওয়া গেল না। সুতরাং শ্যামানন্দবাবু দিনাজপুরে এলেন বাকি তিনজন ব্রাহ্মণের খোঁজে। আর যোগাড় করলেন কাকে কাকে—বল তো? আমি প্যালা, মেজদা ন্যালা, আর পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে।

সেদিন বিকেলেই দেখলাম উঠানে দাঁড়িয়ে ফুচুদা প্রাণপণে মুগুর ভাঁজছেন। সে একখানা দেখবার মতো জিনিস। পাড়ার যত কাক সেদিন সে ব্যাপার দেখে কা কা করে মাইল তিনেক দূরে পালিয়ে গেল। বেগুনক্ষেতে বাঁশের মাথায় কেলে হাঁড়ি দেখলেও তাদের এত ভয় করে না।

পরদিন সকাল থেকেই নামল মুষলধারে বৃষ্টি।

সারা বছরেও বোধ হয় কোনদিন এমন বেথাপ্পা বৃষ্টি নামে নি। আকাশের চৌবাচ্চাটা কী করে সেদিন ফুটো হয়ে গিয়েছিল কে জানে—হড়-হড় করে জল যে পড়তে লাগল তার আর বিরাম নেই।

আর অবস্থা দেখে ফুচুদার চোখ দিয়েও অমনি করে বর্ষা নামবার উপক্রম। আহা হা—বিরোলের কই মাছ বিখ্যাত—তার তিনটেতে সের হয়। তা ছাড়া আগের দিন বিকেলে শ্যামানন্দবাবু দিনাজপুর থেকে যে পরিমাণ বাজার করে নিয়ে গেছেন তাতে ওখানে যে দস্তুরমতো একটা রাজসূয় যজ্ঞের আয়োজন করেছেন তাতেও সন্দেহ নেই! কিন্তু যা বৃষ্টি—স্টেশনে যাওয়া তো দূরের কথা, বাড়ি থেকে বেরুনোও অসম্ভব।

শুধু ফুচুদা কেন—আমাদের মনটাও খারাপ হয়ে গেল।

দশটার ট্রেনে আমাদের যাওয়ার কথা। ন'টা বাজতে না বাজতেই ফুচুদা ছটফট করতে লাগলেন। ইচ্ছেটা—ওই বৃষ্টির মধ্যেই বেরিয়ে পড়বেন।

আর থাকতে না পেরে ফুচুদা দরবার করতে গেলেন বাবার কাছে।

—মামা, ট্রেনের সময় তো হল।

বাবা ভয়ানক রাশভারী লোক—ছুটির দিন বসে বসে পড়েন মোটাসোটা ফিলজফির বই, আর সে সময় কেউ বিরক্ত করলে ভয়ঙ্কর চটে যান। ফুচুদার কথা শুনে তিনি বই থেকে মুখ তুললেন, চশমাটা নামিয়ে আনলেন নাকের একেবারে ডগাটাতে, শান্তভাবে প্রশ্ন করলেন, তাতে কী হয়েছে?

—বিরোল তো যেতেই হয়—

বাবা বললেন, হুঁ।

—ব্রাহ্মণ-ভোজনের ব্যাপার, না গেলে ভদ্রলোকের—

মুখের কথাটা লুফে নিয়ে বাবা বললেন, ভদ্রলোকের স্বর্গীয় বাপের গলায় পিণ্ডি সেঁধোবে না—এই তো? তা নাই সেঁধোল—এই বাদলার দিনে একবেলা উপোস করে থাকলেও তাঁর ক্ষতি হবে না। ভেবেছ এই বৃষ্টির ভেতরে আমি তোমাদের বেরুতে দেব? তারপর ভিজে তিনজনের নিমোনিয়া হলে ডাক্তারের কড়ি গুণবে কে? যাও—এখন ঘরে বসে লজিক পড়ো গে। বিকেলে আমি পরীক্ষা নেব।

হাঁড়ির মতো মুখ করে ফুচুদা পালিয়ে এলেন।

ছোট বোন আনি অত্যন্ত ফাজিল। বললে, ফুচুদা—একটা কোলাব্যাং মেরে উঠোনে চিৎ করে রাখো—এখুনি বৃষ্টি ধরে যাবে।

ফুচুদা দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, যা—যা—

কিন্তু কপাল ভালো, হঠাৎ ঝাঁ করে বৃষ্টিটা থেমে গেল।

আর কথাবার্তা নেই—ফুচুদা আমাদের দু ভাইকে বগলদাবা করে সোজা ছুট দিলেন ইস্টেশনের দিকে। দশটার ট্রেনটা আধঘণ্টা আগেই বেরিয়ে গেছে—আরো আধ-ঘণ্টা পরে এগারোটার গাড়ি পাওয়া গেল। আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে ফুচুদা বললেন, দেখলি তো ট্রেনটা কী রকম পেয়ে গেলাম। আরে, শাস্ত্রে কী বলেছে জানিস্? ব্রাহ্মণ-ভোজনের নিমন্ত্রণ যে অবহেলা করে, তাকে চৌষট্টি হাজার রৌরব আর কুম্ভী-পাক নরকে বাস করতে হয়।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, কোন্ শাস্ত্রে আছে ফুচুদা?

ফুচুদা গম্ভীর হয়ে বললেন, পেটার্থ-সংহিতায়। লিখেছেন অগস্ত্য মুনি। দুনিয়ার সেরা পেটুক—এক চুমুকে সমুদ্রটাকেই জলপান করে ফেলেছিলেন।

ট্রেনটা সবে স্টেশন ছেড়ে বেরিয়েছে এমন সময় আবার বৃষ্টি।

ফুচুদা বললেন, তা হোক। খায়েঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা। সাইক্লোন হলেও কেউ আজ আর ঠেকাতে পারবে না। আহা হা—বিরোলের কই আর রাধিকাপুরের চমচম—এক-খানা মণি-কাঞ্চন যোগ যা হবে।

উস্-উস্ করে জিভে জল টেনে নিয়ে বাজখাঁই গলায় ফুচুদা বিকট রাগিণী ধরলেন :

"যদি কুমড়োর মতো চালে ধরে র'ত
পান্তুয়া শত শত,
আর ধানের মতন হ'ত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত,
আমি গোলা ভরে তুলে রাখতাম গো—"

দশ-বারো মিনিটের পথ। বিরোল স্টেশনে এসে যখন আমরা নামলাম তখন প্রবল বৃষ্টিতে চারিদিকের কোন কিছু আর দেখা যাচ্ছে না। মোটা মোটা ধারায় অশ্রান্ত ভাবে জল পড়ছে আর বৃষ্টির রেণু যেন ঘন কুয়াশার মতো আকাশ-বাতাস মাঠ-ঘাটকে ঢেকে ফেলেছে। কোনোখানে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

সঙ্গে ছাতা ছিল। কিন্তু সে বৃষ্টি কি আর ছাতায় বাগ মানবার পাত্র! রাস্তাও কম নয়—স্টেশন থেকে প্রায় একটি মাইলের ধাক্কা!

আমরা বললাম, ফুচুদা—যা বৃষ্টি, একটু স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেলে হয় না?

ফুচুদা বললেন, বৃষ্টি! বৃষ্টি তো হয়েছে কী? বর্ষাকালে আকাশ থেকে জল পড়বে না তো পাকা তাল পড়বে নাকি? চল্ চল্। এমনিতেই দেরি হয়ে গেছে, আরো দেরি করে গেলে বাকি ন'টা বামুনে সব ক'টা কই মাছ আর সবগুলো চমচম

www.boiRboi.blogspot.com

বেমালুম মেরে দেবে। খানিকটা ঝোল আর খানিক রস ছাড়া আর কিছু জুটবে না তাহলে। নে—বেরিয়ে পড়। গায়ে একটু জলের ছিটে না লাগতেই ছাগলের মতো ঘরের দাওয়া খুঁজে বেড়াস্, জীবনে কী করে উন্নতি করবি—অ্যাঁ?

তা বটে। জীবনে উন্নতি করাটা খুবই দরকার বলে শুনেছি। কিন্তু এমন প্রাণান্তিক নেমন্তন্ন না খেলে সে উন্নতি যে হতে পারে না, একথা কখনো শুনি নি। তবু বেরুতেই হল।

ফুচুদা বললেন, দুর্গা-দুর্গা—দুর্গে দুর্গতিনাশিনী! কিন্তু বৃষ্টির শব্দে দেবী বোধ হয় ফুচুদার কথা ভালো করে শুনতে পান নি। 'দুর্গতিনাশিনী' না শুনে শুনে-ছিলেন বোধ করি 'দুর্গতি-দায়িনী'। তাই পরমানন্দে দুর্গা আমাদের দুর্গতি শুরু করে দিলেন।

রেল-লাইনের পাশ দিয়ে কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় তার যা শ্রী হয়েছে ভাষায় তার বর্ণনা সম্ভব নয়। হাঁটু-প্রমাণ কাদার তলায় জুতো চালান হয়ে যেতে লাগল। পা উঠে এল—জুতো এল না। কাদা হাতড়ে হাতড়ে—যেমন করে লোকে জিওল মাছ ধরে, তেমনি করে—আমরা জুতো উদ্ধার করতে লেগে গেলাম।

বৃষ্টি পড়ছে সমানে। ছাতার ভেতর দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়া আসছে—কই মাছের সঙ্গে চমচমের মতো মণি-কাঞ্চন যোগ হয়েছে। জামা-কাপড়ের আধ ইঞ্চিও শুক্‌নো নেই—ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর বৃষ্টির জলে আমরা হি-হি করে কাঁপছি।

ফুচুদা বুক ঠুকে বললেন, ইস্‌মে ক্যায়া হ্যায়? ধৈর্য চাই—বুঝলি ধৈর্য চাই। দ্যাখ্‌না—বিদ্যেসাগর মশাই—

নীতি-মূলক গল্পটা শেষ হওয়ার আগেই ফুচুদার আর্তনাদ উঠল : আরে—আহা-হা—

দমকা হাওয়ায় ফুচুদার ছাতাটা বেমালুম উল্‌টে গেছে।—আরে মোলো—

প্রাণপণে ছাতায় চাপ দিয়ে ঠিক করতে গিয়েই—মট্ মট্। দু' দুটো শিকের গয়াপ্রাপ্তি।

—ধ্যাত্তোর—যাত্রাটাই খারাপ—এতক্ষণে ফুচুদার স্বীকারোক্তি, কিন্তু দমবার লোক নন তিনি। বললেন, তা হোক। খাওয়াটা ভালোই হবে—কি বলিস্? বিরোলের কই আর রাধিকাপুরের চম্—

কিন্তু বাকি 'চম্'টা বলবার আগেই দম্—একেবারে আলুর দম। ফুচুদা কাদায় ভূত হয়ে গাত্রোত্থান করতে না করতেই আবার অধঃপতন! এঁটেল মাটিতে পা আর দাঁড়ায় না।

দৃশ্যটা উপভোগ করব কী—ততক্ষণে দু'ভাই—আমি প্যালা, আর মেজদা ন্যালা, দু'জনেই আছাড় খেয়ে পড়েছি। পাঁচ মিনিট ধস্তাধস্তির পরে তিনজনে যখন উঠে দাঁড়াতে পারলাম, তখন কেউ কাউকে চেনা তো দূরের কথা—নিজেরাই নিজেদের চিনতে পারছি না। একটু আগেই প্যালারাম ছিলাম তাতে সন্দেহ নেই—কিন্তু এখন আমি কে? কাদায় যা অবস্থা হয়েছে, তাতে তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এখন আমিও হতে পারি, মেজদা ন্যালাও হতে পারি—এমন কি ফুচুদা হওয়াও আশ্চর্য নয় বোধ হয়!

নিজের নিজত্ব সম্বন্ধে সজাগ হবার আগেই আবার পতন, আবার উত্থান, পুনরায় পতন। কখনো পর পর তিনজন, কখনো একসঙ্গে দু'জন, কখনো বা তিনজনই এক-সঙ্গে। পতন-অভ্যুদয়ের সে কি বিচিত্র লীলা! আঘাত খেতে খেতে এখন আর ব্যথা পাচ্ছি না—আছাড় খাওয়াটা যেন নেশার মতো ধরেছে আমাদের। কারো মুখে আর

কোন কথা নেই, পড়ছি, উঠছি আবার পড়ছি। যেন জীবনে আছাড় খাওয়াই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য।

খানিক পরে পায়ের নীচে আবার শক্ত জমি পাওয়া গেল। আর মুখ খুলল ফুচুদার : উঃ—কার মুখ দেখে আজ বেরিয়েছিলাম রে! একেবারে ত্রিভুবন দেখিয়ে দিলে। আচ্ছা—এর শোধ তুলব, কই—

কথাটা শেষ হল না—সঙ্গে সঙ্গে যেন ভোজবাজী। ধপাস্ ঝুপ্ করে একটা শব্দ আর ফুচুদা ভ্যানিশ্।

আমি প্যালা, আর মেজদা ন্যালা—আমরা দু'ভাই নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না! সত্যিই ফুচুদা নেই, কোথাও নেই! রাস্তার পাশে একটা ছোট নালা দিয়ে বর্ষার জল যাচ্ছে—শুধু তার ওপরে একটা ছাতার বাঁট দেখা যাচ্ছে। আর স্থলে জলে অন্তরীক্ষে—উঁহু—কোথাও নেই। ফুচুদা একেবারে হাওয়া! ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?

আমরা দু'ভাই প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠলাম : ও ফুচুদা—

নালার জলে বিরাট আলোড়ন। ওরে বাবা, কুমীর উঠছে নাকি?

না, ভয় নেই—কুমীর নয়, ফুচুদা উঠে এলেন। বৃষ্টির জলে যেটুকু বাকি ছিল—নালার জল তা শেষ করে দিয়েছে। গা বোঝাই পাঁক—ঘাড়ে মাথায় একরাশ পচা পাতা—নাকে মুখে ব্যাঙাচির নৃত্য—ফুচুদার সে কী রূপ খুলেছে—মরি মরি!

ফুচুদা হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, একপাটি জুতো গেল। অনেক ডুবে ডুবে খুঁজলাম—ব্যাটাকে কোথাও পাওয়া গেল না। নাঃ—কপালটাই খারাপ!

তবু সব পথের শেষ আছে, আমাদেরও শেষ হল।

নেমন্তন্ন বাড়িতে যখন পেঁছিলাম তখন আমাদের দেখে শ্যামানন্দবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, সর্বনাশ এ কী হয়েছে! এস, কাপড়-জামা ছেড়ে ফেল এখুনি—

তোমরা ভাবছ এত দুঃখের পরে খাওয়াটা বোধ হয় ভালোই জমল। কিন্তু হায়রে! তা'হলে কি আর এ গল্প লেখবার দরকার ছিল! দুর্গা দুর্গতি-দায়িনী কী কুক্ষণেই যে ফুচুদার প্রার্থনায় কর্ণপাত করেছিলেন! এ যাত্রাও তিনি আমাদের ভুলবেন না।

কই মাছের গামলাটা সবে আমাদের বারান্দার দিকে আসছে আর সেদিকে তাকিয়ে জ্বলজ্বল করে উঠেছে ফুচুদার চোখ, এমন সময়—আরে দূর্-দূর্-মার্-মার্-মার্—

শ্যামানন্দবাবু চেঁচিয়ে উঠেছেন। কিন্তু তার আগেই যা হবার তা হয়ে গেছে। কোত্থেকে একটা ঘিয়ে ভাজা কুত্তা তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে বারান্দায়।

নতুন ব্রাহ্মণ, সবে পৈতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে পাতা ছেড়ে আমরা উঠে পড়লাম। খাওয়ার পর্ব ওইখানেই ইতি।

কই মাছের গামলা আবার অন্যদিকে ফিরে গেল।

শ্যামানন্দবাবু হায় হায় করতে লাগলেন। কিন্তু ফুচুদার বুকে যে আগুন জ্বলছে তাকে নেবাবে কে?

দধীচি, পোকা ও বিশ্বকর্মা

আপাতত গভীর অরণ্যে ধ্যানে বসে আছি। বেশ মন দিয়েই ধ্যান করছি। শুধু কতকগুলো পোকা উড়ে উড়ে ক্রমাগত নাকে মুখে এসে পড়ছে আর এমন বিশ্রী লাগছে যে কী বলব! নাকে ঢুকে সুড়সুড়ি দিচ্ছে, কানের ভেতর ঢুকে ওই গভীর গহ্বরটার ভেতরে কোনো জটিল রহস্য আছে কিনা সেটাও বোঝবার চেষ্টা করছে। একবার ঢোক গিলতে গিয়ে ডজনখানিক খেয়েও ফেলেছি। খেতে বেশ মৌরি মৌরি লাগল—কিন্তু যা বিকট গন্ধ! বমি করতে পারতাম, কিন্তু ধ্যান করতে বসলে তো আর বমি করা যায় না। তাড়াব সে উপায়ও নেই, কারণ এখন আমি সমাধিস্থ—একেবারে নিবাত-নিষ্কম্প হয়েই থাকতে হবে আমাকে।

আমি গোড়াতেই বুঝেছিলাম এরকম হবে। হাবুলকেও বলেছিলাম কথাটা। কিন্তু সে তখন ইন্দ্রত্ব লাভ করে কৈলাসে শিবের কাছে যাওয়ার কথা ভাবছে, আমলই দিলে না। বললে, যাঃ যাঃ, এখন ওসব ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিস নি। অরণ্যে পোকা থাকেই এবং নাকে মুখেও তারা পড়ে। চুপচাপ বরদাস্ত করে যা—নইলে মহর্ষি হবি কেমন করে?

তা বটে। তবে একটা জিনিস বুঝেছি মহর্ষিদের মেজাজ অমন ভীমরুলের চাকের মতো কেন, আর কথায় কথায়ই তাঁরা অমন তেড়ে ব্রহ্মশাপ ঝাড়েন কেন! আরে বাপু, ধৈর্যের একটা সীমা তো আছে মানুষের। নাকে মুখে অমন পোকার উপদ্রব হলে শান্তনুর মতো শান্ত মানুষও যে দুর্বাসা হতে বাধ্য এ ব্যাপারে আমার আর তিল-মাত্রও সন্দেহ নেই।

আচ্ছা জ্বালাতনেই পড়া গেল বাস্তবিক। সত্যি বলছি, আমি প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, পালাজ্বরে ভুগি আর বাসকপাতার রস খাই, আমার কী দায়টা পড়েছে মহর্ষি-টহর্ষির মতো গোলমেলে ব্যাপারে পা বাড়িয়ে? পটলডাঙার গলিতে থাকি, পটল দিয়ে শিং-মাছের ঝোল আর আতপ চালের ভাত আমার বরাদ্দ, এক মুঠো চানাচুর খেয়েছি কি পেটের গোলমালে আমার পটল তুলবার জো! এ হেন আমি—একেবারে গোরুর মতো বেচারা লোক, আমিই শেষে পড়ে গেলাম ছ'হাত লম্বা আর বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুক-ওলা টেনিদার পাল্লায়!

আর টেনিদার পাল্লায় পড়া মানে যে কী, যারা পড়ো নি—উঁহু, ভাবতেই পারবে না। গড়ের মাঠের গোরা থেকে চোরাবাজারের চালিয়াৎ দোকানদার পর্যন্ত ঠেঙিয়ে একেবারে রপ্ত। হাত তুললেই মনে হবে রদ্দা মারলে, দাঁত বার করলেই বোধ হবে কামড়ে দিলে বোধ হয়। এই ভৈরব ভয়ঙ্কর লোকের খপ্পরে পড়েই আমাকে এখন মহর্ষি হয়ে ধ্যান করতে হচ্ছে।

কী আর করি! বসে আছি তো বসেই আছি। অরণ্যের ভেতরে একটা ফুটো—সেখান দিয়ে দেখছি হতভাগা হাবুলের নাক বেরিয়ে আছে। পোকার কামড়ে জেরবার হয়ে ভাবছি ওই নাকেই একটা ধাঁ করে ঘুষি বসাব কিনা, এমন সময় শিষ্য দধি-মুখের প্রবেশ।

দধিমুখ বললে, প্রভু আছে নিবেদন।
বললাম, কহ বৎস, শুনিব নিশ্চয়।
দধিমুখ বললে, কালি নিশিশেষে

www.boiRboi.blogspot.com

দেখিলাম আশ্চর্য স্বপন।
দেখিলাম প্রভু যেন দেবদেহ ধরি
আরোহিয়া অগ্নিময় রথে,
চলেছেন মহাব্যোমে ছায়াপথ করি বিদারণ!
সত্রাসে কহিনু কাঁদি—
ওয়াক্—ওয়াক্ থুঃ।

আর কী, পোকা! থু থু করে দধিমুখ সেটা আমার গায়েই ঝেড়ে দিলে, শিষ্যের আস্পর্ধাখানা দেখো একবার। রাগে আমার শরীর জ্বলে গেল,—টিকি খাড়া হয়ে উঠল ব্রহ্মতেজে। কিন্তু শিষ্যকে শাপ দিলেই ত সব মাটি। মনে মনে ভাবলাম, দাঁড়াও চাঁদ, তোমাকেও সায়েস্তা করতে হচ্ছে।

হেসে বললাম, আছে, আছে রহস্য অদ্ভুত।
নিরেট মগজ তব সহজে তো বুঝিবে না সেটা,
কাছে এসো কহি কানে কানে।

দধিমুখ হাঁ করে তাকিয়ে রইল। আমার মুখ থেকে যা আশা করছিল তা শুনতে পায় নি—কী যে করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। দধিমুখ অসহায়ভাবে একবার চারদিকে তাকাল।

আমি বললাম, দাঁড়াইয়া কেন?
কাছে এসো, মুখ আনো কানের নিকটে,
তবে তো জানিবে সেই অদ্ভুত বারতা।
এসো বৎস—
বালক, আরো কাছে আয়—কাছে আয় না—

দধিমুখের বয়স অল্প—একেবারে আনাড়ী। ইতস্ততঃ করে, যেই আমার কানের কাছে মুখ আনা, অমনি আমি পাল্টা জবাব দিলাম। মস্ত একটা হাঁ করলাম, সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক পোকা পড়ল মুখের ভেতর। আর পত্রপাঠ সেগুলো থু-থু শব্দে ফেরত গেল দধিমুখের গালে, নাকে, মুখে, কপালে। শিষ্যকে গুরুর স্নেহাশিস!

দধিমুখ অ্যাঁ-অ্যাঁ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ঝড়াং করে ড্রপ সিন্। খট্ করে বাঁশটা আমার নাকে পড়ল, তারপর সোজা নীচে। সিন্ শেষ হওয়ার আগেই দ্বিতীয় অঙ্ক সমাপ্ত।

তক্ষুনি স্টেজের ভেতর ছুটে এল ইন্দ্রবেশী হাবুল আর বিশ্বকর্মাবেশী টেনিদা। টেনিদা বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ? এর মানেটা কী, শুনি?

আমি বিদ্রোহ করে বললাম, কিসের মানে?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : প্লে-টা তুই মাটি করবি হতভাগা? কেন ওভাবে থুথু দিলি ক্যাবলার মুখে? একদম বরবাদ হয়ে গেল সিন্টা। কী রকম হাসছে অডিয়ান্স্—তা দেখছিস্?

আমি বললাম, ক্যাবলাই তো থুথু দিয়েছে আগে।

টেনিদা বললে, হুম্। দুটোর মাথাই একসঙ্গে ঠুকে দেব এক জোড়া বেলের মতো। যাক যা হয়ে গেছে সে তো গেছেই। এখন পরের সিন্গুলোকে ভালো করে ম্যানেজ করা চাই—বুঝলি? যদি একটু বেয়াড়াপনা করিস্ তো একটা চাঁটির চোটে নাক একেবারে নাসিকে পাঠিয়ে দেব।

আমি বললাম, তুমি তো বলেই খালাস। কিন্তু স্টেজে হাঁ করে বসে ওই পোকা হজম করবে কে, সেটা শুনি?

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা হুঙ্কার করল, তুই করবি। আলবাৎ তোকেই করতে হবে। থিয়েটার করতে পারবি আর পোকা খেতে পারবি না? দরকার হলে মশা খেতে হবে, মাছি খেতে হবে—

হাবুল যোগ দিয়ে বললে, ইঁদুর খেতে হবে, বাদুড় খেতে হবে—

টেনিদা বললে, মাদুর খেতে হবে, এমন কি খাট-পালং খাওয়াও আশ্চর্য নয়। হুঁ হুঁ বাবা, এর নাম থিয়েটার।

—থিয়েটার করতে গেলে ওসব খেতে হয় নাকি?—আমি ক্ষীণ প্রতিবাদ জানালাম।

—হয় হয়। তুই এসবের কি বুঝিস্ র‍্যা—অ্যাঁ? দানীবাবুর নাম শুনেছিস্, দানীবাবু? তিনি যখন সীতার ভূমিকায় প্লে করতেন তখন মনুমেণ্ট্ খেয়ে নামতেন, সেটা জানিস?

—মনুমেণ্ট্ খেয়ে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ—মনুমেণ্ট্ খেয়ে। যাঃ—যাঃ ক্যাচ্ম্যাচ্ করিস্ নি। এক্ষুনি সিন্ উঠবে—কেটে পড়্—নিজের পার্ট মুখস্থ করগে।

বেগুন-ক্ষেতে কাক-তাড়ানো কেলে হাঁড়ির মতো মুখ করে আমি স্টেজের এক-ধারে এসে বসলাম। মনুমেণ্ট্ খাওয়া! চালিয়াতির আর জায়গা পাও নি—মানুষে কখনো মনুমেণ্ট্ খেতে পারে! কিন্তু প্রতিবাদ করলেই চাঁটি, তাই অমন বোম্বাই চালখানাও হজম করে গেছি।

থিয়েটার করতে এলেই পোকা খেতে হবে! কেন রে বাপু, তোমাদের সঙ্গে থিয়েটার না করতে পারলে তো আমার আর শিঙ্গি মাছের ঝোল হজম হচ্ছিল না কিনা! আমি প্যালারাম বাঁড়ুয্যে, আমার পেটজোড়া পিলে—দায় পড়েছিল আমার একমুখ কুট্কুটে দাড়ি নিয়ে দধীচি সাজতে! যত সব জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে পড়ে এখন আমার এই হাঁড়ির হাল।

দিব্যি বসেছিলাম চাটুয্যেদের রোয়াকে—ওরা উঠোনে হাত-পা নেড়ে রিহার্সেল দিচ্ছিল। কিন্তু দধীচি সাজবার ছেলে পাওয়া যাচ্ছিল না। টেনিদা তার ভাঁটার মতো চোখ পাকিয়ে এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে এসে খপ করে আমার কাঁধটা ধরে ফেলল : অ্যাই পাওয়া গেছে।

আমি বললাম, অ্যাঁ—অ্যাঁ—

টেনিদা বাঘাটে গলায় বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ নয়, হ্যাঁ হ্যাঁ। দিব্যি মুনি-ঋষির মতো চেহারা তোর, বেশ অহিংস ছাগল ছাগল ভাব। গালে ছাগলের মতো দাড়ি লাগিয়ে দেব,—যা মানাবে আঃ! দেখাবে একেবারে রায়বাড়ির কেশো-বুড়োটার মতো।

আপাতত এই তার পরিণতি।

এ অঙ্কে আমার পার্ট নেই, তাই স্টেজের অন্ধকার একটা কোণায় ঝিম মেরে বসে আছি। দাড়িটা হাতে খুলে নিয়েছি, আর মশা তাড়াচ্ছি প্রাণপণে। নাঃ—এ অসম্ভব। আবার স্টেজে গেলেই ধ্যানে বসতে হবে এবং ধ্যানে বসা মানেই পোকা। আর কি মারাত্মক সে পোকা!

কী করা যায়?

রাগে হাড়-পিত্তি জ্বলছে। দয়া করে পার্ট করছি এই ঢের, তার ওপর আবার অপমান। এমন করে শাসানো। চাঁটি হাঁকড়ে নাক নাসিকে উড়িয়ে দেবে। ইস্, শখখানা দেখো একবার। না হয় তোমার আছেই পিরামিডের মতো উঁচু একটা অতিকায় নাক, আর আমার নাকটা না হয় চীনেম্যানদের মতো থ্যাবড়া, তাই বলে নাক নিয়ে অপমান। আচ্ছা, দাঁড়াও, দাঁড়াও। এই খাঁদা নাককেই—মৈনাকের মতো উঁচু করে তোমার ভরাডুবি করে ছাড়ব।

কিন্তু কী করা যায় বাস্তবিক?

ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছি না, ওদিকে স্টেজে তখন দারুণ বক্তৃতা দিচ্ছে টেনিদা, এমন এক একটা লাফ মারছে যে চাটুয্যেদের ছারপোকাভরা পুরোনো তক্তাপোশটা একেবারে মড়্‌মড়্‌ করে উঠছে। থিয়েটার করছে না হাই-জাম্প্‌ দিচ্ছে বোঝা মুশকিল।

স্টেজ-ম্যানেজার হাবুল পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। বললে, এই প্যালা, অমন ভূতের মতো অন্ধকারে বসে আছিস্‌ যে?

বললাম, একটু চা খাওয়া না ভাই হাবুল, গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

হাবুল নাকটা কুঁচকে বললে, নেঃ নেঃ, অত চা খায় না। যা পার্ট করছিস্‌, আবার চা!

অ্যাডিং ইনসাল্ট্‌ টু ইন্‌জুরি—অ্যাঁ। আমি অন্ধকারে দাঁত বের করে হাবুলকে ভেংচে দিলাম, হাবুল দেখতে পেলে না।

চম্পট দেব নাকি দাড়িফাড়ি নিয়ে? সোজা চলে যাব বাড়িতে? দধীচির সিনে যখন দেখবে আমি বেমালুম হাওয়া—তখন টের পাবে মজাটা কাকে বলে। উঁহুঁ—তাতে সুবিধে হবে না। তারপর কাল সকালে আমায় বাঁচায় কে? পটলডাঙার বিখ্যাত টেনিদার বিখ্যাত চাঁটিতে প্লেফ পটল তুলে বসতে হবে।

না-না, ওসব নয়। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। এমন জব্দ করে দেব যে কিল খেয়ে কিলটি সোনামুখ করে গিলে নিতে হবে। টেনিদার বত্রিশ পাটি দাঁতের সঙ্গে আর একটি দাঁত গজিয়ে দেব—যার নাম আক্কেল দাঁত। আর সেই সঙ্গে টেনিদার ধামাধরা ওই স্টেজ-ম্যানেজার শ্রীমান হাবুল সেনকেও টেরটি পাইয়ে দিতে হচ্ছে।

ভগবানকে ডেকে বললাম, প্রভু, আলো দাও—এ অন্ধকারে পথ দেখাও! এবং প্রভু আলো দিলেন।

হাবুলকে বললাম, ভাই, পাঁচ মিনিটের জন্যে একটু বাড়ি থেকে আসছি।

হাবুল আঁতকে বললে, কেন?

—এই পেটটা একটু কেমন কেমন—

হাবুল বললে, সেরেছে। যত সব পেটরোগা নিয়ে কারবার—শেষটায় ডোবাবে বোধ হচ্ছে। একটু পরেই যে তোর পার্ট রে।

আমি বললাম, না, না, এক্ষুনি আসছি।

মনে মনে বললাম, পেট কার কেমন একটু পরেই দেখা যাবে এখন। মনুমেন্ট্‌ খাইয়ে পার্ট করাতে চাও—দেখি আরো কত গুরুপাক জিনিস হজম করতে পারো।

ঠিক পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমি ফিরলাম। ডাক্তার ছোটকাকার ওষুধের আল্‌মারিটা হাতড়াতে বেশি সময় লাগে নি—একেবারে মোক্ষম ওষুধটি নিয়ে এসেছি। হিসেব করে দেখেছি আমার পার্ট আসতে আরো প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরি—এর মধ্যেই কাজ হয়ে যাবে।

চায়ের বড় কেট্‌লিটা যেখানে উনানের ওপর ফুটছে, সেখানে গেলাম। তখন কেট্‌লির দিকে কারো মন নেই, সবাই উইংসে ঝুঁকে পড়ে প্লে দেখছে। টেনিদা লাফাচ্ছে ভীমসেনের মতো—আর সে কি ঘন ঘন ক্ল্যাপ্‌। দাঁড়াও দাঁড়াও—কত ক্ল্যাপ্‌ চাও দেখব।

পিরামিডের মতো নাক উঁচু করে বিজয়-গৌরবে ফিরে এল টেনিদা। এক গাল হাসি ছড়িয়ে বললে, কেমন পার্ট হল রে হাবুল?

হাবুল কৃতার্থভাবে বললে, চমৎকার, চমৎকার। তুমি ছাড়া এমন পার্ট আর কে করতে পারত? অডিয়ান্স্‌ বলছে, সাবাস্‌ সাবাস্‌!

অডিয়ান্স কেন সাবাস্‌ সাবাস্‌ বলছে আমি জানি। তারা বুঝতেই পারে নি যে ওটা ভীমের না বিশ্বকর্মার পার্ট। কিন্তু আসল পার্ট করতে আর একটুখানি

www.boiRboi.blogspot.com

দেরি আছে—আমি মনে মনে বললাম।

স্টেজ কাঁপিয়ে টেনিদা হুঙ্কার ছাড়লে, চা—ওরে চা আন—

হাবুল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল।

আবার ড্রপ উঠেছে। দধীচির ভূমিকায় আমি ধ্যানস্থ হয়ে বসে পোকা খাচ্ছি। শিষ্য দধিমুখ এবার দূরে দাঁড়িয়ে আছে—আগের অভিজ্ঞতাটা ভোলে নি।

বিশ্বকর্মা আর ইন্দ্রের প্রবেশ। টেনিদা আর হাবুল।

হাবুল বললে, প্রভু, গুরুদেব,
আসিয়াছি শিবের আদেশে।
তব অস্থি দিয়া
যেই বজ্র হইবে নির্মাণ—

টেনিদা বললে, দেখাইব বিশ্বকর্মা যশ।
হেন অস্ত্র তুলিব গড়িয়া,
ঘোরনাদে কাঁপাইবে সসাগরা ব্রহ্মাণ্ড বিশাল
দীপ্ততেজে দগ্ধ হবে স্থাবর-জঙ্গম,—

তারপরেই স্বগতোক্তি করলে, উঃ, জোর কামড় মেরেছে পেটে মাইরি!

হাবুল চাপা গলায় বললে, আমারও পেটটা যেন কেমন গোলাচ্ছে রে!

আড়চোখে আমি একবার তাকিয়ে দেখলাম মাত্র। মনুমেন্ট খেয়ে হজম করতে পারো, দেখিই না হজমের জোর কত!

আমি বললাম, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ—
আগে করি ইষ্ট নাম ধ্যান—
ধ্যান ভঙ্গ যতক্ষণ নাহি হয়,
চুপচাপ থাকো ততক্ষণ।
তারপরে তনুত্যাগ করিব নিশ্চয়।

আমি ধ্যানে বসলাম। সহজে এ ধ্যান ভাঙছে না। পোকার উপদ্রব লেগেই আছে—তা থাক। আমি কষ্ট না করলে টেনিদা আর হাবুলের কেষ্ট মিলবে না। গরম চায়ের সঙ্গে কড়া পাগেটিভ—এখনই কি হয়েছে!

টেনিদা মুখ বাঁকা করলে, শীগগির ধ্যান শেষ কর মাইরি। জোর পেট কামড়াচ্ছে রে!

আমি বললাম, চুপ। ধ্যান ভঙ্গ করিয়ো না
ব্রহ্মশাপ লাগিবে তা'হলে—

ধ্যান কি সত্যি সত্যিই করছি নাকি! আরে ধ্যাৎ! আমি আড়চোখে দেখছি টেনিদার মুখ ফ্যাকাশে মেরে গেছে। হাবুলের অবস্থাও তথৈবচ। ভগবান করুণাময়।

টেনিদা কাতরস্বরে বললে, ওরে প্যালা, গেলাম যে। দোহাই তোর, শীগগির ধ্যান শেষ কর—তোর পায়ে পড়ছি প্যালা—

হাবুল বললে, ওরে, আমারও যে প্রাণ যায়—

আমি একেবারে নট্‌-নড়ন-চড়ন। সামলাও এখন। মুনি-ঋষির ধ্যান—দেহত্যাগের ব্যাপার—এ কী সহজে ভাঙবার জিনিস!

—বাপ্‌স গেলাম—এক লম্ফে টেনিদা অদৃশ্য। একেবারে সোজা অন্ধকার আমতলার দিকে। পেছনে পেছনে হাবুল।

আর থিয়েটার?

সে কথা বলে আর কী হবে!

সভাপতি

অনেকগুলো গল্পের বই আর দশ-বারোখানা উপন্যাস লিখেছেন রামহরিবাবু। তাঁর বইগুলোর ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর নাম—প্রলয়ের আগুন, ডাইনীর আর্তনাদ, রক্তের হুঙ্কার, ডাকাতের খাঁড়া, কাটামুণ্ডুর নাচ—এই সব! রামহরিবাবুর ধারণা শরৎচন্দ্রের পরে তাঁর মতো ভালো কেউ তো লিখতে পারেই না—শরৎচন্দ্রের চাইতেও তিনি ভালো লেখেন।

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, ধারণাটা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। এত রাশি রাশি বই লিখলেন অথচ লোকে তাঁর কদর বুঝল না। কুড়িয়ে-বাড়িয়ে সবসুদ্ধ পঞ্চাশখানার বেশি বই এ পর্যন্ত তাঁর বিক্রী হল না। সাধে কি জাতির অধঃপতন হচ্ছে! ওই পঞ্চানন শিকদার—নিতান্তই সেদিনকার ছোকরা—এখনো ভালো করে গোঁফ ওঠে নি, আর তার বই কিনা ঝড়ের বেগে কাটতি হয়ে যায়! অথচ তিনি, যিনি শরৎচন্দ্রের চাইতেও ভালো লেখেন, তাঁর বই কাটে পোকাতে! ধিক্ ধিক্!

পোকায় কাটা বইগুলোর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে রামহরিবাবু বারবার বাঙালী জাতিকে ধিক্কার দিতে থাকেন।

শুধু কি এই? বাংলাদেশে কতই তো সভা-সমিতি হচ্ছে! সেদিনকার ছোকরা পঞ্চানন শিকদার পর্যন্ত সভাপতি হয়ে গলায় মোটা মোটা মালা পরে—দেখে রামহরিবাবুর উত্তেজনায় হার্টের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসতে চায়। কোনো সভায় এ পর্যন্ত তাঁকে কেউ সভাপতি হতে ডাকল না। বড় বড় মিটিংয়ের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, পাড়ার সরস্বতী পুজোয় পর্যন্ত বাইরে থেকে লোক ডেকে এনে সভাপতি করা হয়। অথচ তিনি যে সকলের চোখের সামনে সূর্যের মতো একেবারে জ্বলজ্বল করে জ্বলছেন এটা কারো মনেই পড়ে না। এরই নাম হচ্ছে প্রদীপের নীচে অন্ধকার।

এই সব গবেষণা করে রামহরিবাবু যখন সন্ন্যাসী হওয়ার জন্যে গেরুয়া ছোপাচ্ছিলেন, এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল।

ভগবান অন্তর্যামী। রামহরিবাবুর মনের বেদনা তিনি বুঝলেন!

সেদিন সকালে দাড়ি কামাচ্ছেন রামহরিবাবু। সবে গালের একটা দিক কামিয়েছেন এমন সময়ে শুনতে পেলেন বাইরে তাঁর চাকর বুধুর সঙ্গে কে যেন কথা বলছে।

—রামহরি বটব্যালের বাড়ি এইটে?

—আইগ্যা হ। কত্তা কী কামে আইছেন?

—তাঁকে একটা সভায় সভাপতি হবার জন্যে—

—শোবাপতি? তিনি আবার শোভার পতি অইবেন ক্যান্? আমার মা ঠাইনের পতি তো তিনি অইয়াই আছেন—

লোকটি কী যেন বলতে যাচ্ছিল, এর মধ্যেই ক্যাঙারুর মতো একখানা সমুদ্র-লঙ্ঘন লম্ফ দিয়ে এসে পড়েছেন রামহরিবাবু। একগালে সাবান হাতে ক্ষুর। চেহারাখানা যা খোলতাই হয়েছে বলবার নয়। দেখে লাফিয়ে তিন পা সরে গেল বুধু। বললে, কত্তা, অমন ক্ষুর লইয়া ধাইয়া আইলেন ক্যান্? ক্ষ্যাপছেন নাকি?

—যা যা ব্যাটা গাড়োল, ভেতরে যা।—এক ধমকে নার্ভাস বুধুকে আরো নার্ভাস করে দিয়ে প্রসন্ন দৃষ্টিতে রামহরিবাবু আগন্তুকের দিকে তাকালেন। তারপর আধগাল

দাড়ি আর সাবান নিয়ে তিনি একগাল হাসি হাসলেন: আমিই রামহরি বটব্যাল। কী চাই আপনার?

—আপনিই রামহরিবাবু? নমস্কার নমস্কার! আপনাকে আমাদের একটা সাহিত্য-সভার সভাপতি হবার জন্যে—

—আসুন, আসুন, বসুন—ওরে বুধু, বাবুকে শীগগির চা এনে দে।

কৃপণতার জন্যে রামহরিবাবু বিখ্যাত। তাঁর দোরগোড়া থেকে ভিখিরী ঠ্যাঙা খেয়ে যায়, পাত কুড়োবার মতো কিছু পায় না বলে বাড়িতে কাক পর্যন্ত পড়ে না। এ হেন লোক কিনা খুশির আতিশয্যে আগন্তুককে হাফ-কাপ ঝোলাগুড়ের চা খাইয়ে দিলেন!

তারপরে শুরু হল আসল গল্প।

মার্টিনের রেলগাড়িতে প্রচণ্ড ছারপোকার কামড় খেতে খেতে রামহরিবাবু এসে নামলেন একটা ছোট স্টেশনে। স্টেশনের নাম বাঁশতলা।

যে লোকটি তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে, তার নাম গজেন তফাদার। কথায় কথায় রামহরিবাবু জানতে পেরেছেন সে গ্রামের নাট্য-সমিতির সেক্রেটারী—এ গাঁয়ে ও গাঁয়ে যাত্রা করে বেড়ায়। খবরের কাগজে সাহিত্য-সমিতির হিড়িক দেখে তাদেরও সাহিত্য করবার শখ হয়েছে। তাই তারা রামহরিবাবুকে সভাপতি করবার জন্যে ধরে এনেছে।

রামহরিবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমার সব বই পড়েছেন আপনি?

—ক্ষেপেছেন আপনি!—বিড়িতে টান দিয়ে গজেন তফাদার জবাব দিয়েছিল: আমার সময় কোথায় বলুন দিকি? দিনরাত যাত্রার পার্ট মুখস্থ করেই সময় পাই না, তো বই পড়ব! দু'-একখানা যাত্রার বই যদি লিখতেন স্যার, তা'হলেও বা কথা ছিল।

মুহূর্তে ভারী ক্ষুণ্ণ হয়ে গেলেন রামহরিবাবু, ইচ্ছে করল গজেনের লম্বা লম্বা কান দুটো ধরে বেশ করে ঝাঁকিয়ে দেন। কিন্তু মনের ভাব গোপন করে বললেন, তবে আমি যে লিখি সেটা জানলেন কী করে?

—আমি কেমন করে জানব মশাই? আমাদের যাত্রার দলে যে হনুমান সাজে সেই গদাই শীল আগে কলকাতায় ছাপাখানার কম্পোজিটার ছিল। তাকে জিজ্ঞেস করলাম কোন সাহিত্যিককে চেনে কিনা! সে আপনার 'পাতালের আগুন' না কি একটা কম্পোজ করেছিল, প্রুফ নিয়েও গিয়েছিল আপনার বাড়িতে। তার কাছেই আপনার নাম ঠিকানা পেলাম আর কি! সে বললে, আপনি বেড়ে লেখেন—পাতালের আগুন—

রামহরিবাবু বাধা দিয়ে বললেন, উঁহুঁ, 'প্রলয়ের আগুন'।

—ওই হল স্যার। প্রলয় হলেই সব পাতালে চলে যায় কিনা। তা আপনার বইয়ের আট-দশ পাতা সে পড়েছে, বলেছে দশ পাতাতেই নাকি আপনি দশটা খুন ঘটিয়ে দিয়েছেন। শুনে আমাদেরও আপনার ওপর খুব ভক্তি হয়েছে স্যার! দশ পাতায় দশটা খুন! আপনি স্যার, অসাধারণ লোক।

রামহরিবাবুর ইচ্ছে হয়েছিল তক্ষুনি বাড়ি ফিরে যান, কিন্তু সভাপতি হওয়ার প্রলোভনটা কম নয়। না হয় তাঁর লেখা এরা পড়েই নি, কিন্তু তাতেই বা ক্ষতি কী! বক্তৃতার চোটে মুখ দিয়ে এমন আগুন তিনি ছড়িয়ে দেবেন যে, চারদিকে দাউ-দাউ করে জ্বলে যাবে। এরা বুঝতে পারবে তিনি একেবারে কেউকেটা নন।

অতএব শেষ পর্যন্ত গজেনের সঙ্গে তিনি এসে নামলেন বাঁশতলা স্টেশনে।

আশা ছিল, স্টেশনে তাঁকে দেখবার জন্যে কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে থাকবে। কিন্তু জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। একজন পিলে-রোগী স্টেশন-মাস্টার আর জন তিনেক

www.boiRboi.blogspot.com

ছেলে চাষা স্টেশনময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। রামহরিবাবুর মনটা আর একবার খারাপ হয়ে গেল।

গজেন এসে বললে, দাঁড়িয়ে আছেন কেন? চলুন।

—কোথায় যেতে হবে?

—আমাদের গাঁয়ে।

—সে কোথায়?

—শিয়ালপাড়া।

—শিয়ালপাড়া! সে কদ্দুর?

—বেশি নয়, কোশ দুয়েক।

—কোশ দুয়েক? গাড়ি কই?

গজেন অবাক হয়ে গেল : গাড়ি! এ কি স্যার কলকাতা শহর পেয়েছেন? টুপ্ করে ট্রামগাড়িতে চাপলেন আর ঝুপ্ করে ধরমতলা গিয়ে নামলেন। এ স্যার পাড়াগাঁ।

—কিন্তু দু' কোশ রাস্তা! হাঁটব কী করে? অন্তত একটা গোরুর গাড়ি—

গোরুর গাড়ি! গজেন মুখ ভেংচে উঠল : একটা গাড়ির আজকাল ভাড়া কত জানেন? অন্তত আড়াই টাকা। কে দেবে মশাই? আপনি?

রামহরিবাবু মাথা নেড়ে জানালেন যে তিনি দেবেন না।

—তাহলে হাঁটুন, হাঁটুন। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না, কাছাকাছি গোটা দুই শেয়াল ক্ষেপেছে, কামড়ালেই জলাতঙ্ক।

—ওরে বাবা!—লাফিয়ে উঠে রামহরিবাবু ছুটতে শুরু করেন।

গজেন চেঁচিয়ে বললে, থামুন স্যার, থামুন। অমন ঘোড়ার মতো আদাড়ে-পাদাড়ে ছুটবেন না—এখানকার জঙ্গলে আবার কেউটে সাপের আমদানি বেশি।

অ্যাঁ!—রামহরিবাবু ভয়ে প্রায় শিবনেত্র হবার দাখিল।

তবু সভাপতি হবার লোভ। পঞ্চানন শিকদারকে যে করে হোক টেক্কা দিতে হবে। বেলা দুটোর সময় এক হাঁটু ধুলো নিয়ে রামহরিবাবু যখন শিয়ালপাড়ায় এসে পৌঁছুলেন তখন তাঁর প্রায় দম আটকে আসছে।

জংলা ছোট গ্রাম। কয়েকঘর গৃহস্থ, বেশির ভাগেরই দৈন্যদশা। সভাস্থলের নমুনা দেখেই সভাপতির হয়ে এল।

একটা আধভাঙ্গা চণ্ডীমণ্ডপে চাটাই বিছিয়ে রামহরিবাবুকে বসতে দেওয়া হল। তারপর আস্তে আস্তে দু' চারজন করে ভিড় জমাতে লাগল তাঁর পাশে।

পাঠশালার বুড়ো পণ্ডিত মশাই এসে অনেকক্ষণ ধরে পর্যবেক্ষণ করছিলেন রাম-হরিবাবুকে। এইবার বেশ ক[illegible] কেশে নিয়ে বললেন, আপনার বই আমার বড্ড ভালো লাগে স্যার। খাসা লেখা আপনার।

রামহরিবাবুর অত্যন্ত আনন্দ হল। এখানকার সবাই তাহলে গজেনের মতো নয়, দু'-একজন পড়ুয়া লোকও আছে!

—আমার কী কী বই পড়েছেন আপনি?

—কেন স্যার? ব্যাকরণ-সুধা, বালক-বোধ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ—পড়ি নি কী? আহা-হা, কী চমৎকার তদ্ধিত-প্রকরণ লিখেছেন আপনি। পড়তে পড়তে আমার কান্না পেয়ে গিয়েছিল।

—কিন্তু ব্যাকরণ-ট্যাকরণ তো আমি লিখি নি।

—সে কি! আপনার নাম অশ্বপতি কাব্যচঞ্চু নয়?

কী আশ্চর্য—লোকটা রামহরিবাবুর নাম পর্যন্ত জানে না, অথচ কোন এক অশ্বপতি না অশ্বডিম্ব ঠাউরে বসে আছে! চটে গিয়ে তিনি বললেন, না মশাই, আমি

www.boiRboi.blogspot.com

অশ্বটশ্ব নই, ও নামের কোন লোককে আমি চিনি না।

—ধ্যাৎ, তাহলে খালি খালি এলাম! শুধু সময় নষ্ট—বলে পণ্ডিত মশাই উঠে চলে গেলেন।

এবার এগিয়ে এলেন কবিরাজ মশাই।

—আমাশয় প্রকরণ আর সহজ পাচন-নির্মাণ বই দুটো আপনারই লেখা তো?

রামহরিবাবু সরোষে বললেন, না।

—তাহলে আপনি কৃতান্তকুমার মারণরত্ন নন?

—না—না—না। আমার নাম রামহরি বটব্যাল।

—তাই নাকি?—বিরক্তমুখে কবিরাজ বললেন, গজা হতভাগা তা তো বললে না। খালি খালি বেতো পা নিয়ে ছুটে এলাম। দুর—দুর!

কবিরাজ প্রস্থান করলেন। তারপর আস্তে আস্তে আর সবাই। একা চণ্ডীমণ্ডপে রামহরি বসে রইলেন, রাগে তাঁর গা জ্বলতে লাগল।

ইতিমধ্যে কোত্থেকে একটা ডাবা হুঁকো সেজে এনেছে গজেন। বললে, তামাক ইচ্ছে করুন, তারপর চলুন সভায় যাই।

সক্রোধে রামহরি বললেন, সভা না হাতী! খালি খালি আমাকে ভোগান্তি করতে কেন নিয়ে এলেন বলুন দেখি?

গজেন মধুর হেসে জবাব দিলে, আহা হা, চটছেন কেন স্যার! পাড়াগাঁ জায়গা, এমন হয়েই থাকে। নিন নিন, তামাকটা খেয়ে ফেলুন, তারপর সভায় যাওয়া যাবে।

অগত্যা হুঁকোটা হাতে নিয়ে একটা টান দিলেন রামহরিবাবু। কিন্তু সে কি সোজা তামাক! টান দেবার সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরে একেবারে মূর্ছার উপক্রম। সামলে নিয়ে রামহরিবাবু ক্ষেপে উঠলেন : এ কী কাণ্ড মশাই?

—কী হল স্যার?

—এ তামাক না গাঁজা? উঃ—আর একটু হলে প্রাণটা আমার বেরিয়ে যেত।

—ও কিছু না স্যার—তেমনি মিষ্টি করে হেসে গজেন বললে, দা-কাটা তামাক একটু কড়া হবেই। ওসব না হলে যাত্রাই জমে না।

—কিন্তু আমি তো যাত্রা করতে আসি নি।

—না, সভা করতে এসেছেন। একই কথা স্যার—আসলে তো বক্তৃতা করাই? নিন, এবারে উঠুন।

সভা-পর্বের বিস্তারিত বর্ণনা না করাই ভালো।

একটা খোলামাঠে খানকয়েক চাটাই পাতা। আর একদিকে একখানা তে-পায়া চেয়ার সভাপতির আসন। চেয়ারে বসতে গিয়ে একটুর জন্যে ধরাশয্যার হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলেন রামহরিবাবু।

সভায় লোক হয়েছে গোনা-গুনতি পনেরো জন। সাত-আটটি কালো কালো ন্যাংটো ছেলেমেয়ে, জন দুই চাষা, গজেন আর জন পাঁচেক ভদ্রলোক। মাল্যদান হল না, প্রস্তাব হল না, উদ্বোধন সংগীত হল না। রামহরিবাবুর বুকভরা আশা যেন ধক্ করে নিভে গেল।

কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না। মনে মনে শক্ত করে কোমর বাঁধলেন তিনি। হোক ছোট সভা, না-ই বা থাকুক মালা, কিন্তু তিনি পিছ-পা হবেন না। বক্তৃতার তোড়ে এমন আগুন ছুটিয়ে দেবেন যে, এই পনেরো জন লোকেরই মাথা ঘুরে যাবে। সুতরাং তিনি আরম্ভ করলেন :

"বন্ধুগণ, অদ্যকার এই বিরাট জনসভায় আমাকে সভাপতির আসন দিয়া আমাকে

আপনারা যেভাবে সম্মানিত করিয়াছেন, সেজন্য আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমি জানি, এই আসনের যোগ্য আমি নই—"

হঠাৎ পেছন থেকে চীৎকার উঠল—পালাও—পালাও—

আঁতকে রামহরিবাবু থেমে গেলেন।—কী হয়েছে?

—জমিদারের লাঠিয়াল আসছে। বিনা অনুমতিতে তার জমিতে সভা করা হচ্ছে, তাই লাঠিয়াল পাঠিয়েছে। বলেছে, আগে সভাপতির মুণ্ডুটা দু' ফাঁক করে তারপর—

বাকিটা শোনবার আর সময় ছিল না। 'বাবা গো'—বলে রামহরিবাবু ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে শুরু করলেন। কোথায় কোন্‌দিকে তিনি জানেন না। মুহূর্তে সেখানে সভার চিহ্ন-মাত্রও রইল না।

ওদিকে রামহরিবাবু ছুটলেন। ভুঁড়িটা মস্ত একটা ফুটবলের মতো আগে আগে দৌড়ুচ্ছে, পেছনে দৌড়ুচ্ছে শরীর। তারপরেই ঝপ্—ঝপাস্ করে একটা শব্দ!

হ্যাঁ—এতক্ষণে সভা জমেছে বটে!

একটা পচা ডোবার বুক-সমান কাদার ভেতর থেকে রামহরিবাবু ওঠার চেষ্টা করছেন, কিন্তু উঠতে পারছেন না। জলে কাদায় তাঁর বিরাট শরীরটাকে দেখাচ্ছে একটা জলহস্তীর মতো। আর ডোবার চারদিকে শ'দুয়েক লোক জড়ো হয়েছে। গজেন আছে, পণ্ডিত মশাই আছেন, কবিরাজও আছেন। পরমানন্দে সবাই রামহরিবাবুর দুর্গতিটা উপভোগ করছে। এইবারে সত্যি সত্যিই বিরাট সভা আর রামহরিবাবু সত্যিকারের সভাপতি।

কলকাতায় ফিরে রামহরিবাবু ইজিচেয়ারে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। বুধু তার সর্বাঙ্গে মলম মাখাচ্ছে।

হঠাৎ চোখ মেলে রামহরি করুণস্বরে ডাকলেন, বুধু!

—আইজ্ঞা।

—কোনো দিন কোথাও সভাপতি হোসনে, বুঝলি?

—আইজ্ঞা বুঝছি। আমি আমার পরিবারের পতি অইয়া সুখে আছি, শোবা-টোবার পতি হম কোন্ দুঃখে?—বীরের মতো জবাব দিলে বুধু।

খট্টাঙ্গ ও পলান্ন

ওপরের নামটা যে একটু বিদঘুটে তাতে আর সন্দেহ কী! খট্টাঙ্গ শুনলেই দস্তুরমতো খটকা লাগে, আর পলান্ন মানে জিজ্ঞেস করলেই বিপন্ন হয়ে ওঠা

অস্বাভাবিক নয়।

অবশ্য যারা গোমরামুখো ভালো ছেলে, পটাপট পরীক্ষায় পাশ করে যায়, তারা হয়তো চট্ করে বলে বসবে, ইঃ—এর আর শক্তটা কী! খট্টাঙ্গ মানে হচ্ছে খাট আর পলান্ন মানে হচ্ছে পোলাও। এ না জানে কে!

অনেকেই যে জানে না তার প্রমাণ আমি—আর আমার মতো সেই সব ছাত্র, যারা কমসে কম তিন তিনবার ম্যাট্রিকে ঘায়েল হয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু ওই শক্ত কথা দুটোর মানে আমাকে জানতে হয়েছিল, আমাদের পটলডাঙার টেনিদার পাল্লায় পড়ে। সে এক রোমাঞ্চকর কাহিনী।

আচ্ছা গল্পটা তা'হলে বলি।

খাটের সঙ্গে পোলাওয়ের সম্পর্ক কী? কিছুই না। টেনিদা খাট কিনল আর আমি পোলাও খেলাম। আহা সে কি পোলাও! এই যুদ্ধের বাজারে তোমরা যারা র‍্যাশনের চাল খাচ্ছ আর কড়মড় করে কাঁকর চিবুচ্ছ, তারা সে পোলাওয়ের কল্পনাও করতে পারবে না। জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল, পেস্তা, বাদাম, কিস্‌মিস্—

কিন্তু বর্ণনা এই পর্যন্ত থাক। তোমরা দৃষ্টি দিলে অমন রাজভোগ আমার পেটে সইবে না। তার চাইতে গল্পটাই বলা যাক।

টেনিদাকে তোমরা চেনো না। ছ'হাত লম্বা, খাড়া নাক, চওড়া চোয়াল। বেশ দশাসই জোয়ান, হঠাৎ দেখলে মনে হয় ভদ্রলোকের গালে একটা গালপাট্টা থাকলে আরো বেশি মানাত। জাঁদরেল খেলোয়াড়—গড়ের মাঠে তিন তিনটে গোরার হাঁটু ভেঙে দিয়ে রেকর্ড করেছেন। গলার আওয়াজ শুনলে মনে হয় ষাঁড় ডাকছে।

এমন একটা ভয়ানক লোক যে আরো ভয়ানক বদরাগী হবে এ তো জানা কথা।

আমি প্যালারাম বাঁড়ুয্যে—বছরে ছ'মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগি আর বাটি বাটি সাবু খাই। দু'পা দৌড়াতে গেলে পেটের পিলে খটখট করে। সুতরাং টেনিদাকে দস্তুর-মতো ভয় করে চলি—শতহস্ত দূরে তো রাখিই। ওই বোম্বাই হাতের একখানা বুৎসই চাঁটি পেলেই তো খাটিয়া চড়ে নিমতলায় যাত্রা করতে হবে!

কিন্তু অদৃষ্টের লিখন খণ্ডাবে কে?

সবে দ্বারিকের দোকান থেকে গোটা কয়েক লেডিকেনি খেয়ে রাস্তায় নেমেছি—হঠাৎ পেছন থেকে বাজখাঁই গলা : ওরে প্যালা!

সে কী গলা! আমার পিলে-টিলে একসঙ্গে আঁতকে উঠল। পেটের ভেতরে লেডিকেনিগুলো তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। তাকিয়ে দেখি—আর কে? মূর্তিমান স্বয়ং।

—কী করছিস্ এখানে?

সত্যি কথা বলতে সাহস হল না—বললেই খেতে চাইবে। আর যদি খাওয়াতে চাই তা'হলে ওই রাক্ষুসে পেট কি আমার পাঁচ-পাঁচটা টাকা না খসিয়েই ছেড়ে দেবে! আর খাওয়াতে না চাইলে—ওরে বাবা!

কাঁচুমাচু করে বলে ফেললাম, এই কেত্তন শুনছিলাম।

—কেত্তন শুনছিলে? ইয়ার্কি পেয়েছ? এই বেলা তিনটের সময় শেয়ালদার মোড়ে দাঁড়িয়ে কী কেত্তন শুনছিলে? আমি দেখি নি চাঁদ, এক্ষুনি দ্বারিকের দোকান থেকে মুখ চাটতে চাটতে বেরিয়ে এলে?

এই সর্বনাশ—ধরে ফেলেছে তো। গেছি এবারে। দুর্গানাম জপতে শুরু করে দিয়েছি ততক্ষণে, কিন্তু কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম কে জানে, ফাঁড়াটা কেটে গেল! না চটে টেনিদা গোটা ত্রিশেক দাঁতের ঝলক দেখিয়ে দিলে আমাকে। মানে হাসল।

—ভয় নেই—আমাকে খাওয়াতে হবে না। শ্যামলালের ঘাড় ভেঙে দেলখোসে আজ

www.boiRboi.blogspot.com

বেশ মেরে দিয়েছি। পেটে আর জায়গা নেই।

আহা বেচারা শ্যামলাল! আমার সহানুভূতি হল। কিন্তু আমাকে বাঁচিয়েছে আজকে। দধীচির মতো আত্মদান করে আমার প্রাণ,—মানে, পকেট বাঁচিয়েছে।

টেনিদা বললে, এখন আমার সঙ্গে চল্ দেখি!

সভয়ে বললাম, কোথায়?

—চোরা বাজারে। খাট কিনব একখানা—শুনেছি সস্তায় পাওয়া যায়।

—কিন্তু আমার যে কাজ—

—রেখে দে তোর কাজ। আমার খাট কেনা হচ্ছে না, তোর আবার কাজ কিসের রে? ভারী যে কাজের লোক হয়ে উঠেছিস্—অ্যাঁ?—কথাটার সঙ্গে সঙ্গে ছোটখাটো একটি রদ্দা আমার পিঠে এসে পড়ল।

বাঃ—কী চমৎকার যুক্তি! টেনিদার খাট কেনা না হলে আমার কোনো আর কাজ থাকতে নেই! কিন্তু প্রতিবাদ করবে কে? সূচনাতেই যে রদ্দা পিঠে পড়েছে, তাতেই হাড়-পাঁজরাগুলো ঝন্‌ঝন করে উঠেছে আমার। আর একটি কথা বললেই সজ্ঞানে গঙ্গাপ্রাপ্তি অসম্ভব নয়।

—চল্ চল্।

না চলে উপায় কী। প্রাণের চেয়ে দামী জিনিস সংসারে আর কী আছে?

চলতে চলতে টেনিদা বললে, তোকে একদিন পোলাও খাওয়াতে হবে। আমাদের জয়নগরের খাসা গোপালভোগ চাল—একবার খেলে জীবনে আর ভুলতে পারবি না।

কথাটা আজ পাঁচ বছর ধরে শুনে আসছি। কাজ আদায় করে নেবার মতলব থাকলেই টেনিদা প্রতিশ্রুতি দেয় আমাকে গোপালভোগ চালের পোলাও খাওয়াবে। কিন্তু কাজটা মিটে গেলেই কথাটা আর টেনিদার মনে থাকে না। গোপালভোগ চালের পোলাও এ পর্যন্ত স্বপ্নেই দেখে আসছি—রসনায় তার রস পাবার সুযোগ ঘটল না।

বললাম, সে তো আজ পাঁচশো বার খাওয়ালে টেনিদা!

টেনিদা লজ্জা পেলে বোধ হয়। বললে, না, না—এবারে দেখিস। মুশকিল কী জানিস্—কয়লা পাওয়া যায় না—এ পাওয়া যায় না—সে পাওয়া যায় না।

পোলাও রাঁধতে কয়লা পাওয়া যায় না! গোপালভোগ চাল কী ব্যাপার জানি না, তা সেদ্ধ করতে ক'মণ কয়লা লাগে তাও জানি না। কিন্তু কয়লার অভাবে পোলাও রান্না বন্ধ আছে এমন কথা কে কবে শুনেছে? আমাদের বাসাতেও তো পোলাও মাঝে মাঝে হয়, কই র‍্যাশনের কয়লার জন্য তাতে তো অসুবিধে হয় না! হাইকোর্ট দেখানো আর কাকে বলে! ওর চাইতে সোজা বলে দাও না বাপু—খাওয়াব না। এমনভাবে মিথ্যে মিথ্যে আশা দিয়ে রাখবার দরকার কী?

টেনিদা বললে, ভালো একটা খাট যদি কিনে দিতে পারিস তাহলে তোর কপালে পলান্ন নাচছে, এ বলে দিলাম।

—পলান্ন!

—হ্যাঁ—মানে পোলাও! তোদের বুক্‌ড়ী চালের পোলাওকে কি আর পলান্ন বলে নাকি! হয় গোপালভোগ চাল, তবে না—হুঁ!

হায় গোপালভোগ! আমি নিঃশ্বাস ছাড়লাম।

তারপরে খাট কেনার পর্ব।

টেনিদা বললে, এমন একটা খাট চাই যা দেখে পাড়ার লোক স্তম্ভিত হয়ে যাবে! বলবে, হ্যাঁ—একটা জিনিস বটে! বাংলা নড়বড়ে খাট নয়—একেবারে খাঁটি সংস্কৃত খট্টাঙ্গ। শুনলেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চমকে উঠবে!

কিন্তু এমন একটা খট্টাঙ্গ কিনতে গিয়েই বিপত্তি!

একেবারে বাঁশবনে ডোমকানা। গায়ে গায়ে অজস্র ফার্নিচারের দোকান। টেবিল, চেয়ার, সোফা, আলনা, আয়না, পালঙ্কের একেবারে সমারোহ। কোন্ দোকানে যাই?

চারদিক থেকে সে কী সংবর্ধনার ঘটা! যেন এরা এতক্ষণ ধরে আমাদেরই প্রতীক্ষায় দস্তুরমতো তীর্থের কাকের মতো হাঁ করে বসে ছিল।

—এই যে স্যার—আসুন—আসুন—

—কী লইবেন স্যার, লইবেন কী? আয়েন, আয়েন, একবার দেইখ্যাই যান্—

—একবার দেখুন না স্যার—যা চান, চেয়ার, টেবিল, সোফা, খাট, বাক্স, ডেস্কো, টিপয়, আলনা, আয়না, র‍্যাক, ওয়েস্ট-পেপার বাস্‌কেট, লেটার বক্স—

লোকটা যে ভাবে মুখে ফেনা তুলে বলে যাচ্ছিল, মনে হচ্ছিল একেবারে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পর্যন্ত বলে তবে থামবে।

টেনিদা বললে, দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালাতনে পড়লাম।

উপদেশ দিয়ে বললাম, চট্‌পট্ যেখানে হয় ঢুকে পড়ো, নইলে এর পরে হাত-পা ধরে টানতে শুরু করে দেবে।

তার বড় বাকিও ছিল না। অতএব দু'জনে একেবারে সোজা দমদম বুলেটের মতো সেঁধিয়ে গেলাম—সামনে যে দোকানটা ছিল, তারই ভেতরে।

—কী চান দাদা, কী চাই?

—একখানা ভালো খাট।

—মানে প্লালং? দেখুন না, এই তো কত রয়েছে। যেটা পছন্দ হয়! ওরে ন্যাপলা, বাবুদের জন্যে চা আন, সিগরেট নিয়ে আয়—

—মাপ করবেন, চা-সিগরেট দরকার নেই। এক পেয়ালা চা খাওয়ালে খাটের দরে তার পাঁচ গুণ আদায় করে নেবেন তো। আমরা পটলডাঙার ছেলে মশাই, ওসব চালাকি বুঝতে পারি। বাঙাল পান নি—হুঁ!

দোকানদার বোকার মতো তাকিয়ে রইল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, না খান তো না খাবেন মশাই—ব্যবসার বদনাম করবেন না।

—না করবে না! ভারী ব্যবসা—চোরা বাজার মানেই তো চুরির আখড়া। চা-সিগরেট খাইয়ে আরো ভালো করে পকেট মারবার মতলব!

মিশকালো দোকানদার চটে বেগুনী হয়ে গেল : ইঃ, ভারী আমার ব্রাহ্মণ-ভোজনের বামুন রে! ওঁকে চা না খাওয়ালে আমার আর একাদশীর পারণ হবে না! যান যান মশাই—অমন খদ্দের ঢের দেখেছি।

—আমিও তোমার মতো ঢের দোকানদার দেখেছি—যাও—যাও—

এইরে—মারামারি বাধায় বুঝি! প্রাণ উড়ে গেল আমার। টেনিদাকে টেনে দোকান থেকে বার করে নিয়ে এলাম।

টেনিদা বাইরে বেরিয়ে বললে, ব্যাটা চোর!

বললাম, নিঃসন্দেহ। কিন্তু এখানে আর দাঁড়িও না, চলো অন্য দোকান দেখি।

অনেক অভ্যর্থনা এড়িয়ে আর অনেকটা এগিয়ে আর একখানা দোকানে ঢোকা গেল। দোকানদার একগাল হেসে বললে, আসুন—আসুন—পায়ের ধুলো দিয়ে ধন্য করুন! এ তো আপনাদেরই দোকান।

—আমাদের দোকান হলে কি আর আপনি এখানে বসে থাকতেন মশাই? কোন্ কালে বার করে দিতাম, তারপর যা পছন্দ হয় বিনি পয়সায় বাড়িতে নিয়ে যেতাম।

এ দোকানদারের মেজাজ ভালো—চটল না। একমুখ পান নিয়ে বাধিত হাসি হাসবার চেষ্টা করলে : হেঁঃ—হেঁঃ—হেঁঃ। মশাই রসিক লোক। তা নেবেন কী?

—একখানা ভালো খাট।

www.boiRboi.blogspot.com

—এই দেখুন না। এখানা প্লেন, এখানাতে কাজ করা। এটা বোম্বাই প্যাটার্ণ, এটা লণ্ডন প্যাটার্ণ, এটা ডি-লুক্স প্যাটার্ণ, এটা মানে-না-মানা প্যাটার্ণ—

—থামুন, থামুন। থাকি মশাই পটলডাঙা স্ট্রীটে—অত দিল্লী-বোম্বাই-কাম্‌স-কাট্‌কা প্যাটার্ণ দিয়ে আমার কী হবে! এই এখানার দাম কত?

—ওখানা? তা ওর দাম খুবই সস্তা। মাত্র সাড়ে তিনশো।

—সা—ড়ে তিনশো?—টেনিদার চোখ কপালে উঠল।

—হ্যাঁ—সাড়ে তিনশো। এক ভদ্দরলোক পাঁচশো টাকা নিয়ে ঝুলোঝুলি পরশু—তাঁকে দিই নি।

—কেন দেন নি?

—আমার এসব রয়্যাল খাট মশাই—যাকে-তাকে বিক্রী করব? তাতে খাটের অমর্যাদা হয় যে। আপনাকে দেখেই চিনেছি—বনিয়াদী লোক। তাই মাত্র সাড়ে তিনশোয় ছেড়ে দিচ্ছি—আপনি খাটের যত্ন-আত্তি করবেন।

আহা—লোকটার কী অন্তর্দৃষ্টি। ঠিক খদ্দের চিনেছে তো। আমার শ্রদ্ধাবোধ হল। কিন্তু টেনিদা বশীভূত হবার পাত্র নয়।

—যান—যান মশাই, এই খাটের দাম সাড়ে তিনশো টাকা হয় কখনো? চালাকি পেয়েছেন? কী ঘোড়ার ডিম কাঠ আছে এতে?

বলতে বলতেই খাটের পায়া ধরে এক টান—আর সঙ্গে সঙ্গেই মড়্-মড়্-মড়াৎ। মানে, খাটের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি।

—হায়—হায়—হায়—

দোকানদার হাহাকার করে উঠল : আমার পাঁচশো টাকা দামের জিনিস মশাই, দিলেন সাবাড় করে? টাকা ফেলুন এখন।

—টাকা। টাকা একেবারে গাছ থেকে পাকা আমের মতো টুপটুপ করে পড়ে, তাই না? খাট তো নয়—দেশলাইয়ের বাক্স, তার আবার দাম!

দোকানদার এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে। খপ্ করে টেনিদার ঘাড় চেপে ধরেছে : টাকা ফেলুন—নইলে পুলিস ডাকব।

বেচারা দোকানদার—টেনিদাকে চেনে না। সঙ্গে সঙ্গে যুযুৎসুর এক প্যাঁচে তিন-হাত দূরে ছিটকে চলে গেল। পড়ল একটা টেবিলের ওপর—সেখান থেকে নীচের একরাশ ফুলদানীর গায়ে। ঝন-ঝন করে দু' তিনটে ফুলদানীর সঙ্গে সঙ্গে গয়াপ্রাপ্তি হয়ে গেল—খণ্ড-প্রলয় দস্তুরমতো।

দোকানদারের আর্তনাদ—হৈ-হৈ হট্টগোল। মুহূর্তে টেনিদা পাঁজাকোলা করে তুলে ফেলেছে আমাকে, তারপর বিদ্যুৎবেগে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে বৌ-বাজার স্ট্রীটে। আর বেমালুম ঘুষি চালিয়ে ফ্ল্যাট করে ফেলেছে গোটা তিনেক লোককে। তার পরেই তেমনি ব্লিৎস্‌ক্রীগ করে সোজা লাফিয়ে উঠে পড়েছে একখানা হাওড়ার ট্রামে। যেন ম্যাজিক।

পেছনের গণ্ডগোল যখন বৌ-বাজার স্ট্রীটে এসে পৌঁছেছে, ততক্ষণে আমরা ওয়েলিংটন স্ট্রীট পেরিয়ে গেছি।

আমি তখনো নিঃশ্বাস ফেলতে পারছি না। উঃ—একটু হলেই গিয়েছিলাম আর কী! অতগুলো লোক একবার কায়দা মতো পাকড়াও করতে পারলেই হয়ে গিয়েছিল, পিটিয়ে একেবারে পরোটা বানিয়ে দিত।

টেনিদা বললে, যত সব জোচ্চোর। দিয়েছি ঠাণ্ডা করে ব্যাটাদের।

আমি আর বলব কী। হাঁ করে কাতলা মাছের মতো দম নিচ্ছি তখনো। বহু ভাগ্যি যে পৈতৃক প্রাণটা রক্ষা পেল আজকে।

ট্রাম চীনেবাজারের মোড়ে আসতেই টেনিদা বললে, নাম্—নাম্।

—এখানে আবার কী?

—আয় না তুই।...এক ঝটকায় উড়ে পড়েছি ফুটপাথে।

টেনিদা বললে, চীনেদের কাছে সস্তায় ভালো জিনিস মিলতে পারে। আয় দেখি।

বাঙালীর হাত থেকে রক্ষা পেয়েছি, আবার চীনেম্যানের পাল্লায়! নাঃ, প্রাণটা নিয়ে আর বাড়ি ফিরতে পারব মনে হচ্ছে না। প্যালারাম বাঁড়ুয্যে নিতান্তই পটল তুলল আজকে। কার মুখ দেখে বেরিয়েছিলাম—হায় হায়!

সভয়ে বললাম, আজ না হয়—

—চল্ চল্—ঘাড়ে আবার একটি ছোট রদ্দা।

ক্যাঁক্ করে উঠলাম। বলতে হল, চলো।

চীনেম্যান বললে, কাম কাম, বাবু। হোয়াত্ ওয়ান্ত? (What want?)

টেনিদার ইংরেজী বিদ্যেও চীনেম্যানের মতোই। বললে, কট্ ওয়াণ্ট্।

—কত্? ভেরি নাইস্ কত্ দেয়ার আর মেনি। হুইচ্ তেক? (Cot? Very nice cot. There are many. Which take?)

—দিস্।...একটা দেখিয়ে দিয়ে টেনিদা বললে, কত দাম?

—তু হান্দ্রেদ্ লুপীজ (Two hundred rupees)।

—অ্যাঁ—দুশো টাকা! ব্যাটা বলে কী! পাগল না পেট খারাপ? কী বলিস্ প্যালা—এর দাম দুশো হয় কখনো?

চুপ করে থাকাই ভালো। যা দেখছি তা আশাপ্রদ নয়। পুরোনো খাট—রং-চং করে একটু চেহারা ফিরাবার চেষ্টা হয়েছে। খাট দেখে একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু টেনিদা যখন পছন্দ করেছে, তখন প্রতিবাদ করে মার খাই আর কি! না হয় ম্যালেরিয়াতেই ভুগছি, তাই বলে কি এতই বোকা?

বললাম, হুঁ, বড্ড বেশি বলছে।

টেনিদা বললে, সব ব্যাটা চোর। ওয়েল মিস্টার চীনেম্যান, পনেরো টাকায় দেবে?

হো-হোয়াত? ফিপ্‌তিন লুপীজ? দোন্ত জোক বাবু। গিভ্ এইতি লুপীজ। (What? Fifteen rupees? Don't joke, Babu! Give eighty rupees.)

—নাও—নাও চাঁদ—আর পাঁচ টাকা দিচ্ছি—

—দেন গিভ্ ফিপ্‌তি—

শেষ পর্যন্ত পঁচিশ টাকায় রফা হল।

খাট কিনে মহা উল্লাসে টেনিদা কুলির মাথায় চাপালে। আমাকে বললে, প্যালা, এবারে তুই বাড়ি যা—

পোলাও খাওয়ানোর কথাটা জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল—কিন্তু লাভ কী। দোকানদার ঠেঙিয়ে সেই থেকে অগ্নিমূর্তি হয়ে আছে—পোলাওয়ের কথা বলে বিপদে পড়ব নাকি। মানে মানে বাড়ি পালানোই প্রশস্ত!

কিন্তু পোলাও ভোজন কপালে আছেই—ঠেকাবে কে!

পরের গল্পটুকু সংক্ষেপেই বলি। রাত্রে বাড়ি ফিরে খাটে শুয়েই টেনিদার লাফ। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ছারপোকা—কাঁকড়াবিছে, পিশু—কী নেই সেই চৈনিক খাটে? শোবার সঙ্গে সঙ্গেই জ্বালাময়ী অনুভূতি!

খানিকক্ষণ জ্বলন্ত চোখে টেনিদা তাকিয়ে রইল খাটের দিকে। বটে, চালাকি! তিনটে গোরা আর চোরাবাজারের দোকানদার ঠ্যাঙানো রক্ত নেচে উঠেছে মগজের মধ্যে। তারপরেই একলাফে উঠোনো অবতরণ, কুড়ুল আনয়ন—এবং—

অতগুলো বাড়তি কাঠ দিয়ে আর কী হবে! দিন কয়েক কয়লার অভাব তো

www.boiRboi.blogspot.com

মিটল। আর ঘরে আছে গোপালভোগ চাল—অতএব—

অতএব পোলাও।

খট্টাঙ্গের জয় হোক! আহা-হা কী পোলাও খেলাম! পোলাও নয়—পলান্ন। তার বর্ণনা আর করব না, পাছে দৃষ্টি দাও তোমরা!

Suman Kumar Saha
144. NO Gulisthan, Dhaka

ভুতুড়ে

আমি যতই বলি ভূত নেই, ওসব স্রেফ গাঁজার কলকে, কেষ্টা ততই চেঁচাতে থাকে।

—যেদিন ঘাড় মটকে দেবে, সেদিন টের পাবি, বুঝলি?

—আরে যাঃ যাঃ!...একটা চীনেবাদামের খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে আমি বললাম—রেখে দে তোর ভূত। আমার কাছে এসেই দেখুক না বাছাধন, আমি নিজেই তার ঘাড় মটকে দেব।

কেষ্টা চেঁচাতে লাগল—দেখা যাবে—দেখা যাবে। যেদিন আমগাছে এক ঠ্যাং আর দূরের তালগাছের মাথায় আর একটা ঠ্যাং চাপিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে, সেদিন আর চ্যাঁ-ভ্যাঁ করতে হবে না, বুঝলি? এখন ঘুঘু দেখেছিস তখন ফাঁদ দেখবি।

—ওসব নওগাঁ ব্র্যান্ড শিকেয় তুলে রাখ।...আমি সংক্ষেপে মন্তব্য করলাম।

কেষ্টা বললে—তুই পাষণ্ড, তুই নাস্তিক।

আমি বললাম—হতে পারে। তাই বলে তুই অমন ষণ্ডের মত চ্যাঁচাবি, এর মানে কী?

কেষ্টা রাগে ভোঁ-ভোঁ করতে করতে উঠে যাচ্ছিল, এমন সময় বাঞ্ছা কোত্থেকে এসে তার হাত চেপে ধরলে। বললে—আহাহা চটছিস্ কেন? সবাই তো প্যালা হতভাগার মত নাস্তিক নয়। আমি নিজে বলছি, স্বচক্ষে ভূত দেখেছি আমি।

—সত্যি?—কেষ্টার হাসি গাল ছাপিয়ে কান পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছুল।

আমি বললাম—বাজে।

—বাজে! তবে শোন্। শুনে চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন কর। কিন্তু কেষ্টা, তার আগে কিছু খাওয়াতে হবে মাইরি। বড্ড খিদে পেয়েছে।

এমনিতে কেষ্টা হাড়-কেপ্পন। কাউকে এক পয়সা খাওয়ানো তো দূরের কথা, সব সময়েই পরস্মৈপদীর তালে আছে। কিন্তু ভূতের মহিমাই আলাদা। সঙ্গে সঙ্গে এক টাকার ফুলকপির সিঙ্গাড়া আর 'জলযোগের' সন্দেশ চলে এল। সেগুলোর অর্দ্ধেকের ওপর একাই সাবাড় করে, বড় গোছের একটা ঢেঁকুর তুলে বাঞ্ছা বললে—তবে শোন :

www.boiRboi.blogspot.com

বছর তিনেক আগের কথা।

ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে মামার বাড়িতে বেড়াতে গেছি।

গ্রামটা হল কালনার কাছাকাছি, একেবারে গঙ্গার ধারে। খাসা জায়গা। যেমন খাওয়া-দাওয়া, তেমনি আরাম। দুমাসের মধ্যেই আমি মুটিয়ে গেলাম।

বেশ আছি, আরামে দিন কাটছে। এমন সময় এক অঘটন। পাশের বাড়ির হরিশ হালদার এক বর্ষার রাত্রিতে পটল তুলল।

লোকটা যতদিন বেঁচে ছিল, গ্রামশুদ্ধু লোকের হাড়-মাংস একেবারে ভাজা ভাজা করে রেখেছে। বাজখাঁই গলা, খিটখিটে মেজাজ। বাড়িতে কাক বসলে হার্টফেল করত, বেড়ালে কুকুরে পর্যন্ত বাড়ির ত্রি-সীমানায় ঘেঁষত না। বউটা আগেই মরেছিল, ছেলেটা কোথায় জব্বলপুরে না জামালপুরে যুদ্ধের চাকরি নিয়ে চম্পট দিয়েছিল। বাড়িতে বুড়ো একা থাকত। তার মস্ত একটা ফলের বাগান ছিল—সেইটাই পাহারা দিত।

এমন বিদিকিচ্ছি লোক যে বিদিকিচ্ছি সময়ে মারা যাবে তাতে সন্দেহ কী! সেদিন বেশ মিঠে মিঠে বৃষ্টি নেমেছে ঝিম্‌ঝিম্ করে, পেট ভরে মুগের ডালের খিচুড়ি আর ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে বিছানা নিয়েছি—এমন সময় ডাক এল মড়া পোড়াতে যেতে হবে।

আমি থপ্ করে বাঞ্ছার কথায় বাধা দিয়ে বললাম—ওসব পুরোনো গল্প। পত্রিকার পাতায় গণ্ডা গণ্ডা ওরকম গল্প বেরিয়ে গেছে।

বাঞ্ছা ভ্রূকুটি করে বললে—আরে আগে শোন্ না বাপু! পরে যত খুশি বকর-বকর করিস্।

কেষ্টা বললে—ঠিক!...তারপর এমন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকাল যে বামুন হলে নির্ঘাৎ ভস্ম করে ফেলত।

বাঞ্ছা বলে চলল—কী আর করি! বেরুতেই হল। পাশের বাড়িতে একটা লোক মরে পড়ে থাকবে এটা তো কোনো কাজের কথা নয়। যতই খিট্‌খিটে বদখত লোক হোক না কেন, মানুষ হিসাবে একটা কর্তব্য আছে তো!

বেরিয়ে দেখি আমরা মাত্র চারজন। ডাকাডাকি করেও কারো সাড়া মেলে নি—কেউ কাঁপা গলায় বলেছে জ্বর হয়েছে, কেউ কাতরাতে কাতরাতে জবাব দিয়েছে, কান কটকট করছে। কাজেই আমাদের চারজনকেই কাঁধ দিতে হল। দুজনের দুহাতে দুটো লণ্ঠন ঝুলতে ঝুলতে চলল, আর কাঁধে দুলতে দুলতে চলল মড়া।

মুখুয্যেদের নরেশ আক্ষেপ করে বললে, জ্যান্তে বুড়ো জ্বালিয়ে মেরেছে, মরেও একখানা খেল্ দেখিয়ে গেল।

কিন্তু কী আর করা যাবে, উপায় তো নেই। সেই টিপিটিপি বৃষ্টি আর শন্‌শনে হাওয়ায় বর্ষা-পিছল রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চললাম আমরা। চারদিকে কালির মতো অন্ধকার—গাছপালাগুলো সেই অন্ধকারে এক একটা অতিকায় দৈত্য-দানার মতো মাথা নাড়ছে। বিদ্যুতের চমকানিতে চোখে ধাঁধা লেগে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পথ ভুল করে পাশের খানার মধ্যে গিয়ে পড়ছি আমরা। বৃষ্টির ছাটে চট-চট করে ফাটছে লণ্ঠনের চিম্‌নি। পা পিছলে যেতে চাইছে, ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ঝাপ্‌টা লেগে চোখ জ্বালা করছে! ভোগান্তি আর কাকে বলে?

'বল হরি, হরি বল'—চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে চললাম চারজনে। কাঁধের ওপর বুড়ো যেন পরম আনন্দে দোল খাচ্ছে। আমার সন্দেহ হল এখন হয়তো মড়ার মুখের কাপড় সরালে দেখা যাবে, আমাদের দুর্গতিতে মিটিমিটি হাসছে হাড়-জ্বালানো লোকটা। মনে মনে অভিসম্পাত করতে করতে আমরা এগিয়ে চললাম।

হ্যাঁ—বলতে ভুলে গেছি, শুধু আমরা চারজনেই নই; বুড়োর দুটো বাগ্‌দী প্রজাও ছিল। তারা তো আর বামুনের মড়াকে কাঁধ দিতে পারবে না, তাই তারা কুড়ুল কাঁধে আসছিল পেছনে পেছনে—কাঠ কেটে আনবে।

সে যাই হোক, শ্মশানে তো পৌঁছানো গেল। শ্মশান ঠিক গাঁয়ের নীচে নয়—বেশ খানিকটা দূরে। আশেপাশে বাড়ি-ঘর কিছু নেই—অনেকটা পর্যন্ত ন্যাড়া মাঠের ভেতরে এলোমেলো বাবলার বন। সেখানে একখানা টিনের চালাঘর—অবশ্য চারদিকে তার দেয়াল-ফেয়ালের কোনো বালাই নেই—একেবারে ফাঁকা। এইটেই শ্মশান-যাত্রীদের বসবার জায়গা।

ঠিক তারই নীচে একটা বাঁধানো সিঁড়ি নেমে গেছে গঙ্গার জলে। মস্ত সিঁড়ি, প্রায় খান পনেরো পৈঠে, এখন বর্ষার জলে তিন-চারখানা মাত্র জেগে রয়েছে। ভাঙা-চুরো অবস্থা—যেখানে সেখানে বড় বড় ফাটল, ইট বেরিয়ে পড়েছে। আমরা ওই সিঁড়ির ওপরেই মড়াটাকে নামালাম। এমনভাবে রাখলাম যাতে মড়ার পা দুটো ডুবানো থাকে গঙ্গার জলে। বুড়োর গঙ্গাযাত্রাও হবে, তা ছাড়া এ সুবিধেও আছে যে কারুকে আর ছুঁয়ে বসে থাকতে হবে না।

মড়া নামিয়ে আমরা গিয়ে বসলাম চালাটার নীচে। বাগ্‌দীরা কাঠের ব্যবস্থা করুক, তারপর চিতা সাজানো যাবে। বসে বসে গল্প জুড়ে দিলাম আমরা।

চারদিকে ঘন অন্ধকার। হাওয়ায় হাওয়ায় বাবলা-বনের মাতামাতি। এখানে ওখানে শেয়ালের চোখ ঝল্‌মল্‌ করছে সবুজ রঙের হিংস্র আলোর মতো। সে চোখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কখনো বা ভয় ধরে যাচ্ছিল আমাদের—ভূত নয় তো!

লণ্ঠন দুটোর গায়ে কালি পড়েছে, অল্প অল্প আলো গিয়ে পড়েছে ঘাটে নামানো মড়াটার ওপরে। কথার ফাঁকে ফাঁকে মড়ার দিকে নজর রাখছি আমরা। শেয়ালে-টেয়ালে এসে টেনে না নেয় সে সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকা দরকার।

কতক্ষণ কেটেছে খেয়াল ছিল না, হঠাৎ ভীতস্বরে নরেশ বললে, মড়াটা একটু নড়ল না?

আমরা বললাম, ধ্যাৎ—তোর চোখের ভুল।

খানিক পরে আবার পটলা বললে, মড়াটা সত্যিই কিন্তু নড়ে উঠেছে।

আমাদের ভেতরে সবচেয়ে সাহসী ছিল কানু। যেমন বুকের ছাতি তেমনি বেপরোয়া। কানু আশ্বাস দিয়ে বললে, ও কিছু না—জলের ঢেউয়ে নড়ে থাকবে।

আবার মিনিট কয়েক কাটতে না কাটতে আতঙ্কে আমার সমস্ত শরীর যেন ঝাঁকুনি খেয়ে উঠল। কোনো ভুল নেই—লণ্ঠনের অল্প অল্প আলোতেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে মড়াটা সত্যি সত্যিই একটু একটু করে জলের দিকে নেমে যাচ্ছে।

—ও কি! ও কি!

আমি, নরেশ আর পটলা একসঙ্গেই আর্তনাদ করে উঠলাম।

কানু সোজা দাঁড়িয়ে উঠল। ধমক দিয়ে বললে, দুত্তোর, ভীতুর ডিম সব! পেছল সিঁড়ি, তাই গড়িয়ে পড়ছে নীচের দিকে। দাঁড়া, আমি তুলে নিয়ে আসি।

মড়া তখনো নামছে, হাঁটু পর্যন্ত তার নেমে গেছে গঙ্গায়! কানু গিয়ে বাঁশের মাচাটা ধরে টান দিলে। কিন্তু কী সাংঘাতিক! কানুর টানকে অস্বীকার করেও মড়াটা আরো নীচে নেমে গেল!

গোঁয়ার-গোবিন্দ কানু এবার দু'হাতে মড়াটাকে জাপটে ধরলে। কিন্তু আশ্চর্য—কানু রাখতে পারলে না! দু'ধাপ পিছলে সে শুদ্ধ গিয়ে কোমর জলে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সাহস উবে গেল তার। এবার কানু আকুল হয়ে চীৎকার করে উঠল, ওরে তোরা ছুটে আয়, মড়া আমাকে শুদ্ধ নিয়ে যাচ্ছে!

ততক্ষণে বুকে আমাদের আর রক্ত নেই, তা জল হয়ে গেছে! আমরা চীৎকার করে বললাম, মড়া ছেড়ে দাও—

কানু বললে, পারছি না—

আমরা ছুটে গেলাম—চেপে ধরলাম কানুকে।

তারপরে যা শুরু হল, সে কথা ভাবতে আজও আতঙ্কে মাথার চুল খাড়া হয়ে ওঠে।

ওই হাড্ডিসার মড়াটার গায়ে সে কি অমানুষিক শক্তি! একদিকে আমরা চারজন, অন্যদিকে মড়া একা—আমাদের সকলকে অনায়াসে তুচ্ছ করে সে জলের মধ্যে টেনে নিয়ে চলল! ঠাণ্ডাজল আমাদের কোমর ছাপিয়ে পেট পর্যন্ত উঠল, তারপর এসে পৌঁছুল বুক পর্যন্ত। তারপর—তারপর আমরা পরিষ্কার বুঝতে পারছি—আর আমাদের আশা নেই—এই মড়া আমাদের টেনে নিয়ে চলেছে, চলেছে গঙ্গার অতল জলে, সেখানে—

আশ্চর্য একটা ভয়ঙ্কর অবস্থা! সমস্ত জ্ঞানগম্যি যেন লোপ পেয়ে গেছে আমাদের। একটা আচ্ছন্নতার ঘোরে, যেন মরিয়া হয়ে মড়ার সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার চালিয়ে চলেছি আমরা। অথচ বেশ বুঝতে পারছি, আমাদের জয়ের কোনো আশা নেই, অপদেবতার অমানুষিক শক্তির কাছে আমাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক।

আর সব চাইতে ভয়ানক—মড়া ছেড়ে দিয়ে যে উঠে আসব সে ক্ষমতা আমাদের নেই! কানু মড়াকে ছাড়তে পারছে না—আমরা ছাড়তে পারছি না কানুকে। যেন কী একটা মন্ত্রবলে সে আমাদের তার শরীরের সঙ্গে আটকে নিয়েছে—যেন হিপ্‌নোটাইজ করে ফেলেছে সকলকে।

বুক জল ক্রমশ গলা জলে পৌঁছেছে, আর দেরি নেই মৃত্যুর। চারদিকে গঙ্গার অন্ধকার কালো জলে যেন শুনতে পাচ্ছি শয়তানের হাসির খিল্‌-খিল্‌ শব্দ। গঙ্গার অতল জল—সেখান থেকে প্রেতপুরীর অন্ধকার জগৎ! এই মড়াটা তারই দিকে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছে!

শেষবারের মতো আমরা সমস্বরে আর্তনাদ করে উঠলাম।

ঠিক এমন সময়—কাঠের বোঝা নিয়ে আসছিল বাগ্‌দীরা। আমাদের চীৎকার শুনে তারা এসে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। ছিলাম চারজন, হলাম ছয়জন। পূর্ণোদ্যমে চলতে লাগল সে অমানুষিক টাগ-অব-ওয়ার!

তারপর—

তারপর আস্তে আস্তে থেমে দাঁড়াল মড়া। আস্তে আস্তে আমরা জয়লাভ করতে লাগলাম। ক্রমশ মড়া আমাদের আয়ত্তের মধ্যে এসে পৌঁছতে লাগল। তখনো তার প্রচণ্ড টান আছে বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা তাকে ফিরিয়ে আনতে পারলাম ঘাটের দিকে। গলা জল থেকে বুক জলে, সেখান থেকে কোমর জলে, সেখান থেকে হাঁটু জলে, তারপর—

ওদিকের টানটা ঝড়াৎ করে ছেড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছিটকে এল ওপরে আর আমরা ছয়জন হুড়মুড় করে এ ওর ঘাড়ে ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেলাম।

আর ভুস্‌—স্‌-স্‌—

ঠিক তৎক্ষণাৎ ঘাটের ওপর জলের মধ্যে দেখা দিলে—

বাঙ্কা থামল।

আমরা রুদ্ধশ্বাসে শুনে যাচ্ছি এই অতি ভয়ঙ্কর কাহিনী। একসঙ্গে বলে উঠলাম —কী ভেসে উঠল?

ধীরে সুস্থে বাঙ্কা বললে—আর কী? প্রায় দেড়মণ।

www.boiRboi.blogspot.com

—কী দেড়গণ?—আকুল স্বরে কেষ্টা প্রশ্ন করলে।

—আমাদের কালনার গপ্পার বিখ্যাত অতিকায় কচ্ছপ। সেই ব্যাটাই—

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

কেষ্টা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : মিথ্যেবাদী—জোচ্চোর!

বাঞ্ছা বললে—হতে পারি। কিন্তু আজ বেড়ে খাইয়েছিস্ কেষ্টা, ভূতের জয় জয়কার হোক তোর।

নিরুত্তরে কেষ্টা হন্-হন্ করে নেমে গেল রাস্তায়।

ক্যামোফ্লেজ

চাটুয্যেদের রোয়াকে গল্পের আড্ডা জমেছিল। আমি, ক্যাবলা, হাবুল সেন, আর সভাপতি আমাদের পটলডাঙার টেনিদা। একটু আগেই ক্যাবলার পকেট হাতড়ে টেনিদা চারগণ্ডা পয়সা রোজগার করে ফেলেছে, তাই দিয়ে আমরা তারিয়ে তারিয়ে কুল্পি বরফ খাচ্ছিলাম।

শুধু হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা বসে আছে। হাতের শালপাতাটার ফাঁক দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় কুল্পির রস গড়িয়ে পড়ছে, ক্যাবলা খাচ্ছে না।

টেনিদা হঠাৎ তার বাঘা গলায় হুঙ্কার ছাড়লে, এই ক্যাবলা, খাচ্ছিস না যে?

ক্যাবলার চোখে তখন জল আসবার জো। সে জবাব দিলে না, শুধু মাথা নাড়ল।

—খাবি না? তবে না খাওয়াই ভালো। কুল্পি খেলে ছেলেপুলের পেট খারাপ করে—বলতে না বলতেই থাবা দিয়ে টেনিদা ক্যাবলার হাত থেকে কুল্পিটা তুলে নিলে, তারপর চোখের পলক পড়তে না পড়তে সোজা শ্রীমুখের গহ্বরে।

ক্যাবলা বললে, অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ—

—অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! এর মানে কী? বলি, মানেটা কী হল এর?—টেনিদা বজ্রগর্ভ স্বরে জিজ্ঞাসা করলে।

ক্যাবলা এবারে কেঁদে ফেলল : আমার চার আনা পয়সা তুমি মেরে দিলে, অথচ আমি ভাবছিলাম সিনেমা দেখতে যাব—একটা ভালো যুদ্ধের বই—

—যুদ্ধের বই—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : বলি, যুদ্ধের বইতে কী দেখবার আছে র‍্যা? খালি দুড়ুম্ দাড়ুম্, খালি ধুমধড়াক্কা, আর খানিকটা বাহাদুর কা খেল্! যুদ্ধের গল্প যদি শুনতে চাস্ তবে শোন্ আমার কাছে।

—তুমি যুদ্ধের কী জানো?—আমি ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করলাম।

—কী বললি প্যালা?—টেনিদার হুঙ্কারে আমার পালাজ্বরের পিলে নেচে

www.boiRboi.blogspot.com

উঠল : আমি জানিনে? তবে কে জানে শুনি? তুই?

—না, না, আমি আর জানব কোত্থেকে!—আমি তাড়াতাড়ি বললাম : বাসক-পাতার রস খাই আর পালাজ্বরে ভুগি, ওসব যুদ্ধ-ফুদ্ধ আমি জানব কেমন করে? তবে বলছিলাম কি না—টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি সোজা মুখে ইস্ক্রুপ এঁটে দিলাম।

—কিছুই বলছিলি না। মানে, কখনোই কিছু বলবি না।—টেনিদা চোখ দিয়েই যেন আমাকে একটা পেল্লায় রন্দা কষিয়ে দিলে : ফের যদি যুদ্ধের ব্যাপার নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করেছিস তবে ক্রুদ্ধ হয়ে নাকের ডগায় এমন একটি মুষ্টিবোধ বসিয়ে দেব যে, সোজা বুদ্ধদেব হয়ে যাবি—বুঝলি? মানে মিউজিয়ামে নাকভাঙা বুদ্ধদেব দেখেছিস্ তো, ঠিক সেই রকম।

আতঙ্কে আমি একেবারে ল্যাম্প-পোস্ট্ হয়ে গেলাম।

টেনিদা গলা ঝেড়ে বললে, আমি যখন যুদ্ধে যাই—মানে বার্মা ফ্রন্টে যেবার গেলাম—

খুক-খুক করে একটা চাপা আওয়াজ। হাবুল সেন হাসি চাপতে চেষ্টা করছে।

—হাসছিস্ যে হাবলা?—টেনিদা এবার হাবুলের দিকে মনোনিবেশ করলে।

মুহূর্তে হাবুল ভয়ে পান্সে মেরে গেল। তোত্লিয়ে বললে, এই ন্-ন্-না, ম্-মানে, ভাবছিলাম তুমি আবার কবে যু-যু-যুদ্ধে গেলে—

টেনিদা দারুণ উত্তেজনায় রোয়াকের সিমেন্টের উপর একটা কিল বসিয়ে দিয়ে উঃ উঃ করে উঠল। তারপর সেটাকে সামলে নিয়ে চীৎকার করে বললে, গুরুজনের মুখে মুখে তর্কো! ওই জন্যেই তো দেশ আজও পরাধীন! বলি, আমি যুদ্ধে যাই না যাই তাতে তোর কী? গল্প চাস্ তো শোন্, নইলে স্রেফ ভাগাড়ে চলে যা। তোদের মতো বিশ্ববকাটদের কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি।

—না, না, তুমি বলে যাও, আর আমরা তর্ক করব না। হাবুল সভয়ে আত্মসমর্পণ করল।

টেনিদা কুল্পির শালপাতাটা শেষ বার খুব দরদ দিয়ে চেটে নিলে, তারপর সেটাকে তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে বললে, তবে শোন্—

আমি তখন যুদ্ধ করতে করতে আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ী জায়গায় চলে গেছি। জাপানীদের পেলেই এমন করে ঠেঙিয়ে দিচ্ছি যে ব্যাটারা 'ফুজিয়ামা চুজিয়ামা' বলে ল্যাজ তুলে পালাতে পথ পাচ্ছে না। তেরো নম্বর ডিভিশনের আমি তখন কম্যান্ডার—তিন তিনটে ভিক্টোরিয়া ক্রস্ পেয়ে গেছি।

ক্যাবলা ফস্ করে জিজ্ঞেস করলে, সে ভিক্টোরিয়া ক্রসগুলো কোথায়?

—অত খোঁজে তোর দরকার কী? বলি গল্প শুনবি না বাগড়া দিবি বল তো?

—যেতে দাও, যেতে দাও। অমৃতং ক্যাবলা ভাষিতং। তুমি গল্প চালিয়ে যাও টেনিদা—হাবুল মন্তব্য করলে।

—যুদ্ধ করতে করতে সেই জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলাম—যার নাম তোরা কাগজে খুব দেখেছিস্। নামটা ভুলে যাচ্ছি—সেই যে কিসের একটা ডিম—

আমি বললাম, হাঁসের ডিম?

টেনিদা বললে, তোর মাথা।

ক্যাবলা বললে, তবে কি মুরগীর ডিম?

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু।

আমি আবার বললাম, তবে নিশ্চয় ঘোড়ার ডিম। তাও না? কাকের ডিম, বকের ডিম, ব্যাঙের ডিম—

ক্যাবলা বললে, ঠিক, ঠিক, আমার যেন মনে পড়েছে। বোধ হয় টিক্‌টিকির ডিম—

—অ্যাই, অ্যাই মনে পড়েছে।—টেনিদা এমনভাবে ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে যে ক্যাবলা আর্তনাদ করে উঠল : ঠিক ধরেছিস, টিড্ডিম।...হ্যাঁ—যা বলছিলাম। টিড্ডিমে তখন পেল্লায় যুদ্ধ হচ্ছে। জাপানী পেলেই পটাপট মেরে দিচ্ছি। চা খেতে খেতে জাপানী মারছি, ঝিমুতে ঝিমুতে জাপানী মারছি, এমন কি যখন ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছি তখনো কোন রকমে দু-চারটে জাপানী মেরে ফেলছি!

—নাক ডাকাতে ডাকাতে জাপানী মারা! সে আবার কী রকম?—আমি কৌতূহল দমন করতে পারলাম না।

—হে-হে-হে—টেনিদা একগাল হাসল : সে ভারী ইন্টারেস্টিং! আমার এই কুতুব-মিনারের মতো নাকই দেখেছিস, এর ডাক তো কখনো শুনিস্‌ নি! একেবারে যাকে বলে রণ-ডম্বরু! ওইজন্যেই তো মেজকাকা গেল বছর বিলিতী ইঞ্জিনিয়ার ডেকে আমার ঘরটা সাউন্ড প্রুফ্‌ করিয়ে নিলে, যাতে বাইরে থেকে ওর আওয়াজ কারো কানে না যায়। তা ছাড়া পাড়ার লোকেও কর্পোরেশনে লেখালেখি করছিল কিনা। একদিন তো পুলিস এসে বাড়ি তচনচ—রোজ রাত্রে এ বাড়িতে মেশিন্‌ গানের আওয়াজ পাওয়া যায়, নিশ্চয় এখানে বে-আইনী অস্ত্রের কারখানা আছে। সে এক কেলেঙ্কারী কাণ্ড। যাক্‌ সে গল্প আর একদিন হবে।

হ্যাঁ—গল্পটা বলি। রোজ রাত্রে ট্রেঞ্চ থেকে আমার নাকের এমনি আওয়াজ বেরুত যে আর সেন্ট্রি দরকার হত না। জাপানীরা ভাবত, সারা রাত বুঝি মেশিন্‌ গান চলছে, তাই পাহাড়ের ওপার থেকে তারা আর নাক গলাবার ভরসা পেত না। আমাদের যিনি সুপ্রিম কম্যান্ডার ছিলেন—নাম বোধ হয় মিস্টার বোগাস্‌—তাঁর মগজে শেষে একটা চমৎকার বুদ্ধি গজালে। তিনি একটা লোক রাখলেন। সে ব্যাটা সারারাত আমার পাশে বসে থাকত আর আমার নাকে একটার পর একটা শিসের গুলি, পাথরের টুকরো যা পারত বসিয়ে দিত। আধ সেকেন্ডের মধ্যেই দোনালো বন্দুকের দুটো গুলির মতো সেগুলো ছিটকে বেরিয়ে যেত—কত জাপানী যে ওতে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে তার হিসেব নেই।

আমি বিড়-বিড় করে আওড়ালাম : সব গাঁজা!

টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আমার দিকে ফিরল : কী বললি?

—না, না, বলছিলাম, এই আর কি—আমি সামলে গেলাম : কী মজা!

—হ্যাঁ, সে খুব মজার ব্যাপার। ওই জন্যেই তো একটা ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌ পাই আমি—টেনিদা তার দুর্দান্ত নাকটাকে গণ্ডারের খাঁড়ার মতো সগৌরবে আকাশের দিকে তুলে ধরল।

—তারপর? এই নাকের জোরেই বুঝি যুদ্ধ জয় হল?—হাবুল জানতে চাইল।

—অনেকটা। জাপানীদের যখন প্রায় নিকেশ করে ছেড়েছি, তখন হঠাৎ একটা বিদিকিচ্ছিরি কাণ্ড হয়ে গেল। আর সেইটেই হল আমাদের আসল গল্প।

—বলো, বলো—আমরা তিনজনে সমস্বরে প্রার্থনা জানালাম।

টেনিদা আবার শুরু করল, আমার একটা কুকুর ছিল। তোদের বাংলা দেশের ঘিয়ে ভাজা নেড়ি কুত্তো নয়, একটা বিরাট গ্রে-হাউন্ড। যেমন তার গাঁক গাঁক ডাক, তেমনি তার বাঘা চেহারা। আর কী তালিম ছিল তার। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে দু' পায়ে খাড়া হয়ে হাঁটতে পারত। বেচারা অপঘাতে মারা গেল। দুঃখ হয় কুকুরটার জন্যে. তবে বামুনের জন্যে মরেছে, ব্যাটা নির্ঘাৎ স্বর্গে যাবে।

—কি করে মরল?—হাবুল প্রশ্ন করল।

—আরে দাঁড়া না কাঁচকলা। যত সব ব্যস্তবাগীশ, আগে থেকেই ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে

www.boiRboi.blogspot.com

গল্পটা মাটি করে দিচ্ছে।

যাক, যা বলছিলাম। একদিন বিকেলবেলা, হাতে তখন কোনো কাজ নেই—আমি সেই কুকুরটাকে সঙ্গে করে বেড়াতে বেরিয়েছি। পাহাড়ী জঙ্গলে বেড়াচ্ছি হাওয়া খেয়ে। দু'দিন আগেই জাপানী ব্যাটারা ওখান থেকে সরে পড়েছে, কাজেই ভয়ের কোনো কারণ ছিল না। কুকুরটা আগে আগে যাচ্ছে, আর আমি চলেছি পেছনে।

কিন্তু ওই বেঁটে ব্যাটাদের পেটে পেটে শয়তানী। দিলে এই টেনি শর্মাকেই একটা লেঙ্গি কষিয়ে। যেতে যেতে দেখি পাহাড়ের এক নিরিবিলি জায়গায় এক দিব্যি আমগাছ। যত না পাতা, তার চাইতে ঢের বেশি পাকা আম তাতে। একেবারে কাশীর ল্যাংড়া! দেখলে নোলা শক্‌শক্‌ করে ওঠে।

—আরাকানের পাহাড়ে কাশীর ল্যাংড়া!—আমি আবার কৌতূহল প্রকাশ করে ফেললাম।

—দ্যাখ্‌ প্যালা, ফের বাধা দিয়েছিস্‌ একটা চাঁটি হাঁকিয়ে—

—আহা খেতে দাও—যেতে দাও—হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, পোলাপান!

—পোলাপান!—টেনিদা গর্জে উঠল : আবার বকর-বকর করলে একেবারে জল-পান করে খেয়ে ফেলব—এই বলে দিলাম, হুঁ!

হ্যাঁ, যা বলছিলাম। খাস কাশীর ল্যাংড়া। কুকুরটা আমাকে একটা চোখের ইঙ্গিত করে বললে, গোটা কয়েক আম পাড়ো।

ক্যাবলা বললে, কুকুরটা আম খেতে চাইল?

—চাইলই তো। এ তো আর তোদের এঁটুলি কাটা নেড়ী কুত্তো নয়, স্রেফ বিলিতী গ্রে-হাউন্ড। আম তো আম, কলা, মুলো, গাজর, উচ্ছে, নালতে শাক, সজনেডাঁটা সবই তরিবৎ করে খায়। আমি আম পাড়তে উঠলাম। আর যেই ওঠা—টেনিদা থামল।

—কী হল?

—যা হল তা ভয়ঙ্কর। আমগাছটা হঠাৎ জাপানী ভাষায় 'ফুজিয়ামা-টুজিয়ামা' বলে ডালপালা দিয়ে আমায় সাপটে ধরলে। তারপরেই বীরের মতো কুইক্‌ মার্চ। তিন-চারটে গাছও তার সঙ্গে সঙ্গে 'নিপ্পন বান্‌জাই' বলে হাঁটা আরম্ভ করলে!

—সে কি!—আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলাম : গাছটা তোমাকে জাপটে ধরে হাঁটতে আরম্ভ করলে!

—করলে তো। আরে, গাছ কোথায়? স্রেফ ক্যামোফ্লেজ।

—ক্যামোফ্লেজ! তার মানে?

—ক্যামোফ্লেজ মানে জানিস্‌নে? কোথাকার গাড়োল সব! টেনিদা একটা বিকট মুখভঙ্গি করে বলল : মানে ছদ্মবেশ। জাপানীরা ও ব্যাপারে দারুণ এক্সপার্ট ছিল। জঙ্গলের মধ্যে কখনো গাছ সেজে, কখনো ঢিবি সেজে ব্যাটারা বসে থাকত। তারপর সুবিধে পেলেই—ব্যস্‌!

—সর্বনাশ! তারপর?

—তারপর?—টেনিদা একটা উচ্চাঙ্গের হাসি হাসল : তারপর যা হওয়ার তাই হয়ে গেল।

—কী হল?—আমরা রুদ্ধশ্বাসে বললাম, কী করলে তারপর?

—আমাকে ধরে জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে গেল। ক্যামোফ্লেজটা খুলে ফেললে, তারপর বত্রিশটা কোদালে কোদালে দাঁত বের করে পৈশাচিক হাসি হাসল। কোমর থেকে ঝক্‌ঝকে একটা তরোয়াল বের করে বললে, মিস্টার, উই উইল কাট ইউ!

—কী ভয়ানক!—ক্যাবলা আর্তনাদ করে বললে, তুমি বাঁচলে কী করে?

—আর কী বাঁচা যায়?—বললে 'নিপ্পন বান্‌জাই'—মানে জাপানের জয় হোক। তারপর তলোয়ারটা ওপরে তুলে—

হাবুল অস্ফুটস্বরে বললে, তলোয়ারটা তুলে?

—ঝাঁ করে এক কোপ! সঙ্গে সঙ্গে আমার মুণ্ডু নেমে গেল। তারপর রক্তে রক্তময়!

—ওরে বাবা!—আমরা তিনজনে একসঙ্গে লাফিয়ে উঠলাম: তবে তুমি কি তা'হলে—

—ভূত? দূর গাধা, ভূত হব কেন? ভূত হলে কারু কি ছায়া পড়ে? আমি জল-জ্যান্ত বেঁচেই আছি—কেমন ছায়া পড়েছে—দেখতে পাচ্ছিস্ না?

আমাদের তিনজনের মাথা বোঁ-বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

হাবুল অতি কষ্টে বলতে পারল: মুণ্ডু কাটা গেল, তা'হলে তুমি বেঁচে রইলে কী করে?

—হুঁ হুঁ, আন্দাজ কর দেখি—টেনিদা আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

—কিছু বুঝতে পারছি না—কোনো মতে বলতে পারলাম আমি। মনে মনে ততক্ষণ রাম নাম জপ করতে শুরু করেছি। টেনিদা বলে ভুল করে তা'হলে কি এতকাল একটা স্কন্ধকাটার সঙ্গে কারবার করছি?

—দূর গাধা—টেনিদা বিজয়গর্বে বললে, কুকুরটা পালিয়ে এল যে?

—তাতে কী হল?

—তবু বুঝলি না? আরে এখানেও যে ক্যামোফ্লেজ!

—ক্যামোফ্লেজ!

—আরে ধ্যাৎ। তোদের মগজে বিলকুল সব ঘুটে, এক ছটাকও বুদ্ধি নেই। মানে আমি টেনি শর্মা—চালাকিতে অমন পাঁচশো জাপানীকে কিনতে পারি। মানে আমি কুকুর সেজেছিলাম, আর কুকুরটা হয়েছিল আমি। বেঁটে ব্যাটাদের শয়তানী জানতাম তো! ওরা যখন আমার, মানে কুকুরটার মাথা কেটে ফেলেছে, সেই ফাঁকে লেজ তুলে আমি হাওয়া!

আর তার পরেই পেলাম তিন নম্বর ভিক্টোরিয়া ক্রস্‌টা!

টেনিদা পরিতৃপ্তির হাসি নিয়ে আমাদের সকলের বোকাটে মুখগুলো পর্যবেক্ষণ করতে লাগল। তারপর একটা পৈশাচিক হুঙ্কার ছাড়ল: দু' আনা পয়সা বার কর্ প্যালা, ওই গরম গরম চানাচুর যাচ্ছে—

www.boiRboi.blogspot.com

পুলিশের কারবারই আলাদা

সেই কানে জড়ুলওলা লাল-টাই-পরা ভদ্রলোক বর্ধমান স্টেশনে চা খেতে নেমে যেতেই, ওপরের বাঙ্ক থেকে টুপ করে লাফিয়ে পড়লেন আর-এক ভদ্রলোক—যাঁর চুলগুলো খাড়া খাড়া, নাকের নিচে মাছিমার্কা গোঁফ আর হাওড়া থেকে যিনি সটান চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন।

মাছিমার্কা গোঁফ চট্ করে আমার পাশে এসে বসে পড়লেন। তার পরেই ফিসফিস করে বললেন, আপনি অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করেন?

কলেজে থার্ড ইয়ারে পড়ি, ডন-বৈঠক করে থাকি, শার্লক হোম্‌সের গোয়েন্দা-গল্পগুলো আমার প্রায় মুখস্থ। আমি পছন্দ করব না অ্যাডভেঞ্চার?

কৌতূহলী হয়ে বললুম, ব্যাপার কী মশাই?

—ব্যাপার?—প্ল্যাটফর্মের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে, বেশ করে দেখে-শুনে, মাছিমার্কা গোঁফ বললেন, ঐ যে লোকটা—কানে জড়ুল আর লাল রঙের টাই—এখুনি যে চা খেতে নেমে গেল—ওকে চেনেন?

—না।

—ও হচ্ছে—মাছিমার্কা গোঁফ চোখের তারা দুটো কপালে তুলে বললেন, দুর্দান্ত ডাকাত আর ঘোরতর জালিয়াৎ। ওর নাম হচ্ছে ছেদীলাল খাঁ। ওকেই পাকড়াবার জন্যে আমি, মানে গোয়েন্দা-পুলিশের ইন্‌স্‌পেকটর গঙ্গারাম পাকড়াশী, এমনি ঘাপটি মেরে শুয়ে আছি।

—অ্যাঁ।

গঙ্গারাম পাকড়াশী আবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিয়ে বললেন, ওকে ধরতেই হবে। আপনি আর আমি। পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড পেয়ে যাবেন। রাজী আছেন?

শুনে আমার রোমাঞ্চ হল! উত্তেজনায় কান কটকট করতে লাগল।

বললুম, আলবাৎ।

—তবে প্ল্যানটা শুনুন। চটপট বলে ফেলি। আমি এই সীটের তলায় লুকিয়ে থাকব। ট্রেন চলতে আরম্ভ করলে তলা থেকে ছেদীলালের পা ধরে হেঁইয়ো বলে টান লাগাব। সঙ্গে সঙ্গে পড়ে যাবে কুমড়োর মতো। কিন্তু কী জানেন, লোকটার গায়ে ভীষণ জোর। একা হয়ত ধরে রাখতে পারব না। তখন আপনাকে সাহায্য করতে হবে। তার পর দুজনে মিলে ওকে দড়ি দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলব, আর আসানসোল এলেই—বুঝলেন না?

—বিলক্ষণ! আমার নাকের ডগাটা উৎসাহে এবার সুড়সুড় করতে লাগল। যেন একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে।

—আজ ওকে পাকড়াতে না পারলে আমার পাকড়াশী-জন্মই বৃথা। ভারি ঘুঘু লোক মশাই, অনেক দিন থেকে জ্বালাচ্ছে। তাহলে আপনি রেডি?

—এখুনি। আমার তো ইচ্ছে করছিল, নেমে গিয়ে প্ল্যাটফর্মেই ছেদীলালকে ল্যাং মেরে ফেলে দিই।

—তবে কথা রইল। এই বলেই একটা চমৎকার কাণ্ড করলেন গঙ্গারাম। পুলিশের

লোক তো, ও'দের কারবারই আলাদা! ও'র নিজের সুটকেস আর বালিশ বাঙ্কের ওপর লম্বালম্বি সাজিয়ে তার ওপর চাদরটা এমনভাবে টেনে দিলেন যে ঠিক যেন মনে হল, গণ্গারামই চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমুচ্ছেন। তার পরেই চট্ করে ঢুকে গেলেন সীটের তলায়।

বাইরে জুতোর শব্দ। আমার বুকের ভেতরটা আঁকুপাঁকু করে উঠল। দরজা খুলে এসে ঢুকল দুর্দান্ত ডাকাত আর দুর্ধর্ষ জালিয়াৎ ছেদীলাল খাঁ।

কুট্ করে আমার পায়ে একটা চিমটি পড়ল। চমকে উঠতে গিয়েও আমি সামলে নিলুম। বুঝলুম, পাকড়াশী আমায় হুঁশিয়ার থাকতে বলছেন। কিন্তু অত জোরে চিমটি না কাটলেও ক্ষতি ছিল না, পা-টা জ্বালা করতে লাগল। পুলিশের কারবারই আলাদা।

ছেদীলাল এসে ধুপ করে আমার পাশে বসে পড়ল। দিব্যি ভালোমানুষ চেহারা—যেন ভাজা মাছটাও উল্টে খেতে জানে না। পরমানন্দে পান চিবুচ্ছে। আমি মনে মনে বললুম, চিবোও, যত খুশি পান চিবোও। এতক্ষণ ঘুঘু দেখছ—একটু পরেই ফাঁদ দেখতে পাবে।

ছেদীলাল জিজ্ঞেস করলে, আপনি কোথায় যাবেন?

বললুম, পাটনা। আপনি?

—আসানসোল নামব।

—অঃ! মনে মনে বললুম, তোমাকে আর কষ্ট করে নামতে হবে না, আমরাই হাত-পা বেঁধে নামিয়ে দেব এখন।

ছেদীলাল কানের জড়ুলটাকে একবার চুলকে নিলে। লাল রঙের টাইটাকে বার-কয়েক নাড়াচাড়া করে গণ্গারামের চাদরের দিকে তাকিয়ে রইল ছেদীলাল।

—ও ভদ্রলোক খুব ঘুমোচ্ছেন দেখছি!

—হুঁ! মনে মনে বললুম, কেমন ঘুমোচ্ছেন একটু পরেই টের পাবে।

—সেই হাওড়া থেকে সমানে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন!

—তাই তো দেখছি।

—কারো কারো ট্রেনে উঠলেই বেয়াড়া রকম ঘুম পায়। সে বেলা আটটাই হোক আর সন্ধে ছ'টাই হোক।—বলে বিচ্ছিরি রকম খ্যাঁক-খ্যাঁক আওয়াজ করে হাসতে লাগল ছেদীলাল।

আমার গা জ্বালা করতে লাগল। ইচ্ছে হল, এখুনি ক্যাঁক করে টুঁটি চেপে ধরি ছেদীলালের, একেবারে ছেদন করে ফেলি ওকে। কিন্তু গণ্গারাম রেডি না হলে তো কিছু করা যায় না। নামকরা ডাকাত—গায়ে ভীষণ জোর, ছোরা-পিস্তল কী সঙ্গে আছে কে জানে!

বর্ধমান ছেড়ে ট্রেন ছুটল। মেল গাড়ি। অন্ধকার ফুঁড়ে উড়ে চলেছে তীরের মতো। হঠাৎ কে যেন একমুঠো আলো আমাদের গাড়ির ওপর ছুড়ে মারল—ছিটকে বেরিয়ে গেল একটা স্টেশন।

আমার হাতের বইটার ওপর চোখ পড়ল ছেদীলালের।

—ওটা কী পড়ছেন?

বললুম, গোয়েন্দা-উপন্যাস।

—আপনি বুঝি খুব ডিটেকটিভ বই পড়েন?

—তা পড়ি।

—ডিটেকটিভ হতে ইচ্ছে করে?—ছেদীলাল আর-একটা পান মুখে পুরে দিয়ে,

www.boiRboi.blogspot.com

জিভে খানিকটা চুন লাগিয়ে, কেমন একগাল হেসে বললে, ইচ্ছে করে চোর-ডাকাত ধরতে?

লোকটার সাহস দ্যাখো একবার। যেন ইয়ার্কি দিচ্ছে আমার সঙ্গে। দাঁড়াও, ধরতে ইচ্ছে করে কি না দেখিয়ে দেব একটু পরেই।

—সুবিধে পেলে ধরব বইকি। খপাৎ করে চেপে ধরব।

—এই তো আজকালকার ইয়ং ম্যানের মতো কথা!

—ছেদীলাল জানলা দিয়ে খানিক পানের পিক বাইরে ফেলে বললে, শুনে ভারি খুশি হলুম!—আমার এত রাগ হল যে ওকে ভেংচি কাটতে ইচ্ছে করল। দাঁড়াও, দাঁড়াও কত খুশি হতে পারো দেখিয়ে দিচ্ছি খানিক বাদেই।

অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন উড়ে চলেছে। আবার একমুঠো আলো ছুড়ে দিয়ে আর একটা স্টেশন মিলিয়ে গেল। ছেদীলাল আমার পাশে বসে নিবিষ্ট মনে পান চিবুচ্ছে। আমার কান আবার কটকট করে উঠল, সুড়সুড় করতে লাগল নাকের ডগা। এত দেরি করছেন কেন গণ্গারাম? ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ভদ্রলোক?

আমার কেমন খটকা লাগল। যেই ছেদীলাল বাইরে পিক ফেলবার জন্যে মুখ বাড়িয়েছে, আমি টুপ্ করে সীটের তলায় পায়ের একটা গুঁতো দিলুম। অমনি কোঁক করে আওয়াজ।

ছেদীলাল চমকে উঠল।

—কিসের আওয়াজ বলুন তো?

কী সর্বনাশ! টের পেয়ে গেল নাকি? আমি অমনি তাড়াতাড়ি করে বললুম না না, কোথায় আওয়াজ?

—ওই যে কোঁক করে শব্দ হল?—ছেদীলালের দু-চোখে গভীর সন্দেহ।

বললুম, না না, ও কিছু না। আমি একটা হেঁচকি তুলেছি কেবল।

—তাই বলুন! ছেদীলাল একটু চুপ করে থেকে আবার সামনের বাঙ্কের দিকে তাকালো।

—খুব নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছেন তো ভদ্রলোক!

—তা ঘুমুচ্ছেন।

—এমন ঘুম কি ভালো? একটু নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না—দেখেছেন? মারা গেলেন না তো?

—খামোকা মারা যাবেন কেন? হঠাৎ মারা গিয়ে ও'রই বা লাভ কী? আমার ভারি অস্বস্তি বোধ হল।

কার কিসে লাভ কিছুই বলা যায় না। একটু দেখতে হচ্ছে যে! বলেই ছেদী-লাল উঠে দাঁড়াতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে আমার পায়ে আবার সেই কটাং করে চিমটি! রাম-চিমটি যাকে বলে! আমি আর্তনাদ করে উঠলুম। আর ছেদীলাল এমন চমকালো যে গলায় পান আটকে বিষম খেয়ে গেল একেবারে।

—অমন চ্যাঁচালেন যে?

—পায়ে বাত আছে কিনা! হাঁটুতে কটাং করে লাগল, তাই—

—এই অল্প বয়সে বাত? লক্ষণ খারাপ। বলে আমার দিকে যেন কেমন করে তাকালো ছেদীলাল। তারপর বললে, উঁহু, বাঙ্কের ভদ্রলোককে একবার দেখতেই হচ্ছে। এমনভাবে মড়ার মতো ঘুমুনো কোনো কাজের কথাই নয়।

বলে, ছেদীলাল যেই দাঁড়াতে যাবে, তক্ষুনি সেই রোমাঞ্চকর কাণ্ডটা ঘটল।

সীটের তলা থেকে সড়াক্ করে দুটো সাঁড়াশির মতো বেরিয়ে এল পাকড়াশীর হাত, পটাং করে পাকড়ে ধরল ছেদীলালের পা।—সঙ্গে সঙ্গে ছেদীলাল ধড়াম করে মেজেতে ফ্ল্যাট্।

তার পরেই গঙ্গারাম একেবারে ছেদীলালের বুকের ওপর। আর ছেদীলাল প্রাণ-পণে পা ছুড়তে লাগল। আমি লাফিয়ে উঠে ছেদীলালের ঠ্যাং চেপে ধরতে যাব সঙ্গে সঙ্গে, কী কায়দায় ছেদীলাল শুশুকের মতো উল্টে গেল। আর গঙ্গারাম তার পেটের তলায়।

আমি ছেদীলালকে গাঁট্টা মারতে যাচ্ছি—গঙ্গারাম সঙ্গে সঙ্গে তাকে পট্কে দিয়ে ওপরে উঠে পড়লেন। যেই গঙ্গারামকে সাহায্য করতে যাব—সঙ্গে সঙ্গে ছেদীলাল আবার তাঁর ওপর চড়ে বসল।

কিছুই করতে পারছি না। কেবল অবাক হয়ে দেখছি, দুজনে কুমড়োর মতো গড়িয়ে যাচ্ছে।

হঠাৎ ছেদীলাল গ্যাঙাতে গ্যাঙাতে বললে, হেল্প্ হেল্প্—

তারপর দুজনে একসঙ্গে চেঁচাতে আর কুস্তি করতে লাগল। কে যে কী বলছে আমি ভালো করে বুঝতেই পারছিলুম না। শুধু কানে আসছে; জাপটে ধরুন স্যার—চেন টানুন—হেল্প—হেল্প্—

হেল্প্! কী ভাবে হেল্প্ করি? সাত-পাঁচ ভেবে নিজের অ্যাটাচি কেসটাই তুলে নিলুম। তার পরে 'জয় মা কালী' বলে ধাঁ করে সেটাকে চালিয়ে দিলুম ছেদী-লালের মাথায়।

কিন্তু ততক্ষণে ছেদীলালকে পট্কে গঙ্গারাম ওপরে উঠে বসেছেন। সুটকেসের ঘা একেবারে গিয়ে লাগল গঙ্গারামের চাঁদির ওপর। আর 'আঁক্' করে একটা আওয়াজ তুলে গঙ্গারাম মেজেতে শিবনেত্র হয়ে পড়ে গেলেন। একদম অজ্ঞান।

সর্বনাশ। এ কী করলুম? ছেদীলালকে মারতে গিয়ে ঠাণ্ডা করে দিলুম গঙ্গারামকে?

ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে ছেদীলাল। জামা ধুলোমাখা, টাইটা ছিঁড়ে গেছে; কানের জড়ুলের পাশ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বিধ্বস্ত হয়েও জয়গর্বে দন্তবিকাশ করছে সে।

সুটকেস দিয়ে ছেদীলালকে এক ঘা বসাব ভাবছি, হঠাৎ ছেদীলাল আমার হাত ধরে ঝাঁকিয়ে দিলে।

—সাবাস ছোকরা, মোক্ষম ঘা মেরেছ! দুর্দান্ত ডাকাত ছেদীলাল ছোরা বার করতে যাচ্ছিল, আর-একটু হলেই ঘ্যাঁচ্ করে বসিয়ে দিত। এইবার তোমার বিছানার দড়িটা দাও দিকি, ছেদীলালকে বেঁধে ফেলি।

আমার হাত থেকে সুটকেসটা পড়ে গেল।

—কে ছেদীলাল? কার কথা বলছেন আপনি?

—কে আবার? এই মুখে মাছিমার্কা গোঁফ, খাড়া-খাড়া চুল, ছেদীলাল ছাড়া আর কে? এই ট্রেনে পালাচ্ছে জানতুম—কিন্তু এই গাড়িতেই আছে ঠিক বুঝতে পারি নি। অবশ্যি চাদর-ঢাকা-দেওয়া দেখে আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল। যাই হোক, তোমার সাহায্য না পেলে ওকে ধরতে পারতুম না—পাল্টা আমাকেই খুন করে ফেলত। পাঁচশো টাকা রিওয়ার্ড পাইয়ে দেব তোমায়—নির্ঘাৎ।

বলে, দড়ি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মাছিমার্কা গোঁফকে বাঁধতে লেগে গেলেন।

আমি বারকয়েক খাবি খেয়ে বললুম, আপনি? আপনি কে?

আমি? ডিটেকটিভ ইন্স্পেকটর গঙ্গারাম পাকড়াশী। কানে-জড়ুল আর লাল-টাই লোকটি হেসে বললেন।

ট্রেন আসানসোলে পৌঁছুল। পকেট থেকে পুলিশি হুইসল বার করে বাজালেন ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচজন কনেস্টবল ছুটে এল কোথা থেকে।

আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। পুলিশের কারবারই আলাদা!

চাউস

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, তার মানে কী?

টেনিদা টক টক করে আমার মাথার ওপর দুটো টোকা মারল। বললে, তোর মগজ-ভর্তি খালি শুকনো ঘুটে—তুই এ-সব বুঝবিনি। এ হচ্ছে ফরাসী ভাষা।

আমার ভারি অপমান বোধ হল।

—ফরাসী ভাষা? চালিয়াতির জায়গা পাওনি? তুমি ফরাসী ভাষা কি করে জানলে?

টেনিদা বললে, আমি সব জানি।

—বটে?—আমি চটে বললুম, আমিও তাহলে জার্মান ভাষা জানি।

—জার্মান ভাষা?—টেনিদা নাক কুঁচকে বললে, বল্ তো?

আমি তক্ষুনি বললুম, হিট্লার—নাৎসী—বার্লিন—কটাকট্!

হাবুল সেন বসে বসে বেলের আটা দিয়ে একমনে একটা ছেঁড়া ঘুড়িতে পট্টি লাগাচ্ছিল। এইবার মুখ তুলে ঢাকাই ভাষায় বললে, হঃ, কী জার্মান ভাষাডাই কইলি রে প্যালা! খবরের কাগজের কতগুলিন্ নাম—তার লগে একটা 'কটাকট্' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদি কোরতে আছস্! আমি একটা ভাষা কমু? ক দেখি—'মেকুরে হুড়ুম খাইয়া হক্কৈড় করছে'—এইডার মানে কী?

টেনিদা ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে আবার কী রে! ম্যাডাগাস্কারের ভাষা বলছিস বুঝি?

—ম্যাডাগাস্কার না হাতি!—বিজয়গর্বে হেসে হাবুল বললে, মেকুর কিনা বিড়াল, হুড়ুম খাইয়া কি না মুড়ি খাইয়া—হক্কৈড় করছে—মানে এঁটো করেছে।

হেরে গিয়ে টেনিদা ভীষণ বিরক্ত হল।

www.boiRboi.blogspot.com

—রাখ বাপু তোর হুড়ুম্ দুড়ুম্—শুনে আক্কেল গুড়ুম্ হয়ে যায়। এর চাইতে প্যালার জার্মান 'কটাকট্'ও ঢের ভালো।

বলতে বলতে ক্যাবলা এসে হাজির। চোখ প্রায় অর্ধেকটা বুজে, খুব মন দিয়ে কী যেন চিবুচ্ছে। দেখেই টেনিদার চোখ দুটো জ্বলজ্বল করে উঠল।

—অ্যাই, খাচ্ছিস কী রে?

আরো দরদ দিয়ে চিবুতে চিবুতে ক্যাবলা বললে, চুয়িং গাম।

—চুয়িং গাম!—টেনিদা মুখ বিচ্ছিরি করে বললে, দুনিয়ায় এত খাবার জিনিস থাকতে শেষে রবার চিবুচ্ছিস বসে বসে। এর পরে জুতোর সুখতলা খাবি এই তোকে বলে দিলুম। ছ্যাঃ।

আমি বললুম, চুয়িং গাম থাক। কাল যে বিশ্বকর্মা পুজো—সেটা খেয়াল নেই বুঝি?

টেনিদা বললে, খেয়াল থাকবে না কেন? সেই জন্যেই তো বলছিলুম, ডি-লা-গ্র্যাণ্ড মেফিস্টোফিলিস—

ক্যাবলা পট করে বললে, মেফিস্টোফিলিস মানে শয়তান।

—শয়তান!—চটে গিয়ে টেনিদা বললে, থাম থাম, বেশি পণ্ডিতি করিসনি। সব সময় এই ক্যাবলাটা মাস্টারি করতে আসে। কাল যখন মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্ করে আকাশে উড়বে—তখন টের পাবি।

—তার মানে?—আমরা সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলুম।

—মানে? মানে জানবি পরে—টেনিদা বললে, এখন বল্ দিকি, কাল বিশ্বকর্মা পুজোর কী রকম আয়োজন হল তোদের?

আমি বললুম, আমি দু-ডজন ঘুড়ি কিনেছি।

হাবুল সেন বললে, আমি তিন ডজন।

ক্যাবলা চুয়িং গাম চিবুতে চিবুতে বললে, আমি একটাও কিনিনি। তোদের ঘুড়িগুলো কাটা গেলে আমি সেইগুলো ধরে ওড়াব।

টেনিদা মিট্ মিট্ করে হেসে বললে, হয়েছে, বোঝা গেছে তোদের দৌড়। আর আমি কী ওড়াব জানিস? আমি—এই টেনি শর্মা?—টেনিদা খাড়া নাকটাকে খাঁড়ার মতো উঁচু করে নিজের বুকে দুটো টোকা মেরে বললে, আমি যা ওড়াব—তা আকাশে বোঁ বোঁ করে উড়বে, গোঁ গোঁ করে এরোপ্লেনের মতো ডাক ছাড়বে—হুঁ হুঁ! ডি-লা-গ্র্যাণ্ড—

বাকিটা ক্যাবলা আর বলতে দিলে না। ফস্ করে বলে বসল: ঢাউস ঘুড়ি বানিয়েছ বুঝি?

—বানিয়েছ বুঝি?—টেনিদা রেগে ভেংচে বললে, তুই আগে থেকে বলে দিলি কেন? তোকে আমি বলতে বারণ করিনি?

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তুমি আমাকে ঢাউস ঘুড়ির কথা বললেই বা কখন, বারণই বা করলে কবে? আমি তো নিজেই ভেবে বললুম।

—কেন ভাবলি?—টেনিদা রকে একটা কিল মেরেই উঃ উঃ করে উঠল: বলি, আগ বাড়িয়ে তোকে এ-সব ভাবতে বলেছে কে র‍্যা? প্যালা ভাবেনি, হাবলা ভাবেনি—তুই কেন ভাবতে গেলি?

হাবুল সেন বললে, হ, ওইটাই ক্যাবলার দোষ। এত ভাইব্যা ভাইব্যা শ্যাষে একদিন ও কবি হইবো।

আমি মাথা নেড়ে বললুম, হুঁ, কবি হওয়া খুব খারাপ। আমার পিসতুতো ভাই

ফুচুদা একবার কবি হয়েছিল। দিনরাত কবিতা লিখত। একদিন রামধন ধোপার খাতায় কবিতা করে লিখল:

পাঁচখানা ধুতি, সাতখানা শাড়ি
এ-সব হিসাবে হইবে কিবা?
এ জগতে জীব কত ব্যথা পায়
তাই ভাবি আমি রাত্রি দিবা।
রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধা
মনটি তাহার বড়ই সাদা—
সে-বেচারা তার পিঠেতে চাপায়ে
কত শাড়ি ধুতি প্যাণ্ট লইয়া যায়—
মনোদুখে খালি বোঝা টেনে ফেরে গাধা
একখানা ধুতি-প্যাণ্ট পরিতে না পায়!

টেনিদা বললে, আহা-হা, বেশ লিখেছিল তো! শুনে চোখে জল আসে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, খুবই করুণ।

আমি বললুম, কবিতাটা পড়ে আমারও খুব কষ্ট হয়েছিল। কিন্তু পিসিমা ধোপার হিসেবের খাতায় এইসব দেখে ভীষণ রেগে গেল! রেগে গিয়ে হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে একটা চাল-কুমড়ো নিয়ে ফুচুদাকে তাড়া করলে। ঠিক যেন গদা হাতে নিয়ে শাড়িপরা ভীম দৌড়োচ্ছে।

টেনিদা বললে, তোর পিসিমার কথা ছেড়ে দে—ভারি বেরসিক। কিন্তু কী প্যাথেটিক কবিতা যে শোনালি প্যালা—মনটা একেবারে মজে গেল। ঈস্—সত্যিই তো। গাধা কত ধুতি-প্যাণ্ট-শাড়ি টেনে নিয়ে যায়, কিন্তু একখানা পরিতে না পায়। —বলে টেনিদা উদাস হয়ে দূরের একটা শালপাতার ঠোঙার দিকে তাকিয়ে রইল।

সান্ত্বনা দিয়ে হাবুল বললে, মন খারাপ কইর‍্যা আর করবা কী। এই রকমই হয়। দ্যাখ্ না—গোবর হইল গিয়া গোরুর নিজের জিনিস, অন্য লোকে তাই দিয়া ঘুইট্যা দেয়। গোরু একখানা ঘুইট্যা দিতে পারে না।

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, দিলে সব মাটি করে। এমন একটা ভাবের জিনিস—ধাঁ করে তার ভেতর গোবর আর ঘুটে নিয়ে এল। নে—ওঠ এখন, ঢাউস ঘুড়ি দেখবি চল।

—ডি-লা-গ্র্যাণ্ড মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্—

বলতে বলতে আমরা যখন গড়ের মাঠে পৌঁছুলুম তখন সবে সকাল হচ্ছে। চৌরঙ্গির এদিকে সূর্য উঠছে আর গঙ্গার দিকটা লালে লাল হয়ে গেছে। দিব্যি ঝির-ঝির করে হাওয়া দিচ্ছে—কখনো কখনো বাতাসটা বেশ জোরালো। চারদিকে নতুন ঘাসে যেন ঢেউ খেলছে। সত্যি বলছি—আমি পটলডাঙার প্যালারাম, পটোল দিয়ে শিঙ্গি মাছের ঝোল খাই—আমারই ফুচুদার মতো কবি হতে ইচ্ছে হল।

কখন যে সুর করে গাইতে শুরু করেছি—'রবি মামা দেয় হামা গায়ে রাঙা জামা ওই'—সে আমি নিজেই জানিনে। হঠাৎ মাথার ওপর কটাৎ করে গাট্টা মারল টেনিদা।

—অ্যাই সেরেছে! এটা যে আবার গান গায়!

—তাই বলে তুমি আমার মাথার ওপর তাল দেবে নাকি?—আমি চটে গেলুম।

—তাল বলে তাল! আবার যদি চামচিকের মতো চিঁচিঁ করবি, তাহলে তোর

www.boiRboi.blogspot.com

পিঠে গোটাকয়েক ঝাঁপতাল বসিয়ে দেব সে বলে দিচ্ছি। এসেছে ঘুড়ি ওড়াতে—উনি আবার সুর ধরেছেন!

আমার মনটা বেজায় বিগড়ে গেল। খামোকা সকালবেলায় নিরীহ ব্রাহ্মণ-সন্তানের মাথায় গাঁট্টা মারলে। মনে মনে অভিশাপ দিয়ে বললুম, হে ভগবান, তুমি ওড়বার আগেই একটা খোঁচা-টোচা দিয়ে টেনিদার ঢাউস ঘুড়ির ঢাউস পেটটা ফাঁসিয়ে দাও। ওকে বেশ করে আক্কেল পাইয়ে দাও একবার।

ভগবান বোধহয় সকালে দাঁতন করতে করতে গড়ের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন। আমার প্রার্থনা যে এমন করে তাঁর কানে যাবে—তা কে জানত।

ওদিকে বিরাট ঢাউসকে আকাশে ওড়াবার চেষ্টা চলছে তখন। টেনিদা দড়ির মস্ত লাটাইটা ধরে আছে—আর হাবুল সেন হাঁপাতে হাঁপাতে প্রকাণ্ড ঢাউসটাকে ওপরে তুলে দিচ্ছে। কিন্তু ঢাউস উড়ছে না—ধপাৎ করে নিচে পড়ে যাচ্ছে।

টেনিদা ব্যাজার হয়ে বললে, এ কেমন ঢাউস রে। উড়ছে না যে!

হাবুল সেন মাথা নেড়ে বললে, হ, এইখান উড়বো না। এইটার থিক্যা মনুমেন্ট উড়ান সহজ।

শুনে আমার যে কী ভালো লাগল। খামোকা ব্রাহ্মণের চাঁদিতে গাঁট্টা মারা! হুঁ হুঁ! যতই পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাই, ব্রহ্মতেজ যাবে কোথায়! ও ঘুড়ি আর উড়ছে না—দেখে নিয়ো।

খালি ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। বললে, ওড়াতে জানলে সব ঘুড়িই ওড়ে।

ওড়ে নাকি? টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তবে দে না উড়িয়ে।

ক্যাবলা বললে, তোমার ঘুড়ি তুমি ওড়াবে, আমি ও-সবের মধ্যে নেই। তবে বুদ্ধিটা বাতলে দিতে পারি। অত নিচ থেকে অত বড় ঘুড়ি ওড়ে? ওপর থেকে ছাড়লে তবে তো হাওয়া পাবে। ওই বটগাছটার ডাল দেখছ? ওখানে উঠে ঘুড়িটা ছেড়ে দাও। ডালটা অনেকখানি এদিকে বেরিয়ে এসেছে—ঘুড়ি গাছে আটকাবে না—ঠিক বোঁ করে উঠে যাবে আকাশে।

টেনিদা বললে, ঠিক। এ-কথাটা আমিই তো ভাবতে যাচ্ছিলুম। তুই আগে থেকে ভাবলি কেন র‍্যা? ভারি বাড় বেড়েছে—না? তোকে পানিশমেন্ট দিলুম। যা—গাছে ওঠ—

ক্যাবলা বললে, বা-রে। লোকের ভালো করলে বুঝি এমনিই হয়?

দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, তোকে ভালো করতে কে বলেছিল—শুনি? দুনিয়ার কারুর ভালো করেছিস কি মরেছিস। যা—গাছে ওঠ—

—যদি কাঠপিঁপড়ে কামড়ায়?

—কামড়াবে। আমাদের বেশ ভালোই লাগবে।

—যদি ঘুড়ি ছিঁড়ে যায়?

—তোর কান ছিঁড়বো! যা—ওঠ বলছি—

কী আর করে—যেতেই হল ক্যাবলাকে। যাওয়ার সময় বললে, ঘুড়ির দড়িটা ওই গোলপোস্টে বেঁধে দিয়ো টেনিদা। অত বড় ঢাউস—খুব জোর টান দেবে কিন্তু।

টেনিদা নাক কুঁচকে মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা—যা—বেশি বকিসনি। ঘুড়ি উড়িয়ে উড়িয়ে বুড়ো হয়ে গেলুম—তুই এসেছিস ওস্তাদি করতে। নিজের কাজ কর্।

ক্যাবলা বললে, বহুৎ আচ্ছা।

হু হু করে হাওয়া বইছে তখন। ডালের ডগায় উঠে ক্যাবলা ঢাউসকে ছেড়ে

www.boiRboi.blogspot.com

দিলে। সঙ্গে সঙ্গে গোঁ গোঁ করে ডাক ছেড়ে সেই পেল্লায় ঢাউস আকাশে উড়ল।

টেনিদার ওপর সব রাগ ভুলে গিয়ে মুগ্ধ হয়ে চেয়ে আছি। কী চমৎকার যে দেখাচ্ছে ঢাউসকে। মাথার দুধারে দুটো পতাকা যেন বিজয়গর্বে পত্ পত্ উড়ছে—গোঁ গোঁ আওয়াজ তুলে ঘুড়ি ওপরে উঠে যাচ্ছে। টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল: ডি-লা-গ্র্যান্ডি—

কিন্তু আচমকা টেনিদার চ্যাঁচানি বন্ধ হয়ে গেল। আর হাঁউমাউ করে ডাক ছাড়ল হাবুল।

—গেল—গেল—

কে গেল? কোথায় গেল?

কে আর যাবে! অমন করে কেই বা যেতে পারে টেনিদা ছাড়া? তাকিয়ে দেখেই আমার চোখ চড়াং করে কপালে উঠে গেল। কপালে বললেও ঠিক হয় না, সোজা ব্রহ্মতালুতে।

শুধু ঢাউসই ওড়েনি। সেই সঙ্গে টেনিদাও উড়ছে। চালিয়াতি করে লাটাই ধরে রেখেছিল হাতে, বাঘা ঢাউসের টানে সোজা হাত-দশেক উঠে গেছে ওপরে!

এক লাফে গাছ থেকে নেমে পড়ল ক্যাবলা। বললে, পাকড়ো—পাকড়ো—

কিন্তু কে কাকে পাকড়ায়! ততক্ষণে টেনিদা পনেরো হাত ওপরে! সেখান থেকে তার আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে: হাবুল রে—প্যালা রে—ক্যাবলা রে—

আমরা তিনজন একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলুম:—ছেড়ে দাও, লাটাই ছেড়ে দাও—

টেনিদা কাঁউ কাঁউ করে বললে, পড়ে যে হাত-পা ভাঙব!

হাবুল বললে, তবে আর কী করবা! উইড়্যা যাও—

ঢাউস তখন আরো উপরে উঠেছে। জোরালো পুবের হাওয়ায় সোজা পশ্চিম-মুখো ছুটেছে গোঁ-গোঁ করতে করতে। আর জালের সঙ্গে মাকড়সা যেমন করে ঝোলে, তেমনি করে মহাশূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে টেনিদা।

পেছনে পেছনে আমরাও ছুটলুম। সে কী দৃশ্য! তোমরা কোনো রোমাঞ্চকর সিনেমাতেও তা দ্যাখোনি!

ওপর থেকে তারস্বরে টেনিদা বললে, কোথায় উড়ে যাচ্ছি বল্ তো?

ছুটতে ছুটতে আমরা বললুম, গঙ্গার দিকে!

—অ্যাঁ—শূন্যে থেকে টেনিদা কেঁউ কেঁউ করে বললে, গঙ্গায় পড়ব নাকি?

হাবুল বললে, হাওড়া স্টেশনেও যাইতে পারো!

—অ্যাঁ!

আমি বললুম, বর্ধমানেও নিয়ে যেতে পারে!

—বর্ধমান! বলতে বলতে শূন্যে একটা ডিগবাজি খেয়ে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, দিল্লী গেলেই বা আপত্তি কী? সোজা কুতুব মিনারের চুড়োয় নামিয়ে দেবে এখন।

টেনিদা তখন প্রায় পঁচিশ হাত ওপরে। সেখান থেকে গোঙাতে গোঙাতে বললে, এ যে আরো উঠছে! দিল্লী গিয়ে থামবে তো? ঠিক বলছিস?

আমি ভরসা দিয়ে বললুম, না থামলেই বা ভাবনা কী? হয়ত মঙ্গল-গ্রহেও নিয়ে যেতে পারে।

—মঙ্গল-গ্রহ!—আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে টেনিদা বললে, আমি মঙ্গল-গ্রহে এখন যেতে চাচ্ছি না। যাওয়ার কোনো দরকার দেখছি না!

ক্যাবলা বললে, তবু যেতেই হচ্ছে। যাওয়াই তো ভালো টেনিদা! তুমিই বোধহয়

প্রথম মানুষ যে মঙ্গল-গ্রহে যাচ্ছে। আমাদের পটলডাঙার কত বড় গৌরব সেটা ভেবে দ্যাখো!

—চুলোয় যাক পটলডাঙা। আমি—কিন্তু টেনিদা আর বলতে পারলে না, তক্ষুনি শূন্যে আর-একটা ডিগবাজি খেলে। খেয়েই আবার কাঁউ কাঁউ করে বললে, ঘুরপাক খাচ্ছি যে! আমি মোটেই ঘুরতে চাচ্ছি না—তবু বোঁ বোঁ করে ঘুরে যাচ্ছি।

ঘুড়ি তখন ক্যালকাটা গ্রাউন্ডের কাছাকাছি। আমরা সমানে পেছনে ছুটছি। ছুটতে ছুটতে আমি বললুম, ও-রকম ঘুরতে হয়। ওকে মাধ্যাকর্ষণ বলে। সায়েন্স পড়োনি?

অনেক ওপর থেকে টেনিদা যেন কী বললে। আমরা শুনতে পেলুম না। কেবল কাঁউ কাঁউ করে খানিকটা আওয়াজ আকাশ থেকে ভেসে এল।

কিন্তু ওদিকে ঢাউস যত গঙ্গার দিকে এগোচ্ছে তত হাওয়ার জোরও বাড়ছে। পেছনে ছুটে আমরা আর কুলিয়ে উঠতে পারছি না। টেনিদা উড়ছে আর ডিগবাজি খাচ্ছে, ডিগবাজি খাচ্ছে আর উড়ছে।

স্ট্র্যান্ড রোড এসে পড়ল প্রায়। ঘুড়ি সমানে ছুটে চলেছে। এখুনি গঙ্গার ওপরে চলে যাবে। আমাদের লীডার যে সত্যিই গঙ্গা পেরিয়ে—বর্ধমান হয়ে—দিল্লী ছাড়িয়ে মঙ্গল-গ্রহেই চলল! আমরা যে অনাথ হয়ে গেলুম।

আকাশ থেকে টেনিদা আবার আর্তস্বরে বললে, সত্যি বলছি—আমি মঙ্গল-গ্রহে যেতে চাই না—কিছুতেই যেতে চাই না—

আমরা এইবারে একবাক্যে বললুম, না—তুমি যেয়ো না।

—কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে যে!

—তাহলে তাড়াতাড়ি ফিরে এসো!—ক্যাবলা জানিয়ে দিলে।

—আর পৌঁছেই একটা চিঠি লিখো—আমি আরো মনে করিয়ে দিলুম : চিঠি লেখাটা খুব দরকার।

টেনিদা বোধহয় বলতে যাচ্ছিল নিশ্চয়ই চিঠি লিখবে, কিন্তু পুরোটা আর বলতে পারলে না। একবার কাঁউ করে উঠেই কোঁক্ করে থেমে গেল। আমরা দেখলুম, ঢাউস গোঁত্তা খাচ্ছে।

সে কী গোঁত্তা! মাথা নিচু করে বোঁ-বোঁ শব্দে নামছে তো নামছেই! নামতে নামতে একেবারে—ঝপাস করে সোজা গঙ্গায়। মঙ্গল-গ্রহে আর গেল না—মত বদলে পাতালের দিকে রওনা হল।

আর টেনিদা? টেনিদা কোথায়? সেও কি ঘুড়ির সঙ্গে গঙ্গায় নামল?

না—গঙ্গায় নামে নি। টেনিদা আটকে আছে। আটকে আছে আউটরাম ঘাটের একটা মস্ত গাছের মগডালে। আর বেজায় ঘাবড়ে গিয়ে একদল কাক কা-কা করে টেনিদার চারপাশে চক্কর দিচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে আমরা গাছতলায় এসে হাজির হলুম। কেবল আমরাই নই। চারিদিক থেকে তখন প্রায় শ-দুই লোক জড়ো হয়েছে সেখানে। পোর্ট কমিশনারের খালাসি, নৌকোর মাঝি, দুটো সাহেব—তিনটে মেম।

—ওঃ মাই—হোয়াজ জ্যাট্ (হোয়াট্স্ দ্যাট্)?—বলেই একটা মেম ভিরমি গেল।

কিন্তু তখন আর মেমের দিকে কে তাকায়? আমি চেঁচিয়ে বললুম, টেনিদা, তাহলে মঙ্গল-গ্রহে গেলে না শেষ পর্যন্ত?

টেনিদা ঢাউস ঘুড়ির মতো গোঁ গোঁ আওয়াজ করে বললে, কাকে ঠোকরাচ্ছে!

—নেমে এসো তাহলে।

টেনিদা গাঁ গাঁ করে বললে, পারছি না! ওফ্—কাকে মাথা ফুটো করে দিলে রে প্যালা।

পোর্ট কমিশনারের একজন কুলি তখুনি ফায়ার-ব্রিগেডে টেলিফোন করতে ছুটল। ওরাই এসে মই বেয়ে নামিয়ে আনবে।

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি বললুম, ডিলা-গ্র্যাণ্ড—

সারা গায়ে আইডিন-মাখানো টেনিদা কাতর স্বরে বললে, থাক, ও আর বলিসনি। তার চাইতে একটা করুণ কিছু বল্। তোর ফুচুদার লেখা 'রামধনের ওই বৃদ্ধ গাধার' কবিতাটাই শোনা। ভারি প্যাথেটিক। ভারি প্যাথেটিক।

www.boiRboi.blogspot.com

রোমাঞ্চকর বন্দুক

হলধরদা নাক-টাক কুঁচকে আমাকে বললে, কেন পেছনে ঘুর-ঘুর করে বেড়াচ্ছিস প্যালা! এ-সব বন্দুক ছোড়া তোর কাজ নয়। রীতিমতো বুকের পাটা চাই—গায়ের জোর চাই। ঐ পালাজ্বরের পিলে নিয়ে ধাষ্টামো করতে চেষ্টা করিসনি প্যালা—মারা যাবি, স্রেফ বেঘোরে মারা যাবি।

হলধরদার লেকচার শুনে আমার গা জ্বলে গেল। ইস্—নিজে কী একখানা গামা পালোয়ান রে। রোগা ডিগডিগে শরীর—ঘাড়টা সব সময়ে ঝুঁকে রয়েছে সামনের দিকে। সম্পত্তির মধ্যে খরগোসের মতো দুটো খাড়া কান—তাদের একটার ওপর আবার জড়ুল—যেন মাছি বসে আছে। গলায় সর্বজ্বরহর মাদুলি দুলছে, সেটার রং কালো, মনে হয় একটা পকেট-ডিক্শনারি ঝুলিয়ে রেখেছে। আমার তো তবু পালাজ্বর; ম্যালেরিয়া জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর—কী নেই হলধরদার?

ইচ্ছে করলে আমি হলধরদাকে এক্ষুনি ল্যাং মেরে ফেলে দিতে পারি। নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তাহলে হলধরদার বন্দুকটা আর হাতে পাওয়া যাবে না। কাজেই গায়ের ঝাল গায়ে মেরে বললাম, সে তো বটেই। তোমার মতো জোয়ান লোকের হাতেই তো বন্দুক মানায়। রোজ সকালে তুমি পাঁচশো করে ডন-বৈঠক দাও, আধসের করে ছোলা খাও—তোমার নাম শুনলে ভীম-ভবানী পর্যন্ত দৌড়ে পালায়...

শুনে, হলধরদা কিছুক্ষণ কটকট করে আমার দিকে চেয়ে রইল।

—ইয়ার্কি দিচ্ছিস নাকি?

বললাম, সর্বনাশ, একে তুমি সাক্ষাৎ হলধরদা, তায় তোমার হাতে বন্দুক। তোমার সঙ্গে ইয়ার্কি দিয়ে কি শেষে পৈতৃক প্রাণটা খোয়াব?

হলধরদা বললে, হুঁ! তারপর হন্‌হন্‌ করে আমবাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিলে।

আমিও সঙ্গ ছাড়ি না। গুটি-গুটি পায়ে পেছনে চলেছি তো চলেইছি। একটা বন্দুক কিনে কী ডাঁটই হয়েছে হলধরদার—আমাদের আর মানুষ বলেই গ্রাহ্য করে না। অথচ লোকটা কী অকৃতজ্ঞ দ্যাখো একবার। এই সেদিনও ঠাকুরমার ঘর থেকে আমসত্ত্ব আর আচার চুরি করে এনে ওকে খাইয়েছি, কথা ছিল বন্দুক কিনলেই আমাকে একবার ছুঁড়তে দেবে। কিন্তু নাকটাকে এখন সোজা আকাশের দিকে তুলে হাঁটছে—আমাদের যেন চিনতেই পারছে না।

হলধরদা পেছন ফিরে তাকালো।

—ওকি, আবার সঙ্গে আসছিস যে?

আমি কান চুলকে বললাম, না না, এমনিই। মানে, তুমি যখন পাখি-টাখি মারবে, তখন সেগুলো বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে একজন লোকও চাই তো! সেইজন্যেই সঙ্গে যাচ্ছি।

—গোলমাল করবি না?

—না।

—পাখি উড়িয়ে দিবি না?

—রামচন্দ্র! পাখি ওড়ালে তুমি আমার কান উড়িয়ে দিয়ো।

—শিকারের ভাগ চাইবি নাকি?

—ছিঃ ছিঃ! তুমি পাখি মারবে—তাই দেখেই আমার স্বর্গীয় আনন্দ! তুচ্ছ ভাগের কথা কেন তুলছ হলধরদা? মনে মনে বললাম, তুমি যা পাখি মারবে সে তো আমি জানিই! সব বাসায় গিয়ে মরে থাকবে।

হলধরদার বোধহয় এতক্ষণে আমার ওপর একটুখানি করুণা হল।

—ইয়ে, কথাটা কী জানিস? ছেলে তুই নেহাৎ খারাপ নোস—সে আমি জানি। একবার তোকে বন্দুক ছুঁড়তে দিতেও আমার আপত্তি ছিল না। কিন্তু তোর তো ওই পালাজ্বরের পিলে—হঠাৎ ধাক্কা খেয়ে যদি উড়ে যাস—

—কিসের ধাক্কা? কোথায় উড়ে যাব?

—এঃ, তুই একটা ছাগল। কিছু জানিস নে। বন্দুক ছোড়বার সময় পেছন দিকে একটা ভয়ঙ্কর ধাক্কা লাগে। সে ধাক্কায়, যারা রোগা-পটকা তারা যে কে কোথায় ছিটকে পড়ে কেউ বলতে পারে না।—বলে ডিগডিগে পালোয়ান হলধরদা সগর্বে নিজের বন্দুকের দিকে তাকালো।

—তাই নাকি?

—হেঁ হেঁ—তবে আর বলছি কী! সেবার গোয়ালন্দে—বুঝলি, একটা রোগা-পটকা সায়েব বন্দুক নিয়ে চখাচখি মারতে গিয়েছিল। যেই 'ধ্রাম্‌' করে গুলি ছুড়েছে, তার পরেই কী হল বল্‌ তো?

—তুমিই বলো। আমি তো কখনো গোয়ালন্দে যাইনি।

—যাসনি? তা হলে তোর বেঁচে থাকাই মিথ্যে। ঢাকার ইষ্টিমারও দেখিসনি? সে এক পেল্লায় ব্যাপার। তোদের কলকাতার চাঁদপাল ঘাটের জাহাজগুলো তার কাছে একেবারেই তুচ্ছ।

—তা হোক তুচ্ছ।—আমি অধৈর্য হয়ে বললাম, 'ধ্রাম্‌' করে গুলি ছোরার পরে কী হলো তাই বলো।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই বলছি। গুলি ছুড়েছে, ধোঁয়া বেরিয়েছে—সবই হয়েছে। কিন্তু

সায়েবের আর পাত্তা নেই। বন্দুক, টুপি, সব পড়ে রয়েছে, শুধু সায়েবই নেই। নেই তো নেই—কোথাও নেই। একেবারে বেমালুম ভ্যানিশ!

—ভ্যানিশ! নিজের গুলিতে নিজেই উড়ে গেল বুঝি?

—থাম না—কেন বাজে বকছিস? সায়েব তো নেই। চারদিকে হৈ-চৈ। থানা, পুলিশ, টেলিগ্রাম, ফৌজ—সে এক কাণ্ড! ওদিকে মেম সাহেবের ঘন ঘন ফিট হচ্ছে। শেষে সেই সায়েবের পাত্তা পাওয়া গেল পদ্মার ওপারে। বালুচরের ওপর দাঁত-কপাটি লেগে পড়ে রয়েছে। তিন দিন পরে তার জ্ঞান আসে। বন্দুকের এক ধাক্কাতেই পদ্মা পেরিয়ে গেল—নৌকোয় চড়লে না, স্টীমারে চড়লে না, কিচ্ছু না! এরই নাম বন্দুক ছোড়া—বুঝলি? বলে হলধরদা আমার মুখের দিকে তাকালো, খাড়া খাড়া কান দুটো পর্যন্ত নড়ে উঠল তার।

ইস্‌, কী বোম্বাই চালটাই দিলে। বলতেও যাচ্ছিলাম সে-কথা, কিন্তু বুদ্ধি করে সামলে নিলাম। খামোকা চটিয়ে লাভ কী? বন্দুকটা একবার হাতে পাওয়ার আশা এখনো ছাড়িনি।

হলধরদা বললে, নেঃ—রাস্তার মধ্যে আর বকিসনি। সঙ্গে যাবি তো চল। কিন্তু আগেই সাবধান করে দিচ্ছি—যদি পাখি উড়িয়ে দিস—

—তাহলে বন্দুকের ঘায়ে আমাকে সুদ্ধ উড়িয়ে দিয়ো—আমিই বলে দিলাম শেষটা।

আমবাগানের মধ্যে দিয়ে টিপি-টিপি পায়ে দুজনে চলেছি। বন্দুক বাগিয়ে হলধরদা পাখি খুঁজছে। আর আমি যথাসাধ্য ওকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

হঠাৎ আমি আনন্দে চেঁচিয়ে উঠলাম : হলধরদা, ওই যে একজোড়া ঘুঘু!

—কই, কোথায়?—বলে আরো চেঁচিয়ে উঠল হলধরদা!

ব্যস্‌ আর দেখতে হল না। সেই চিৎকারেই ঘুঘু দুটো উড়ে পালালো। হলধরদা রুখে দাঁড়ালো আমার দিকে।

—চ্যাঁচালি যে?

—চ্যাঁচালাম কই? তোমাকে তো পাখি দেখালাম।

—তাই বলে চ্যাঁচাবি? অমন গাধার মতো ডাক ছাড়বি?

—বাঃ রে, তুমিও তো ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলে। তাই তো পালিয়ে গেল।

—এঃ, ভারি ভুল হয়ে গেছে! হলধরদা টাকটা চুলকে নিলে; তোরই দোষ। তুই চেঁচিয়ে উঠেই আমাকে এমন ঘেবড়ে দিলি যে কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। শোন—এর পরে পাখি দেখলে আর চ্যাঁচাবি না।

—তবে কী করব?

—এই, একটা খোঁচা-টোঁচা, কিংবা একটা চিম্‌টি—বুঝেছিস তো?

বিলক্ষণ! এ বুঝতে আর বাকি থাকে। আমি পটলডাঙার প্যালারাম, চিম্‌টি কাকে বলে টেনিদার দৌলতে তা ভালোই বুঝি। সানন্দে মাথা নাড়লাম।

আরো খানিকটা এগিয়ে হলধরদা বললেন : এঃ, আবার ভুল হয়ে যাচ্ছে। এভাবে তো হাঁটা চলবে না। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে।

—বলো কি! চারদিকে কাঁটা, বিছুটি—তার মধ্যে হামাগুড়ি দিতে হবে?

—তুই শিকার করতে এসেছিস, না মোগলাই পরোটা খেতে এসেছিস? হলধরদা ভেংচি কাটল : অত আরাম চলবে না। নে—হামা দে। এইটেই নিয়ম। আমি অনেক শিকারীকে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে দেখেছি।

—শিকার সামনে না থাকলেও হামা দিতে হবে?

www.boiRboi.blogspot.com

—হ্যাঁ, দিতে হবে। বেশি বকিসনি প্যালা, যা বলছি তাই কর্।

ইঃ, এ আবার কী ফ্যাচাং রে বাপ্! আর সেই আমবাগানে হামা দেওয়া কি চারটিখানি কথা! তিন হাত না-যেতেই হাঁটুর ছাল যাবার জো। কেটে পড়া দরকার কি না ভাবছি, তার আগেই লাফিয়ে উঠল হলধরদা : উরে—বাপ—গেছি গেছি!

বলে বন্দুকটা নামিয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে লাগল।

—কী হল?

—বিচ্ছুটি। ঈস্ কী জ্বলছে রে! দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এমনভাবে পা চুলকে চলল যে মনে হল ছাল-টাল সব তুলে ফেলবে।

—তাহলে আর হামা দিয়ে দরকার নেই বোধহয়? আমি জানতে চাইলাম।

না—না—না! হলধরদা মুখ সিঁটকে বললে, ও-সব আনাড়ি শিকারীর জন্যে। ভালো শিকারীরা বুক চিতিয়েই হাঁটে। বলে বন্দুক তুলে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলে। অবশ্য সবটা বুক চিতিয়ে নয়, মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়িয়ে পা চুলকে নিতে হচ্ছিল।

একটু পরেই সামনে একটা জলা। সেই জলার দিকে যেই আমার চোখ পড়েছে, অমনি আমি হলধরদার পিঠে কটাং করে চিমটি দিয়েছি একটা।

—উরেঃ বাপস্! বলে হলধরদা লাফিয়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে জলা থেকে তিনটে পাখি উড়ে পালালো একসঙ্গে।

চোখ পাকিয়ে হলধরদা আমাকে বললে, এটা কী হল—অ্যাঁ? বলি, এটা কী হল?

—কেন, কী করেছি? গো-বেচারার মতো আমি জানতে চাইলাম।

—কী করেছি? হলধরদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, অমন করে রাম-চিমটি দিলি যে? পিঠের মাংস প্রায় তুলে নিয়েছিস এক খাবলা! উঃ উঃস্-স্স্! একে পায়ের জ্বলুনিতে মরছি, তার ওপরে—

বললাম, আমার কী দোষ? পাখি দেখলে তুমি চিমটি দিতে বলেছিলে। আমি দেখলাম, জলায় তিনটে জলপিপি বসে আছে—

—তাই বলে অত জোরে চিমটি কাটবি?

—আচ্ছা, এবার থেকে আস্তে কাটব।

—থাক, হয়েছে। চিমটি কেটে আর দরকার নেই তোমার। এবার একটা ধাক্কা দিবি—বুঝেছিস তো?

—বুঝেছি।

জলা পার হয়ে একটা জাম-জারুল-গামারের বন। চারদিকে ছায়া-ছায়া ঠাণ্ডা। সেখানে ঢুকেই হলধরদা দেখি সোজা মাথার ওপর বন্দুক তাগ করছে।

পাখি পেলে বুঝি? আমি চেঁচাতে যাচ্ছিলাম, হলধরদা আরো জোরে চেঁচিয়ে বললে, চুপ কর, বলছি! গাছের ওপরে দুটো লাল পাখি দেখা যাচ্ছে।

লাল পাখি দুটো ভালো—এত চেঁচানোতেও পালালো না। তাকিয়ে দেখে আমার কেমন সন্দেহ হল। সেকথা বলতেও যাচ্ছি, এমন সময় : ধুম্ ধ্যাস্!

দুম্ হল বন্দুক—আর ধ্যাস্—হলধরদা। অর্থাৎ গুলি ছুড়েই কুঁদোর ঘা খেয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

—এঃ—এঃ—

কিন্তু তার আগেই লাল পাখি দুটো পড়েছে। একটা আমার নাকে আর একটা হলধরদার টাকে। টিপ আছে হলধরদার!

কিন্তু রাম-রাম, কী বিচ্ছিরি পাখি! পড়েই ফটাস করে ফাটল। কী সব বদগন্ধওলা কালো কালো জিনিস আমার নাকে-মুখে ঢুকে গেল, আর হলধরদার

টাকের যে বাহার খুলল সে আর কী বলব!

পাখি নয়—দুটো টুকটুকে পাকা মাকাল। গাছের অনেক ওপরে ভালো করে দেখা যাচ্ছিল না, তাই খানিকক্ষণ আমরা দুজনেই চুপচাপ। আমি শোকে মুহ্যমান আর হলধরদা কাঁকাল চেপে ধরে বসে আছে—টাকটা পর্যন্ত মুছতে পারছে না। হলধরদার বন্দুকই ওঁকে একখানা মোক্ষম কুঁদোর ঘা বসিয়েছে।

প্রায় পাঁচ মিনিট পরে হলধরদা উঠে দাঁড়ালো। অবস্থা দেখে দয়া হল আমার। কয়েকটা শুকনো পাতা দিয়ে টাকটা সাফ করে দিলাম।

—যাত্রাটাই খারাপ।—না হলধরদা? দুটো মাকাল শিকার করলে, তার ওপরে কুঁদোর ঘা! ভাগ্যিস ধাক্কাটা ওপর দিক থেকে এসেছিল, নইলে এতক্ষণে হয়তো তোমাকে গঙ্গার ওপারে নিয়ে ফেলত।

এত করে যে টাক পরিষ্কার করে দিলাম, তার কোনো কৃতজ্ঞতা আছে নাকি? হলধরদা যাচ্ছেতাই রকমের ভেংচি কেটে বললে, থাম-থাম, ওস্তাদি করিসনি। তুই-ই তো গোলমাল করে দিলি—তাইতেই বেসামাল হয়ে কোমরে কুঁদোর ঘা লেগে গেল। কিন্তু হাতের টিপ দেখেছিস তো? মাকাল দুটোকে ঠিক নামিয়েছি!

—তা নামিয়েছ। আর পড়েওছে ঠিক তাক-মাফিক। আমার নাকে আর তোমার টাকে।

—খুব হয়েছে। চল্ এখন। পাখি না মেরে আজ কিছুতেই ফিরছি না! তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বাহাদুরির হাসি হাসল : আরে, আমি কি আর জানিনে যে ওদুটো মাকাল? হাতের টিপ কিরকম, সেইটেই দেখিয়ে দিলাম তোকে।

আমার নাকটা ব্যথা করছিল। ক্ষুণ্ণ হয়ে বললাম, তা বটে, তা বটে।

আবার খানিক দূর এগোতেই আমি দেখতে পেলাম—একটা ঘাসঝোপের পাশে একজোড়া পাখি চরছে। তিতির—নির্ঘাৎ তিতির।

আর তখুনি ধাক্কা দিলাম হলধরদাকে।

কিন্তু হলধরদা যে এমন পল্কা তা কে জানত! ধাক্কা খেয়েই বোঁ করে সামনের দিকে ছুটল। তিতির-টিতির সব টপ্কে, একেবারে ঘাস-ঝোপটায় গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

উঠে দাঁড়িয়েই হলধরদা চেরা গলায় সিংহনাদ করলে—প্যালা!

আমি তখন কাছে এগিয়ে এসেছি। বললাম, কী আদেশ সেনাপতি?

—থাম্, আর মশকরা করতে হবে না। কী আক্কেলে অমন ধরে ধাক্কা দিলি ইস্টুপিড কোথাকার?

—বাঃ, তুমিই তো পাখি দেখলে ধাক্কা দিতে বলেছিলে। আমি দেখলাম একজোড়া তিতির—

—তাই আমাকে ভেবেছিলি বুঝি গুল্তির গুলি? ভেবেছিলি, একেবারে সোজা ঠেলে পাখির গায়ে ফেলে দিবি? ইস্টুপিড গাধা! তোকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে! চলে যা এখান থেকে, আমি আর তোর মুখদর্শনও করতে চাইনে!

—এবার মাপ করো হলধরদা। আমি হাতজোড় করলাম।

—আর চাঁচাবি না?

—না।

—আর চিমটি কাটবি না?

—কক্ষনো না।

—পাঞ্জাব মেলের ইঞ্জিনের মতো পেছন থেকে ধাক্কা দিবি না?

www.boiRboi.blogspot.com

—ছিঃ ছিঃ—আবার!

—বেশ, কথা রইল। শুধু সঙ্গে থাকবি আর কিছু করতে হবে না।

—একেবারে কিছুই না?

—না—না। হলধরদা চেঁচিয়ে উঠল : এক নম্বরের ভণ্ডুলরাম তুই। যা বলব, ঠিক উল্‌টোটি করে বসে থাকবি। তোকে কিছু করতে হবে না, শুধু পাখি পড়লেই কুড়িয়ে নিবি।

—আচ্ছা, আচ্ছা তাই হবে—মাথা নেড়ে আমি সম্মতি জানিয়ে দিলাম।

হাঁটতে হাঁটতে নদীর ধারে।

এতক্ষণে শিকার কিছু হয়নি। সত্যি বলছি, আমি চ্যাঁচাইনি, কিচ্ছু করিনি—একেবারে মুখ বুজে পেছনে পেছনে চলে এসেছি। তবু হতচ্ছাড়া পাখিগুলো যে কী করে টের পেয়েছে, ওরাই জানে। আমাদের দেখার সঙ্গে সঙ্গেই হাওয়া। একটা ডাহুক একটু সময় দিয়েছিল, কিন্তু হলধরদা—ওই যে ওই যে—বলে লাফিয়ে ওঠায় সেটা পালিয়ে গেল।

হলধরদা বলেছিল, যখন তুই সঙ্গে এসেছিস, তখনই জানি আজকের শিকারের নামে লবডঙ্কা।

আমি বলেছিলাম, একবার আমার হাতে যদি বন্দুকটা দিতে—

ইঃ, আম্বা দ্যাখো না? আমার মতো বড় শিকারীই জেরবার হয়ে গেল, আর এই পুঁটিরাম এসেছেন শিকার করতে!

হলধরদা একেবারে দমিয়ে দিয়েছিল আমাকে।

শেষে এসে গেলাম নদীর ধারে।

হলধরদা নিজেই দেখল এবার জলের ধারে একজোড়া বক।

—বক মারব প্যালা?

—বক মেরে কী হবে? কেউ তো খায় না।

—আরে, পালক ছাড়িয়ে নিয়ে গেলে বকও যা, বুনো হাঁসও তাই। নাহয়, তোকেই দিয়ে দেব।

আহা, কী দয়া রে! আমাকে বক দেখাচ্ছেন! দু-একটা ঘুঘু হরিয়াল মেরে দিলেও নয় বোঝা যেত, বক দান করে আর দরকার নেই।

আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, আচ্ছা, আচ্ছা, বকের ব্যবস্থা পরে হবে। আগে মারো তো দেখি।

—আরে, মারা আর শক্ত কী! ওরা তো মরেই রয়েছে! বলে হলধরদা বললে, আমার কোমরটা জাপ্‌টে ধর্‌ দেখি প্যালা।

—আবার কোমর জাপটাবো কেন?

—বলা তো যায় না বন্দুকের মর্জি! এক ধাক্কায় যদি—

—তার মানে, আমাকে সুদ্ধু ওড়াতে চাও? ওসবে আমি নেই হলধরদা!—বলে আমি সরে দাঁড়ালাম।

—মাইরি প্যালা, লক্ষ্মী ভাইটি, এবারটি কথা শোন্‌। তোর মনের ব্যথা আমি বুঝেছি। যদি একটা বকও মারতে পারি, তাহলে তোকে একবার আমি বন্দুকটা ছুড়তে দেব। দিব্যি গেলে বলছি—হলধরদার স্বর করুণ হয়ে এল।

—ঠিক বলছ?

—ঠিক বলছি।

—মা-কালীর দিব্যি?

—মা-কালীর দিব্যি।

আমি হলধরদার কোমর সাপটে ধরলাম, প্রাণপণে।

হলধরদা বন্দুক বাগালো। বললে, জয় মা রক্ষাকালী, জোড়া বক দিস মা—দুম্‌! তারপরেই ধপাস্‌ আর ঝপাস্‌।

আবার মোক্ষম ঘা মেরেছে বন্দুকের কুঁদো। হলধরদা ক্যাঁক করে উঠল, তারপরে আমাকে নিয়ে সোজা ডিগবাজি খেয়ে পড়ল একেবারে নদীর মধ্যে।

যেমন কন্‌কনে ঠাণ্ডা জল—তেমনি স্রোত। প্রায় কুড়ি হাত সাঁতরে উঠতে হল ডাঙায়। আমি আবার বেশ খানিক জল গিলেও খেয়েছি, একটু হলেই মহাপ্রাণী বেরিয়ে যেত।

ডাঙায় উঠে দশ মিনিট ঠকঠক করে কাঁপতে লাগলাম দুজনে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে আমি বললাম, হলধরদা, তোমার বন্দুক?

—ও হতচ্ছাড়াকে নদীতেই বিসর্জন দিলাম! উঃ, পাঁজরায় এমন লেগেছে যে সাতদিনে সে ব্যথা সারলে হয়। তার ওপর যা ঠাণ্ডা—নিমোনিয়ায় না পড়লেই বাঁচি!

মাথার ওপরে উড়ন্ত বকজোড়া ক্যাঁ-ক্যাঁ করে উঠল।

www.boiRboi.blogspot.com

কুট্‌টিমামার দন্ত-কাহিনী

আমি সগর্বে ঘোষণা করলাম, জানিস, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা একটা গুল্‌তি নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে একটা নেড়ি কুকুরের ল্যাজকে তাক করছিল। কুকুরটা বেশ বসে ছিল, হঠাৎ কী মনে করে ঘোঁক শব্দে পিঠের একটা এঁটুলিকে কামড়ে দিলে—তারপর পাঁই-পাঁই করে ছুট লাগালো। ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, দ্যুৎ! কতক্ষণ ধরে টার্গেট করছি—ব্যাটা পালিয়ে গেল!—আমার দিকে ফিরে বললে, তোর ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে—এ আর বেশি কথা কী! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, রাঙা কাকা সবাই দাঁত বাঁধিয়েছে। আচ্ছা, কাকারা সকলে দাঁত বাঁধায় কেন বল্‌ তো? এর মানে কী?

হাবুল সেন বললে, হুঃ! এইটা বোঝোস্‌ নাই। কাকাগো কামই হইল দাঁত খিঁচানি। অত দাঁত খিঁচালে দাঁত খারাপ হইবো না তো কী?

টেনিদা বসে বসে এক মনে একটা দেশলাইয়ের কাঠি চিবুচ্ছিল। টেনিদার ওই একটা অভ্যেস—কিছুতেই মুখ বন্ধ রাখতে পারে না। একটা কিছু-না-কিছু তার

চিবোনো চাই-ই চাই। রসগোল্লা, কাটলেট, ডালমুট, পকৌড়ি, কাজু বাদাম—কোনোটায় অরুচি নেই। যখন কিছু জোটে না, তখন চুয়িংগাম থেকে শুকনো কাঠি—যা পায় তাই চিবোয়। একবার ট্রেনে যেতে যেতে মনের ভুলে পাশের ভদ্রলোকের লম্বা দাড়ির ডগাটা খানিক চিবিয়ে দিয়েছিল—সে একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড! ভদ্রলোক রেগে গিয়ে টেনিদাকে ছাগল-টাগল কী সব যেন বলেছিলেন।

হঠাৎ কাঠি চিবুনো বন্ধ করে টেনিদা বললে, দাঁতের কথা কী হচ্ছিল র‍্যা? কী বলছিলি দাঁত নিয়ে?

আমি বললাম, আমার ছোট কাকা দাঁত বাঁধিয়েছে।

ক্যাবলা বললে, ঈস্—ভারি একটা খবর শোনাচ্ছেন ঢাকঢোল বাজিয়ে! আমার বড় কাকা, মেজ কাকা, ফুলু মাসি—

টেনিদা বাধা দিয়ে বললে, থাম্ থাম্ বেশি ফ্যাচ্-ফ্যাচ্ করিসনি। দাঁত বাঁধানোর কী জানিস তোরা? হুঃ! জানে বটে আমার কুট্টিমামা গজগোবিন্দ হালদার। সায়েবরা তাকে আদর করে ডাকে মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে। সে-ও দাঁত বাঁধিয়েছিল। কিন্তু সে দাঁত এখন আর তার মুখে নেই—আছে ডুয়ার্সের জঙ্গলে!

—পড়ে গেছে বুঝি?

—পড়েই গেছে বটে!—টেনিদা তার খাঁড়ার মতো নাকটাকে খাড়া করে একটা উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে হাই ক্লাস! তারপর বললে, সে-দাঁত কেড়ে নিয়ে গেছে।

—দাঁত কেড়ে নিয়েছে? সে আবার কী? আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম, এত জিনিস থাকতে দাঁত কাড়তে যাবে কেন?

—কেন? টেনিদা আবার হাসল : দরকার থাকলেই কাড়ে। কে নিয়েছে বল্ দেখি?

ক্যাবলা অনেক ভেবে-চিন্তে বললে, যার দাঁত নেই।

—ইঃ, কী পণ্ডিত! টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, দিলে বলে! অত সোজা নয়, বুঝলি? আমার কুট্টিমামার দাঁত যে-সে নয়—সে এক একটা মুলোর মতো। সে বাঘা দাঁতকে বাগানো যার-তার কাজ নয়।

—তবে বাগাইল কেডা? বাঘে? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

—এঃ, বাঘে! বলছি দাঁড়া। ক্যাবলা, তার আগে দুআনার ডালমুট নিয়ে আয়—হাঁড়ির মতো মুখ করে ক্যাবলা ডালমুট আনতে গেল। মানে, যেতেই হল তাকে।

আমাদের জ্বলজ্বলে চোখের সামনে একাই ডালমুটের ঠোঙা সাবার করে টেনিদা বললে, আমার কুট্টিমামার কথা মনে আছে তো? সেই যে চা-বাগানে চাকরি করে আর একাই দশজনের মতো খেয়ে সাবাড় করে? আরে, সেই লোকটা—যে ভালুকের নাক পুড়িয়ে দিয়েছিল?

আমরা সমস্বরে বললাম, বিলক্ষণ! 'কুট্টিমামার হাতের কাজ' কি এত সহজেই ভোলবার?

টেনিদা বললে, সেই কুট্টিমামারই গল্প। জানিস তো—সায়েবরা ডেকে নিয়ে মামাকে চা-বাগানে চাকরি দিয়েছিল? মামা খাসা আছে সেখানে। খায়-দায় কাঁসি বাজায়। কিন্তু বেশি সুখ কি আর কপালে সয় রে? একদিন জুৎ করে একটা বন-মুরগির রোস্টে যেই কামড় বসিয়েছে—অমনি ঝন্-ঝনাৎ! কুট্টিমামার একটা দাঁত পড়ল প্লেটের ওপর খসে আর তিনটে গেল নড়ে।

হয়েছিল কী, জানিস? শিকার করে আনা হয়েছিল তো বন-মুরগি? মাংসের মধ্যে ছিল গোটাকয়েক ছর্‌রা। বেকায়দা কামড় পড়তেই অ্যাকসিডেণ্ট, দাঁতের বারোটা

www.boiRboi.blogspot.com

বেজে গেল।

মাংস রইল মাথায়—ঝাড়া তিন ঘণ্টা নাচানাচি করলে কুট্টিমামা। কখনো কেঁদে বললে, পিসিমা গো তুমি কোথায় গেলে? কখনো ককিয়ে ককিয়ে বললে, ইঁ-হি-হি—আমি গেলুম! আবার কখনো দাপিয়ে দাপিয়ে বললে, ওরে বনমুরগি রে—তোর মনে এই ছিল রে! শেষকালে তুই আমায় এমন করে পথে বসিয়ে গেলি রে!

পাকা তিন দিন কুট্টিমামা কিচ্ছুটি চিবুতে পারলো না। শুধু রোজ সের-পাঁচেক করে খাঁটি দুধ আর ডজন-চারেক কমলালেবুর রস খেয়ে কোনোমতে পিত্তি-রক্ষা করতে লাগল।

দাঁতের ব্যথা-ট্যথা একটু কমলে সায়েবরা কুট্টিমামাকে বললে, তোমাকে ডেনটিস্টের ওখানে যেতে হবে।

—অ্যাঁ!

সায়েবরা বললে, দাঁত বাঁধিয়ে আসতে হবে।

ডেনটিস্টের নাম শুনেই তো কুট্টিমামার চোখ তালগাছে চড়ে গেল। কুট্টিমামার দাদু নাকি একবার দাঁত তুলতে গিয়েছিলেন। যে ডাক্তার দাঁত তুলছিলেন, তিনি চোখে কম দেখতেন। ডাক্তার করলেন কী—দাঁত ভেবে কুট্টিমামার দাদুর নাকে সাঁড়াশি আটকে দিয়ে সেটাকেই টানতে লাগলেন। আর বলতে লাগলেন : ইস্—কী প্রকাণ্ড গজদন্ত আর কী ভীষণ শক্ত! কিছুতেই নাড়াতে পারছি না!

কুট্টিমামার দাদু তো হাঁই-মাই করে বলতে লাগলেন, ওঁটা—ওঁটা আমার আঁক! আঁক!—টানের চোটে নাক বেরুচ্ছিল না—'আঁক!'

ডাক্তার রেগে বললেন, আর হাঁক-ডাক করতে হবে না—খুব হয়েছে। আরো গোটা-কয়েক টান-ফান দিয়ে নাকটাকে যখন কিছুতেই কায়দা করতে পারলেন না—তখন বিরক্ত হয়ে বললেন : নাঃ, হল না। এমন বিচ্ছিরি শক্ত দাঁত আমি কখনো দেখিনি! এরকম দাঁত কোনো ভদ্রলোকে তুলতে পারে না।

কুট্টিমামার দাদু বাড়ি ফিরে এসে বারো দিন নাকের ব্যথায় বিছানায় শুয়ে রইলেন। তেরো দিনের দিন উকিল ডাকিয়ে উইল করলেন : 'আমার পুত্র বা উত্তরাধিকারীদের মধ্যে যে-কেহ দাঁত বাঁধাইতে যাইবে, তাহাকে আমার সমস্ত সম্পত্তি হইতে চিরতরে বঞ্চিত করিব।'

অবশ্যি কুট্টিমামার দাদুর সম্পত্তিতে কুট্টিমামার কোনো রাইট নেই—তবু দাদুর আদেশ তো! কুট্টিমামা গাঁই-গুঁই করতে লাগলেন। ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে 'মাই নোজ'-টোজও বলবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ঝড়াং করে বলে দিলে, নো ফোক্‌লা দাঁত উইল ডু! দাঁত বাঁধাতেই হবে।

কুট্টিমামা তো মনে মনে 'তনয়ে তারো তারিণী' বলে রামপ্রসাদী গান গাইতে গাইতে, বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে গিয়ে ডেনটিস্টের কাছে হাজির। ডেনটিস্ট প্রথমেই তাঁকে একটা চেয়ারে বসালে। তারপর দাঁতের ওপরে খুর্ খুর্ করে একটা ইলেকট্রিক বুরুশ বসিয়ে সেগুলোকে অর্ধেক ক্ষয় করে দিলে। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে ঠুকে বাকি সবক'টা দাঁতকে নড়িয়ে ফেললে। শেষে বেজায় খুশি হয়ে বললে, এর দু-পাটি দাঁতই খারাপ। সব তুলে ফেলতে হবে।

শুনেই কুট্টিমামা প্রায় অজ্ঞান। গোটা-তিনেক খাবি খেয়ে বললেন, নাকটাও?

ডাক্তার ধমক দিয়ে বললেন, চোপরাও!

তারপর আর কী? একটা পেল্লায় সাঁড়াশি নিয়ে ডাক্তার কুরুৎ কুরুৎ করে কুট্টি-মামার সবক'টা দাঁত তুলে দিলে। কুট্টিমামা আয়নায় নিজের মূর্তি দেখে কেঁদে

ফেললেন। কিছুটি নেই মুখের ভেতর—একদম গাঁয়ের পেছল রাস্তার মতো—মাঝে মাঝে গর্ত। ও'কে ঠিক বাড়ির বুড়ি ধাই রামধনিয়ার মত দেখাচ্ছিল।

কুট্‌টিমামা কেঁদে ফ্যাক ফ্যাক করে বললেন, ওগো আমার কী হলো গো—

ডাক্তার আবার ধমক দিয়ে বললে, চোপরাও! সাত দিন পরে এসো—বাঁধানো দাঁত পাবে।

বাঁধানো দাঁত নিয়ে কুট্‌টিমামা ফিরলেন। দেখতে শুনতে দাঁতগুলো নেহাত খারাপ নয়। খাওয়াও যায় একরকম। খালি একটা অসুবিধে হত। খাওয়ার অর্ধেক জিনিস জমে থাকত দাঁতের গোড়ায়। পরে আবার সেগুলোকে জাবর কাটতে হত।

তবু ওই দাঁত নিয়েই দুঃখে সুখে কুট্‌টিমামার দিন কাটছিল। কিন্তু সায়েবদের কাণ্ড জানিস তো? ওদের সুখে থাকতে ভূতে কিলোয়—কিছুতেই তিনটে দিন বসে থাকতে পারে না। একদিন বললে, মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, আমরা বাঘ শিকার করতে যাব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

বাঘ-টাঘের ব্যাপার কুট্‌টিমামার তেমন পছন্দ হয় না। কারণ বাঘ হরিণ নয়—তাকে খাওয়া যায় না, বরং সে উল্‌টে খেতে আসে। কুট্‌টিমামা খেতে ভালোবাসে, কিন্তু কুট্‌টিমামাকেই কেউ খেতে ভালোবাসে—এ-কথা ভাবলে তাঁর মন ব্যাজার হয়ে যায়। বাঘগুলো যেন কী! গায়ে যেমন বিটকেল গন্ধ, স্বভাব-চরিত্তিরও তেমনি যাচ্ছেতাই।

কুট্‌টিমামা কান চুলকে বললে, বাঘ স্যার—ভেরি ব্যাড স্যার্—আই নট্ লাইক্ স্যার—

কিন্তু সায়েবেরা সে কথা শুনলে তো! গোঁ যখন ধরেছে তখন গেলই। আর কুট্‌টিমামাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চলে গেল।

গিয়ে ডুয়ার্সের জঙ্গলে এক ফরেস্ট বাংলোয় উঠল।

চারদিকে ধুন্ধুমার বন। দেখলেই পিত্তি ঠাণ্ডা হয়ে আসে। রাত্তিরে হাতির ডাক শোনা যায়—বাঘ হুম্ হাম্ করতে থাকে। গাছের ওপর থেকে টুপ টুপ করে জোঁক পড়ে গায়ে। বানর এসে খামোকা ভেংচি কাটে। সকালে কুট্‌টিমামা দাড়ি কামাচ্ছিলেন—একটা বানর এসে 'হিলিক্ চিলিক্' এইসব বলে তাঁর ব্রুশটা নিয়ে গেল! আর সে কী মশা! দিন নেই—রাত্তির নেই—সমানে কামড়াচ্ছে। কামড়ানোও যাকে বলে! দু-তিন ঘণ্টার মধ্যেই হাতে পায়ে মুখে যেন চাষ করে ফেললে।

তার মধ্যে আবার সায়েবগুলো মোটর গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঢুকল বাঘ মারতে।

—মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমিও চলো।

কুট্‌টিমামা তক্ষুনি বিছনায় শুয়ে হাত পা ছুড়তে আরম্ভ করে দিলে। চোখ দুটোকে আলুর মতো বড় বড় করে, মুখে গ্যাঁজলা তুলে বলতে লাগল : বেলি পেইন স্যার—পেটে ব্যথা স্যার—অবস্থা সিরিয়াস্ স্যার—

দেখে সায়েবরা ঘোঁয়া-ঘোঁয়া—ঘ্যাঁয়োৎ-ঘ্যাঁয়োৎ করে বেশ খানিকটা হাসল।—ইউ গাঁজা-গাবিণ্ডে, ভেরি নটি—বলে একজন কুট্‌টিমামার পেটে একটা চিমটি কাটলে—তারপর বন্দুক কাঁধে ফেলে শিকারে চলে গেল।

আর যেই সায়েবরা চলে যাওয়া—অম্‌নি তড়াক করে উঠে বসলেন কুট্‌টিমামা। তক্ষুনি এক ডজন কলা, দুটো পাঁউরুটি আর এক শিশি পেয়ারার জেলি খেয়ে, শরীর-টরির ভালো করে ফেললেন।

বাংলোর পাশেই একটা ছোট পাহাড়ি ঝর্ণা। সেখানে একটা শিমুল গাছ। কুট্‌টি-

www.boiRboi.blogspot.com

মামা একখানা পেল্লায় কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে সেখানে এসে বসলেন।

চারদিকে পাখি-টাখি ডাকছিল। পেটটা ভরা ছিল, মিঠে মিঠে হাওয়া দিচ্ছিল—কুট্‌টিমামা খুশি হয়ে মহাভারতের সেই জায়গাটা পড়তে আরম্ভ করলেন—যেখানে ভীম বকরাক্ষসের খাবার-দাবারগুলো সব খেয়ে নিচ্ছে।

পড়তে পড়তে ভাবের আবেগে কুট্‌টিমামার চোখে জল এসেছে, এমন সময় : গর্‌র্—গর্‌র্—

কুট্‌টিমামা চোখ তুলে তাকাতেই :

কী সর্বনাশ! ঝর্ণার ওপারে বাঘ!

কী রূপ বাছার! দেখলেই পিলে-টিলে উল্‌টে যায়। হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা, আগুনের ভাঁটার মতো চোখ, হল্‌দের ওপরে কালো কালো ডোরা, অজগরের মতো বিশাল ল্যাজ। মস্ত হাঁ করে, মুলোর মতো দাঁত বের করে আবার বললে, গর্—র্—র্

একেই বলে বরাত! যে-বাঘের ভয়ে কুট্‌টিমামা শিকারে গেল না, সে-বাঘ নিজে থেকেই দোরগোড়ায় হাজির। আর কেউ হলে তক্ষুনি অজ্ঞান হয়ে যেত, আর বাঘ তাকে সারিডন ট্যাবলেটের মতো টপাং করে গিলে ফেলত। কিন্তু আমারই মামা তো—ভাঙে তবু মচকায় না। তক্ষুনি মহাভারত বগলদাবা করে এক লাফে একেবারে শিমুল গাছের মগডালে!

বাঘ এসে গাছের নিচে থাবা পেতে বসল। দু-চারবার থাবা দিয়ে গাছের গুঁড়ি আঁচড়ায়, আর ওপর দিকে তাকিয়ে ডাকে : ঘ'র্—র্ ঘুঁ—ঘুঁ। বোধহয় বলতে চায়—তুমি তো দেখছি পয়লা নম্বরের ঘুঘু!

কিন্তু বাঘটা তখনো ঘুঘুই দেখেছে—ফাঁদ দেখেনি। দেখল একটু পরেই। কিছুক্ষণ পরে বাঘটা রেগে যেই ঝাঁক করে একটা হাঁক দিয়েছে—অম্‌নি দারুণ চম্‌কে উঠেছে কুট্‌টিমামা, আর বগল থেকে কালীসিঙ্গির সেই জলঝম্প মহাভারত ধপাস্ করে নিচে পড়েছে। আর পড়বি তো পড় সোজা বাঘের মুখে। সেই মহাভারতের ওজন কম্‌সে কম পাক্কা বারো সের—তার ঘায়ে মানুষ খুন হয়—বাঘও তার ঘা খেয়ে উল্‌টে পড়ে গেল। তারপর গোঁ—গোঁ—ঘেয়াং—ঘেয়াং বলে বার-কয়েক ডেকেই—এক লাফে ঝর্ণা পার হয়ে জঙ্গলের মধ্যে হাওয়া!

কুট্‌টিমামা আরো আধ ঘণ্টা গাছের ডালে বসে ঠক-ঠক করে কাঁপল। তারপর নিচে নেমে দেখল মহাভারত ঠিক তেমনি পড়ে আছে—তার গায়ে আঁচড়টিও লাগেনি। আর তার চারপাশে ছড়ানো আছে কেবল দাঁত—বাঘের দাঁত। একেবারে গোনা-গুনতি বত্রিশটা দাঁত—মহাভারতের ঘায়ে একটি দাঁতও আর বাঘের থাকেনি। দাঁতগুলো কুড়িয়ে নিয়ে, মহাভারতকে মাথায় ঠেকিয়ে, কুট্‌টিমামা এক দৌড়ে বাংলোতে। তারপর সায়েবেরা ফিরে আসতেই কুট্‌টিমামা সেগুলো তাদের দেখিয়ে বললে, টাইগার টুথ।

ব্যাপার দেখে সায়েবরা তো থ!

তাই তো—বাঘের দাঁতই তো বটে? পেলে কোথায়?

কুট্‌টিমামা ডাঁট দেখিয়ে বুক চিতিয়ে বললে, আই গো টু ঝর্ণা। টাইগার কাম্। আই ডু বক্‌সিং—মানে ঘুসি মারলাম। অল্ টুথ ব্রেক। টাইগার কাট ডাউন—মানে বাঘ কেটে পড়ল।

সায়েবরা বিশ্বাস করল কি না কে জানে, কিন্তু কুট্‌টিমামার ভীষণ খাতির বেড়ে গেল। রিয়্যালি গাঁজা-গাবিণ্ডে ইজ এ হিরো! দেখতে কাঁকলাসের মতো হলে কী হয়—হি ইজ এ গ্রেট হিরো! সেদিন খাওয়ার টেবিলে একখানা আস্ত হরিণের ঠ্যাং

মেরে দিলেন কুট্টিমামা।

পরদিন আবার সায়েবরা শিকারে যাওয়ার সময় ওকে ধরে টানাটানি : আজ তোমাকে যেতেই হবে আমাদের সঙ্গে! ইউ আর এ বিগ পালোয়ান!

মহা ফ্যাসাদ! শেষকালে কুট্টিমামা অনেক করে বোঝালেন, বাঘের সঙ্গে বক্সিং করে ও'র গায়ে খুব ব্যথা হয়েছে। আজকের দিনটাও থাক।

সায়েবরা শুনে ভেবেচিন্তে বললে, অল্ রাইট্—অল্ রাইট্।

আজকে কুট্টিমামা হুঁসিয়ার হয়ে গেছেন—বাংলোর বাইরে আর বেরুলেনই না। বাংলোর বারান্দায় একটা ইজি চেয়ারে আবার সেই কালীসিঙ্গির মহাভারত নিয়ে বসলেন।

—ঘেঁরাও—ঘুন্তু—

কুট্টিমামা আঁতকে উঠলেন। বাংলোর সামনে তারের বেড়া—তার ওপারে সেই বাঘ। কেমন যেন জোড়হাত করে বসেছে। কুট্টিমামার মুখের দিকে তাকিয়ে করুণ স্বরে বললে, ঘেঁয়াং—কুঁই!

আর হাঁ করে মুখটা দেখালো!

ঠিক সেই রকম। দাঁতগুলো তোলবার পরে কুট্টিমামার মুখের যে চেহারা হয়েছিল, অবিকল তা-ই! একেবারে পরিষ্কার—একটা দাঁত নাই! নির্ঘাৎ রামধনিয়ার মুখ।

বাঘটা হুবহু কান্নার সুরে বললে—ঘ্যাং—ঘ্যাং—ভ্যাঁও! ভাবটা এই, দাঁতগুলো তো সব গেল দাদা! আমার খাওয়া-দাওয়া সব বন্ধ! এখন কী করি?

কিন্তু তার আগেই এক লাফে কুট্টিমামা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেছেন। বাঘটা আরো কিছুক্ষণ ঘ্যাং-ঘ্যাং—ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কেঁদে বনের মধ্যে চলে গেল।

পরদিন সকালে কুট্টিমামা জানলার পাশে দাঁড়িয়ে, বাঁধানো দাঁতের পাটি দুটো খুলে নিয়ে, বেশ করে মাজছিলেন। দিব্যি সকালের রোদ উঠেছে—সায়েবগুলো ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমুচ্ছে তখনো, আর কুট্টিমামা দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে ফ্যাক-ফ্যাকে গলায় গান গাইছিলেন : 'এমন চাঁদের আলো, মরি যদি সে-ও ভালো—'

সকাল বেলায় চাঁদের আলোয় গান গাইতে গাইতে কুট্টিমামার বোধহয় আর কোনদিকে খেয়ালই ছিল না। ওদিকে সেই ফোকলা বাঘ এসে জানলার বাইরে বসে রয়েছে ঝোপের ভেতরে। কুট্টিমামার দাঁত খোলা—বুরুশ দিয়ে মাজা—সব দেখছে এক মনে। মাজা-টাজা শেষ করে যেই কুট্টিমামা দাঁত দু'পাটি মুখে পুরতে যাবেন—অমনি : ঘোঁয়াং ঘালুম!

অর্থাৎ তোফা—এই তো পেলুম!

জানলা দিয়ে এক লাফে বাঘ ঘরের মধ্যে।

—টা—টাইগার—পর্যন্ত বলেই কুট্টিমামা ফ্ল্যাট!

বাঘ কিন্তু কিছুই করলে না। টপাৎ করে কুট্টিমামার দাঁত দু-পাটি নিজের মুখে পুরে নিলে—কুট্টিমামা তখনো অজ্ঞান হননি—জুলজুল করে দেখতে লাগলেন, সেই দাঁত বাঘের মুখে বেশ ফিট করেছে। দাঁত পরে বাঘ আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বেশ খানিকক্ষণ নিঃশব্দ বাঘা হাসি হাসল, তারপর টপ্ করে টেবিল থেকে টুথ-ব্রাশ আর টুথ-পেস্টের টিউব মুখে তুলে নিয়ে জানলা গলিয়ে আবার—

কুট্টিমামার ভাষায়—একেবারে উইন্ড! মানে হাওয়া হয়ে গেল।

টেনিদা থামল। আমাদের দিকে তাকিয়ে গর্বিতভাবে বললে, তাই বলছিলুম, দাঁত বাঁধানোর গল্প আমার কাছে করিসনি! হুঃ!

www.boiRboi.blogspot.com

খলে-রহস্য

পটলডাঙার বিরিঞ্চি কখনো পাড়াগাঁ দেখেনি। তার বন্ধু নীরদ ওরফে ন্যাদারও সেই দশা। তাই ক্লাসের হারু যখন গ্রাম থেকে ঘুরে এসে বললে,—পাড়াগাঁ কী সুন্দর, তার মাঠে মাঠে ধান, গাছে গাছে ফল-ফুল, আকাশে কেবল কোকিল আর হংস-বলাকা—তখন বিরিঞ্চির মন ভারি খারাপ হল। এত খারাপ হল যে নাকের ডগা সুড়সুড় করতে লাগল; আর টিফিন পিরিয়ডে বসে বসে একাই দু-আনার চীনেবাদাম খেয়ে ফেলল, কাউকে একটুও ভাগ দিলে না।

বিরিঞ্চির এক পিসিমা থাকেন হুগলির এক পাড়াগাঁয়ে। কলকাতা থেকে তিন ঘণ্টা লাগে সেখানে যেতে। কিন্তু বিরিঞ্চির বাবা কখনো সেখানে যাননি—কাউকে যেতেও দেননি। তাঁর ধারণা, হাওড়া স্টেশনের চৌহদ্দি পেরুলেই ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি-মশা আর বীজাণু এসে আক্রমণ করবে, তারপর কালাজ্বর, পালাজ্বর, ডেঙ্গুজ্বর, ম্যালেরিয়া, প্লেগ, বাত, টাকপড়া—সব একসঙ্গে চেপে ধরবে।

—পাড়াগাঁ! উরে ব্বাস্! সাক্ষাৎ যমপুরী! বলেই বিরিঞ্চির বাবা টপাৎ করে একটা প্যালুড্রিন খেয়ে ফেলেন—পাড়াগাঁয়ে যাওয়ার আগেই।

কিন্তু এ-যাত্রা বিরিঞ্চিকে তিনি আর ঠেকাতে পারলেন না। বিরিঞ্চি আসছে বারে স্কুল-ফাইন্যাল দেবে, সে বিদ্রোহ করে বসল : পিসিমার বাড়ি আমায় যেতে দেবে না?

বিরিঞ্চির বাবা বললেন, উফ্, অসম্ভব!

—দেবে না তো? ঠিক আছে। তাহলে রাস্তায় বেরিয়ে আমি তেলেভাজা খাব।

—অ্যাঁ! শুনে বিরিঞ্চির বাবা বিষম খেলেন : ওতে যে কলেরা হবে!

—তারপর পথের ধার থেকে ফিরিওলার সরবৎ—

বিরিঞ্চির বাবা আর্তনাদ করে বললেন, ডবল নিমোনিয়া!

—আইসক্রীমও কিনে খেতে পারি—

বিরিঞ্চির বাবা প্রায় ফিট হওয়ার উপক্রম। ধরা গলায় বললেন, যক্ষ্মা!

—তাহলে পিসিমার বাড়ি যেতে দাও!

বিরিঞ্চির বাবা প্রায় অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, এমন সময় বিরিঞ্চির মা এসে হাজির। তিনি স্বামীকে একটা ধমক দিয়ে বললেন, তোমার নাহয় মাথা খারাপ হয়েছে, তাই বলে ছেলেটাকেও পাগল করবে নাকি? যা বীরু, তোর তো এখন ছুটি আছে—দিনকয়েক ঘুরেই আয় পিসির বাড়ি থেকে। ঠাকুরঝি কত খুশি হবে।—এই বলে সব মিটিয়ে দিয়ে বিরিঞ্চির মা ঝিকে বকতে গেলেন। ঝি দুটো কাচের গ্লাস ভেঙে ফেলেছিল।

বিরিঞ্চির বাবার ভুঁড়ি কাঁপিয়ে সাইক্লোনের মতো একটা দীর্ঘশ্বাস বেরুল। চিঁ-চিঁ করে বললেন, তবে ঘুরে আয়। কিন্তু যাওয়ার সময় একবাক্স ওষুধ দিয়ে দেব—ক্লোরোডাইন, প্যালুড্রিন, চ্যবনপ্রাশ, সিনা থার্টি, বেলেডোনা টু হান্ড্রেড আর ভাস্কর লবণ। সব চার্ট করে দেব—দরকার পড়লেই খেয়ে নিবি। হ্যাঁ—হ্যাঁ—সেই সঙ্গে বেনজিন আর তুলোও দিতে হবে।

বিরিঞ্চি বলতে যাচ্ছিল, মেডিক্যাল কলেজটাও সঙ্গে দিয়ে দিয়ো—আর কোনো ভাবনা থাকবে না। কিন্তু বাবাকে কি আর সে কথা বলা যায়? আপাতত পার্মিশন পাওয়ার আনন্দে সে লাফাতে লাফাতে তার বন্ধু ন্যাদাকে খবর দিতে ছুটল।

ট্রেন থেকে নেমে দেখা গেল, পিসেমশাই আসেননি। এই রে—এখন কোন্ দিকে যাওয়া যায়?

বিরিঞ্চি বললে, আয়, এই প্ল্যাটফর্মে কিছুক্ষণ হাওয়া খেয়ে নিই, তারপর ভাবা যাবে ওসব।

ন্যাদা বললে, বেজায় খিদে পেয়েছে যে! হাওয়ায় পেট ভরবে না।

বলতে-বলতেই পিসেমশাই এসে হাজির। পায়ে চটি, গায়ে গেঞ্জি, কাঁধে গামছা। হাঁপাচ্ছেন।

বিরিঞ্চি দেখেই চিনল। তাদের কলকাতার বাড়িতে সে আগেও দু-তিনবার পিসেমশাইকে দেখেছে। ধাঁ করে তখুনি তাঁকে একটা প্রণাম ঠুকে ফেলল, সঙ্গে সঙ্গে ন্যাদাও।

পিসেমশাই বললেন, আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। রাস্তায় ভালো মাছ দেখলাম, তাতেই—আরে—আরে—পিসেমশাইয়ের হাতের ন্যাকড়ার পুঁটলিতে কী যেন দাপাদাপি করছিল। হঠাৎ তা থেকে কালো লম্বা-মতন একটা জিনিস ছিটকে পড়ল ন্যাদার পায়ের কাছে। ন্যাদা সঙ্গে সঙ্গে তিন হাত এক হাইজাম্প মারল : সাপ—সাপ!

সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চি একটা আছাড় খেতে খেতে সামলে গেল : অ্যাঁ—সাপ! কোথায় সাপ? কী সাপ?

কাঁচা-পাকা গোঁফের তলায় পিসেমশাইয়ের হাসি ঝিলিক দিয়ে উঠল : সাপ নয়—মাগুর মাছ।—বলেই পিসেমশাই উবু হয়ে সেই কালো লম্বা জিনিসটাকে কপাৎ করে পাকড়াও করলেন; তারপর বললেন, তোমাদের জন্যে এগুলো কিনতেই তো দেরি হয়ে গেল। নাও—এবার বাড়ি চলো—

বাড়ি কাছেই। কাঁচা রাস্তা দিয়ে মিনিট-দশেক হেঁটে, একটা আমবাগান পেরুতেই।

পিসিমা দোর-গোড়াতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ভারি খুশি হয়ে বললেন, আয়—আয়! এতদিন পরে বুঝি গরিব পিসিকে মনে পড়ল? আর এটি বুঝি তোর বন্ধু? কী নাম—ন্যাদা? বাঃ, বেশ নাম। তা এসো বাবা—ভেতরে এসো।

তারপর চিঁড়ে মুড়ি নারকোলের নাড়ুর এলাহি কাণ্ড।

খেতে খেতে বিরিঞ্চি বললে, বেশ লাগছে—না রে?

ন্যাদা চোখ বুজে নারকোলের নাড়ু চিবুতে চিবুতে বললে, লা গ্র্যান্ড।

দুপুরেও সেই ব্যাপার। মাগুর মাছের কালিয়া, পোনা মাছের ঝাল, মুড়িঘণ্ট, বাটি-চচ্চড়ি, পোস্তর বড়া, সোনামুগের ডাল। বাটির পর বাটি। ন্যাদা বললে, আমার আর পাড়াগাঁ ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না রে! মনে হচ্ছে এখানেই থেকে যাই চিরকালের মতো!

বিরিঞ্চি সুরুৎ করে মুড়িঘণ্টের একটা কাঁটা চুষে নিয়ে আবেগভরা গলায় বললে, যা বলেছিস!

ন্যাদা হাত চাটতে-চাটতে জিজ্ঞেস করলে, পাড়াগাঁয়ে এমন সব পিসিমা থাকতে লোকে পাঁইডাঁটা আর কুচো-চিংড়ি খাবার জন্যে কলকাতায় কেন থাকে র‍্যা?

মাগুর মাছের কালিয়াটাকে প্রবল বেগে আক্রমণ করতে করতে বিরিঞ্চি বললে, গোমুখ্যু বলে।

www.boiRboi.blogspot.com

খাওয়ার পরে দুজনে একেবারে অজগর। মানে, হরিণ-টরিণ গিলে অজগরের যে দশা হয় তাই আর কি! নড়াচড়াই মুশকিল।

পিসিমা দোতলার বারান্দায় শীতলপাটি বিছিয়ে দিলেন। বললেন, এখানে একটু গড়িয়ে নাও। ঘরে গরম লাগবে—দিব্যি হাওয়া আছে এখানটায়।

দিব্যি হাওয়াই বটে! শরীর জুড়িয়ে গেল। তায় আবার ঝির-ঝির করে গাছের পাতা কাঁপছে, তাতে পাখি বসে আছে।

ন্যাদা বললে, ওটা কী গাছ রে?

বিরিঞ্চি ভেবে-চিন্তে বললে, পাড়াগাঁয়ে সব ভালো ভালো গাছ থাকে। খুব সম্ভব ওটা তমাল গাছ। কিংশুকও হতে পারে।

ন্যাদা আরো খানিক ভেবে বললে, কুরুবকও হতে পারে। আচ্ছা—শাল্মলী নয় তো?

—নাঃ, বোধহয় শাল্মলী নয়। তা হলে তো ফুলের মালা দিয়েই কাটা যেত। কেন—পণ্ডিতমশাই সেই যে পড়ায় নি?

'ফুলদল দিয়া, কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে?' শাল্মলী নিশ্চয়ই খুব রোগা আর ছোট গাছ হবে।

ন্যাদা বললে, ঠিক। তাহলে ওটা তমাল কিংবা কুরুবক। কিংশুকটা শুনতে আরো ভালো। আচ্ছা, ওতে একটা পাখি বসে আছে, দেখেছিস? ওটা কী পাখি বল দিকি?

বিরিঞ্চি বললে, পাখিটা দেখতে কিন্তু বেশ। দোয়েল-শ্যামা-পাপিয়া কিছু একটা হবে। নীলকণ্ঠও হতে পারে।

ন্যাদা বললে, নীলকণ্ঠ নামটা বেশ জুতসই। বাঃ কী সুন্দর! আমার ভাই কবিতা লিখতে ইচ্ছে করছে। 'ওই যে কিংশুক বৃক্ষের শাখায়—বসিয়া আছে নীলকণ্ঠ বিহঙ্গ—'

—আমি মিলিয়ে দিচ্ছি, দাঁড়া—বিরিঞ্চি বললে, 'তাই দেখে মোর মনে নাচিতেছে পুলক-তরঙ্গ'।

হঠাৎ পিসেমশায়ের হাসিতে ওরা চমকে উঠল। হুঁকো হাতে কখন তিনি এসে হাজির!

—কিংশুক—বটে? পিসেমশাই হুঁকোয় টান দিয়ে বললেন, ওই গাছের নাম হচ্ছে ঘোড়ানিম। আর ও পাখিটা নীলকণ্ঠ নয়—ওর নাম হাঁড়িচাঁচা, ব্যাঙ আর কেঁচো ধরে খায়—

দুত্তোর! এমন কবিতাটা মাঠে মারা গেল! ভারি ব্যাজার হল ন্যাদা। বিরিঞ্চিরও মন খারাপ হয়ে গেল।

খানিকক্ষণ কুড়ুক্ কুড়ুক্ করে হুঁকো টেনে পিসেমশাই এলোমেলো গল্প জুড়ে দিলেন। ধান চালের দর, গাঁয়ের গো-মড়ক, কলকাতায় খাঁটি দুধ পাওয়া যায় কি না, রাইটার্স বিলডিঙের নতুন বাড়িটা কী প্রকাণ্ড—এই সব। কিন্তু ওদের তখন বিরক্তি ধরে গেছে। দুজনে হুঁ হুঁ করতে করতে কোন্ ফাঁকে টুপ করে ঘুমিয়ে পড়ল।

বিকেলে লুচি হালুয়া আর চা খেয়ে দুজনে বেড়াতে বেরুল।

পাড়াগাঁয়ের রাস্তা। মাঝে মাঝে দু-একখানা বাড়ি। তা ছাড়া গাছগাছড়া, পুকুর, ঝোপজঙ্গল। বেশ লাগছিল।

হঠাৎ দেখা গেল জঙ্গলের মধ্যে এক জায়গায় একটা লোক কী যেন খুঁড়ছে কোদাল দিয়ে। একেবারে নিবিষ্ট মনে।

বিরিঞ্চি ফিসফিস করে ন্যাদাকে বললে, গুপ্তধন খুঁজছে নাকি রে?

ন্যাদা বললে, অসম্ভব কী! পাড়াগাঁয়েই তো এখানে ওখানে ঘড়া-ঘড়া মোহর

লুকোনো থাকে শুনেছি।

গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দুজনে দেখতে লাগল। হিঁস্‌সো হিঁস্‌সো করে লোকটা সমানে মাটি কাটছে। টপটপিয়ে ঘাম পড়ছে গা দিয়ে।

খানিক পরেই কী যেন টেনে তুলল আঁকপাঁক করে। বেশ পেল্লায় জিনিস একটা।

—কী ওটা? ন্যাদা ফিসফিস করে বললে।

—বোধহয় মোহরের ঘড়া—বলেই উত্তেজিত হয়ে বিরিঞ্চি যেই গলা বাড়িয়ে দেখতে গেছে, অমনি শুকনো পাতায় খচর-মচর আওয়াজ শুনে লোকটা ফিরে তাকাল। দেখতেও পেল ওদের।

এক মুখ দাঁত বের করে হেসে বললে, কী দেখছ খোকারা?

বিরিঞ্চি আর কৌতূহল সামলাতে পারল না; বলল, মাটি থেকে ওটা কী তুললে তুমি? গুপ্তধন নাকি?

লোকটা, হি হি করে হেসে বললে, গুপ্তধনই বটে! জব্বর ওল একখানা। দেব একটুখানি কেটে? নিয়ে যাও না—তোফা ডালনা খাবে।

—ধুৎ! ডালনার নিকুচি করেছে। গুপ্তধনের বদলে শেষকালে কি না ওল! ছ্যাঃ—ছ্যা! বিরিঞ্চি বললে, ন্যাদা,—যাই এখান থেকে।

দুজনে হন্‌-হন্‌ করে এগিয়ে যেতে যেতে শুনল, পেছনে লোকটা খিকখিক করে হাসছে।

আরো খানিকটা হাঁটতেই একটা পুরোনো পোড়ো বাড়ি।

দরজা-জানলা কোথাও কিছু নেই। ভেতরে জন-মানুষ আছে বলে মনে হয় না। ওই গুপ্তধন কথাটা তখন বিরিঞ্চিকে পেয়ে বসেছে। এই বাড়িটা দেখে কেমন সন্দেহ হল তার। হঠাৎ মনে হল—এমনি পোড়ো বাড়িতে তো গুপ্তধন লুকোনো থাকে! কে জানে—হয়তো এই বাড়িতেই আছে?

বিরিঞ্চি দাঁড়িয়ে পড়ল।

—ন্যাদা!

—কী রে?

—এই বাড়িতে গুপ্তধন আছে!

শুনে ন্যাদার রোমাঞ্চ হল; বললে, সত্যি? কী করে জানলি?

—আমার মনে হল। বাড়িটার কেমন রহস্যময় চেহারা দেখেছিস? পাড়াগাঁয়ের এ-সব বাড়িতেই মোহরের ঘড়া লুকোনো থাকে। যাবি খুঁজতে?

ন্যাদার কান কুটকুট্‌ করতে লাগল। রোমাঞ্চ হলেই তার কান চুলকোয়।

—মন্দ কী? চল্‌ না। বেশ অ্যাডভেঞ্চার হবে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দুজনে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

অনেককালের পুরোনো বাড়ি। ঠাণ্ডা সব শ্যাওলা-পড়া ঘর। ইঁট-বেরুনো দেওয়ালগুলো আবছা অন্ধকারে যেন হা-হা করে হাসছে।

ন্যাদার ভারি ভয় করতে লাগল।

—চল্‌ ভাই, এখানে আর নয়। এ-সব পোড়ো বাড়িতে ভূত থাকে।

—ভূত! বিরিঞ্চি ভ্রূকুটি করে বললে, এ যুগের ছেলে হয়ে তুই ভূতে বিশ্বাস করিস?

ন্যাদা বললে, ইয়ে—ভূত ঠিক নয়, তবে সাপ-টাপ—

বিরিঞ্চি বললে, সাপ-টাপ দু-একটা না থাকলে আর অ্যাডভেঞ্চার কিসের রে? আরে, দেখিই না এ-ঘর ও-ঘর একটু খুঁজে। মনে কর ফস্‌ করে একটা সুড়ঙ্গ পেয়ে

গেলাম।

বলতে-বলতেই ন্যাদা হঠাৎ বিরিঞ্চির কাঁধে জোর থাবড়া দিলে একটা। বিরিঞ্চি আঁতকে উঠল।

—ওখানে ওগুলো কী রে?

—কোথায়?

—ওই ছাদের গায়ে! পাঁচ-সাতটা থলে ঝুলছে না?

—অ্যাঁ—তাই তো! থলেই তো! আবছা অন্ধকারেও পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে!

—বিরিঞ্চি কাঁপতে কাঁপতে বললে, ন্যাদা রে—পেয়ে গেলাম।

—কী পেয়ে গেলি?

—গুপ্তধন। ওগুলো মোহরের থলে—বুঝতে পারছিস না!

ন্যাদার তখন আনন্দে গলা ধরে এসেছে। কথা বলার আগে খানিকক্ষণ বু-বু করে নিলে।

—কিন্তু ভাই, গুপ্তধন তো মাটির তলায় থাকে শুনেছি। ছাদে ঝুলিয়ে রাখে বলে তো কোনো বইয়ে পড়িনি!

—যারা বই লেখে—তারা কি সব খবর জানে? চোখের সামনেই তো দেখছিস, কেউ কেউ গুপ্তধন থলেতে করে ছাদেও ঝুলিয়ে রাখে।

—এখন কী করা যায় বল তো? ন্যাদা কথা কইতে পারছিল না।

বিরিঞ্চি বললে, কী আর করা যায়? আয় এখুনি ওগুলো চট্‌পট্‌ পেড়ে ফেলি। গুপ্তধন দেখলে কি আর দেরি করতে আছে? হয়তো কাল আর-কারুর চোখে পড়ে যাবে—ব্যস, গেল!

ন্যাদা বললে, তা ঠিক। কিন্তু ঘরটায় ভাই ভারি বিচ্ছিরি গন্ধ। আর পায়ের নিচে ময়লা কি-সব চট্‌চট্‌ করছে।

বিরিঞ্চি বললে, রেখে দে তোর গন্ধ! গুপ্তধন যেখানে থাকে সেখানে ওরকম অনেক ময়লা আর গন্ধও থাকে। ওতে কি ঘাবড়ালে চলে? নে—এখন কাজে লেগে যা—

ন্যাদা বললে, আমি?

বিরিঞ্চি বললে, তুই বইকি! একখানা ঘুড়ির জন্যে তুই পাড়ার হেন ছাদ নেই যাতে উঠিসনি! আর গুপ্তধনের জন্যে ইঁটে পা দিয়ে এই ছাদে উঠতে পারবি নে? এই দরজার এখান দিয়ে উঠে যা—বেশ সোজা হবে।

বলতে বলতে বিরিঞ্চির মাথায় কালো কী খানিকটা পড়ল। ইস্‌—কী যাচ্ছেতাই গন্ধ!

বিরিঞ্চি রুমাল দিয়ে মাথা ঘষতে ঘষতে বললে, নাঃ—আর দাঁড়ানো যাচ্ছে না। এই ন্যাদা, উঠে পড়্‌ না। আরে আটটা থলেতে কম করেও হাজারখানেক মোহর তো নির্ঘাৎ! হীরে-টীরেও থাকতে পারে। আধাআধি ভাগ করে নেব। ওভারনাইট বড়লোক—বুঝলি না?

ন্যাদা বললে, নিয়ে যাবি কী করে? লোকে দেখবে যে?

বিরিঞ্চি বিরক্ত হয়ে বললে, কোঁচড়ে করে নিয়ে যাব। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব—ওল নিয়ে যাচ্ছি। পাড়াগাঁয়ে পথেঘাটে কত ওল থাকে—নিজের চোখেই তো দেখলি।

—তা দেখলাম বটে। ন্যাদা মাথা নেড়ে বললে, তবে উঠি।

—ওঠ্‌! আমি নিচ কোঁচা পেতে রাখছি। থলে পাড়বি—আর কোঁচার ভেতরে টুপ্‌টাপ্‌ করে ফেলে দিবি।

—তাহলে জয়গুরু—বলেই ন্যাদা দেওয়াল বাইতে শুরু করল। আর কী আশ্চর্য

www.boiRboi.blogspot.com

—উঠেও গেল ঠিক।

বিরিঞ্চি কোঁচা পেতে এদিকে রেডি হয়েই আছে। এখুনি বড়লোক হয়ে যাবে। কোঁচার ভেতর পড়বে মোহর-হীরে—উঃ!

—শিগগির দে, ফেলে দে ওপর থেকে! একবারে দুটো করে।—ওয়ান—টু—

থ্রী বলবার আগেই ন্যাদা দুটো থলে ধরে টান দিয়েছিল এক হাতেই। কিন্তু তক্ষুনি হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল—বাপরে! গেছি—

—কী হল?

আর্তনাদ করে ন্যাদা বললে, থলে আমায় কামড়াচ্ছে।

—অ্যাঁ!

—মোক্ষম কামড় মেরেছে। ন্যাদা সমানে হাউ-হাউ করতে লাগল : ইস্—থলের কী দাঁত রে। রক্ত বের করে দিলে! এমন দাঁতাল থলে তো কখনো দেখিনি।

—অ্যাঁ!

বলতেই আবার সেই কালো-কালো বিচ্ছিরি জিনিস বিরিঞ্চির একেবারে নাকে-মুখে পড়ল : কী গন্ধ রে—ওয়াক্—ওয়াক্!

বিরিঞ্চির গলায় পিসিমার সব মুড়িঘণ্ট আর লুচি-হালুয়া উল্টে এল।

আর ন্যাদা চেঁচিয়ে উঠল, থলেরা আমায় কামড়াচ্ছে! আমায় খেয়ে ফেললে! থলে যে কখনো কামড়ায় সে তো জানতাম না!

তাড়াতাড়ি করে দেওয়াল বেয়ে নামতে গিয়ে ন্যাদা একেবারে বিরিঞ্চির ঘাড়ে এসে পড়ল। তারপর দুজনে ময়লা দুর্গন্ধ মেঝেতে গড়াগড়ি।

গুপ্তধনের থলেরা তখন ডানা মেলে উড়তে শুরু করেছে। ওরা উঠে দাঁড়াতেই ওদের নাক-মুখ খিমচে দিয়ে কিচিরমিচির করতে করতে বাইরের বিকেলের ছায়ায় তারা মিলিয়ে গেল।

ওরা যখন পোড়ো বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল তখন আর কেউ কারো দিকে তাকাতে পারছে না। ময়লায় পা থেকে মাথা পর্যন্ত ভর্তি। আর গায়ের গন্ধ! যেন গন্ধমাদন পর্বত একজোড়া।

বিরিঞ্চি ব্যাজার মুখে বললে, বুঝেছি। ওগুলো মোহরের থলে নয়।

ন্যাদা বললে, না—থলে কখনো কামড়ায় না।

বিরিঞ্চি বললে, বোধহয় বাদুড়।

ন্যাদা মাথা নেড়ে বললে, আমারও তাই মনে হচ্ছে! বইয়ে পড়েছিলাম, অন্ধকার জায়গাতে বাদুড় ঝুলে থাকে।

গায়ের খোশবু ছড়িয়ে দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ হেঁটে চলল। গিয়েই সাবান মেখে চান করতে হবে। তাতেও গন্ধ ছাড়ল হয় গা থেকে!

বিরিঞ্চি খানিক পরে বললে, পাড়াগাঁ একদম বাজে জায়গা—না রে?

ন্যাদা বললে, ঠিক তাই। চল্ না কাল চলে যাই কলকাতায়। আমার হাতে কী জোর কামড়ে দিয়েছে রে! রক্ত পড়ছে—উফ্!

আমার নাকও আঁচড়ে দিয়েছে—ভীষণ জ্বালা করছে! বাবার ওষুধের বাক্সোটা এবারে সত্যিই কাজে লাগবে—

বিরিঞ্চির বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস পড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

দৈত্য-সঙ্গীত

গোরু, ছাগল, ভেড়া—সবাই কান নাড়াতে পারে। কান নাড়ানোর সুবিধে কত! কান নেড়ে নেড়ে খুশি হওয়া যায়, মাছি-মশা তাড়ানো যায়—কানের কাছে যদি বেয়াড়া সুরে কেউ গান গায়, তবে সেটাও তাড়ানো যায় খুব সম্ভব। কানের নিদারুণ কষ্ট-কষ্টানি নিয়ে বসে বসে প্যাঁচার মতো মুখ করে সেই কথাটাই ভাবছিলেন রসময়বাবু।

তিনি কান নাড়াতে পারেন না। পারেন না বলেই তখন থেকে একদল মশা তাঁর কানের কাছে সমানে ঘ্যান-ঘ্যান করছে। ঢুকে পড়ার তালও তাদের কারো কারো আছে বলে রসময়বাবুর সন্দেহ হয়। তা ছাড়া একটু আগেও তার ভাগনে পঞ্চুলাল কানের কাছে ঝাড়া দু-ঘণ্টা এমন পেশোয়ারী ঠুংরি শুনিয়েছে যে, এখনো তাঁর মাথার মধ্যে যেন করাত চলছে।

—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ! একেবারে মানুষ-মারা গান শিখেছে পণ্ডা! ছোঃ! আরে ধ্যেৎ—বলে ভীষণ বিরক্ত হয়ে রসময়বাবু একটা মশা মারতে গেলেন। আর এমন যাচ্ছেতাই ব্যাপার যে চড়টা চড়াং করে তার নিজের গালে গিয়েই পড়ল।

—ওফ্-ফ্! রসময়বাবু আর্তনাদ করলেন। নিজের হাতে নিজেকে ঠ্যাঙালে যে এমন খারাপ লাগে তা কে জানত। রসময়বাবু ডানহাতে আহত গালকে বাঁ হাত বুলিয়ে বুলিয়ে পরিচর্যা করতে লাগলেন, আর ভাবতে লাগলেন : আরে ছিঃ। কী ভয়ঙ্কর গানই তাঁকে শোনাল পণ্ডা।

পেশোয়ারী ঠুংরিই বটে। যেন দাড়িওলা এক পেল্লায় গান—তার হাতে ইয়া লাঠি, সেই লাঠি দিয়ে দমাদ্দম রসময়বাবুকে পিটিয়ে গেল। আগে যদি ক্ষুণাক্ষরেও জানতেন, তাহলে কি আমল দিতেন পণ্ডাকে? ভেবেছিলেন, পেশোয়ারী ঠুংরি পেশোয়ারী মেওয়ার মতোই বেশ সুস্বাদু হবে। কিন্তু সে যে পেশোয়ারী লাঠিও হতে পারে, সেটা বুঝলেন অনেক পরে।

তখন আর পণ্ডাকে কে ঠেকায়। সে তখন আকাশজোড়া হাঁ করে 'খাজ্জা-গজ্জা রাওলপিণ্ডি—এ পিণ্ডি—পি—পিন্—পিন্ডি—পিণ্ডিদান খাঁ—আঁ—আঁ—' এই সব গাইছে, তার সেই প্রচণ্ড রাগিণীর বন্যায় রসময়বাবু ভেসে গেলেন। তাঁর মাথা ঘুরতে লাগল, কান ভোঁ ভোঁ করতে লাগল। তিনি প্রায় অজ্ঞান হয়ে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে পড়ে রইলেন।

পণ্ডার গান শেষ হল প্রায় দু-ঘণ্টা পরে। যাওয়ার আগে পঞ্চুলাল বলে গেল : মামা, পরশু আবার আসব। আবার গান শোনাব তোমাকে।

রসময়বাবু সেই থেকে প্রায় পাথর হয়ে বসে আছেন। কান কটকট করছে, কানের কাছে মশারা গর্জন করে বেড়াচ্ছে। পণ্ডা আবার পরশু আসবে! তাকে ঠেকানো যায় কী করে?

ঠিক এই সময় ঘরে ঢুকলেন তাঁর বন্ধু জলধরবাবু।

—ওহে রসময়—কেমন আছো?

আনন্দে রসময় লাফিয়ে উঠলেন। জলধর তাঁর বহুকালের বন্ধু। এক স্কুলে এক ক্লাসে পড়েছেন, কান ধরে পাশাপাশি গাধার টুপি মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেছেন,

এক সঙ্গে ফেল করেছেন, এক সঙ্গে আলুকাবলি কিনে দুদিক থেকে পাতা চেটে খেয়েছেন। হঠাৎ সাত বছর পরে জলধরকে দেখে সাময়িকভাবে তিনি কানের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলেন।

—আরে জলধর, এসো—এসো—

বলবার দরকার ছিল না, তার আগেই জলধর এসে পড়েছিলেন। বন্ধুদের মধ্যে আলাপ শুরু হল।

—তোমার গোঁফগুলো তো অনেক পেকে গেছে হে!

—তোমার টাকও তো মাথা ছেয়ে ফেলেছে!

বেশ আছো—অ্যাঁ!

—তুমিই বা মন্দ আছো কী—বলে জলধরের চোখ পড়ল রসময়ের দিকে : ও কি, অত কান চুলকোচ্ছ কেন? পোকা ঢুকেছে নাকি?

—পোকা নয়—গান।

—গান? জলধর উঁচু হয়ে বসলেন : গান কী হে? গান মানে বন্দুক নাকি? জলধরের মুখে অবিশ্বাসের ছায়া পড়ল : তোমার কানের ফুটো অবিশ্যি খুবই বড়—লাঠি-ফাটি হয়তো ঢুকতেও পারে, কিন্তু বন্দুক! উহু, বন্দুক অসম্ভব। এটা বাড়াবাড়ি।

—বন্দুক কে বলেছে?—রসময় ব্যাজার হয়ে বললেন : বন্দুক ঢুকবে কেন? ঢুকতে দেবই বা কেন? সঙ্গীত—সঙ্গীত ঢুকে বসেছে।

—কে ঢোকালে? জলধরকে কৌতূহলী মনে হল।

—কে আর ঢোকাবে? আমার ভাগনে পঞ্চা। কী যে পেশোয়ারী ঠুংরি শুনিয়ে গেল—

—পেশোয়ারী ঠুংরি! জলধরের গোঁফ নেচে উঠল : ফুঃ!—ও আবার গান নাকি? আসল গান হচ্ছে আফগানী ধামার! হ্যাঁ—গানের মতো গান! শুনলে আর জীবনে ভুলতে পারবে না। তোমাকে চুপি চুপি বলি, এই সাত বছর আমি আফগানী ধামারের চর্চা করেছি। শুনবে?

রসময় হাঁ-হাঁ করে ওঠবার আগেই জলধর ঘরজোড়া হাঁ করে আফগানী ধামার ধরলেন।

উঃ—সে কী গান! আর কী গলা! রসময়ের মনে হল তাঁর দম ফেটে যাবে। বারোটা গাধা পামা গাধা গাইলেও শুনতে এমন জবরদস্ত হয় না। পঞ্চলাল তো এর কাছে নস্যি!

রসময় তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন।

বিরক্ত হয়ে গান থামিয়ে জলধর বললেন, আঃ—লাফাচ্ছ কেন? এইজন্যেই কাউকে আমি গান শোনাতে চাইনে। কিছু বোঝে না—খালি লাফালাফি আর চ্যাঁচামেচি জুড়ে দেয়।

—সেজন্যে নয়। আমি ভাবছিলাম, পঞ্চা তোমার গান শুনলে কী খুশিই যে হত! সে দুঃখু করছিল, এত গান শুনলাম, কিন্তু ভালো আফগানী ধামার আর শুনতে পাই না আজকাল। সে-রকম গুণীই আর এদেশে নেই।

—কে বলে নেই? এই আমিই তো রয়েছি।—জলধরের গোঁফ ফুলে উঠল : কোথায় থাকে তোমার পঞ্চা? কী তার ঠিকানা?

ওষুধ তবে ধরেছে! পরম পুলকে রসময় বললেন, যাবে তার কাছে? তাহলে এখুনি যাও ভাই। আহা—তার বড় কষ্ট! আফগানী ধামার শুনতে না পেয়ে সে মরমে

মরে রয়েছে। তার ঠিকানা হল আটাশ বাই আটাশ ধোবাতলা লেন—

—আমি তবে এখুনি চললাম—বলেই তীরবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন জলধর।

জলধর বেরিয়ে যেতেই পরম আনন্দে আধঘণ্টা ধরে হাসলেন রসময়। এই ঠিক হয়েছে! একেই বলে কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা! যেমন পঞ্চলাল, তেমনি জলধর! কেউ কাউকে ছেড়ে কথা কইবে না—দুজনেই দুজনকে গান শোনাতে চাইবে। তারপর?

তারপর জলধরের গানে পঞ্চলালের ভূত পালাবে—পঞ্চলালের গান শুনে জলধরের গান বন্ধ হয়ে যাবে। এই হচ্ছে মোক্ষম দাওয়াই!

কথাটা ভেবে এত ভালো লাগল যে, কানের ব্যথা ভুলে গিয়ে রসময়ের নাচতে ইচ্ছে করল। চাকর দুটো রেকাবি করে খাবার আনল—একটা জলধরের জন্যে। মনের আনন্দে রসময় দুটো রেকাবিই একা সাবাড় করলেন—এমনকি রসগোল্লার একটুখানি রস অবধি চেটে নিলেন জিভ দিয়ে।

আসল ঘটনা ঘটল দুদিন পরে।

রসময় প্রায় ভুলেই গিয়েছিলেন গানের কথা। হঠাৎ ঘরের ভেতরে এসে ঢুকল পঞ্চলাল, আর তার সঙ্গে জলধর।

রসময় কিছু বলবার আগেই পঞ্চলাল বললে, মামা, জলধরমামাকে সঙ্গে করে আনলাম।

জলধর হেসে বললেন, হ্যাঁ, একসঙ্গেই এলাম। তোমার ভাগনেটি ভারি খাসা ছেলে হে রসময়! খুব জমিয়ে নিলে আমার সঙ্গে। আমরা ঠিক করেছি—পেশোয়ারী ঠুংরি আর আফগানী ধামার মিলিয়ে দুজনে একসঙ্গে 'ডুয়েট'—মানে দ্বৈত-সঙ্গীত গাইব এর পর থেকে। তুমিই আমাদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটিয়েছিলে—তাই প্রথমে তোমাকেই শোনাতে চাই।

—অ্যাঁ!

রসময়ের চোখ দুটো কপালে ওঠবার আগেই জলধর ঘরজোড়া হাঁ করলেন। পঞ্চা কানে হাত দিয়ে চোখ বুজে চিৎকার জুড়ল : ধামা ধামা ধামার পিণ্ডি এ পিণ্ডি—পিণ্ডি—পিণ্ডিদাদন খাঁ—আঁ—আঁ—

দ্বৈত-সঙ্গীত নয়—দৈত্য-সঙ্গীত! একা পঞ্চায় রক্ষা নেই—জলধর দোসর! রসময় বারকয়েক কেবল বললে : ওঁ—ওঁ—ওঁ—তারপর সোজা মেজেতে পড়ে গিয়ে ফিট হয়ে গেলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

সাংঘাতিক

সাত দিন পরেই পরীক্ষা। আর কী? সেই কালান্তক স্কুল-ফাইন্যাল!

পর পর দু'বার সাদা কালিতে আমার নাম ছাপা হয়েছে, তিন বারের বারও যদি তাই ঘটে—তাহলে বড়দা শাসিয়েছে আমাকে সোদপুরে রেখে আসবে।

—সোদপুরে তো গান্ধীজী এসে থাকতেন। আমি গম্ভীর হয়ে বলেছিলাম।

—তুমিও থাকবে। বড়দা আরো গম্ভীর হয়ে বললে, তবে গান্ধীজী যেখানে থাকতেন সেখানে নয়। তিনি যাদের দুধ খেতেন—তাদের আস্তানায়।

—মানে?

—মানে পিঁজরাপোলে।

আমি ব্যাজার হয়ে বললাম, পিঁজরাপোলে কেন থাকতে যাব? ওখানে কি মানুষ থাকে?

—মানুষ থাকে না, গোরু-ছাগল তো থাকে। সেইজন্যেই তো তুই থাকবি। কচি-কচি ঘাস খাবি আর ভ্যা-ভ্যা করে ডাকবি। শুনে মনটা এত খারাপ হল যে কী বলব। একদিন সন্ধেবেলা গড়ের মাঠে গিয়ে চুপি চুপি একমুঠো কাঁচা ঘাস খেয়ে দেখলাম—যাচ্ছেতাই লাগল! ছাদে গিয়ে একা-একা ব্যা-ব্যা করেও ডাকলাম, কিন্তু ছাগলের মতো সেই মিঠে প্রাণকাড়া আওয়াজটা কিছুতেই বেরুল না!

তাই ভারি দুশ্চিন্তায় পড়লাম। গিয়ে বললাম লীডার টেনিদাকে।

টেনিদার অবস্থা আমার মতোই। এবার নিয়ে ওর চারবার হবে। হাবুল সেনের দ্বিতীয় বার। শুধু হতভাগা ক্যাবলাটাই লাফে লাফে ফার্স্ট হয়ে এগিয়ে আসছে—তিন ক্লাশ নিচে ছিল, ঠিক ধরে ফেলেছে আমাকে। এর পরে যদি টপকে চলে যায়—তাহলে সত্যিই পিঁজরাপোলে যেতে হবে!

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা আতা খাচ্ছিল। গভীরভাবে চিন্তা করতে গিয়ে গোটাকয়েক বিচি খেয়ে ফেললে। তারপর অন্যমনস্কভাবে খোসাটা যখন অর্ধেক খেয়ে ফেলেছে, তখন সেটাকে থু—থু করে ফেলে দিয়ে বললে, ইউরেকা। হয়েছে!

—কী হয়েছে?

—প্ল্যানচেট।

—প্ল্যানচেট কাকে বলে?

টেনিদা বললে, তুই একটা গাধা। প্ল্যানচেট করে ভূত নামায়—জানিসনে?

এর মধ্যেই কোত্থেকে পাঁটার ঘুগনি চাটতে চাটতে ক্যাবলা এসে পড়েছে। বললে, উহু, ভুল হল। ওর উচ্চারণ হবে প্লাঁসেং।

—থাম্-থাম্—বেশি ওস্তাদি করিসনি! ভূতের কাছে আবার শুদ্ধ উচ্চারণ! তারা তো চন্দ্রবিন্দু ছাড়া কথাই কইতে পারে না—বলেই ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে ঘুগনির পাতাটা কেড়ে নিলে টেনিদা।

ক্যাবলা হায়-হায় করে উঠল। টেনিদা একটা বাঘাটে হুঙ্কার করে বললে, থাম্, চিল্লাসনি! এ হল তোর ধৃষ্টতার শাস্তি। বলতে বলতে জিভের এক টানে ঘুগনির পাতা একদম সাফ।

ভেবেছিলাম আমাকেও একটু দেবে—কিন্তু পাতার দিকে তাকিয়ে 'বুকভরা আশা' একেবারে 'ধুক করে নিবে গেল।' বললাম, মরুকগে প্ল্যানচেট আর প্লাঁসেং—কিন্তু ওসব ভূতুড়ে কাণ্ড আবার কেন? ভূত-টুত আমার একেবারেই পছন্দ হয় না।

টেনিদা হেঁ-হেঁ করে বললে, আছে রে গোমুখ্যু—আছে। সবাই কি আর তাল-গাছের মতো হাত বাড়িয়ে ঘাড় মটকে দেয়? ওদের মধ্যেও দু-চারটে ভদ্দর লোক আছে। তারা পরীক্ষার কোশ্চেন-টোশ্চেন বলে দেয়।

—অ্যাঁ?

—তবে আর বলছি কী! টেনিদা এবার শালপাতার উল্টো দিকটা একবার চেটে দেখল। কিছু পেলে না—তালগোল পাকিয়ে ক্যাবলার মুখের ওপর পাতাটা ছুড়ে দিলে। বললে, আমার বিরিঞ্চি মামা কিছুতেই আর বি, এ পাশ করতে পারে না। গুণে গুণে আঠারো বার গাড্ডা খেলো। শেষকালে যখন আমার মামাতো ভাই গুবরে বি, এ ক্লাশে উঠল, তখন বিরিঞ্চি মামার আর সইল না। প্ল্যানচেটে বসল। আর বললে পেত্যয় যাবি না প্যালা—টপ টপ করে কোশ্চেন-পেপার এসে পড়তে লাগল টেবিলের ওপর।

—পরীক্ষার পরে না আগে? রোমাঞ্চিত হয়ে আমি জানতে চাইলাম।

—দূর উল্লুক! পরে হবে কেন রে, একমাস আগে!

হঠাৎ ক্যাবলা একটা বেয়াড়া প্রশ্ন করে বসল।

—আচ্ছা টেনিদা—সবশুদ্ধ তোমার ক'টা মামা?

—অত খবরে তোর দরকার কী রে গর্দভ? পুলিশ কমিশনার থেকে পকেটমার পর্যন্ত সারা বাংলা দেশে আমার যত মামা, তাদের লিস্টি করতে গেলে একটা গুপ্ত-প্রেসের পঞ্জিকা হয়ে যায়—তা জানিস?

—ছাড়ান দে—ছাড়ান দে! বললে হাবুল সেন।

আমি বললাম, আমাদের অঙ্কের কোশ্চেন যে করেছে সে কি তোমার মামা হয় নাকি?

—কে জানে, হতেও পারে! টেনিদা তাচ্ছিল্য করে জবাব দিলে।

—তাহলে তাকেই প্ল্যানচেটে ডাকো না!

—চুপ কর বেল্লিক! জ্যান্ত মানুষ কি কখনো প্ল্যানচেটে আসে? ভূতকে ডাকতে হয়। ভূতের অসীম ক্ষমতা—যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। তেমন-তেমন ভূত যদি আসে—ব্যাস—মার দিয়া কেল্লা!

—বেশ তো—আনো না তবে ভূতকে? আমি অনুনয় করলাম।

—বললেই হল? টেনিদা প্রায় ভূতের মতো দাঁত খিঁচোল : ভূত কি চানাচুরওয়ালা যে ডাকলেই আসবে? তার জন্যে হ্যাপা আছে না? অন্ধকার ঘর চাই—টেবিল চাই—চারজন লোক চাই—

ক্যাবলার চোখ দুটো মিটমিট করছিল। বললে, ঠিক আছে। আমাদের গ্যারাজের পাশে একটা অন্ধকার ঘর আছে—একটা পা-ভাঙা টেবিল আমি দেব, আর চার মূর্তি আমরা তো আছিই।

টেনিদা বললে, বাঃ, গ্র্যান্ড! শুনে এত ভালো লাগছে যে তোর পিঠে আমার তিনটে চাঁটি মারতে ইচ্ছে করছে!

ক্যাবলা একলাফে রোয়াক থেকে নেমে পড়ল। বললে, তাহলে আজ রাত্রেই?

টেনিদা বললে, হ্যাঁ—আজ রাত্রেই।

আমার কেমন যেন সুবিধে মনে হচ্ছিল না। ভূত-টুত কেমন যেন গোলমেলে

www.boiRboi.blogspot.com

ব্যাপার! কিন্তু সাতদিন পরেই যে স্কুল ফাইন্যাল! আর তার দেড়মাস বাদেই পিঁজরাপোল!

অগত্যা নাক-টাক চুলকে আমায় রাজী হয়ে যেতে হল।

বাড়ির পেছনে গ্যারাজ—এমনি ঘুরঘুটি অন্ধকার সেখানে গ্যারাজের পাশের ছোট টিনের ঘরটা যেন ভুষো কালি মাখানো। গিয়ে দেখি ক্যাবলা সব বন্দোবস্ত করে রেখেছে। একটা পায়া-ভাঙা টেবিল। তার চারদিকে চারটে চেয়ার। একটু দূরে লম্বা দড়ির সঙ্গে ছোট একটা বস্তা ঝুলছে। টেবিলের ওপর ক্যাবলা একটা মোম-বাতি জেবলে রেখেছিল—তার আলোতেই সব দেখতে পেলাম।

বস্তাটা দেখিয়ে হাবুল বললে, ওইটা কী ঝুল্যা আছে রে! খাওন-দাওনের কিছু আছে নাকি?

টেনিদা বললে, পেট-সর্বস্ব সব—খালি খাওয়াই চিনেছে! ওটা বক্‌সিংয়ের বালির বস্তা।

—ভূত আইস্যা ওইটা লইয়া বক্‌সিং কোরবো নাকি? হাবুলের জিজ্ঞাসা।

ক্যাবলা হেসে বললে, ওটা ছোড়দার।

টেনিদা বললে, থাম—এখন বেশি বাজে বকিসনি। এবার কাজ শুরু করা যাক। হ্যাঁ রে ক্যাবলা—এদিকে কেউ কখন আসবে না তো?

—না, সে ভয় নেই।

—তবে দরজা বন্ধ করে দে।

ক্যাবলা দরজা বন্ধ করে দিলে। টেনিদা বললে চারজনে চারটে চেয়ারে বসব আমরা। আলো নিবিয়ে দেব। তারপরে ধ্যান করতে থাকব।

—ধ্যান? কিসের ধ্যান?—আমি জানতে চাইলাম।

—ভূতের। মানে অঙ্কের কোশ্চেন বলে দিতে পারে—এমন ভূতের।

হাবুল বললে, সেইডা মন্দ কথা না। হারু পণ্ডিতরে ডাকন যাউক!

হারু পণ্ডিত! শুনে আমার বুকের ভেতরে একেবারে ছ্যাঁৎ করে উঠল। তিন বছর আগে মারা গেছেন হারু পণ্ডিত। দুর্দান্ত অঙ্ক জানতেন। তার চাইতেও জানতেন দুর্দান্তভাবে পিটতে। একটা চৌবাচ্চার নল দিয়ে জল-টল ঢোকার কী সব অঙ্ক দিতেন, আমরা হাঁ করে থাকতাম আর পটাং পটাং গাঁট্টা খেতাম। সেই হারু পণ্ডিতকে ডাকা!

আমি বললাম, বড্ড মারত যে!

—এখন আর মারবে না। ভূত হয়ে মোলায়েম হয়ে গেছে। তা ছাড়া কেউ তো ডাকে না—আমরা ডাকলে কত খুশি হবে দেখিস। শুধু অঙ্ক কেন—চাই কি আদর করে সব কোশ্চেনই বলে দেবে! টেনিদা আমাকে উৎসাহিত করলে।

ক্যাবলা বললে, তবে ধ্যানে বসা যাক।

আমি বললাম, হ্যাঁ ভাই, একটু তাড়াতাড়ি! বেশি দেরি হয়ে গেলে বড়দা কান পেঁচিয়ে দেবে। আমি বলে এসেছি—ক্যাবলার কাছে অঙ্ক কষতে যাচ্ছি।

টেনিদা বললে, আমি আলো নিবিয়ে দিচ্ছি। তার আগে শেষ কথাগুলো বলে নিই। সবাই হারু পণ্ডিতকে ধ্যান করবি। এক মনে এক প্রাণে। সেই দাড়ি—সেই ডাঁটভাঙা চশমা, সেই টাক—সেই নস্যি নেওয়া—

ক্যাবলা বললে, সেই গাঁট্টা—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, চুপ, বাজে কথা এখন বন্ধ। শুধু ধ্যান। এক মনে এক প্রাণে। শুধু প্রার্থনা : "স্যার—দয়া করে একবার আসুন—আপনার অধম ছাত্রদের

www.boiRboi.blogspot.com

পরীক্ষার কোশ্চেনগুলো বলে দিয়ে যান।" আর কিছু না—আর কোনো কথা নয়। আচ্ছা আমি আলো নেভাচ্ছি। ওয়ান-টু-থ্রী—

টুক্ করে আলো নিভে গেল।

বাপ্‌স্ কী অন্ধকার! যেন দম আটকে যায়। ভয়ে আমার গা শির্ শির্ করতে লাগল। ধ্যান করব কী ছাই, এমনিতেই মনে হচ্ছিল, চারদিকে যেন সার বেঁধে ভূত দাঁড়িয়ে আছে।

তবু ধ্যানের চেষ্টা করা যাক। কিন্তু কী যাচ্ছেতাই মশা এ ঘরে। পা দুটো একেবারে ফুটো করে দিচ্ছে। অনেকক্ষণ দাঁত-টাঁত খিঁচিয়ে থেকে আর পারা গেল না। চটাস্ করে একটা চাঁটি মারলাম।

কিন্তু একি! পায়ে চাঁটি মারলাম—কিন্তু লাগল না তো? আমার পা কি একেবারে অসাড় হয়ে গেছে? আর আমার পাশ থেকে হাবুল তখুনি হাঁইমাই করে চেঁচিয়ে উঠল : অ টেনিদা, ভূতে আমার পায়ে ঠাঁই কইর‍্যা একটা চোপাড় মারছে!

টেনিদা বললে, শাট্ আপ! ধ্যান করে যা।

—কিন্তু আমারে যে চোপাড় মারল!

—ধ্যান না করলে আরো মারবে। চোখ বুজে বসে থাক।

আমি একদম চুপ। এঃ হে-হে—ভারি ভুল হয়ে গেছে। অন্ধকারে নিজের ঠ্যাং ভেবে হাবুলের পায়েই চড় মেরে দিয়েছি।

আরো কিছুক্ষণ কাটল। ধ্যান করবার চেষ্টা করছি—কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। হারু পণ্ডিতের টাক আর দাড়িটা বেশ ভাবতে পারছি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই গাঁট্টাটাও বিচ্ছিরিভাবে মনে পড়ে যাচ্ছে। তক্ষুনি ধ্যান বন্ধ করে দিচ্ছি। ওদিকে আবার দারুণ খিদে পাচ্ছে। আসবার সময় দেখেছি—রান্নাঘরে মাংস চেপেছে। এতক্ষণে হয়েও গেছে বোধহয়। বাড়িতে থাকলে ঠাকুরের কাছে গিয়ে এক-আধটু চাখতে-টাখতেও পারতাম। যতই ভাবি, খিদেটা ততই যেন নাড়ির ভেতরে পাক খেতে থাকে।

হঠাৎ অন্ধকার ভেদ করে রব উঠল : ব্যা-ব্যা-ব্যা—অ্যা-অ্যা—

কী সর্বনাশ! ধ্যান করতে করতে শেষকালে পাঁটার আত্মা ডেকে আনলাম নাকি! এতক্ষণ যে মাংসের কথাই ভাবছিলাম!

আমার পাশ থেকে হাবুল কাঁপা গলায় বললে, অ টেনিদা—পাঁঠা ভূত!

অন্ধকারে টেনিদা গর্জন করলে : যেমন তোরা পাঁটা—পাঁটা ভূত ছাড়া আর কী আসবে তোদের কাছে।

ক্যাবলা খিক-খিক করে হেসে উঠল। সঙ্গে সঙ্গেই আবার শোনা গেল : ভ্যা—অ্যা—অ্যা—অ্যা—

টেনিদা বললে, অমন কত আসবে। ধ্যানে বসলে সবাই আসতে চায় কিনা। এখন কেবল একমনে জপ করে যা—পাঁটা ভূত, তুমি চলে যাও, স্বর্গে নিয়ে ঘাস খাও। আমরা শুধু হারু পণ্ডিতকে চাই। সেই টাক, সেই দাড়ি—সেই নস্যির ডিবে—আমাদের সেই স্যারকেই চাই। আর কাউকে না—কাউকেই না—

পাঁটা ভূতকে যে আমিই ডেকে ফেলেছি সেটা চেপে গেলাম। কিন্তু আমার পায়ে ওটা কী সুড়সুড়ি দিয়ে গেল? প্রায় চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি—হঠাৎ টের পেলাম—আরসোলা।

খিদেটা ভুলে গিয়ে প্রাণপণে স্যারকে ডাকতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ ধ্যানের জো আছে? ঘটাং করে কে যেন আমার পায়ে ল্যাং মারল।

—টেনিদা। ভূতে ল্যাং মারছে আমাকে—আমি আর্তনাদ করলাম।

হাবুল বলে উঠল : আঃ—খামাখা গাধার মতন চ্যাঁচাস্ ক্যান? আমার পা-টা হঠাৎ লাইগ্যা গেছে।

টেনিদা দাঁত কিড়মিড় করে উঠল : উঁঃ—এই গাড়োলগুলোকে নিয়ে কি ধ্যান হয়? তখন থেকে সমানে ডিস্টার্ব করছে। এবার যে একটা কথা বলবে, তার কান ধরে সোজা বাইরে ফেলে দেব।

আবার ধ্যান শুরু হল।

প্রায় হারু পণ্ডিতকে ধ্যানের মধ্যে এনে ফেলেছি। এলো, এলো—এসেই পড়েছে বলতে গেলে। টাকটা প্রায় আমার চোখের সামনে—মনে হচ্ছে যেন দাড়ির সুড়সুড়ি আমার মুখে এসে লাগছে। এক মনে বলছি : দোহাই স্যার, স্কুল ফাইন্যাল স্যার—অঙ্কের কোশ্চেন স্যার।—আর ঠিক তক্ষুনি—

কেমন একটা বিট্‌কেল শব্দ হল মাথার ওপর।

চমকে তাকাতে দেখি টিনের চালের গায়ে দুটো জ্বলজ্বলে চোখ। ঠিক যেন মোটা মোটা চশমার আড়াল থেকে হারু পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে রয়েছেন। আমার পালাজ্বরের পিলেটা সঙ্গে সঙ্গে তড়াং করে লাফিয়ে উঠল।

—ওকি—ওকি টেনিদা।—আমি আবার আর্তনাদ করে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে সেই জ্বলন্ত চোখ দুটো যেন শূন্য থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ল—আর আমার মাথায় এসে লাগল এক রামচাঁটি। ভূত হয়ে সে চাঁটি মোলায়েম হওয়া তো দূরে থাক—আরো মোক্ষম হয়ে উঠেছে।

—বাপ্‌রে গেছি—বলে আমি প্রচণ্ড এক লাফ মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে টেবিল উলটে পড়ল।

—খাইছে—খাইছে—ভূতে খাইছে রে—হাবুল কেঁদে উঠল।

—টেবিল চাপা দিয়ে আমায় মেরে ফেলে দিলে রে—টেনিদার চিৎকার শোনা গেল।

অন্ধকারে আমি দরজার দিকে ছুটে পালাতে চাইলাম। সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন আমার ঘাড়ে লাফ দিয়ে পড়ল। আমার গলা দিয়ে—'গ্যাঁ—ঘোঁক্'—বলে একটা আওয়াজ বেরুলো—আর তার পরেই—সর্ষে ফুল। ঝিঁঝির ডাক। পটলডাঙার প্যালা-রাম একেবারে ঠায় অজ্ঞান।

চোখ মেলে দেখি, মেঝেয় পড়ে আছি। ঘরে মোমবাতি জ্বলছে, আর ক্যাবলা আমার মাথায় জল দিচ্ছে। চেয়ার টেবিলগুলো ছত্রাকার হয়ে আছে ঘরময়।

আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত।

ক্যাবলা বললে, না—ভূত নয়। টেনিদা আর হাবুল তক্ষুনি পালিয়েছে বটে, কিন্তু তোকে চুপি চুপি সত্যি কথা বলি। ঘরটার পেছনেই একটা ছাগল বাঁধা আছে। দাদুর হাঁপানির রোগ আছে কিনা, ছাগলের দুধ খায়। সেই ছাগলটাই ডাকছিল।

—আর সেই জ্বলজ্বলে চোখ? সেই চাঁটি?

—হুলোর।

—হুলো কে?

—আমাদের বেড়াল। এ ঘরে প্রায়ই ইঁদুর ধরতে আসে।

—কিন্তু হুলো কি অমন চাঁটি মারতে পারে?

—চাঁটি মারবে কেন রে বোকা? তুই চ্যাঁচালি—ভয় পেয়ে হুলোও চাল থেকে লাফ দিলে। পড়বি তো পর ছোড়দার স্যাণ্ড-ব্যাগের ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ দোল খেয়ে এসে তোর মাথায় লাগল—তুই ভাবলি হারু পণ্ডিতের গাঁট্টা।—ক্যাবলা হেসে উঠল।

—আর আমার ঘাড়ে অমন করে লাফিয়ে পড়ল কে?

—হাবলা। ভয় পেয়ে বেরুতে গিয়ে তোকে বিধ্বস্ত করে চলে গেছে।—ক্যাবলা হেসে উঠল আবার।

আমি আবার চোখ বুজলাম। ক্যাবলার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু আমার মন বলছে—ওই হুলো আর বালির বস্তার মধ্য দিয়ে সত্যি সত্যিই হারু পণ্ডিতের মোক্ষম চাঁটি আমার মাথায় এসে লেগেছে।

কারণ, পৃথিবীতে অমন দুর্মদ চাঁটি আর কেউ হাঁকড়াতে পারে না। আর কিছুতেই না।

পেশোয়ার কী আমীর

চাটুজ্জেদের রকে বসে আমি একটা পাকা আমকে কায়দা করতে চেষ্টা করছিলুম। কিন্তু বেশিক্ষণ খেতে হল না। গোটা-চারেক কামড় দিয়েই ফেলে দিতে হল—অ্যায়সা টক। দাঁতগুলো শির্ শির্ করতে লাগল—মেজাজটা বেজায় খিঁচড়ে গৈল আমার। বাড়িতে মাংস এসেছে দেখেছি—রাত্তিরে জুৎ করে হাড় চিবুতে পারব কি না কে জানে!

এই সময় কোত্থেকে পটলডাঙার টেনিদা এসে হাজির। গাঁক গাঁক করে বললে, এই প্যালা, আমটা ফেলে দিলি যে?

—যাচ্ছেতাই টক। খাওয়া যায় নাকি?

—টক? টেনিদা ধুপ করে আমার পাশে বসে পড়ে বললে, টক বলে বুঝি গেরাহ্যি হল না? সংসারে টক যদি না থাকত, তাহলে আচার পেতিস কোথায়? টক যদি না থাকত তাহলে কী করে দই জমত? টক যদি না থাকত তাহলে চালকুমড়োর সঙ্গে কামরাঙার তফাত কী থাকত? টক যদি না থাকত তাহলে পিঁপড়েরা কী করে টক-টক হত? টক না থাকলে—

টক না থাকলে পৃথিবীতে আরো অনেক অঘটন ঘটত—কিন্তু সে-সবের লম্বা লিস্টি শোনবার মতো উৎসাহ আমার ছিল না। আমি বাধা দিয়ে বললুম, তাই বলে অত টক আম কোনো ভদ্দরলোকে খেতে পারে নাকি?

আমের গন্ধে কোত্থেকে একটা মস্ত নীল রঙের কাঁঠালে-মাছি এসেছে, সেটা শেষতক টেনিদার খাঁড়ার মতো মস্ত নাকটার ওপর বসবার চেষ্টা করছিল। আমার কথা শুনে টেনিদার সেই পেল্লায় নাকের ভেতর থেকে রণ-ডম্বরুর মতো একটা বিদ-

www.boiRboi.blogspot.com

ঘুটে আওয়াজ বেরুলো। মাছিটা শূন্যে বার-দুই ঘুরপাক খেয়ে বোঁ করে মাটিতে পড়ে গেল—ভির্মি খেল না হার্টফেলই করল কে জানে?

টেনিদা বললে, ইস্-স্-স্। খুব যে ভদ্দর লোক হয়ে গেছিস দেখছি। তবু যদি পালাজ্বরে ভুগে দু-বেলা পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল না খেতিস! তুই কি আমার গাবলু মামার চাইতেও ভদ্দরলোক? জানিস, গাবলু মামা এখন চারশো টাকা মাইনে পায়?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, জেনে আমার লাভ কী? তোমার গাবলু মামা তো আমায় টাকা ধার দিতে যাচ্ছে না?

—তোর মতো অখাদ্যিকে টাকা ধার দিতে বয়ে গেছে গাবলু মামার? টেনিদার নাক দিয়ে আবার একটা আওয়াজ বেরুলো: জানিস—তিনবার-আই-এ-ফেল-করা গাবলু মামা অতো বড় চাকরিটা পেলো কী করে? স্রেফ টক আমের জন্যে।

—টক আমের জন্যে? আমি হাঁ করে রইলুম: টক আম খেলে বুঝি ওইরকম চাকরি হয়?

—খেলে নয় রে গাধা—খাওয়ালে। তবে, তাক বুঝে খাওয়াতে জানা চাই। বলছি তোকে ব্যাপারটা—অনেক জ্ঞান লাভ করতে পারবি। তার আগে গলির মোড় থেকে দু-আনার ডালমুট নিয়ে আয়।

জ্ঞানলাভ করতে চাই আর না চাই, টেনিদা যখন একবার ডালমুট খেতে চেয়েছে—তখন খাবেই। পকেটে পয়সা থাকলে ও ঠিক টের পায়। কী করি, আনতেই হল ডালমুট।

—তুই পেটরোগা, এসব তোর খেতে নেই—বলে হ্যাঁচকা টানে টেনিদা ঠোঙাটা কেড়ে নিলে। আমি ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম। খেতে যখন দেবে না, তখন বেশ করে নজর দিয়ে দিই। পরে টের পাবে।

টেনিদা ভ্রূক্ষেপ করলে না। বললে, তবে শোন। আমার মামার বাড়ি কোথায় জানিস তো? খলাপুরে। সেই যে খলাপুর—যেখানে রেলের অনেক ইঞ্জিন-টিঞ্জিন আছে?

সেবার গরমের ছুটিতে মামাবাড়ি বেড়াতে গেছি। ওই যে একটা ছড়া আছে না—'মামাবাড়ি ভারি মজা—কিল চড় নাই?' কথাটা একদম বোগাস—বুঝলি? কক্ষনো বিশ্বাস করিসনি।

অবিশ্যি মামাবাড়িতে ভালো লোক একেবারে নেই তা নয়। দিদিমা, দাদু এরা বেশ খাসা লোক। বড় মামীরাও মন্দ হয় না। কিন্তু ওই গাবলু মামা-টামা—বুঝলি, ওরা ভীষণ ডেঞ্জারাস হয়।

বললে বিশ্বাস করবি নে, সাতদিনের মধ্যে গাবলু মামা দু-বার আমার কান টেনে দিলে। এমন কিছু করিনি, কেবল একদিন ওর ঘড়িটায় একটু চাবি দিয়েছিলুম—তাতে নাকি স্প্রিংটা কেটে গিয়েছিল। আর একদিন ওর শাদা নাগরাটা কালো কালি দিয়ে একটু পালিশ করেছিলুম, আর নেটের মশারিতে কাঁচি দিয়ে একটা গ্র্যান্ড জানলা বানিয়ে দিয়েছিলুম। এর জন্যে দু-দিন আমার কান ধরে পাক দিয়ে দিলে। কী ভীষণ ছোটলোক বল্ দিকি।

তা পরে মরুক গাবলু মামা—খলাপুরে দিনগুলো আমার ভালোই কাটছিল। দিব্যি খাওয়া-দাওয়া—মজাসে ইস্টিশানে রেল দেখে বেড়ানো, হাঁটতে হাঁটতে একেবারে কাঁসাইয়ের পুল পর্যন্ত চলে যাওয়া, সেখানে বেশ চড়ুইভাতি—আরো কত কী! বেশ ছিলুম।

বেশ মনের মতো বন্ধুও জুটে গিয়েছিল একটি। তার ডাকনাম ঘটা—ভালো নাম ঘটকর্পর। ওর ছোট ভাইয়ের নাম ক্ষপণক, ওর দাদার নাম বরাহ। ওদের বাবা গোবর্ধনবাবুর ইচ্ছে ছিল,—ওদের ন-ভাইকে নিয়ে নবরত্ন সভা বসাবেন বাড়িতে।

কিন্তু ক্ষপণকের পর আর ভাই জন্মালো না—খালি বোন আর বোন। রেগে গিয়ে গোবর্ধনবাবু তাদের নাম দিতে লাগলেন, জ্বালামুখী, মুণ্ডমালিনী এইসব। এমনকি খনা নাম পর্যন্ত রাখলেন না কারুর।

তা এই তিন রত্নেই যথেষ্ট—একেবারে তিন তিরিখ্‌খে নয়! এক-একটা বিচ্ছু অবতার! আর ঘটা তো একেবারে সাক্ষাৎ শয়তানির ঘট!

আগে কি আর বুঝতে পেরেছিলুম? তাহলে ঘটার ত্রিসীমানায় কে যায়! ওর ঠাকুরমার ভাঁড়ার থেকে আচার-টাচার চুরি করে এনে আমায় খাওয়াতো—আমি ভাবতুম অমন ভালো ছেলে বুঝি দুনিয়ায় আর হয় না!

কিন্তু শেষকালে এই ঘটাই আমাকে এমন একখানা লেংগি মেরে দিলে যে কী বলব!

একদিন দুপুরবেলা গাবলু মামা বেশ প্রেমসে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে, আর আমি দরজার ফাঁক দিয়ে উঁকিঝুঁকি মারছি। একটা ছিপ চাঁছব—গাবলু মামার দাড়ি-কামানোর চকচকে ক্ষুরটা হাত-সাফাই করতে পারলে ভীষণ সুবিধে হয়।

এমন সময় ফিস্ ফিস্ করে ঘটা আমার কানে কানে বললে, এই টেনি, আম খাবি?

কেন খাব না—খেতে আর ভয় কী! আর আমায় জানিস তো প্যালা—খাওয়ার ব্যাপারে কাপুরুষতা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে লাফিয়ে উঠে আমি বললুম, কোথায় রে?

—আমাদের বাগানে।

আমি বললুম, ওরে বাবা!

বলবার কারণ ছিল। গোবর্ধনবাবুর খুব ভালো একটা আমের বাগান আছে—বাছাই বাছাই কলমের আম। ল্যাংড়া, বোম্বাই, মিছরিভোগ—আরো কত কী! দেড় মাইল দূর থেকেও আমের গন্ধে জিভে জল আসে। কিন্তু কাছে যায় সাধ্যি কার! যমদূতের মতো একটা অ্যায়সা জোয়ান মালী রাতদিন খাড়া পাহারা দিচ্ছে সেখানে। একটু উঁকিঝুঁকি দিয়েছে কি সঙ্গে সঙ্গে বাজখাঁই গলায় হাঁক পাড়বে, ইখানে হেঁচ্ছে কী? ও-সব চলিবেনি! না পালাইছ তো পিট্টী খাইছ?

ঘটা বললে, কিছু ঘাবড়াসনি—বুঝলি? আজ জামাইষষ্ঠী কিনা—মালী এবেলা শ্বশুরবাড়ি গেছে। ভালোমন্দ খেয়ে-দেয়ে সন্ধের পরে ফিরবে। আজকেই সুযোগ!

অমন জাঁদরেল মালীরও শ্বশুরবাড়ি থাকে—আমার বিশ্বাসই হল না। ঘটা বললে, সত্যি বলছি টেনি। চল্ না বাগানে—গেলেই বুঝতে পারবি!

গেলুম বাগানে। বেগতিক দেখলেই রামদৌড় লাগাবো। লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটো তো আছেই!

গিয়ে দেখি, সত্যিই তাই। মালীর ঘরে মস্ত একটা তালা ঝুলছে। আর বাগানে?

গাছ ভর্তি আম আর আম! তাদের কী রঙ, আর ক্যায়সা খোশবু! মনে হল যেন স্বর্গের নন্দনবনে এসে ঢুকেছি আর চারদিকে অমৃত ফল ঝুলছে। কিন্তু হলে কি হবে! প্রায় সবগুলো গাছই বিচ্ছিরি রকমের জাল দিয়ে ঘেরাও করা। ঢিল মারলে পড়বে না—আঁকশিতে নামবে না।

শুধু একদিকে বেঁটে চেহারার একটা গাছে কোনো জালই নেই! আর কী আম হয়েছে সে গাছে! মাটির হাতখানেক কাছাকাছি পর্যন্ত আম ঝুলে পড়েছে। পেকে

www.boiRboi.blogspot.com

টুকটুক করছে আমগুলো—লালে আর হলদেতে কী আশ্চর্য তাদের রঙ! দেখেই আনন্দে আমার মূর্ছা যাওয়ার জো হল।

ঘটা বললে, এ আমের নাম হল পেশোয়ার কি আমীর। আমের সেরা। খেলে মনে হবে পেশোয়ারের আঙুর, ভীম নাগের সন্দেশ আর কাশীর চমচম একসঙ্গে খাচ্ছিস। লেগে যা টেনি—

বলবার আগেই লেগে গেছি আমি। চক্ষের নিমেষে টেনে নামিয়েছি গোটা পনেরো পেশোয়ার কি আমীর। তারপর বেশ টুস্‌টুসে একটা আমে যেই কামড় বসিয়েছি—

সঙ্গে সঙ্গে কী যে হল সে আমার মনে নেই প্যালা! আমি মাথা ঘুরে সেইখানেই বসে পড়লুম। ওরে বাপ্‌স—কী টক! দশ মিনিট ধরে খালি মনে হতে লাগল, আমার দুপাটি দাঁতের ওপর কেউ দমাদম হাতুড়ি ঠুকছে—আমার দু-কানে তিরিশটা ঝিঁঝি পোকা কোরাস গাইছে, আমার নাকের ওপর তিন ডজন উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে, আমার মাথার ওপর সাতটা কাঠঠোকরা এক নাগাড়ে ঠুকে চলেছে।

যখন জ্ঞান হল—তখন দেখি দু' ডজন পেশোয়ার কি আমীর সামনে নিয়ে আমি বসে আছি ধুলোর ওপর। ঘটার চিহ্নমাত্র নেই। ঘটকর্পর কর্পূরের মতোই উবে গেছে।

কী শয়তান, কী বিশ্বাসঘাতক! একবার যদি ওকে সামনে পাই, তাহলে ওর নাক খিমচে দেব, কান কামড়ে দেব, পিঠে জলবিছুটি ঘষে দেব, ওর ছুটির টাস্কের সব অঙ্কগুলো এমন ভুল করে রেখে দেব যে ইস্কুলে গেলেই সপাসপ বেত। কিন্তু সে তো পরের কথা পরে। এখন কী করি!

আমের লোভেই কি না কে জানে, পাটকিলে রঙের মস্ত দাড়িওলা একটা রাম-ছাগল গুটি গুটি পায়ে আমার দিকে এগোচ্ছে। আমার সমস্ত রাগ ছাগলটার ওপরে গিয়ে পড়ল। বটে—আম খাবে। দ্যাখো একবার পেশোয়ার কি আমীরকে পরখ করে! ছাগলে সব খায়—জানিস তো প্যালা? ছাতা খায়, খাতা খায়, হকিস্টিক খায়, জুতো খায়—জুতোবুরুশওয়ালাকেও যে বাগে পেলে খায় না একথা জোর করে বলা যায় না। আমার সেই কামড়-দেওয়া আমটাকেই দিলুম ছুড়ে ওর দিকে।

মাটিতেও পড়তে পেলো না—ক্রিকেটের বলের মতোই আকাশে লাফিয়ে উঠে ছাগলটা আমটাকে লুফে নিলে! তারপর?

—ব্যা-আ-আ—করে গগনভেদী আওয়াজ হল একটা। একটা নয়—যেন সমস্ত ছাগলজাতি একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। তারপরেই টেনে একখানা দৌড় মারল। সে কী দৌড় রে প্যালা! চক্ষের পলকে বাগান পেরুলো, মাঠ পেরুলো, লাফ মারতে মারতে খানা-খন্দল পেরুলো। বোধহয় মোদিনীপুরে গিয়েই শেষতক সেটা থামল।

আমি জ্বলন্ত চোখে আমগুলোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। ঘটাকে একটা খাওয়াতে পারলে বুকের জ্বালা নিভত। কিন্তু সেটাকে আর পাই কোথায়? তিন দিনের মধ্যেও টিকির ডগাটি পর্যন্ত দেখতে পাব না এটা নিশ্চিত।

তাহলে কাকে খাওয়াই?

নির্ঘাৎ গাবলু মামাকে। দুদিন আমার কান দুটো বেহালার কানের মতো আচ্ছা করে মুচড়ে দিয়েছে। এ আম গাবলু মামারই খাওয়া দরকার।

গোটা আষ্টেক আম কোঁচড়ে লুকিয়ে ফিরে এলুম।

ভগবান ভরসা থাকলে সবই সম্ভব হয় প্যালা—বুঝলি? বাড়ি ফিরে দেখি ভীষণ হৈ চৈ! গাবলু মামা কোন্ সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে চাকরির

চেষ্টায়। দইয়ের ফোঁটা-টোঁটা পরানো হচ্ছে—দিদিমা—বড়মামী—দাদু—সবাই এক-সঙ্গে দুর্গা দুর্গা—কালী কালী এই সব আওড়াচ্ছেন।

গাবলু মামার ঘরে উঁকি দিয়ে দেখি—কেউ নেই। শুধু টেবিলের ওপর রঙচঙে একটা বেতের ঝুড়ি। তাতে বাছা-বাছা সব বোম্বাই আম। ভগবান বুদ্ধি দিলেন রে প্যালা! কেউ দেখবার আগেই আমি ঘরে ঢুকে গোটাকয়েক বোম্বাই সরিয়ে ফেললুম—তার ওপর সাজিয়ে দিলুম সাতটা পেশোয়ার কি আমীর—মানে, সাতটা অ্যাটম বম্!

তারপরে গোয়ালঘরে লুকিয়ে বসে সেই বোম্বাই আমগুলো সাবাড় করছি—দেখি না, সেই ঝুড়িটা নিয়ে গাবলু মামা গটগটিয়ে বেরিয়ে গেলেন। আর দাদু দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে সমানে 'কালী কালী' বলতে লাগলেন।

এইবার আমার চটকা ভাঙল। আ্যাঁ—ওই আম সাহেবের কাছে ভেট যাচ্ছে! গাবলু মামার অবস্থা কী হবে ভেবে আমারই তো গায়ের রক্ত জমে গেল! চাকরি তো দূরে থাক—হাড়গোড় নিয়ে গাবলু মামা ফিরতে পারলে হয়। বেশ খানিকটা অনুতাপই হল এবার। ইস্—এ যে লঘু পাপে গুরুদণ্ড হয়ে গেল রে!

বললে বিশ্বাস করবিনি প্যালা—ওই আমের জোরেই শেষতক গাবলু মামার চাকরি হয়ে গেল। কী রে? সেইটেই তো আদত গল্প।

যে সাহেবটার সঙ্গে মামা দেখা করতে গেল, তার নাম ডার্কডেভিল। যতটা না বুড়ো হয়েছে—তার চাইতে বেশি ধরেছে বাতে। প্রায় নড়তে-চড়তে পারে না, একটা চেয়ারে বসে রাত-দিন কোঁ কোঁ করছে। তার হাতেই গাবলু মামার চাকরি।

আমের ঝুড়ি নিয়ে গিয়ে গাবলু মামা সায়েবকে সেলাম দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে, মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, মাই গার্ডেনস্ ম্যাংগো স্যার? ভেরি গুড স্যার—ফর ইয়োর ইটিং স্যার—

একদম চালিয়াতি—বুঝলি প্যালা? আমার মামার বাড়ির ধারে-কাছেও আমের গাছ নেই। তবু ও-সব বলতে হয়—গাবলু মামাও চালিয়ে দিলে।

সায়েবটা বেজায় লোভী, তায় রাত-দিন রোগে ভুগে লোভ আরো বেড়ে গিয়েছিল। আমের ঝুড়ি দেখেই সায়েবের নোলা সকসকিয়ে উঠল। তার ওপরে আবার সেই পেশোয়ার কি আমীর—তার যেমন গড়ন, তেমনি রঙ! তক্ষুনি সে ছুরি বের করলে টেবিলের টানা থেকে।

—কাম্ বাবু, হ্যাভ সাম (একটুখানি খাও)—বলেই এক টুকরো সে গাবলু মামার দিকে এগিয়ে দিলে।

—নো স্যার—আই ইট মেনি স্যার,—এইসব বলে গাবলু মামা হাত-টাত কচলাতে লাগল। কিন্তু সায়েবের গোঁ—জানিস তো? ধরেছে যখন—খাইয়ে ছাড়বেই।

অগত্যা গাবলু মামাকে নিতেই হল টুকরোটা। আর মুখে দিয়েই—

—দাদা গো! গেলুম—বলে গাবলু মামা চেয়ারশুদ্ধ উলটে পড়ে গেল। কষে একটা দাঁত নড়ছিল, সেটাও খসে গেল সঙ্গে সঙ্গেই।

আর সায়েব?

আমে কামড় দিয়েই বিটকেল আওয়াজ ছাড়লে: ও গশ্—ঘোঁয়াক! তারপরেই তড়াক করে এক লাফে টেবিলে উঠে পড়ল, দাঁড়িয়ে উঠে বললে, মাই গড্—ঘ্যাচাৎ!

এই বলে আর এক লাফ! মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল, সায়েব তার একটা ব্লেডকে চেপে ধরলে। তারপর ঘুরন্ত ফ্যানের সঙ্গে শুনো ঘুরতে লাগল বাঁই-বাঁই করে।

সে কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড—তোকে কী বলব প্যালা! ঘরের ভেতর নানারকম

www.boiRboi.blogspot.com

আওয়াজ শুনে সায়েবের আর্দালি ছুটে এসেছিল। সে সায়েবকে ফ্যানের সঙ্গে বনবনিয়ে ঘুরতে দেখে বললে, রাম-রাম—এ কেইসা কাম! বলে সে কাকের মতো হাঁ করে রইল।

আর সেই সময়েই ঘুরন্ত আর উড়ন্ত সায়েবের হাত থেকে পেশোয়ারকী আমীর টুপ্ করে খসে পড়ল। আর পড়বি তো পড় একেবারে আর্দালির হাঁ-করা মুখে।—এ দেশোয়ালী ভাই জান গইরে—বলে আর্দালি পাঁই-পাঁই করে একেবারে ইস্টিশানের প্ল্যাটফর্মে এসে পড়ল। তখন মাদ্রাজ মেল ইস্টিশান ছেড়ে চলে যাচ্ছে—এক লাফে তাতেই উঠে পড়ল আর্দালি, তারপরে পতন ও মূর্ছা। ওয়ালটেয়ারে গিয়ে নাকি তার জ্ঞান হয়েছিল।

ততক্ষণে গাবলু মামার চটকা ভেঙেছে। মাথার ওপরে সায়েবের বুটের ঠোক্কর কাঁধে এসে লাগতেই গাবলু মামা টেনে ছুট। একদৌড়ে বাড়িতে এসে আছাড় খেয়ে পড়ল—তারপরেই একশো চার জ্বর, আর তার সঙ্গে ভুল বকুনি : ওই—ওই আম আসছে! আমায় ধরলে!

বাড়িতে তো কান্নাকাটি। আমার মনের অবস্থা তো বুঝতেই পারছিস! কিন্তু পরের দিন তাজ্জব কাণ্ড! সকালেই সায়েবের দু' নম্বর চাপরাশি গাবলু মামার নামে এক চিঠি নিয়ে এসে হাজির।

ব্যাপার কী?

না—গাবলু মামার চাকরি হয়েছে। আড়াইশো টাকা মাইনের চাকরি।

কেমন করে হল? আরে, কেন হবে না? সায়েব তো ফ্যানের ব্লেড থেকে ছিটকে পড়ল। পড়তেই দেখে—আশ্চর্য ঘটনা। সায়েবের দশ বছরের বাত—হাত-পা ভালো করে নাড়তে পারত না—পেশোয়ার কি আমীরের এক ধাক্কাতেই সে বাত বাপ-বাপ করে পালিয়েছে। কাল সারা বিকেল সায়েব মাঠে ফুটবল খেলেছে, আনন্দে সকলকে ভেংচি কেটেছে, বাড়ি ফিরে তার পেল্লায় মোটা মেমসায়েবের সঙ্গে মারামারি করেছে পর্যন্ত।

আর গাবলু মামার জ্বর? তক্ষুনি রেমিশন! দশ বালতি জলে চান করে, ভাত খেয়ে, কোট-পেণ্টুলুন পরে গাবলু মামা তক্ষুনি সায়েবকে সেলাম দিতে ছুটল।

বুঝলি প্যালা—তাই বলছিলুম, টক আমকে অচ্ছেদ্দা করতে নেই! জুতমতো কাউকে খাইয়ে দিতে পারলে বরাত খুলে যায়।

ডালমুটের ঠোঙাটা শেষ করে টেনিদা থামল।

—আহা, এমন বাতের ওষুধ! আমি বললুম, সে আম গাছটা—

দীর্ঘশ্বাস ফেলে টেনিদা বললে, ও-সব ভগবানের দান রে—বেশিদিন কি সংসারে থাকে? পরদিনই কালবৈশাখী ঝড়ে গাছটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল।

www.boiRboi.blogspot.com

ভালোয়-ভালোয়

ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামতে গিয়ে সোজা ধড়াস করে প্ল্যাটফর্মের উপর একটা আছাড় খেলো বটুকেশ্বর সামন্ত। গড়িয়ে গেল বাজারের-ঝাঁকা-থেকে-পড়ে-যাওয়া একটা ছাঁচিকুমড়োর মতো।

—আহা-হা মারা গেল বুঝি লোকটা!—চারদিক থেকে হাহাকার উঠল একটা।

—বাঙালগুলো এমনি করেই মরে, বুঝলেন!—কোথা থেকে একজন সবজান্তা ঘোষণা করলেন।

বটুক ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ব্যথার চাইতে অপমানের জ্বালাতেই গা জ্বলছে বেশি।

আস্তিন গুটিয়ে বটুক বললে, মুখ সামলে কথা কইবেন মশাই! বাঙাল! জানেন, কলকাতার হাটখোলায় আমাদের চোদ্দপুরুষ বাস?

—চোদ্দপুরুষ কলকাতায় বাস হলেও বাঙাল বাঙালই থাকে! সেই সবজান্তা আবার জানালেন। চটে আগুন হয়ে গেল বটুক। ইচ্ছে হল লোকটার কান ধরে বার-কয়েক উঠ-বোস করিয়ে দেয়। কিন্তু সাহস হল না। অচেনা জায়গা—সবাই শত্রুপক্ষ। চাঁদা করে সবাই যদি এক ঘা করে বসিয়ে দেয়, তাহলেই আর দেখতে হবে না। একদম কাঁচাগোল্লা বানিয়ে দেবে।

সুতরাং কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

গোঁ-গোঁ করতে করতে বেরিয়ে যাচ্ছিল—স্টেশন-মাস্টার পথ আটকালেন—একটু দাঁড়িয়ে যান না দাদা!

—কেন, হঠাৎ আবার আপনার এই রসালাপ কিসের?

স্টেশন-মাস্টার নাক চুলকে বললেন, ইয়ে—দেখুন দাদা, আমার স্টেশনে নামতে গিয়ে আপনার হাত-পা ছড়ে গেল, তাই বলছিলাম, একবার অফিস-ঘরে আসুন, একটু আইডিন লাগিয়ে দি। আপনারা স্যার কলকাতার লোক, গিয়ে হয়ত বদনাম গাইবেন—

বটুক দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চুপ করুন মশাই! আর ভালমানুষি করতে হবে না! আধ মিনিট ট্রেন থামে না আপনার স্টেশনে, আপনি আবার স্টেশন-মাস্টার! আপনি একটা পয়েণ্টসম্যান, বুঝলেন? স্রেফ পয়েণ্টসম্যান!

—কী, পয়েণ্টসম্যান! রোঁয়া-তোলা বেড়ালের মতো স্টেশন-মাস্টার ফ্যাঁচ করে উঠলেন : পয়েণ্টসম্যান! এত বড় কথা! আমি আপনার নামে মানহানির মামলা করব!

—মানহানি, প্রাণহানি, কানহানি—যা খুশি করুন। যে-চুলোয় খুশি যান—বটুক গটগট করতে করতে বেরিয়ে গেল স্টেশন থেকে।

ইশ! যাত্রাটাই মাটি!

স্টেশনের বাইরে এসে বটুক একবার করুণ চোখে নিজের দিকে তাকালো।

হাঁটুর কাছে ফেঁসে গেছে অমন খাসা শান্তিপুরী ধুতিটা। গিলে-করা পাঞ্জাবিটা এখানে-ওখানে ময়লা হয়ে গেছে। এই পোশাক নিয়ে কখনো জামাই-ষষ্ঠীতে শ্বশুর-বাড়ি যাওয়া যায়!

শ্বশুরেরও যেন আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না! রিটায়ার করে কলকাতা ছেড়ে একেবারে এই ধ্যাধ্যেড়ে ঘোড়াডাঙায় এসে আস্তানা নিয়েছেন। পৈতৃক বাড়ি! নিকুচি করছে অমন পৈতৃক বাড়ির! যেখানকার স্টেশনে আধ মিনিটের বেশি গাড়ি দাঁড়ায় না আর যেখানকার লোকগুলো এমন অসভ্য—সেখানে কোনো ভদ্রলোক আসে?

কিন্তু এসেই যখন পড়া গেছে—তখন কী আর করা যাবে! তাছাড়া শাশুড়ি খাওয়ান ভালো—পাকা রুইয়ের কালিয়া, কচি পাঁটার মুড়ো, বাটি ভরা ক্ষীর—ইশ! ইশ! ভাবতেও বটুকের জিভে জল এল। আশা হল, বেশ একটা জাঁকালো খাওয়ার উপরেই পথের কষ্টটা পুষিয়ে নেওয়া যাবে।

কিন্তু ঘোড়াডাঙা? কোথায় সেই ঘোড়ার ডিমের ঘোড়াডাঙা?

স্টেশনের বাইরে একটা নিমগাছের তলায় তিনখানা গোরুর গাড়ি। বটুককে দেখেই গাড়োয়ানেরা হৈ চৈ করে তেড়ে এল।

না, ঠ্যাঙাবার জন্যে নয়।

—কোথায় যাবেন বাবু? কোথায়?

—ঘোড়াডাঙা।

—আসুন, আমার গাড়িতে আসুন—

—এ-গাড়িতে আসুন বাবু—তাড়াতাড়ি পেঁছে দেব!

—আমার গাড়িতে চলুন মশাই! গোরু তো নয়—পক্ষীরাজ ঘোড়া! উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

বটুক থতমত খেয়ে গেল।

দুদিক থেকে দুই গাড়োয়ান হাত চেপে ধরেছে। আর-একজন পেছন থেকে জামা ধরে টানছে।

—আমার গাড়িতে উঠুন বাবু—

—এ গাড়িতে আসুন বাবু—

—আমার তো গোরু নয় মশাই, পক্ষীরাজ ঘোড়া—

কানের কাছে তিন গাড়োয়ান সমানে চিৎকার করতে লাগল। বটুকের প্রায় ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, প্রাণ যাওয়ার দাখিল।

—এই, কী হচ্ছে সব? ভদ্রলোককে নিয়ে মশকরা পেয়েছিস?

একটা বাজখাঁই গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। হঠাৎ যেন মাটি ফুঁড়ে সামনে এসে দাঁড়ালো একটা লোক। ছ-হাতের মতো লম্বা কটকটে কালো গায়ের রঙ—গরুড়ের ঠোঁটের মতো নাকটা মুখের উপর যেন আধ হাত আন্দাজ ঝুলে পড়েছে। গায়ে আধ-ময়লা শার্ট—আস্তিন গোটানো। ছোটখাটো একটা দৈত্যবিশেষ!

যেন জাদুমন্ত্রের কাজ হল। বটুককে ছেড়ে তিন পা পেছনে সরে গেল গাড়োয়ান-গুলো।

বিরাট লোকটা আবার বিকট গলায় বললে, দেখছিস নে কেমন ধোপদুরস্ত কলকাতার বাবু? তোদের ও-সব ঝরঝরে গোরুর গাড়িতে চড়তে যাবে কেন র‍্যা?—লোকটা বটুককে বগলের মধ্যে চেপে ধরল—আসুন স্যার আমার সঙ্গে।

—তুমি আবার কে হে বাপু?—লোকটার বগলদাবা থেকে বটুক প্রাণপণে নিজেকে ছাড়াতে চেষ্টা করতে লাগল।

—কেউ নই স্যার।—অতিকায় লোকটা প্রায় দেড় মাইল চওড়া একখানা হাসি হাসল : অধীনের নাম পানকেষ্ট পাড়ুই।—আপনার দাসানুদাস।

—দাসানুদাস। নিজেকে ছাড়াবার বৃথা চেষ্টা করে বটুক রুদ্ধশ্বাসে বললে,

তাহলে অমন করে জাপটে ধরেছ কেন?

—একবার হাতে পেলে কি আর স্যার সহজে ছাড়ি?—আবার একখানা দেড় মাইল হাসি দেখা দিল পানকেষ্ট পাড়ুইয়ের মুখে।

ভয়ে সর্বাঙ্গ হিম হয়ে গেল বটুকের : তোমার মতলবখানা কী হে?

—ঘাবড়াবেন না স্যার—আমি লোক খারাপ নই। চেহারাটা আমার এমনি দেখছেন বটে, কিন্তু মনখানা একেবারে মাখনের মতো নরম। গাড়োয়ান ব্যাটারা আপনার হাঁড়ির হাল করছিল, দেখে আর সইতে পারলাম না—ছুটে এলাম।

—যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছ, এবার ছেড়ে দাও। হাঁপাতে হাঁপাতে বটুক বললে।

—ছাড়ব কী স্যার, আপনি যে আমার সোয়ারি। ছাড়লেই হল? ছাড়াটা কি ইয়ার্কি নাকি? কত পুণ্যি করলে আপনাদের মতো লোক পাওয়া যায়! চলুন স্যার—কোথায় যাবেন। আমার ট্যাক্সি করে পেঁছে দিচ্ছি।

—ট্যাক্সি! কোথায় ট্যাক্সি?

—ঐ যে আমগাছ তলায়, দেখছেন না?

তা বটে! কিন্তু না বলে দিলে মোটর গাড়ি বলে চেনা মুস্কিল। ধুলোয় মলিন বাঁকা-ট্যারা একখানা একশো বছরের পুরোনো অস্টিন। হুডটা ছিঁড়ে গিয়ে ঝালরের মতো ঝুলছে চারিদিকে।

—ঐটে?

—হ্যাঁ স্যার। পানকেষ্ট আবার বত্রিশটা দাঁতের ঝলক দেখিয়ে দিলে : একটু পুরোনো বটে, কিন্তু একদম সাচ্চা জিনিস। আজকালকার সৌখিন গাড়ির মতো ঠুনকো নয়। নাম দিয়েছি 'দোদুল-দোলা'। একবার চড়েই দেখুন না স্যার—দু-মিনিটের মধ্যে আমেজে ঘুম এসে যাবে!

বটুক কি একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বলার আর সুযোগ পেল না। একটা হ্যাঁচকা টানে তাকে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল পানকেষ্ট। হাজির করল একেবারে দোদুল-দোলার সামনে। মরচে-পড়া দরজাটা নারকোলের দড়ি দিয়ে বাঁধা। দড়ির ফাঁস খুলে পানকেষ্ট বললে, উঠুন।

—উঠব? কোথায় উঠব?—ভেতর দিকে তাকিয়ে হাঁ করে রইল বটুক।

ভেতরে উঠবেন স্যার—সীটে গিয়ে বসবেন। আমি কি নইলে হুডের উপর চাপতে বলছি আপনাকে?

—সীট কোথায় হে! বটুক বারকয়েক খাবি খেল। এটা একটা প্রশ্ন বটে। সীটের উপর গদি-টদির বিশেষ বালাই নেই। একরাশ খোঁচা-খোঁচা স্প্রিং, আর তার সঙ্গে জড়ানো নারকোলের ছিবড়ে। সীট নয়—শরশয্যা!

—ওর ওপরে কেমন করে বসব হে?

—স্প্রিং-এর কথা বলছেন? আজ্ঞে, ও তো তুলোর মতো নরম। একবার বসলেই বুঝতে পারবেন।

—পাগল পেয়েছ আমাকে?—বটুক এবারে দাঁত খিঁচালো—কেউ কখনো বসতে পারে ওর ওপর?

একটা প্রকাণ্ড হ্যাণ্ডেল নিয়ে গাড়ির সামনে ঘটর-ঘটর করে স্টার্ট দেবার চেষ্টা করছিল পানকেষ্ট। এবার ব্যাজার মুখ করে এগিয়ে এল।

—আপনার স্যার বড্ড বায়নাক্কা। পাড়াগাঁয়ে এর চেয়ে ভাল ট্যাক্সি পাওয়া যায় না। এতে চাপিয়ে কত রাজা-মহারাজাকে পার করিয়ে দিলুম, আর আপনি খুঁত ধরছেন।

www.boiRboi.blogspot.com

ইঞ্জিনের কাছ থেকে একটা ছেঁড়া চট এনে দু-ভাঁজ করে পেতে দিলে পানকেষ্ট : নিন, বসুন এবার।

বটুক ভাবছিল, এ ট্যাক্সির চাইতে গোরুর গাড়িও ছিল ভাল। কিন্তু তারপরেই মনে পড়ল, ঘোড়াডাঙা অনেকখানি রাস্তা। গোরুর গাড়িতে চাপলে কবে যে গিয়ে পৌঁছুবে ঠিক নেই। একটু কষ্ট করলেও তাড়াতাড়ি পৌঁছোনো যাবে অন্তত।

চটের ওপরেই অগত্যা চেপে বসল। বিলক্ষণ লাগছে।

—কই হে, আরাম হচ্ছে না তো?

—হবে স্যার, আস্তে আস্তে—পানকেষ্ট আবার হাসল : সময়ে বুঝতে পারবেন।

ঝরঝরে গাড়িটা এতক্ষণে স্টার্ট নিয়েছে। বিরাট ভূমিকম্পের মতো সর্বাঙ্গ থর-থর করে কাঁপছে তার। ড্রাইভারের সীটে লাফিয়ে উঠে বসে পানকেষ্ট বারকয়েক হর্ন বাজালো। সে হর্নের শব্দে দু-কান চেপে ধরল বটুক। মাথার ওপর থেকে কতক-গুলো কাক কা-কা করে উড়ে গেল—দেখা গেল মাঠের ভেতর দিয়ে একপাল গোরু ল্যাজ তুলে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট দিয়েছে।

দোদুল-দোলা রওনা হল।

কিন্তু হাত-কয়েক এগিয়েই গাড়ি প্রায় দু-হাত লাফিয়ে উঠল শূন্যে—তারপরেই ধপাং করে পড়ল।

—গেছি, গেছি। চেঁচিয়ে উঠল বটুক।

—এখুনি গেলে চলবে কেন স্যার?—ড্রাইভারের সীট থেকে ফিরে তাকালো পান-কেষ্ট—একেবারে ঘোড়াডাঙা গিয়ে তবে ছুটি।

—ঘোড়াডাঙা যাবার আগেই যে তুমি আমাকে গো-ভাগাড়ে পৌঁছে দেবে হে!

—ও একই কথা স্যার—পানকেষ্ট আবার দন্তরুচি বিকাশ করল : আপনার গেঁটে-বাত আছে স্যার?

—না।

—হেঁড়ে বাত?

—না।

—মাজার বাত?

—না—না—বটুক চটে উঠল : কিছু নেই ওসব। ওসবের ধার ধারি না আমি।

—থাকলে বড় ভালো হতো স্যার!—পানকেষ্ট যেন ব্যথা পেল।

—মানে?

পানকেষ্ট আবার বিকট শব্দে হর্ন বাজালো—একটা ধোপার গাধা আচমকা ভয় পেয়ে কোথায় তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

—মানে? পানকেষ্ট বললে : থাকলে সেরে যেত আর কি। এইজন্যেই তো দোদুল-দোলার এত নাম স্যার। কত লোক যে এ-গাড়িতে চড়ে বাত সারাতে আসে!

—তোমার মুণ্ডু।—চটে মুখ ভ্যাংচালো বটুক।

—আমার মুণ্ডু নয় স্যার, আপনার বাত।—পানকেষ্ট আবার হর্নের শব্দে কানে তালা ধরিয়ে দিলে।

—পথে লোক নেই জন নেই, খামোকা অমন করে হর্ন বাজাচ্ছ কেন হে?

—দোদুল-দোলা যাচ্ছে স্যার, লোককে একটু হুঁশিয়ার তো করে দিতে হয়। ব্রেকটা আবার ভাল নেই কিনা, ঝট্ করে কেউ সামনে এসে পড়লে আবার সামলানো যাবে না।

—বল কি হে! অবিশ্রাম ঝাঁকুনির অসহ্য যন্ত্রণা এতক্ষণ যদি-বা সইছিল, বটুক

এবার আঁতকে উঠল—মেরে ফেলবে না তো শেষ পর্যন্ত!

—আজ্ঞে না স্যার, ঘাবড়াবেন না!—পানকেষ্ট অভয় দিলে : আজ পাঁচ বৎসর দোদুল-দোলা চালাচ্ছি, এর মধ্যে কুড়িজনের বেশি সোয়ারি খতম করতে পারিনি। আপনি হয়ত বেঁচেও যেতে পারেন।

—থামাও, থামাও!—বটুক চেঁচিয়ে উঠল : আমি এখনই নেমে পড়ব।

—থামাতে চাইলেই তো এ গাড়ি থামবে না স্যার। যখন তেল ফুরুবে, নামতে গেলে সেই তখন।

—তার মানে? তাহলে ঘোড়াডাঙায় গিয়ে থামবে কি করে?

পানকেষ্ট বিরক্ত হয়ে বললে, একটু-আধটু এদিক-ওদিক হয়ে যেতে পারে।

—এদিক-ওদিক?—এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় মারাত্মক ঝাঁকুনি আর স্প্রিং-এর খোঁচায় যেন প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে। বিকৃত মুখে বটুক বললে, কতটা এদিক-ওদিক?

—ঠিক নেই।—পানকেষ্ট আবার সেই প্রচণ্ড হর্নটা বাজালো : আমাকে বেশি বকাবেন না মশাই, অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে যেতে পারে।

—অ্যাঁ!—বটুক চুপ করল।

বেবি অস্টিন পাগলের মতো ছুটছে। ঝড়াং-ঝড়াং শব্দে একবার লাফিয়ে উঠছে আর একবার ধপাং করে নেমে পড়ছে মাটিতে। বটুক ইষ্টনাম জপ করতে লাগল।

মাথা ঘুরছে, চোখে ঝিম ধরছে। একবার শুধু দুর্বল গলায় বটুক জানতে চাইল : শেষ পর্যন্ত বাঁচব তো হে পানকেষ্ট?

—কিছু বলা যায় না স্যার—তবে চেষ্টা করে দেখব—পানকেষ্টর জবাব এল। ভগবানের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েই মড়ার মতো ঝিম মেরে রইল বটুক।

কতক্ষণ ওই অবস্থায় ছিল ঠিক নেই। হঠাৎ কানে এল পানকেষ্টর চিৎকার : ঘোড়াডাঙায় এসে গেছে স্যার! এই যে ঘোড়াডাঙা—

বটুক ধড়মড় করে নড়ে উঠল। একটা গ্রামের ভেতর দিয়ে গাড়ি তীরবেগে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—থামাও! থামাও! বটুক চেঁচিয়ে উঠল।

—তেল না ফুরুলে থামবে না স্যার!—প্রশান্ত জবাব পানকেষ্টর।

—তাহলে? ঘোড়াডাঙা যে ছাড়িয়ে গেল!

—তা গেল। কিন্তু সেজন্যে ভাবছেন কেন? মাইল পাঁচেক আগে একটা বাঁক আছে, ওখান থেকে ঘুরিয়ে আনছি। এর মধ্যে তেল ফুরিয়ে যাবে। পেছনে পড়ে রইল ঘোড়াডাঙা—গাড়ি মাঠের ভেতর দিয়ে সমানে বন্‌বন্ করে ছুটছে।

—যদি না ফুরোয়?

—আবার স্টেশন পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসব। ফের তেল নেব।

—তারপর আবার যে ঘোড়াডাঙা পেরিয়ে যাবে?

—আবার ঘুরিয়ে আনব।—পানকেষ্ট জবাব দিলে।

—খুনে! ডাকাত! বটুক চেঁচিয়ে উঠল।

—খামকা গালাগালি করবেন না স্যার।—গর্জে উঠল পানকেষ্ট। দৈত্যের মতো ভয়ঙ্কর মুখে একটা বীভৎস ভঙ্গি ফুটে বেরুলো : তাহলে সোজা ঐ জামগাছে ধাক্কা দিয়ে অ্যাকসিডেণ্ট করে দেব—হ্যাঁ! তখন আমার দোষ দিতে পারবেন না।

বটুক কাঠ হয়ে বসে রইল।

ঝড়ের বেগে গাড়ি একটা চৌমাথায় পৌঁছল। তারপরে বাঁদিকে খানিকটা ঘুরে আবার ফেলে-আসা পথ ধরল।

www.boiRboi.blogspot.com

—এবার ঘোড়াডাঙায় গিয়ে থামবে তো?

—বলা যায় না স্যার। তেল মাপবার যন্ত্রটা নষ্ট হয়ে গেছে। গাঁজার নেশায় সকালে কতখানি তেল ঢেলেছি খেয়াল নেই।

—কী সর্বনাশ!

—অত ঘাবড়ে যাচ্ছেন কেন মশাই? আজ হোক কাল হোক—ঘোড়াডাঙার সামনে গাড়ি আমার থামবেই, তবে আমার নাম পানকেষ্ট পাড়ুই!

—আজ হোক, কাল হোক! বটুক হাঁ করে রইল।

—পরশুও হতে পারে। তরশু হওয়াও অসম্ভব নয়। কী করে ঠিকমতো বলব স্যার? আমি তো আর জ্যোতিষী নই?

বটুক আবার সেই খোঁচা-খাওয়া স্প্রিং-এর সীটে এলিয়ে পড়ল। জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খাওয়ার সাধ চিরদিনের মতো মিটে গেছে। এখন প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারলে হয়।

—ঘোড়াডাঙায় গিয়ে আমার কাজ নেই, স্টেশনেই নিয়ে চল।

—স্টেশনে গেলেই যে গাড়ি থামবে, একথা কী করে বলব মশাই?

বটুক অজ্ঞানের মতো পড়ে রইল।

—ঘোড়াডাঙা যাচ্ছে—ঘোড়াডাঙা যাচ্ছে!—আবার পানকেষ্টর চিৎকার!

—থামছে না যে! এবারেও যে থামছে না!—বটুক হাহাকার করে উঠল।

—তেল বেশি আছে বোধহয়।—পানকেষ্টর জবাব।

কিন্তু আর নয়। এবার এসপার কি ওসপার। মাথায় যেন খুন চেপে গেল বটুকের!

—পেরিয়ে যাচ্ছে ঘোড়াডাঙা! ছাড়িয়ে যাচ্ছে একটা বন্দুকের গুলির মতো!

—জয় মা কালী!

চলতি গাড়ি থেকে বটুক ঝাঁপ মারল।

—করেন কী—করেন কী মশাই!—বলতে না বলতে পানকেষ্টর দোদুল-দোলা দু-মাইল রাস্তা পার হয়ে গেল।

গাঁয়ের ডাক্তার, টিংচার আইডিন আর লোকজন নিয়ে শ্বশুর ধারেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আশঙ্কা ছিল, শহুরে জামাই বটুক হয়ত ট্যাক্সির লোভ সামলাতে পারবে না।

তাঁরা ছুটে এলেন। ধরাধরি করে রাস্তা থেকে তুললেন বটুককে।

ডাক্তার প্রথমেই ডান পাটা পরীক্ষা করলেন। বললেন, একটু ভেঙেছে। দিন-সাতেকের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।

শ্বশুর একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন: যাক, ভালোয়-ভালোয় পৌঁছেছে তাহলে!

ভালোয়-ভালোয় বইকি! লোকের কাঁধে চেপে জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্ন খেতে যেতে একবার করুণ কণ্ঠে বটুক জিজ্ঞাসা করলে, কিন্তু ট্যাক্সি-ভাড়াটা? ট্যাক্সি-ভাড়া নেবে না পানকেষ্ট?

—নেবে বইকি? যেদিন তেলের হিসেব করে ঘোড়াডাঙার সামনে থামতে পারবে—সেইদিন। আজ হোক, কাল হোক, একমাস পরে হোক।—শ্বশুর জবাব দিলেন।

www.boiRboi.blogspot.com

বন-ভোজনের ব্যাপার

হাবুল সেন বলে যাচ্ছিল—পোলাও, ডিমের ডালনা, রুই মাছের কালিয়া, মাংসের কোর্মা—

উস্-আস্ শব্দে নোলার জল টানল টেনিদা: বলে যা—থামলি কেন? মুর্গ মুসল্লম, বিরিয়ানি পোলাও, মশলা দোসে, চাউ-চাউ, সামি কাবাব—

এবার আমাকে কিছু বলতে হয়। আমি জুড়ে দিলাম: আলু ভাজা, শুক্তো, বাটি-চচ্চড়ি, কুমড়োর ছোকা—

টেনিদা আর বলতে দিলে না! গাঁক-গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল: থাম প্যালা, থাম বলছি। শুক্তো—বাটি-চচ্চড়ি।—দাঁত খিচিয়ে বললে, তার চেয়ে বল না হিঙে সেদ্ধ, গাঁদাল আর সিঙি মাছের ঝোল! পালা-জ্বরে ভুগিস আর বাসক-পাতার রস খাস, এর চাইতে বেশি বুদ্ধি আর কী হবে তোর! দিব্যি অ্যায়সা অ্যায়সা মোগলাই খানার কথা হচ্ছিল, তার মধ্যে ধাঁ করে নিয়ে এল বাটি-চচ্চড়ি আর বিউলির ডাল! ধ্যাত্তোর!

ক্যাবলা বললে, পশ্চিমে কুঁদরুর তরকারি দিয়ে ঠেকুয়া খায়। বেশ লাগে!

—বেশ লাগে?—টেনিদা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল: কাঁচা লঙ্কা আর ছোলার ছাতু আরো ভাল লাগে না? তবে তাই খা-গে যা। তোদের মতো উল্লুকের সঙ্গে পিকনিকের আলোচনাও ঝকমারি!

হাবুল সেন বললে, আহা-হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন? পোলাপানে কয়—

—পোলাপান! এই গাড়োলগুলোকে জলপান করলে তবে রাগ যায়! তাও কি খাওয়া যাবে এগুলোকে? নিম-নিসিন্দের চেয়েও অখাদ্য! এই রইল তোদের পিকনিক—আমি চললাম! তোরা ছোলার ছাতু আর কাঁচা লঙ্কার পিণ্ডি গেল গে—আমি ওসবের মধ্যে নেই!

সত্যিই চলে যায় দেখছি! আর দলপতি চলে যাওয়া মানেই আমরা একেবারে অনাথ! আমি টেনিদার হাত চেপে ধরলাম: আহা, বোসো না। একটা প্ল্যান-ট্যান হোক। ঠাট্টাও বোঝ না।

টেনিদা গজগজ করতে লাগল: ঠাট্টা! কুমড়োর ছোকা আর কুঁদরুর তরকারি নিয়ে ওসব বিচ্ছিরি ঠাট্টা আমার ভাল লাগে না।

—না—না, ওসব কথার কথা!—হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বোঝাতে লাগল: মোগলাই খানা না হইলে আর পিকনিক হইল কী?

—তবে লিস্টি কর—টেনিদা নড়ে-চড়ে বসল।

প্রথমে যে লিস্টটা হল তা এইরকম:

বিরিয়ানি পোলাও
কোর্মা
কোপ্তা
কাবাব দু-রকম
মাছের চপ—

মাঝখানে বেরসিকের মতো বাধা দিলে ক্যাবলা: তাহলে বাবুর্চি চাই, একটা চাকর,

একটা মোটর লরি, দুশো টাকা—

—দ্যাখ ক্যাবলা—টেনিদা ঘুষি বাগাতে চাইল।

আমি বললাম, চটলে কী হবে? চারজনে মিলে চাঁদা উঠেছে দশ টাকা ছ-আনা।

টেনিদা নাক চুলকে বললে, তাহলে একটু কম-সম করেই করা যাক। টাঁক-খালির জমিদার সব—তোদের নিয়ে ভদ্দরলোকে পিকনিক করে!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, তুমি দিয়েছ ছ-আনা, বাকি দশ টাকা গেছে আমাদের তিনজনের পকেট থেকে। কিন্তু বললেই গাঁট্টা। আর সে গাঁট্টা ঠাট্টার জিনিস নয়—জুতসই লাগলে স্রেফ গালপাট্টা উড়ে যাবে।

রফা করতে করতে শেষ পর্যন্ত লিস্টিটা যা দাঁড়ালো তা এই :

খিচুড়ি (প্যালা রাজহাঁসের ডিম আনিবে বলিয়াছে)

আলু ভাজা (ক্যাবলা ভাজিবে)

পোনা মাছের কালিয়া (প্যালা রাঁধিবে)

আমের আচার (হাবুল দিদিমার ঘর হইতে হাত-সাফাই করিবে)

রসগোল্লা, লেডিকেনি (ধারে 'ম্যানেজ' করিতে হইবে)

লিস্টি শুনে আমি হাঁড়িমুখ করে বললাম, ওর সঙ্গে আর-একটা আইটেম জুড়ে দে হাবুল। টেনিদা খাবে।

—হেঁ—হেঁ—প্যালার মগজে শুধু গোবর নেই, ছটাকখানেক ঘিলুও আছে দেখছি। বলেই টেনিদা আদর করে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে। 'গেছি গেছি' বলে লাফিয়ে উঠলাম আমি।

আমরা পটলডাঙার ছেলে—কিছুতেই ঘাবড়াই না। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে রোজ দু-বেলা আমরা গণ্ডায় গণ্ডায় হাতি-গণ্ডার সাবাড় করে থাকি। তাই বেশ ভাঁটের মাথায় বলেছিলাম, দূর-দূর। হাঁসের ডিম খায় ভদ্দরলোকে! খেতে হলে রাজ-হাঁসের ডিম। রীতিমতো রাজকীয় খাওয়া!

—কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে শুনি? খুব যে চালিয়াতি করছিস, তুই ডিম পাড়বি নাকি?—টেনিদা জানতে চেয়েছিল।

—আমি পাড়তে যাব কোন দুঃখে? কী দায় আমার?—আমি মুখ ব্যাজার করে বলেছিলাম : হাঁসে পাড়বে।

—তাহলে সেই হাঁসের কাছ থেকে ডিম তোকেই আনতে হবে। যদি না আনিস, তাহলে—

তাহলে কী হবে বলবার দরকার ছিল না। কিন্তু কী গেরো বলো দেখি। কাল রবিবার—ভোরের গাড়িতেই আমরা বেরুব পিকনিকে। আজকের মধ্যেই রাজহাঁসের ডিম জোগাড় করতে না পারলে তো গেছি। পাড়ায় ভণ্টাদের বাড়ি রাজহাঁস আছে গোটাকয়েক। ডিম-টিমও তারা নিশ্চয় পাড়ে। আমি ভণ্টাকেই পাকড়ালাম। কিন্তু কী খলিফা ছেলে ভণ্টা! দু-আনার পাঁঠার ঘুগনি আর ডজনখানেক ফুলুরি সাবড়ে তবে মুখ খুলল!

—ডিম দিতে পারি, তবে, নিজের হাতে বার করে নিতে হবে বাক্স থেকে।

—তুই দে না ভাই এনে। একটা আইসক্রীম খাওয়াব। ভণ্টা ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে, নিজেরা পোলাও-মাংস সাঁটাবেন আর আমার বেলায় আইসক্রীম! ওতে চলবে না। ইচ্ছে হয় নিজে বের করে নাও—আমি বাবা ময়লা ঘাঁটতে পারব না। কী করি, রাজী হতে হল।

ভণ্টা বললে, দুপুরবেলা আসিস। বাবা মেজদা অফিসে যাওয়ার পরে। মা তখন

ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। সেই সময় ডিম বের করে দেব!

গেলাম দুপুরে। উঠোনের একপাশে কাঠের বাক্স—তার ভেতরে সার-সার খুপরি। গোটা-দুই হাঁস ভেতরে বসে ডিমে তা দিচ্ছে। ভণ্টা বললে, যা—নিয়ে আর।

কিন্তু কাছে যেতেই বিদিকিচ্ছিরিভাবে ফ্যাঁস-ফ্যাঁস করে উঠল হাঁস দুটো। ফোঁস-ফোঁস করছে যে!

ভণ্টা উৎসাহ দিলে : ডিম নিতে এসেছিস—একটু আপত্তি করবে না? তোর কোন ভয় নেই প্যালা—দে হাত ঢুকিয়ে।

হাত ঢুকিয়ে দেব? কিন্তু কী বিচ্ছিরি ময়লা!—ময়লা আর কী বদখৎ গন্ধ! একেবারে নাড়ি উলটে আসে। তার ওপরে যে-রকম ঠোঁট ফাঁক করে ভয় দেখাচ্ছে—

ভণ্টা বললে, চিয়ার আপ্ প্যালা। লেগে যা!

যা থাকে কপালে বলে যেই হাত ঢুকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে—ওরে বাপরে! খটাং করে হাঁসটা হাত কামড়ে ধরল। সে কী কামড়! হাঁই-মাই করে চেঁচিয়ে উঠলাম আমি।

—কী হয়েছে রে ভণ্টা, নিচে এত গোলমাল কিসের?—ভণ্টার মা'র গলার আওয়াজ পাওয়া গেল।

আমি আর নেই। হাঁচকা টানে হাঁসের ঠোঁট থেকে হাত ছাড়িয়ে চোঁচা দৌড় লাগালাম। দরদর করে রক্ত পড়ছে তখন।

রাজহাঁস এমন রাজকীয় কামড় বসাতে পারে কে জানত। কিন্তু কী ফেরেব্বাজ ভণ্টাটা। জেনে-শুনে ব্রাহ্মণের রক্তপাত ঘটালো। আচ্ছা—পিকনিকটা চুকে যাক—দেখে নেব তারপর। ওই পাঁঠার ঘুগনি আর ফুলুরির শোধ তুলে ছাড়ব।

কী করা যায়—গাঁটের পয়সা দিয়ে মাদ্রাজী ডিমই কিনতে হল গোটাকয়েক।

পরদিন সকালে শ্যামবাজার ইস্টিশানে পৌঁছে দেখি, টেনিদা, ক্যাবলা আর হাবুল এর মধ্যেই মার্টিনের রেলগাড়িতে চেপে বসে আছে। সঙ্গে একরাশ হাঁড়ি-কলসি, চালের পুঁটলি, তেলের ভাঁড়। গাড়িতে গিয়ে উঠতে টেনিদা হাঁক ছাড়ল : এনেছিস রাঁজহাসের ডিম?

দুর্গা-নাম করতে করতে পুঁটলি খুলে দেখালাম।

—এর নাম রাজহাঁসের ডিম! ইয়ার্কি পেয়েছিস?—টেনিদা গাঁট্টা বাগালো।

আমি গাড়ির খোলা দরজার দিকে সরে গেলাম : মানে—ইয়ে, ছোট রাজহাঁস কিনা—

—ছোট রাজহাঁস! কী পেয়েছিস আমাকে শুনি? পাগল না পেটখারাপ?

হাবুল সেন বললে, ছাড়ান দাও—ছাড়ান দাও। ডিম তো আনছে!

টেনিদা গর্জন করে বললে, ডিম এনেছে না কচু। এই তোকে বলে রাখছি প্যালা—ডিমের ডালনা থেকে তোর নাম কেটে দিলাম। এক টুকরো আলু পর্যন্ত নয়, একটু ঝোলও নয়!

মন খারাপ করে আমি বসে রইলাম। ডিমের ডালনা আমি ভীষণ ভালবাসি, তাই থেকেই আমাকে বাদ দেওয়া! আচ্ছা বেশ, খেয়ো তোমরা। এমন নজর দেব পেট ফুলে ঢোল হয়ে যাবে তোমাদের!

পিঁ করে বাঁশি বাজল—নড়ে উঠল মার্টিনের রেল। তারপর ধস্-ধস্ ভোঁস ভোঁস করে এর রান্নাঘর, ওর ভাঁড়ার-ঘরের পাশ দিয়ে গাড়ি চলল।

টেনিদা বললে, বাগ্‌ইআটি ছাড়িয়ে আরো চারটে ইস্টিশান। তার মানে প্রায় এক ঘণ্টার মামলা। লেডিকেনির হাঁড়িটা বের কর, ক্যাবলা।

ক্যাবলা বললে, এখুনি! তাহলে পৌঁছবার আগেই যে সাফ হয়ে যাবে?

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা বললে, সাফ হবে কেন, দুটো-একটা চেখে দেখব শুধু। আমার বাবা ষ্টেনে চাপলেই খিদে পায়। এই একঘণ্টা ধরে শুধু-শুধু বসে থাকতে পারব না। বের কর হাঁড়ি—চটপট—

হাঁড়ি চটপটই বেরুল—মানে, বেরুতেই হল তাকে। তারপর মাটির্নের রেলের চলার তালে তালে ঝটপট করে সাবাড় হয়ে চলল। আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন জুল-জুল করে শুধু তাকিয়েই রইলাম। একটা লেডিকেনি চেখে দেখতে আমরাও যে ভালবাসি, সে-কথা আর মুখ ফুটে বলাই গেল না।

ইস্টিশান থেকে নেমে প্রায় মাইলখানেক হাঁটবার পরে ক্যাবলার মামার বাড়ি। কাঁচা রাস্তা, এ'টেল মাটি, তার ওপর কাল রাতে একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে আবার। আগে থেকেই রসগোল্লার হাঁড়িটা বাগিয়ে নিলে টেনিদা।

—এটা আমি নিচ্ছি। বাকি মোটঘাটগুলো তোরা নে।

—রসগোল্লা বরং আমি নিচ্ছি, তুমি চালের পোঁটলাটা নাও টেনিদা।—লেডিকেনির পরিণামটা ভেবে আমি বলতে চেষ্টা করলাম।

টেনিদা চোখ পাকালো : খবরদার প্যালা, ও-সব মতলব ছেড়ে দে। টুপটাপ করে দু-চারটে গালে ফেলবার বুদ্ধি, তাই নয়? হুঁ-হুঁ বাবা—চালাকি ন চলিষ্যতি!

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গাঁটরি বোচকা কাঁধে ফেলে আমরা তিনজনেই এগোলাম।

কিন্তু তিন পাও যেতে হল না। তার আগেই ধাঁই—ধপাস্! টেনে একখানা রাম-আছাড় খেল হাবুল।

—এই খেয়েছে কচুপোড়া!—টেনিদা চেঁচিয়ে উঠলো।

সারা গায়ে কাদা মেখে হাবুল উঠে দাঁড়ালো। হাতের ডিমের পুটলিটা তখন কুঁকড়ে এতটুকু—হলদে রস গড়াচ্ছে তা থেকে।

ক্যাবলা বললে, ডিমের ডালনার বারোটা বেজে গেল।

তা গেল। করুণ চোখে আমরা তাকিয়ে রইলাম সেইদিকে। ইস্—এত কষ্টের ডিম! ওরই জন্যে রাজহাঁসের কামড় পর্যন্ত খেতে হয়েছে!

টেনিদা হুঙ্কার দিয়ে উঠল : দিলে সব পণ্ড করে! এই ঢাকাই বাঙালটাকে সঙ্গে এনেই ভুল হয়েছে! পিটিয়ে ঢাকাই পরোটা করলে তবে রাগ যায়!

আমি বলতে যাচ্ছিলাম, হাবুল চার টাকা চাঁদা দিয়েছে—তার আগেই কী যেন একটা হয়ে গেল! হঠাৎ মনে হল আমার পা দুটো মাটি ছেড়ে শোঁ করে শূন্যে উড়ে গেল, আর তারপরেই—

কাদা থেকে যখন উঠে দাঁড়ালাম, তখন আমার মাথা-মুখ বেয়ে আচারের তেল গড়াচ্ছে। ঐ অবস্থাতেই চেটে দেখলাম একটুখানি। বেশ ঝাল-ঝাল টক-টক—বেড়ে আচারটা করেছিল হাবুলের দিদিমা!

ক্যাবলা আবার ঘোষণা করলে, আমের আচারের একটা বেজে গেল!

টেনিদা ক্ষেপে বললে, চুপ কর বলছি ক্যাবলা—এক চড়ে গালের বোম্বা উড়িয়ে দেব।

কিন্তু তার আগেই টেনিদার বোম্বা উড়ল—মানে স্রেফ লম্বা হল কাদায়। সাত হাত দূরে ছিটকে গেল রসগোল্লার হাঁড়ি—ধবধবে শাদা রসগোল্লাগুলো পাশের কাদা-ভরা খানায় গিয়ে পড়ে একেবারে নেবুর আচার।

ক্যাবলা বললে, রসগোল্লার দুটো বেজে গেল!

এবার আর টেনিদা একটা কথাও বললে না। বলবার ছিলই বা কী! রসগোল্লার শোকে বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলতে ফেলতে চারজনে পথ চলতে লাগলাম আমরা।

টেনিদা তবু লেডিকেনিগুলো সাবাড় করেছে, কিন্তু আমাদের সান্ত্বনা কোথায়! অমন স্পঞ্জ রসগোল্লাগুলো!

পাঁচ মিনিট পরে টেনিদাই কথা কইল।

—তবু পোনা মাছগুলো আছে—কী বলিস! খিচুড়ির সঙ্গে মাছের কালিয়া আর আলুভাজা—নেহাত মন্দ হবে না—অ্যাঁ?

হাবুল বললে, হ-হ, সেই ভালো। বেশি খাইলে প্যাট গরম হইবো। গুরুপাক না খাওয়াই ভালো।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল : শেয়াল বলেছিল দ্রাক্ষাফল অতিশয় খাট্টা!—ক্যাবলা ছেলেবেলায় পশ্চিমে ছিল, তাই দুই-একটা হিন্দী শব্দ বেরিয়ে পড়ে মুখ দিয়ে।

টেনিদা বললে, খাট্টা! বেশি পাঁঠ্ঠামি করবি তো চাঁট্টা বসিয়ে দেব!

ক্যাবলা ভয়ে স্পীকটি নট! আমি তখনও নাকের পাশ দিয়ে ঝাল-ঝাল টক-টক তেল চাটছি। হঠাৎ বুক-পকেটটা কেমন ভিজে-ভিজে মনে হল। হাত দিয়ে দেখি, বেশ বড়ো-সড়ো এক টুকরো আমের আচার তার ভেতরে কায়েমি হয়ে আছে।

—জয় গুরু! এদিক-ওদিক তাকিয়ে টপ করে সেটা তুলে নিয়ে মুখে পুরে দিলাম। সত্যি—হাবুলের দিদিমা বেড়ে আচার করেছিল! আরো গোটাকয়েক যদি ঢুকতো!

বাগান-বাড়িতে পৌঁছুলাম আরো পনেরো মিনিট পরে।

চারিদিকে সুপুরি আর নারকেলের বাগান—একটা পানা-ভর্তি পুকুর, মাঝখানে একতলা বাড়িটা। কিন্তু ঘরে চাবিবন্ধ। মালীটা কোথায় কেটে পড়েছে, কে জানে!

টেনিদা বললে, কুছ্ পরোয়া নেই। চুলোয় যাক মালী। বলং বলং বাহুবলং—নিজেরা উনুন খুঁড়ব—খড়ি কুড়ুব, রান্না করব—মালী ব্যাটা থাকলেই তো ভাগ দিতে হত! যা হাবুল—ইঁট কুড়িয়ে আন্—উনুন করতে হবে। প্যালা, কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে আয়,—ক্যাবলাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যা।

—আর তুমি?—আমি ফস্ করে জিজ্ঞেস করে ফেললাম।

—আমি?—একটা নারকেল গাছে হেলান দিয়ে টেনিদা হাই তুলল : আমি এগুলো সব পাহারা দিচ্ছি। সবচাইতে কঠিন কাজটাই নিলাম আমি। শেয়াল কুকুর এলে তাড়াতে হবে তো।—যা তোরা—হাতে-হাতে বাকি কাজগুলো চটপট সেরে আয়।

কঠিন কাজই বটে! ইস্কুলের পরীক্ষার গার্ডদেরও অমনি কঠিন কাজ করতে হয়। ত্রৈরাশিকের অঙ্ক কষতে গিয়ে যখন 'ঘোড়া-ঘোড়া ঘাস-ঘাস' নিয়ে আমাদের দম আটকাবার জো, তখন গার্ড মোহিনীবাবুকে টেবিলে পা তুলে দিয়ে 'ফোঁরর্-ফোঁ' শব্দে নাক ডাকাতে দেখেছি।

টেনিদা বললে, যা—যা সব—দাঁত বের করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ঝাঁ করে রান্নাটা করে ফ্যাল—বড্ড ক্ষিদে পেয়েছে।

তা পেয়েছে বৈকি। পুরো এক হাঁড়ি লেডিকেনি এখনো গজগজ করছে পেটের ভেতর। আমাদের বরাতেই শুধু অন্তরম্ভা। প্যাঁচার মতো মুখ করে আমরা কাঠখড়ি সব কুড়িয়ে আনলাম।

টেনিদা লিস্টি বার করে বললে, মাছের কালিয়া—প্যালা রাঁধবে।

আমাকে দিয়েই শুরু। আমি মাথা চুলকে বললাম, খিচুড়ি-টিচুড়ি আগে হয়ে যাক—তবে তো?

—খিচুড়ি লাস্ট আইটেম—গরম গরম খেতে হবে। কালিয়া সকলের আগে। নে

www.boiRboi.blogspot.com

প্যালা—লেগে যা—

ক্যাবলার মা মাছ কেটে নুন-টুন মাখিয়ে দিয়েছিলেন, তাই রক্ষা। কড়াইতে তেল চাপিয়ে আমি মাছ ঢেলে দিলাম তাতে।

আরে—এ কী কান্ড! মাছ দেবার সঙ্গে সঙ্গেই কড়াই-ভর্তি ফেনা। তারপরেই আর কথা নেই—অতগুলো মাছ তালগোল পাকিয়ে গেল একসঙ্গে। মাছের কালিয়া নয়—মাছের হালুয়া।

ক্যাবলা আদালতের পেয়াদার মতো ঘোষণা করলো : মাছের কালিয়ার তিনটে বেজে গেল।

—তবে রে ইস্টুপিড—।—টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : কাঁচা তেলে মাছ দিয়ে তুই কালিয়া রাঁধিছিস? এবার তোর পালাজ্বরের পিলেরই একদিন কি আমারই একদিন।

এ তো মার্টিনের রেল নয়—সোজা মাঠের রাস্তা। আমার কান পাকড়াবার জন্যে টেনিদার হাতটা এগিয়ে আসবার আগেই আমি হাওয়া। একেবারে পাঞ্জাব মেলের স্পীডে।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, খিচুড়ির লিস্ট থেকে প্যালার নাম কাটা গেল।

তা যাক। কপালে আজ হরি-মটর আছে সে তো গোড়াতেই বুঝতে পেরেছি। গোমড়া মুখে একটা আমড়া-গাছতলায় এসে ঘাপটি মেরে বসে রইলাম।

বসে বসে কাঠ-পিঁপড়ে দেখছি, হঠাৎ গুটি গুটি হাবুল আর ক্যাবলা এসে হাজির।

—কী রে, তোরাও?

ক্যাবলা ব্যাজার মুখে বললে, খিচুড়ি টেনিদা নিজেই রাঁধবে। আমাদের আরো খড়ি আনতে পাঠাল।

সেই মুহূর্তেই হাবুল সেনের আবিষ্কার! একেবারে কলম্বাসের আবিষ্কার যাকে বলে!

—এই প্যালা—দ্যাখছস? ঐ গাছটায় কী রকম জলপাই পাকছে!

আর বলতে হল না। আমাদের তিনজনের পেটেই তখন ক্ষিদেয় ইঁদুর লাফাচ্ছে। জলপাই—জলপাই-ই সই! সঙ্গে সঙ্গে আমরা গাছে উঠে পড়লাম—আহা—টক-টক—মিঠে-মিঠে জলপাই—যেন অমৃত।

হাবুলের খেয়াল হল প্রায় ঘন্টাখানেক পরে।

—এই, টেনিদার খিচুড়ি কী হইল?

ঠিক কথা—খিচুড়ি তো এতক্ষণে হয়ে যাওয়া উচিত। তড়াক করে গাছ থেকে নেমে পড়ল ওরা। হাতের কাছে পাতা-টাতা যা পেলে, তাই নিয়ে ছুটল ঊর্ধ্বশ্বাসে। আমিও গেলাম পেছনে পেছনে, আশায় আশায়। মুখে যাই বলুক—এক হাতা খিচুড়িও কি আমায় দেবে না? প্রাণ কি এত পাষাণ হবে টেনিদার?

কিন্তু খানিক দূর এগিয়ে আমরা তিনজনেই থমকে দাঁড়ালাম। একেবারে মন্ত্রমুগ্ধ!

টেনিদা সেই নারকেল গাছটা হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, দে—দে ক্যাবলা, পিঠটা আর একটু ভাল করে চুলকে দে।

পিঠ চুলকে দিচ্ছে—সন্দেহ কী। কিন্তু সে ক্যাবলা নয়—একটা গোদা বানর। আর চার-পাঁচটা গোল হয়ে বসেছে টেনিদার চারিদিকে। কয়েকটা তো মুঠো-মুঠো চাল-ডাল মুখে পুরছে, একটা আলুগুলো সাবাড় করছে আর আস্তে আস্তে

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদার পিঠ চুলকে দিচ্ছে। আরামে হাঁ করে ঘুমুচ্ছে টেনিদা, থেকে থেকে বলছে, দে ক্যাবলা, আর একটু ভালো করে চুলকে দে!

এবার আমরা তিনজনে গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম : টেনিদা—বাঁদর—বাঁদর!

—কী! আমি বাঁদর!—বলেই টেনিদা হাঁ করে সোজা হয়ে বসল—সঙ্গে সঙ্গেই বাপ্ বাপ্ বলে চিৎকার!

—ই-ই—ক্লিচ্-ক্লিচ্! কিচ্-কিচ্!

চোখের পলকে বানরগুলো কাঁঠাল গাছের মাথায়। চাল-ডাল আলুর পুঁটলিও সেই সঙ্গে। আমাদের দেখিয়ে দেখিয়ে তরিবৎ করে খেতে লাগল—সেই সঙ্গে কী বিচ্ছিরি ভেংচি! ঐ ভেংচি দেখেই না লঙ্কার রাক্ষসগুলো ভয় পেয়ে যুদ্ধে হেরে গিয়েছিল!

পুকুরের ঘাটলায় চারজনে আমরা পাশাপাশি চুপ করে বসে রইলাম। যেন শোক-সভা! খানিক পরে ক্যাবলাই স্তব্ধতা ভাঙল।

—বন-ভোজনের চারটে বাজল।

—তা বাজল।—টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : কিন্তু কী করা যায় বল তো প্যালা? সেই লেডিকেনিগুলো কখন হজম হয়ে গেছে—পেট চুঁই-চুঁই করছে খিদেয়!

অগত্যা আমি বললাম, বাগানে একটা গাছে জলপাই পেকেছে, টেনিদা—

—জলপাই! ইউরেকা! বনে ফল-ভোজন—সেইটেই তো আসল বন-ভোজন! চল চল, শিগগির চল!

লাফিয়ে উঠে টেনিদা বাগানের দিকে ছুটল।

প্যাঁচা ও পাঁচুগোপাল

ছেলেবেলা থেকেই পাঁচুগোপালের দুর্দান্ত বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

না হয়ে যায় কোথায়! তিনদিন তিনরাত পাঁচুঠাকুরের দোরগোড়ায় ধর্ণা দিয়ে তবে পাঁচুগোপালের আবির্ভাব। যখন জন্মেছিল তখন তার হাত-পা ছিল কাঠির মতো সরু সরু—তিন নম্বরী ফুটবলের মতো তার মস্ত মাথাটাই চোখে পড়ত তখন। আরো কী আশ্চর্য—পুরো একটি বছর মাথায় একগাছা চুল গজায়নি পর্যন্ত।

প্রতিবেশীর কাছে পাঁচুগোপালের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে হাপুস্-হুপুস্ করে কেঁদেই সারা হয়ে যেতেন ক্ষেমঙ্করী পিসিমা।

—আহা, পাঁচু আমাদের ক্ষণজন্মা! এখন বরাতে টিঁকলে হয়!—ওর মাথায় কেন

চুল গজায়নি, জানো? বাছার মাথায় এত বুদ্ধি যে সেই বুদ্ধির গরমে আর চুল গজাতে পারেনি। সাক্ষাৎ পাঁচুঠাকুর আমাদের ঘরে জন্মেছেন গো! এসব তাঁরই 'নীলে' (লীলা)—আবেগের চোটে শেষ পর্যন্ত ক্ষেমঙ্করী পিসিমার হিক্কা উঠতে থাকে। তখন পাড়াপড়শিরা তাঁর মাথায় জল ঢেলে তাঁকে বাড়ি পাঠিয়ে দেয়।

তারপর অনেক দিন পার হয়ে গেছে।

আগ্নেয়গিরির আগুনও একদিন ঠাণ্ডা হয়—পাঁচুগোপালের মগজ তো কোন্ ছার! যথাসময়ে সে-মাথায় উলুবনের মতো চুল গজিয়েছে। শুধু গজায়নি, সে চুল ছাঁটতে এখন পাঁচুগোপালের করকরে নগদ দুটি করে টাকা খরচ। আর জুতসই করে টেরি বাগাতে কোন্ না দুটি ঘণ্টা দৈনিক কাবার হয়ে যায় তার?

আর ঐ টেরি বাগাতে গিয়েই যতো ঝামেলা! রোজ ইস্কুলে লেট হয়ে যায়। লেট হতে হতে একেবারে ফেল—ট্রেন নয়, ম্যাট্রিকুলেশন। পাক্কা তিনটি বার ঠোক্কর খেয়ে পাঁচুগোপাল এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণায় রত।

পোকা-মাকড়, টিকটিকি, আরশোলা, পাখি—এইসব তার গবেষণার বিষয়বস্তু। আর সে গবেষণার চোটে স্বয়ং ক্ষেমঙ্করী পিসিমারই হাঁড়ির হাল!

কুঁড়োজালির মধ্যে হাত দিয়েছেন—ফরফর করে একঝাঁক আরশোলা উড়ে বেরিয়ে করকরে ঠ্যাঙে তাঁর গায়ে হাঁটতে শুরু করল—পিসিমার তো হাই-মাই চিৎকার! পাঁচু তার কুলির মধ্যে আরশোলা পুষতে চেয়েছিল। আর একবার ঘরে ঢুকতে দেখলেন—চারিদিকের দেওয়ালে সুতো বাঁধা সাত-আটটা জ্যান্ত টিকটিকি ঝুলছে।

—এ কী রে মুখপোড়া! এ কী!—পিসিমা চেঁচিয়ে উঠলেন—

একগাল হেসে পাঁচু বললে, ঘাবড়াচ্ছ কেন পিসিমা, দিব্যি বিনি-পয়সার ঘড়ি, সারা দিনরাত টিক্‌টিক্ করবে।

—তোর ঘড়ির নিকুচি করেছে অনামুখো!—হাতের কাছে একটা ধামা কুড়িয়ে পেয়ে তাই নিয়ে পাঁচুকে তাড়া করলেন ক্ষেমঙ্করী পিসিমা।

কিন্তু যে ছেলে ছাই-চাপা আগুন, তাকে ধামা-চাপা দেওয়া অতই শস্তা? রামচন্দ্র! ততক্ষণে তুফান মেল আসানসোল পার—মানে, পাঁচুগোপাল বেমালুম ভ্যানিশ!

* * *

ক্ষেমঙ্করী পিসিমার পাঁচুগোপাল, আর পাঁচুগোপালের ক্ষেমঙ্করী পিসিমা—ত্রিসংসারে দুজনের আপন বলতে আর কেউ নেই। পাঁচু জন্মাবার অল্প কয়েক বছর পরেই ওর বাবা-মা মারা গেলে নিঃসন্তান বিধবা পিসিমাই পরম যত্নে পাঁচুগোপালকে মানুষ করে আসছেন।

হাওড়া বাজেশিবপুরে বলাই ঢ্যাং লেনে ক্ষেমঙ্করী পিসিমার বাড়ি। পিসিমা পূর্বজন্মে বোধহয় গোটাকয়েক হাঁড়িচাঁচা ভাজা খেয়ে থাকবেন, তাই এজন্মে একেবারে মোক্ষম গলা নিয়ে জন্মেছেন। গলা থেকে তো আওয়াজ বেরোয় না—বেরোয় নিনাদ। আচমকা সে চিৎকার কানে গেলে রোগা পটকা লোকের হার্টফেল হয়ে যেতে পারে।

লোকে বলে, ঐ গলা আছে তাই বাঁচোয়া। ক্ষেমঙ্করী পিসিমা সাক্ষাৎ যক্ষী বাড়ি। তার টাকায় ছাতা পড়েছে। আধপেটা খেয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা জমিয়েছে বাড়ি। এই গলা দিয়েই পিসিমা সে টাকা পাহারা দেন। পিসিমা মরলে সে টাকা লাগবে পাঁচুগোপালের ভোগে।

কিন্তু তার আগেই যা অবস্থা—পিসিমাকে জেরবার করে ফেলেছে পাঁচুগোপাল। ব্যাপার আর কিছুই নয়—সেরেফ সেই বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

পাঁচুগোপাল বায়না ধরে বসেছে, সে প্যাঁচা পুষবে।

প্যাঁচা পুষবে! কথাটা শুনে আধঘণ্টা প্যাঁচার মতো মুখ করে বসে থেকেছেন ক্ষেমঙ্করী পিসিমা। পাগল না পাহারাওলা!

পাঁচুগোপাল নাছোরবান্দা।

—ওরে গোমুখ্যু, এ কী বুদ্ধি তোর? প্যাঁচা কি কেউ পোষে? শিস দেয় না—রা কাড়ে না, শুধু রাতদুপুরে 'হুদ্দুমদুম' করে এমন বিটকেল আওয়াজ ছাড়ে যে আত্মারাম খাঁচাছাড়া! না না—ওসব চলবে না—ক্ষেমঙ্করী পিসিমা ঘোষণা করছেন।

পাঁচুগোপালের মুখে-চোখে ফুটে বেরিয়েছে গভীর একটা সংসার-বৈরাগ্য : প্যাঁচা পুষতে দেবে না? বেশ, ভাল কথা। আমিও তাহলে ছাই মেখে সন্নিসি হয়ে হিমালয়ে চলে যাব। এ সংসারে কেই বা কার!

শুনে কেঁদে ফেলেছেন ক্ষেমঙ্করী পিসিমা : ওরে অমন অলক্ষুণে কথা বলিসনি! সংসারে তুই আমার, আমিই তোর; সন্নিসি হয়ে তোর কাজ নেই বাবা—তোর চাঁদমুখে একরাশ দাড়ি দেখলে আমি সইতে পারব না! তুই প্যাঁচা পোষ বাবা, বাদুড় পুষতে পারিস, চামচিকে পুষলেও আপত্তি নেই। দোহাই বাপধন পাঁচুগোপাল, সন্নিসি হোসনি!

এতক্ষণে একগাল হেসেছে পাঁচুগোপাল। তারপর লম্বা একটা শিস দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্যাঁচার সন্ধানে।

যোগাড় করতে অবিশ্যি খুব কষ্ট হয়নি। গলির মোড়ের বিড়িওলা এজলাস মিঞাকে আটগণ্ডা পয়সা দিতেই একটা প্যাঁচার বাচ্চা এনে দিলে দমদমা থেকে।

নতুন কেনা খাঁচায় নতুন প্যাঁচার ছানা নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ঢুকল পাঁচুগোপাল।

—পিসিমা, পিসিমা!

ক্ষেমঙ্করী পিসিমা তখন কুঁড়োজালি জপবার নাম করে চোখ বুজে টাকার হিসেব করছিলেন। পাঁচুর ডাকে চমকে উঠলেন।

—কী রে মুখপোড়া, হয়েছে কি? অমন চ্যাঁচাচ্ছিস কেন?

—পিসিমা, চিড়িয়া আ গিয়া—আনন্দের চোটে পাঁচুর মুখ দিয়ে হিন্দী বেরিয়ে পড়ল।

—চিঁড়ে! আবার চিঁড়ে দিয়ে কী হবে? এই তো একটু আগে একধামা মুড়ি-মুড়কি খেয়ে গেলি।—বলতে বলতে খাঁচার দিকে নজর পড়ল পিসিমার : ওগো মাগো, এটা আবার কী গো।

—ওগো এটা প্যাঁচা গো। চিঁড়ে নয়, চিঁড়ে নয়, এটাই চিড়িয়া গো—পিসিমার স্বরের অনুকরণে জানালো পাঁচুগোপাল।

—মরণ! মুখ কুঁচকে পিসিমা বললেন, তোর চিঁড়ে-মুড়ি নিয়ে ধুয়ে খা, ওসব অনাছিষ্টি কাণ্ডের মধ্যে আমি নেই!

এবার পাঁচুগোপাল লেগে গেল তার চিঁড়ে-মুড়ি অর্থাৎ চিড়িয়া মানে প্যাঁচার পরিচর্যায়।

আহা, কী রূপ! রূপে একেবারে চারিদিক অন্ধকার করে রেখেছে! সারা গায়ে ছাই রঙের পালক ফুলে আছে। থ্যাবড়া গোল মুখ—ধারালো ঠোঁট। সমস্ত মুখটায় এমন বিচ্ছিরি বিরক্ত যে মনে হয় প্যাঁচাটা বুঝি এইমাত্তর এক গেলাস চিরতা খেয়ে এসেছে। আফিংখোরের মতো সারাটা দিন বসে বসে ঝিমুচ্ছে, এক-আধবার যখন

www.boiRboi.blogspot.com

চোখ মেলছে, তখন ভাঁটার মতো সে চোখ দেখে হৃৎকম্প হচ্ছে লোকের। কেউ কাছে গিয়ে ঝিমুনি ভাঙানোর চেষ্টা করলেই খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে এক ঠোকর—একেবারে রক্তারক্তি কাণ্ড!

তার আসল পরাক্রম প্রকাশ পায় রাত্তিরবেলায়।

—হুদ্দুম্‌দুম—হুদ্দুম—দুদুম—সারা রাত সে ভুতুড়ে চিৎকার ছাড়ে। দুটো আগুনের গোলার মত চোখ তার জ্বল্‌জ্বল্‌ করে জ্বলে—খাঁচার মধ্যে সে পাখা ঝাপটে ঝাপটে উড়তে চেষ্টা করে। আর সারাদিন ধরে যেসব আরশোলা, ব্যাঙ আর টিকটিকি পাঁচু তার খাঁচায় জোগাড় করে রেখেছে, একটার পর একটা সেগুলোই সে গিলতে থাকে টপাটপ করে।

এক-একদিন ক্ষেপে ওঠেন পিসিমা।

—গেরস্ত বাড়িতে এক কী সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড গো! সাতজন্মে এমন কথা কেউ শুনেছে! ও যমের অরুচি প্যাঁচাকে বাড়ি থেকে আজ বিদায় করে ছাড়ব!

পাঁচু আঁতকে ওঠে : সর্বনাশ, বলছ কী পিসিমা। প্যাঁচা তাড়াবে?

—তাড়াব না? প্যাঁচা আমার কোন্‌ নাতজামাই শুনি? মাগো, কী বিদিকিচ্ছি ডাক! শুনলে ভূত পালায়! না, প্যাঁচা আমি বাড়িতে রাখব না—

—পিসিমা, ছি-ছি!—পাঁচুর গলা হঠাৎ গম্ভীর : জানো, প্যাঁচা কে?

—কে আবার? দুনিয়ার অখাদ্যি জন্তু—পিসিমার প্রত্যুত্তর।

—না পিসিমা, তা নয়!—পাঁচু থিয়েটারি ভঙ্গিতে বলতে থাকে, তুমি কি জানো না পিসিমা, প্যাঁচা লক্ষ্মীর বাহন? যদি প্যাঁচাকে তাড়িয়ে দাও—লক্ষ্মী এসে কোথায় বসবেন? বরং প্যাঁচা ঘরে থাকলে তার পিঠে চেপে থাকবেন—একদম অচলা। এমন সুযোগ হেলায় হারিয়ো না পিসিমা—সাধা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলো না।

অকাট্য যুক্তি। খানিকক্ষণ মাথা চুলকে পিসিমা দেখলেন, এর প্রতিবাদ করা যাবে না। অগত্যা মনে মনে প্যাঁচার মৃত্যু-কামনা করতে করতে পিসিমা ছাদে ঘুটে দিতে চললেন। পেছনে পাঁচু শিস দিয়ে প্যাঁচাকে শোনাতে লাগল : পড়ো বাবা আত্মারাম, নিতাই-গৌর রাধেশ্যাম—

প্যাঁচা, পাঁচু ও পিসিমার এমনি দুঃখেসুখে যখন দিন কাটছিল, তখন ঘটনাস্থলে গুরুপুত্তুরের আবির্ভাব হল।

সাতপুরুষে আগে ক্ষেমঙ্করী পিসিমার কোন এক আত্মীয় গুরুপুত্তুরের কোন পূর্বপুরুষের কাছে দীক্ষা নিয়েছিলেন। সেই সুবাদে বছরে একবার এই গুরু-পুত্তুরদের আবির্ভাব হয়। দশটি টাকা, একজোড়া ধুতি আর পর্বত-প্রমাণ খাওয়া-দাওয়া করে তাঁরা বিদায় নেন। ক্ষেমঙ্করী পিসিমা মনে মনে বিরক্ত হন—কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেন না। হাজার লোক—গুরুর বংশ! তাকে চটানো মানেই গোখরো সাপের ল্যাজ দিয়ে কান চুলকোনো। কখন ফোঁস করে অভিসম্পাত দিয়ে বসবে,—ব্যাস তাহলেই সর্বনাশ।

সন্ধেবেলা দর্শন দিলেন গুরুপুত্তুর।

এর আগে যে বুড়ো আসতেন, এ তাঁর ছেলে। বুড়ো গুরু মানুষটি মোটের ওপর মন্দ ছিলেন না। গত বছর তিনি মারা গেছেন। তাই এবার তাঁর ছেলে এসেছে বার্ষিক প্রণামী আদায়ের ফিকিরে।

ছেলেটির চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, এক নম্বরের পাখোয়াজ। বছর আঠারো-উনিশ বয়স হবে। মাথায় টেরির কায়দাটি এমন নিপুণ যে, পাঁচুগোপালও লজ্জা পায়। নাকের নিচে বাটারফ্লাই গোঁফ, কানে সিগারেট গোঁজা।

এসেছে দিব্যি রসকলি কেটে। 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ' বলতে বলতে বাড়ি ঢুকল। যেন সাক্ষাৎ বৃন্দাবনের গোঁসাই।

গুরুপুত্তুরকে দেখেই ক্ষেমঙ্করী পিসিমার মেজাজ খিচড়ে গেছে। কিন্তু আর কী করেন, মহা সমাদরে বসালেন। হাজার হোক গুরুপুত্তুর! গোখরো সাপ না হোক তার ল্যাজ তো বটে!

গুরুপুত্তুর বয়সে পিসিমার চাইতে চল্লিশ বছরের ছোট। কিন্তু কী আসে যায় —গোখরোর ল্যাজ কিনা! কান থেকে সিগারেট নামিয়ে সেটাকে ধরালো, তারপর কায়দা করে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে, কই হে ক্ষেমঙ্করী, এবার সেবার ব্যবস্থা করো।

পিসিমার পিত্তি জ্বলে গেল। তবু গলবস্ত্র হয়ে সবিনয়ে বললেন, কী সেবা হবে বাবা?

পোলাও আর পাঁঠার কালিয়া। যাও—চটপট। ভারি খিদে পেয়েছে!

পিসিমা বললেন, সে কী ঠাকুর! আপনি তো বোষ্টমের সন্তান। পাঁঠার কালিয়া খাবেন কী করে? আমি বরং কাঁচকলার 'কারি' তৈরি করে দিচ্ছি—

—ড্যাম ইয়োর কাঁচকলার কারি—তেড়ে উঠলেন গুরুপুত্তুর। ওসব কাঁচকলা-ফাঁচকলার মধ্যে আমি নেই। পাঁঠার কালিয়ায় একটা তুলসী-পাতা ফেলে দিয়ো, তাহলে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে—একদম মালসা-ভোগ। যাও, দেরি কোরো না। Hurry up!

'হারি আপ' শুনে হাঁড়ির মতো মুখ করে পিসিমা উঠে গেলেন। ইচ্ছে করছিল পাঁঠার নয়, মুড়ো ঝাঁটার কালিয়া খাইয়ে দেন। কিন্তু হাজার হোক—

পাঁচুগোপাল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গুরুপুত্তুরের লীলা দেখছিল। এবার গুরু-পুত্তুর তার দিকে মনোনিবেশ করলেন।

—এই, তোর নাম কী রে?

—পাঁচুগোপাল।

—পাঁচুগোপাল! গুরুপুত্তুর দাঁত খিঁচিয়ে বলেন, পাঁচু না, পেঁচো। যা তোর মুখের শ্রী—তুই আবার পাঁ—চু গো—পাল। নে চলে আয়—গুরুপুত্তুর একখানা পা পাঁচুর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, টেপ।

—টিপব?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—টিপবি বৈকি। গুরুর পা টিপলে স্বর্গে যাবি। নে, চলে আয়, দেরি করিসনি—গুরুপুত্তুর আবার মুখভরা সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়লেন।

পেঁচোর মতোই মুখ করে পাঁচু পা টিপতে বসল। মনে মনে স্বগতোক্তি করলে : আচ্ছা দাঁড়াও। পা টেপানো তোমার বার করে ছাড়ব—তবে আমি পাঁচুগোপাল।

সেইদিন মাঝরাত্রে গুরুপুত্তুরের হাউমাউ চিৎকারে পিসিমা লাফিয়ে উঠলেন। পাড়ার লোকজন লাঠি ঠ্যাঙা নিয়ে তেড়ে এল। হৈ-হৈ কাণ্ড!

রাত্তিরে প্যাঁচাটাকে কে ছেড়ে দিয়েছিল কে জানে! গুরুপুত্তুর যেই গুটি-গুটি ঘর থেকে বেরিয়েছেন, অমনি কোত্থেকে সেটা এসে তাঁকে আক্রমণ করেছে। দুটো জ্বলজ্বলে আগুনের মতো চোখ দেখে আর মাথার ওপর তিনটে ঠোকর খেয়েই একবার চিৎকার ছেড়ে তাঁর পতন ও মূর্ছা।

মাথায় দশ বালতি জল ঢালবার পরে তবে তাঁর চৈতন্য হল। গোঙাতে গোঙাতে তিনি তখনো বলছেন : ভূ—ভূ—ভূত।

—ভূত না, প্যাঁচা। পাঁচুর প্যাঁচা।—পিসিমা জানালো।

www.boiRboi.blogspot.com

—অ্যাঁ, প্যাঁচা। ভদ্দরলোকের বাড়িতে প্যাঁচা।—গুরুপুত্তুর উঠে বসলেন।

—হ্যাঁ, পোষা—আবার সভয়ে জ্ঞাপন করলেন পিসিমা।

—পোষা! প্যাঁচা কেউ পোষে!—গুরু চেঁচিয়ে উঠলেন : তাড়িয়ে দাও। একটু হলেই আমার মহাপ্রাণ বেরিয়ে গিয়েছিল!

—পাঁচুর পোষা প্যাঁচা বাবা। ও লক্ষ্মীর বাহন—ওকে তাড়াতে পারব না। ব্যাজার মুখে পিসিমা বললেন।

—তবে অন্তত ওটাকে খাঁচায় আটকাও।—গুরুপুত্তুর বললেন, নইলে এ বাড়িতে একদণ্ড আমি থাকব না—অভিসম্পাত দিয়ে চলে যাব।

অভিসম্পাত। পিসিমা শিউরে উঠলেন। গোখরো সাপের ল্যাজ ক্ষেপে উঠেছে। ভয়ে ভয়ে বললেন, বাবা পাঁচু, তোর প্যাঁচা সামলা!

পাঁচু নীরবে দেখছিল ব্যাপারটা। মন্দ হয়নি—পা টেপানোটা আদায় করা গেছে সুদে-আসলে। প্যাঁচাটার দিকে হাত বাড়িয়ে ডাকল : আয় আয় আত্মারাম—চুঃ—

প্যাঁচাটা উড়ে এসে তার হাতে বসল।

কিন্তু গুরুপুত্তুর কেন প্যাঁচাকে সামলাতে বলেছিলেন, তার উত্তর পাওয়া গেল পরদিন সকালে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তাঁর টিকিও দেখা গেল না। আর সেই-সঙ্গে দেখা গেল না পিসিমার বাক্সের নগদ তিনশো টাকা, একরাশ বাসন আর পাঁচু-গোপালের একজোড়া নতুন সিল্কের পাঞ্জাবি।

বুক চাপড়ে কাঁদতে লাগলেন পিসিমা : হায় হায়। প্যাঁচাই ঠিক বুঝেছিল। কেন প্যাঁচাকে খাঁচায় বন্ধ করতে গেলাম! হায় হায়। প্যাঁচাই আমার ঘরের লক্ষ্মী, কেন প্যাঁচাকে আটকাতে বললাম!

এক বছর পরের কথা।

হাথরাস জংশন। ওয়েটিং রুমের এক প্রান্তে বসে মথুরার ট্রেনের প্রতীক্ষা করছিলেন পিসিমা আর পাঁচুগোপাল। তীর্থ করতে এসেছেন তাঁরা।

পাঁচুর হাতের ওপর প্যাঁচা ধ্যানস্থ হয়ে বসে আছে।

ওয়েটিং রুমের আর-এক পাশে দাড়িওয়ালা এক সাধুবাবা একদল গ্রাম্য লোককে উপদেশ দিচ্ছেন। কারো হাত দেখছেন, কাউকে তাবিজ দিচ্ছেন, কাউকে বিতরণ করছেন ধর্মোপদেশ। দুটি একটি করে টাকা জমছে পায়ের কাছে—বেশ ব্যবসা ফেঁদেছেন সাধুবাবা।

কিন্তু কেমন যেন খটকা লাগছে পিসিমার। সাধুবাবার গলাটা যেন চেনা! কোথায় শুনেছেন?

কিছুতে মনে করতে পারলেন না।

কিন্তু প্যাঁচাটার মনে পড়ল।

ওয়েটিং রুমটার ওপর থেকে দিনের আলো নিবে গিয়ে যেই এল সন্ধ্যার অন্ধকার, অমনি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল প্যাঁচাটা। চোখ দুটো দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলে উঠল তার। তারপর হঠাৎ ফড়াৎ করে উড়ে গিয়ে প্রচণ্ড বেগে কয়েকটা ঠোকর মারল সাধুবাবার মাথার ওপর।

সাধু হাঁইমাই করে উঠলেন। হট্টগোলে ভরে গেল ওয়েটিং রুম। আর সেই গোলমালে সাধুবাবার নকল গোঁফদাড়ি খসে গিয়ে বেরিয়ে পড়ল—গুরুপুত্তুর!

পুলিস এসে পড়ল। সাধুর ঝোলা থেকে বেরুল সিঁধকাঠি, সেইসঙ্গে একগাদা চোরাই মাল। দুজন শিষ্য সঙ্গে ছিল, তারাও ধরা পড়ল। জানা গেল, তারা এ অঞ্চলের দুজন নামকরা দাগী চোর।

প্যাঁচা ততক্ষণে ভালো মানুষটির মতো পাঁচুগোপালের হাতে এসে বসেছে।

সম্প্রতি ইউ. পি. গভর্নমেণ্ট ক্ষেমঙ্করী পিসিমাকে একখানা চিঠি দিয়েছেন। সে চিঠিতে জানানো হয়েছে, তিনটে নামকরা চোরকে ধরিয়ে দেবার জন্যে পাঁচুগোপালের প্যাঁচাকে একটা সোনার মেডেল আর একবাক্স নেংটি ইঁদুর পুরস্কার দেওয়া হবে।

www.boiRboi.blogspot.com

পরের উপকার করিও না

আমি, প্যালারাম, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—তিনজনে নেহাত গো-বেচারার মতো কাঁচুমাচু মুখ করে বসে আছি। তাকিয়ে আছি কাঠগড়ার আসামীর দিকে। তার মুখ আমাদের চেয়েও করুণ। ছ' ফুট লম্বা অমন জোয়ানটা ভয়ে কেন্নোর মতো কুঁকড়ে গেছে। গণ্ডারের খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটাও যেন চেপসে গেছে একটা থ্যাবড়া ব্যাংয়ের মতো। সাধুভাষায় যাকে বলে, দস্তুরমতো পরিস্থিতি!

কে আসামী?

আর কে হতে পারে? আমাদের পটলডাঙার সেই স্বনামধন্য টেনিদা। গড়ের মাঠের গোরা ঠ্যাঙানোর সেই প্রচণ্ড প্রতাপ এখন একটা চায়ের কাপের মতো ভাবা-চাকা হয়ে গেছে। চায়ের কাপ না বলে চিরতার গেলাসও বলতে পারা যায় বোধহয়।

—হুজুর ধর্মাবতার—

ফরিয়াদী পক্ষের উকিল লাফিয়ে উঠলেন। মনে হল যেন হাত দশেক ছিটকে উঠল একটা কুড়ি-নম্বরী ফুটবল। গলার আওয়াজ তো নয়—যেন আট-দশটা চিনে-পটকা ফাটল একসঙ্গে। ধর্মাবতার চেয়ারের ওপর আঁতকে উঠে পড়তে পড়তে সামলে গেলেন।

—অমন বাজখাঁই গলায় চেঁচাবেন না মশাই, পিলে চমকে যায়।—জজ সাহেব ভ্রু কোঁচকালেন : কী বলতে হয় ঝটপট বলে ফেলুন।

উকিল একটা ঘুসি বাগিয়ে তাকালেন টেনিদার দিকে। একরাশ কালো কালো আলপিনের মতো গোঁফগুলো তাঁর খাড়া হয়ে উঠল।

—ধর্মাবতার, আসামী ভজহরি মুখুজ্জে (আমাদের টেনিদা) কী অন্যায় করেছে, তা আপনি শুনেছেন। অবোলা জীবের ওপর ভীষণ অত্যাচার সে করেছে, তার নিন্দের ভাষা নেই। একটা ছাগল পরশু থেকে কাঁচা ঘাস পর্যন্ত হজম করতে পারছে না। আর-একটা সমানে বমি করছে। আর-একটা তিন দিন ধরে যা পাচ্ছে তাই খাচ্ছে—ফরিয়াদীর একটা ট্যাঁক-ঘড়ি সুদ্ধু চিবিয়ে ফেলেছে!

রোগা সিটকে একটা লোক, হলধর পালুই—সে-ই ফরিয়াদী। হলধর ফোঁস্-ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগল।

—খুব ভালো ঘড়ি ছিল হুজুর—কী শক্ত! আমার ছেলে ঐটে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আম পাড়ত। চলত না বটে, তবু ঘড়ির মতো ঘড়ি ছিল একটা!—বলে, হলধর এবার ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেলল। কান্নার বেগ একটু থামলে বললে, ঘড়ি না-হয় যাক হুজুর, কিন্তু আমার অমন তিনটে ছাগল! বুঝি পাগল হয়ে গেল হুজুর—একেবারে উদ্দাম পাগল!

জজ কানে একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে চুলকোতে চুলকোতে বিরক্ত মুখে বললেন, আঃ—জ্বালাতন! আরে বাপু, তুমি তো দেখছি একটা ছাগল! ছাগল কখনো পাগল হয়? সে যাক, অপরাধের গুরুত্ব চিন্তা করে আমি আসামী ভজহরি মুখুজ্জেকে তিন টাকা জরিমানা করলাম। এই তিন টাকা ফরিয়াদী হলধর পালুইকে দেওয়া হবে তার ছাগলদের রসগোল্লা খাওয়াবার জন্যে।

জজ উঠে পড়লেন।

টেনিদা আমাদের দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। ভাবটা এই : এ-যাত্রা তরিয়ে দে! আমার টাঁকি তো গড়ের মাঠে!

আমি, ক্যাবলা আর হাবুল সেন—চার মূর্তির তিন মূর্তি—চাঁদা করে তিন টাকা জমা দিয়ে টেনিদাকে খালাস করে আনলাম।

নিঃশব্দে চারজনে পথ দিয়ে চলেছি। কে যে কী বলব ভেবে পাচ্ছি না।

খানিক পরে আমি বললাম, খুব ফাঁড়া কেটে গেছে।

ক্যাবলা বললে, হ্যাঁ—জেল হয়ে যেতে পারত!

হাবুল ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, দ্বীপান্তরও হইতে পারত! একটা ছাগল যদি মইর‍্যা যাইতগা, তাইলে ফাঁসি হওনই বা আশ্চর্য আছিল কী।

এতক্ষণ পরে টেনিদা গাঁক-গাঁক করে উঠল : চুপ কর, মেলা বাজে বকিসনি। ইঃ, ফাঁসি! ফাঁসি হওয়া মুখের কথা কিনা!

আবার নিস্তব্ধতা। টেনিদার পেছু-পেছু আমরা গড়ের মাঠের দিকে এগিয়ে চললাম। খানিক পরে আমিই আবার জিজ্ঞাসা করলাম, চানাচুর খাবে টেনিদা?

—নাঃ—টেনিদার মুখে-চোখে একটা গভীর বৈরাগ্য।

—আইসক্রীম কিনুম?—হাবুল সেনের প্রশ্ন।

—কিচ্ছু না।—টেনিদা একটা বুক-ফাটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : মন খিঁচড়ে গেছে—বুঝলি পটলা! সংসারে কারুর উপকার করতে নেই!

আমি বললাম, নিশ্চয় না!

—উপকারীকে বাঘে খায়।—ক্যাবলা বললে।

আমার মনের কথাটা বলে দিয়েছিস—বলে টেনিদা ক্যাবলার পিঠ চাপড়ে দিলে। ক্যাবলা 'উঃ উঃ' করে উঠল।

হাবুল বললে, বিনা উপকারেই যখন পৃথিবী চলতে আছে, তখন উপকার করতে গিয়ে খামাখা ঝামেলা বাড়াইয়া হইবো কী?

—যা কইছস!—মনের আবেগে টেনিদা এবার হাবুলের ভাষাতেই হাবুলকে সমর্থন জানালো। তারপর গর্জন করে বললে, আমি আর-একখানা নতুন বর্ণ-পরিচয় লিখব। তার প্রথম পাঠ থাকবে : কখনও পরের উপকার করিও না।

ক্যাবলা বললে, সাধু, সাধু।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, সাধু! খবরদার—সাধু-ফাধুর নাম আমার কাছে

আর করবিনে। যদি ব্যাটাকে পাই—বলে, প্রচণ্ড একটা ঘুঁসি হাঁকালো আকাশের দিকে।

ব্যাপারটা তাহলে খুলেই বলি গোড়া থেকে।

মানুষের অনেক রকম রোগ হয় : কালাজ্বর, পালাজ্বর, নিমোনিয়া, কলেরা, পেট-ফাঁপা—এমনকি ঝিনঝিনিয়া পর্যন্ত। সব রোগের ওষুধ আছে, কিন্তু একটি রোগের নেই। সে হল পরোপকার। যখন চাগায় তখন অন্য লোকের প্রাণান্ত করে ছাড়ে।

টেনিদাকে একদিন এই রোগে ধরল। ছিল বেশ, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে খাচ্ছিল-দাচ্ছিল, বাঁশি বাজাচ্ছিল। হঠাৎ কী যে হল—কালীঘাটের এক সাধুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল।

হাতে চিমটে, মাথায় জটা, লেংটি পরা এক বিরাটকায় সাধু। খানিকক্ষণ কটমট করে টেনিদার দিকে তাকিয়ে হেঁড়ে গলায় বললে, দে পাঁচসিকে পয়সা।

পাঁচসিকে পয়সা! টেনিদা বলতে যাচ্ছিল, ইয়ার্কি নাকি! কিন্তু সাধুর বিশাল চেহারা, বিরাট চিমটে আর জবাফুলের মতো চোখ দেখে ভেবড়ে গেল। তো-তো করে বললে, পাঁচসিকে তো নেই বাবা, আনা-সাতেক হবে!

—আনা-সাতেক? আচ্ছা তাই দে, আর একটা বিড়ি।

—বিড়ি তো আমরা খাইনে বাবাঠাকুর।

—হুঁ, গুড-বয় দেখছি। তা বেশ। বিড়ি-ফিড়ি কক্ষনো খাসনি—ওতে যক্ষ্মা হয়। যাক—পয়সাই দে।

পয়সা হাতে পেয়ে সাধুর হাঁড়ির মতো মুখখানা খুশিতে ভরে উঠল। ঝুলি থেকে একটা জবা ফুল বের করে টেনিদার মাথায় দিয়ে বললে, তুই এখানে কেন রে?

—আজ্ঞে প্যাঁড়া খেতে এসেছিলাম।

সাধু বললে, তা বলছি না। তুই যে মহাপুরুষ রে। তোকে দেখে মনে হচ্ছে, পরোপকার করে তুই দেশজোড়া নাম করবি।

—পরোপকার!—টেনিদা একটা ঢোঁক গিলে বললে, দুনিয়ায় অনেক সৎকাজ করেছি বাবা। মারামারি, পরের মাথায় হাত বুলিয়ে ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়া, ইস্কুলের সেকেণ্ড পণ্ডিতের টিকি কেটে নেওয়া—কিন্তু কখনো তো পরোপকার করিনি!

—করিসনি মানে?—সাধু হেঁড়ে গলায় বললে, তুই ছোকরা তো বড্ড এঁড়ে তর্কো করিস। এই আমাকে নগদ সাত আনা পয়সা দিলি, খেয়াল নেই বুঝি? আমার কথা শোন্। সংসার-টংসার ছেড়ে স্রেফ হাওয়া হয়ে যা। দুনিয়ায় মানুষের অশেষ দুঃখু—সেই দুঃখু দূর করতে আদা-নুন খেয়ে লেগে পড়্। আর্তের সেবা কর—দেখবি তিন দিনেই তোর নামে ঢি-ঢি পড়ে যাবে। দে-দে একটা বিড়ি দে—

—বললাম যে বাবাঠাকুর, আমি বিড়ি খাই না।

—ওহো, তাও তো বটে! বেশ, বেশ, বিড়ি কখনো খাসনি। আর শোন—পরের উপকারে নশ্বর জীবন বিলিয়ে দে। আজ থেকেই লেগে যা—বলে কান থেকে একটা আধপোড়া বিড়ি নামিয়ে, সেটা ধরিয়ে সাধু ভিড়ের মধ্যে অদৃশ্য হল।

টেনিদা খানিকক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপরেই—কালীঘাটের মা কালীর মহিমাতেই কি না কে জানে—সাধুর কথাগুলো তার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল। পরোপকার? সত্যিই তো, তার মতো কি আর জিনিস আছে! জীবন আর ক'দিনের? সবই তো মায়া—স্রেফ ছলনা! সুতরাং যে-ক'দিন বাঁচা যায়—লোকের ভালো করেই কাটিয়ে দেওয়া যাক।

সেই রাত্রেই সংসার ছাড়ল টেনিদা। মানে কলকাতা ছাড়ল।

www.boiRboi.blogspot.com

গেল দেশে। কলকাতা থেকে মাইল-দশেক দূরে ক্যানিং লাইনে বাড়ি। গাঁয়ের নাম ঘোপাখোলা। দেশের বাড়িতে দূর-সম্পর্কের এক বুড়ি জ্যাঠাইমা থাকেন। কানে খাটো। টেনিদাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ রে, এমন অসময়ে দেশে এলি যে?

—পরোপকার করব জেঠিমা!

—পুরী খেতে এসেছিস? পুরী এখানে কোথায় বাবা? পোড়া দেশে কি আর ময়দা-ফয়দা কিছু আছে? ইংরেজ রাজত্বে আর বেঁচে সুখ নেই!

—ইংরেজ রাজত্ব কোথায় জেঠিমা? এখন তো আমরা স্বাধীন, মানে—টেনিদা বাংলা করে বুঝিয়ে দিলে, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট।

—কোট-প্যাণ্ট?—জেঠিমা বললেন, ছি বাবা, আমি বিধবা মানুষ, কোট-প্যাণ্ট পরব কেন? থান পরি।

—দুত্তোর—এ যে মহা জ্বালা হল! আমি বলছিলাম, দেশে রোগ-বালাই কিছু আছে?

—মালাই! মালাই খাবি? দুধই পাওয়া যায় না! গো-মড়কে সব গোরু উচ্ছন্ন হয়ে গেছে।

—উঃ—কানে হাত দিয়ে টেনিদা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

কিন্তু দিন-তিনেক গ্রামে ঘুরে টেনিদা বুঝতে পারল, সত্যিই পরোপকারের অখণ্ড সুযোগ আছে। গ্রাম জুড়ে দারুণ ম্যালেরিয়া। পেটভরা পিলে নিয়ে সারা গাঁয়ের লোক রাত-দিন বোঁ-বোঁ করছে। সেইদিনই কলকাতায় ফিরল টেনিদা। পাঁচ বোতল তেতো পাঁচন কিনে নিয়ে দেশে চলে গেল। কিন্তু দুনিয়াটা যে কী যাচ্ছেতাই জায়গা, সেটা টের পেতে তার দেরি হল না।

অসুখে ভুগে মরবে, তবু ওষুধ খাবে না।

একটা জামগাছের নিচে বসে ঝিমুচ্ছিল গজানন সাঁতরা। সন্দেহ কী—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়া। টেনিদা গজাননের দিকে এগিয়ে এল। তারপর গজানন ব্যাপারটা বুঝতে না বুঝতে এবং ট্যাঁ-ফোঁ করে উঠবার আগেই টেনিদা তার মুখে আধ বোতল জ্বরারি পাঁচন ঢেলে দিলে। যেমন বিচ্ছিরি, তেমনি তেতো! আসলে গজাননের জ্বর-ফর কিছু হয়নি—খেয়েছিল খানিকটা তাড়ি। যেমন পাঁচন মুখে পড়া—নেশা ছুটে গিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সোজা 'মার-মার' শব্দে টেনিদাকে তাড়া করল।

কিন্তু ধরতে পারবে কেন? লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফেলে টেনিদা ততক্ষণে পগার পার।

কী সাঙ্ঘাতিক লোক এই গজানন! পরোপকার বুঝল না,—বুঝল না টেনিদার মধ্যে আজ মহাপুরুষ জেগে উঠেছে। তবু হাল ছাড়লে চলবে না। পরের ভালো করতে গেলে অমন কিছু-না-কিছু হয়ই। মনকে সান্ত্বনা দিয়ে টেনিদা স্বগতোক্তি করলে, এই দ্যাখো না বিদ্যাসাগর মশাই—

পরদিন বিকেলে সে গেল গ্রামের পাঁচুমামার বাড়িতে।

একটা ভাঙা ইজিচেয়ারে শুয়ে পাঁচুমামা উঃ-আঃ করছেন।

—কী হয়েছে মামা?—বগল থেকে পাঁচনের বোতলটা বাগিয়ে দাঁড়ালো টেনিদা।

—এই গেঁটে বাত বাবা! গাঁটে গাঁটে ব্যথা। করুণ স্বরে পাঁচুমামা জানালেন।

—বাত? ওঃ!—টেনিদা মুহূর্তের জন্যে কেমন দমে গেল। তারপরেই উৎসাহের চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখেমুখে।

—আর ম্যালেরিয়া? ম্যালেরিয়া কখনো হয়নি?

—হয়েছিল বৈকি। গত বছর।

—হতেই হবে!—বিজ্ঞের মতো গম্ভীর গলায় টেনিদা বললে, ঐ হল রোগের জড়।

www.boiRboi.blogspot.com

ঐ ম্যালেরিয়া থেকেই সব। কিন্তু ভেবো না—বাত-ফাত সব ভালো করে দিচ্ছি।

—ভাল করে দিবি?—পাঁচুমামার মুখে-চোখে কৃতজ্ঞতা ফুটে বেরুল : তুই তাহলে ডাক্তার হয়ে এসেছিস? কই শুনিনি তো!

—ডাক্তার কী বলছ মামা—তার চেয়ে ঢের বড়। একেবারে মহাপুরুষ!

অগাধ বিস্ময়ে পাঁচুমামা হাঁ করলেন। টেনিদার দিকেই মুখ করে ছিলেন ; কাজেই হাঁ করার সঙ্গে সঙ্গেই আর কথা নয়—জ্বরারি পাঁচন চলে গেল মামার গলার মধ্যে।

—ওয়াক্-ওয়াক্! ওরে বাবারে—ডাকাত রে—মেরে ফেললে রে—ওয়াক্-ওয়াক্—গেছি গেছি—পাঁচুমামা হাহাকার করে উঠলেন।

টেনিদা ততক্ষণে বাড়ির চৌহদ্দির বাইরে। শুনতে পেল, ভেতর থেকে মামা অশ্রাব্য ভাষায় তাকে গাল দিচ্ছেন। তা দিন—তাতে কিছু আসে যায় না। পরোপকার তো হয়েছে! এর দাম মামা বুঝবে যথাসময়ে। তৃপ্তির হাসি নিয়ে টেনিদা পথ চলল।

খানিক দূর আসতেই চোখে পড়ল একটা আমগাছ-তলায় একটি বছর-আটেকের ছেলে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে চ্যাঁচাচ্ছে।

—এই, কী নাম তোর?

ছেলেটা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, লাড্ডু।

—লাড্ডু! তা অমন করে কাঁদছিস কেন? চোখের জলে যে হালুয়া হয়ে যাবি—আর লাড্ডু থাকবি না! কী হয়েছে তোর?

—বড়দা চাঁটি মেরেছে।

—কেন, তোকে তবলা ভেবেছিল বুঝি?

—না! লাড্ডু বললে, আমি কাঁচা আম খেতে চেয়েছিলাম।

—এই কার্তিক মাসে কাঁচা আম খেতে চেয়েছিস! শুধু চাঁটি নয়, গাঁট্টা খাওয়ার মতো শখ!

টেনিদা চলে যাচ্ছিল, কি মনে হতেই ফিরে দাঁড়ালো হঠাৎ।

—তোর টক খেতে খুব ভাল লাগে বুঝি?

লাড্ডু মাথা নাড়ল।

—হুঁ—নির্ঘাৎ ম্যালেরিয়ার লক্ষণ! তোর জ্বর হয়?

—হয় বৈকি!

—তবে আর কথা নেই—টেনিদা বোতল বের করে বললে, হাঁ কর—

লাড্ডু আশান্বিত হয়ে বললে, আচার বুঝি?

—আচার বলে আচার! দুরাচার, কদাচার, সদাচার—সকলের সেরা এই আচার। হাঁ কর—হাঁ কর ঝটপট—

লাড্ডু হাঁ করল।

তার পরের ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। 'বাপরে মা-রে বড়দা-রে' বলে লাড্ডু চেঁচিয়ে উঠল।

টেনিদা দ্রুত পা চালালো।

—বাপ্—

পিঠের উপর একটা ঢিল পড়তেই চমকে উঠল টেনিদা। লাড্ডু ঢিল চালাচ্ছে। অতএব যঃ পলায়তি—এবং প্রাণপণে। লাড্ডু বাচ্চা হলেও ঢিলে বেশ জোর আছে, হাতের তাকও তার ফসকায় না।

কিন্তু আর চলে না! গ্রামের লোক ক্ষেপে উঠেছে তার ওপর। বাড়ির ত্রিসীমানায় দেখলে হৈ-হৈ করে ওঠে। রাস্তায় দেখলে তেড়ে আসে। তাকে দেখলে ছেলেপুলে

পালাতে পথ পায় না।

জ্যাঠাইমা বললেন, তুই কী শুরু করেছিস বাবা? লোকে যে তোকে ঠ্যাঙাবার ফন্দি আঁটছে!

টেনিদা গম্ভীর হয়ে রইল। পরে বললে, পরের জন্যে আমি প্রাণ দেব জেঠিমা!

—কী বললি? ঘরের লোকের কান কেটে নিবি? কী সর্বনাশ! ওগো, আমাদের টেনু কি পাগল হয়ে গেল গো—মড়াকান্না জুড়লেন জ্যাঠাইমা।

উদাস ব্যথিত মনে পথে বেরিয়ে পড়ল টেনিদা। কী অকৃতজ্ঞ, নরাধম দেশ! এই দেশের উপকারের জন্যে সে মরীয়া হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, অথচ কেউ বুঝছে না তার কদর! ছিঃ ছিঃ! এইজন্যেই দেশ আজ পরাধীন—থুড়ি স্বাধীন! কিন্তু কী করা যায়? কীভাবে মানুষগুলোর উপকার করা যায়?

টেনিদা শূন্য মনে একটা গাছতলায় এসে বসল। ভরা দুপুর। কার্তিক মাসের নরম রোদের সঙ্গে ঝিরঝিরে হাওয়া। আকুল হয়ে চিন্তা করতে করতে হঠাৎ চটকা ভেঙে গেল।

একটু দূরে একটা নিমগাছের নিচে একটা ছাগল ঝিমুচ্ছে।

ঝিমুচ্ছে! ভারি খারাপ লক্ষণ! এখানকার জলে হাওয়ায় ম্যালেরিয়া! ছাগলকেও ধরেছে। ধরাই স্বাভাবিক। আহা—অবোলা জীব! উপকার করতে হয়, তো ওদেরই! কেউ কখনো ওদের দুঃখ বোঝে না। আহা!

তাছাড়া সুবিধেও আছে। মানুষের মতো এরা অকৃতজ্ঞ নয়। উপকার করতে গেলে তেড়ে মারতেও আসবে না। ঠিক কথা—আজ থেকে সেই অসহায় প্রাণীগুলোর ভালো করাই তার ব্রত। ছিঃ ছিঃ! কেন এতদিন তার একথা মনে হয়নি!

পাঁচনের বোতল বাগিয়ে নিয়ে টেনিদা ছাগলের দিকে পা বাড়ালো।

তারপর?

তারপরের গল্প তো আগেই বলে নিয়েছি।

সেই বইটি

প্রকাশকের দোকানে বসেছিলাম। সামনে কাউন্টারের ওপর নানা আকারের নানা রঙের বই। অসংখ্য মানুষের অসংখ্য মনের যেন এক বিশাল পৃথিবী এই বইগুলো। কত চিন্তা—কত গবেষণা—জ্ঞান-বিজ্ঞানের কত খবর। সুখ-দুঃখ, কান্না-হাসি, গল্প-কবিতা, রোমান্স-অ্যাডভেঞ্চারের স্বপ্নপুরী।

www.boiRboi.blogspot.com

অন্যমনস্কভাবে বইগুলো নাড়াচাড়া করছি, হঠাৎ একখানা বইয়ের ওপর এসে চোখ আটকে গেল আমার। মলাটে সেই পুরোনো ছবিটি—সেই গাঢ় নীল বড় বড় হরফের লেখা, "গহন বনের গল্প"। লেখক প্রিয়দর্শন মিত্র।

আকাশে যেমন উল্কা ঝরে, তেমনিভাবে কতকগুলো বছর ঝরে গেছে। কত অদল-বদল হয়েছে পৃথিবীর! আমরা যারা ছোট ছিলাম তারা বড় হয়ে গেছি—যাঁরা বড় ছিলেন, বুড়িয়ে গেছেন তাঁরা। ছেলেদের জন্যে হাজার হাজার রঙচঙে বইয়ে ছেয়ে গেছে বাজার। তাদের মাঝখান থেকে বহুদিনের চেনা বইখানা সেই চেনা চেহারা নিয়ে করুণ চোখে যেন আমার দিকে তাকালো।

প্রকাশককে বললাম, এ বইটার দাম কত?

একটু অবাক হলেন প্রকাশক : কী করবেন ও বই নিয়ে? ছেলেদের বই পড়বার বাতিক আছে নাকি আপনার?

বললাম, তা আছে। আমারও যে একটা ছেলেবেলা ছিল, এসব বই দেখলে সেকথা মনে পড়ে যায়।—এটা আমি নেবো।

প্রকাশক তবু বললেন, নিতেই যদি হয়, তাহলে নতুন বই কিছু নিন বরং। ওসব তো পুরোনো হয়ে গেছে। আজকালকার ছেলেরা আর পড়ে না।

—তা হোক! এইটেই আমার দরকার। কত দাম?

প্রকাশক বন্ধু লোক। হেসে বললেন, এমনিই নিয়ে যান। ওর আর দাম দিতে হবে না।

বাইরে এসে দাঁড়ালাম ট্রাম-স্টপের পাশে। দুপাশে বাড়িগুলোর মাথায় বেলা-শেষের রাঙা আলো ঝিকমিক করছে—ছায়া ঘনিয়ে পড়েছে রাস্তার ওপর। ঠাণ্ডা মিষ্টি হাওয়া বইছে। বইটাকে কাছে আঁকড়ে ধরে ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

নিজে বই লিখি এখন। সাহিত্যিক বন্ধুর অভাব নেই—নতুন বই পাওয়ার দুঃখও নেই আর। তবু এই 'গহন বনের গল্প' কোনদিন এমনি করে হাতে আসবে, তা কল্পনাতেও ছিল না। মনে হত হাতের মুঠোর মধ্যে পেয়েও যে হীরেটা হারিয়ে ফেলেছিলাম একদিন, আজ অযাচিতভাবে তা আমার কাছে ফিরে এল। এখন এ আমার—চিরদিনের মতোই আমার!

ট্রাম এল। চেপে বসে কণ্ডাকটারকে বললাম, এস্‌প্ল্যানেড।

ট্রাম চলল। মনের মধ্যে ছেলেবেলার দিনগুলো—ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই দিনাজ-পুরের সহর—ষষ্ঠীতলার বটগাছ—কাঞ্চন নদীর ধারে, পুরোনো সাহেবি গোরস্থানের পাশে পাশে সেই পথ। আম জাম বিলিতি পাকুড়ের ছায়া—লাটা গিলে আর বৈঁচির বন; সেই শঙ্খচিল, শেয়াল, গোসাপ আর গোখরোর খোলশ। তার ভিতর দিয়ে চলেছি। ভিতরে কাঁপছে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা—দূরের আকাশে উড়ন্ত মস্ত গগনবেড় পাখিটার মতো কল্পনাও ডানা মেলেছে। এই পথটাও তো হয়ে যেতে পারে আফ্রিকার জঙ্গল,—এসে হাজির হতে পারে গরিলা, সামনে লাফিয়ে পড়তে পারে সিংহ—বাইসনের সঙ্গে বাধতে পারে চিতাবাঘের লড়াই—চারিদিক থরথর করে কেঁপে উঠতে পারে বুনো হাতির গর্জনে। ছেলেবেলার সেই ছুটির দিন—স্বপ্নভরা দুপুর—বুকের ভিতর যেন ঝিমঝিম করে বাজতে লাগল।

চমক ভেঙে দেখি, গাড়ি এস্‌প্ল্যানেডে এসে ঢুকেছে। নেমে পড়লাম। কার্জন পার্কের পাশ কাটিয়ে, মনুমেন্ট ছাড়িয়ে, এগিয়ে গেলাম আরো খানিকটা। তারপর নিরিবিলি দেখে এক জায়গায় ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে বসে পড়লাম।

বুকের কাছে বইটা এখনো ধরা। কোলের ওপর নামিয়ে রাখলাম। সন্ধ্যার আবছায়াতে গাঢ় সবুজ বড় বড় অক্ষরে লেখা 'গহন বনের গল্প' ঝাপসা হয়ে আসছে। কিন্তু ছেলেবেলার হারানো দুপুরের রোদ লেগে ঐ লেখাটাই ঝকঝক করে জ্বলতে লাগল বুকের ভিতরে।

সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। একেবারে পরিষ্কার ছবি দেখছি চোখে।

নিঝ্‌ঝুম দুপুর। গরম হাওয়া বইছে। আমে রঙ ধরতে শুরু হয়েছে। মাঝখানে টার্মিনাল পরীক্ষা, তারপরেই গ্রীষ্মের ছুটি। ইস্কুলে আর মন বসতে চায় না। জানলা দিয়ে ঘন ঘন বাইরে তাকাই আর ভাবি—কখন লাস্ট পিরিয়ডের ঘণ্টা পড়বে।

ড্রয়িং-এর ক্লাশ নিচ্ছেন মৌলভী সাহেব। ভারি নিরীহ ভালোমানুষ। একটা ছোট্ট ঘোড়ার পিঠে জিনের বদলে একখানা কাঁথা বসিয়ে তাতেই চেপে ইস্কুলে আসতেন। আর ক্লাশে ঢুকে ব্ল্যাকবোর্ডে একটি ঘটি কিংবা বেগুন যা-হোক কিছু এঁকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়তেন।

হেডমাস্টার কাছাকাছি না থাকলে ছেলেরা কেউ কেউ এই ফাঁকে তাঁর গোবেচারা ঘোড়াটায় চাপবার চেষ্টা করত। কেউ বা বেগুনের বদলে তাঁর মুখ আঁকত খাতায়। কোনদিন ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে নিশ্চিন্তে ঘুমোতেন মৌলভী সাহেব। বেশি গোলমাল হলে কখনো কখনো ঘুম-ভরা চোখ তুলে আলগা ধমক দিয়ে বলতেন, এই, এত গোলমাল হচ্ছে ক্যান? কানটা যে ফাটাই দিলে হে আমার!

এই মৌলভী সাহেবের ক্লাশেই—এমনি একটা মন-উড়ু-উড়ু দুপুরে এসে দেখা দিল 'গহন বনের গল্প।'

যথারীতি একটা কুমড়ো এঁকে দিয়ে মৌলভী সাহেব ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি আর আমার পরম বন্ধু যাচ্ছু সেন খাতায় কাটাকাটি খেলছি। এমন সময় চোখে পড়ল, সেকেণ্ড বেঞ্চে বসে খগেন বড়াল খুব মন দিয়ে কি একখানা বই পড়ছে।

ব্যাপারটা একটু নতুন। ড্রয়িং ক্লাশের ছেলে খগেন, ভালো ছবির হাত। ওর আঁকা কুমড়োকে কখনো বিঙে বলে ভুল হয় না—মৌলভী সাহেব ওকে দশের মধ্যে এগারো নম্বর দিতে পারলে খুশি হন। এ-হেন খগেন ড্রয়িং ভুলে গিয়ে বই পড়ছে। কিমাশ্চর্যম্‌!

—কী বই রে ওটা খগেন?—কৌতূহল সামলাতে পারলাম না।

খগেন জবাব দিলে না। একেবারে তন্ময়।

—এই, বল্‌ না—কী বই?

খগেন ভারি বিরক্ত হলো! রুদ্ধশ্বাসে বইয়ের একটা পাতা উলটে বললে, এখন ভীষণ ব্যাপার। রাত্তির বেলা সিংহ এসে শিকারীকে তাঁবু থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে! গোলমাল করিসনি এখন!

শুনেই রোমাঞ্চ হল। থাবা দিয়ে বললাম, দে না একটু দেখি!

ঝট্‌ করে বইটা সরিয়ে নিল খগেন। চোখ পাকিয়ে বললে, খবরদার রঞ্জন—মারা-মারি হয়ে যাবে বলছি!

মৌলভী সাহেবের ঘুম ভাঙলো।

—হাঁ হে, তুমরা কি এইটাক্‌ খেলার মাঠ পাইছ? বেশি গোলমাল হইলে সব হাফ্‌ ডাউন করাই দিব—হুঁ!

তখনকার মতো শান্তি রক্ষা হল—কিন্তু কৌতূহলে মন ছটফট করতে লাগল। তারপর গোপীবাবুর অঙ্কের ক্লাশ—যমের ঘণ্টা। 'গহন বনের গল্প' ধামা-চাপা রইল কিছুক্ষণ। কিন্তু ছুটি হতেই ফেউয়ের মতো লেগে গেলাম খগেনের পিছনে।

—দে না ভাই, একটু দেখি বইটা।

খগেন বললে, আমার বই নয়। পড়বার জন্যে চেয়ে এনেছি। আজই সন্ধ্যেবেলা ফেরত দিতে হবে।

—আমি তো আর নিচ্ছি না, হাতে করে দেখব শুধু। দে না একবার—

খগেনের করুণা হল। বই-খাতার তলা থেকে সন্তর্পণে বইটা বের করে দিলে।

কিন্তু না দেখলেই ভালো হত। মোটা, বড় সাইজের বই—পাতায় পাতায় রুনো জানোয়ারের রোমাঞ্চকর ছবি। ছোট বড় অসংখ্য গল্প—কোনটা 'মানুষখেকো সিংহ', কোনটা 'গরিলার বিভীষিকা', কোনটা 'কুমিরের করাল গ্রাস'। পড়বার আগেই গা ছম্‌ছম্‌ করে ওঠে।

চমক ভাঙল খগেনের চিৎকারে।

—বাঃ—দেখবার নাম করে বেশ পড়া শুরু হয়ে গেছে তো। ও-সব চালাকি চলবে না, দাও বই। ছোঁ মেরে বইটা কেড়ে নিলে খগেন। বই তো নিলে না—যেন হৃৎপিণ্ড উপড়ে নিলে! তারপরই আর কথা নেই—হন্‌-হন্‌ করে হাঁটতে শুরু করলে বাড়ির দিকে।

আমি তবু সঙ্গ ছাড়ি না খগেনের।

—একদিনের জন্যে দিবি ভাই বইটা? একবেলার জন্যে?

—বললাম তো, আমার বই নয়। আমাকে এড়াবার জন্যে খগেন আরো জোরে পা চালালে : অপরের কাছ থেকে এনেছি। সন্ধেবেলায় ফেরত দিতে হবে।

—কার বই?

—কালীতলার কুঞ্জর। হল তো? ইচ্ছে হয় তার কাছে থেকে চেয়ে নাও। বইটা পাছে আমি কেড়ে নিই, হয়ত এই ভয়েই খগেন একটা চলতি ঘোড়ার গাড়ির পিছনে উঠে বসল।

হতাশ চোখে আমি সেদিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিন্তু কালীতলার কুঞ্জ! মনটা ভয়ানক দমে গেল। কুঞ্জকে চিনি—বিলক্ষণ চিনি। গত দোলের সময়ও ওদের পাড়ার সঙ্গে আমাদের পাড়ার ছেলেদের বেশ একচোট মারামারি হয়ে গেছে—আমি নিজেই কয়েক ঘা বসিয়েছিলাম কুঞ্জকে। তা ছাড়া আমাদের সমবয়সী হলেও কুঞ্জ যে-পরিমাণে এঁচোড়ে পেকেছে তার তুলনা হয় না। ক্লাশ ফাইভেই একবার ফেল করেছে—শুনেছি, সিগারেট খায়। সেই কুঞ্জর কাছে গিয়ে বই চাইতে হবে!

সম্ভব হলে নিজেই কিনতে পারতাম একখানা। কিন্তু বইয়ের দামটা দেখে নিয়েছি চোখের পলকে—তিন টাকা। তিন টাকা! স্বপ্নের চেয়েও অসম্ভব! ইস্কুলের পয়সা বাঁচিয়ে আনা-ছয়েক সঞ্চয় করেছি নিজের কাছে। মা'র কাছে জমা আছে আট আনা। আরো আনা-আষ্টেক ছোড়দি দিলেও দিতে পারে—বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসেছে—মনটা খুশি আছে ছোড়দির। কিন্তু তিন টাকা! সে অনেক দূর, সেখানে পৌঁছুবার কোনো উপায়ই নেই।

একটা ভারি মন নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

মা বললেন, মুখ অমন কেন রে? মার খেয়েছিস নাকি ইস্কুলে?

—না।

হাতমুখ ধুয়ে জলখাবারের দুধ-রুটি খেয়েই আবার বেরিয়ে পড়লাম ঊর্ধ্বশ্বাসে। পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলা হচ্ছে—ওরা ডাকল, আমি ফিরেও তাকালাম না। যেমন করে হোক, কুঞ্জকে আমার ধরা চাই-ই।

www.boiRboi.blogspot.com

কুঞ্জকে পেতে অবশ্য দেরি হল না। স্টেশনের কাছে বাহাদুর বাজারের এক চায়ের দোকানে নিয়মিত বিকেলে আড্ডা দিতে দেখেছি ওকে। আজও সেইখানে ছিল সে। দুটো মস্ত মস্ত ধেড়ে ছেলের সঙ্গে হাত-পা ছুঁড়ে কি যেন আলোচনা করছিল।

বাবার কড়া হুকুম—রাস্তার কোন চায়ের দোকানে ঢোকা আমাদের বারণ। আরো বিশেষ করে এ দোকানটা যত পাজি ছেলের আড্ডা। দোকানটার সামনে এসে আমার বুক কাঁপতে লাগল।

কিন্তু 'গহন বনের গল্প'—পাতায় পাতায় তার ছবি, তার 'গরিলার বিভীষিকা' আর 'মানুষখেকো সিংহ' একটা অসহ্য তীব্র স্বরের মতো আমার মাথার মধ্যে কাঁপছে। আমি আর থাকতে পারলাম না।

দোকানে ঢুকে ডাকলাম—কুঞ্জ!

কুঞ্জ প্রথমটা চমকে গেল। তারপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ ভেংচে বললে, কি হে গুড্‌বয়, এখানে?

বললাম, তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—কী কথা? আমার কাছে কী দরকার তোর—আমাদের ছায়া মাড়ালেও তো তোদের গুড কণ্ডাক্টের প্রাইজ পাওয়া নষ্ট হয়ে যাবে! তেমনি ভ্যাংচানির ভঙ্গিতে কুঞ্জ হেসে উঠল।

—তোর বইটা একবার পড়তে দিবি আমাকে?—অপমানে কান জ্বালা করছিল, তবু না বলে থাকতে পারলাম না।

—আমার বই? কী বই?

—'গহন বনের গল্প।'

—ও! খোঁজ পেয়েছ তাহলে!—কুঞ্জর চোখ মিটমিট করতে লাগল: সে তো আমার কাছে নেই।

—জানি। খগেন নিয়েছে। আজ সন্ধেবেলাতে ফেরত দেবে। আমি মিনতি করলাম; আজ রাত্রিটা আমায় পড়তে দে, কাল সকালেই তোকে দিয়ে যাবো।

কুঞ্জ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। তারপর নাক কুঁচকে বললে, কেন দেব তোকে?

—ভাই কুঞ্জ—

কুঞ্জ আবার ভেংচি কেটে বললে, অত ভাই-ভাই করতে হবে না! মারামারির সময় মনে থাকে না? আমাদের খারাপ ছেলে বলবার সময় মনে থাকে না?

এর পরে চায়ের দোকান থেকে সোজা বেরিয়ে আসা উচিত ছিল। কিন্তু পারলাম না। আমার ভেতরে তখনো জ্বরের মতো নেশাটা কাঁপছে! নিশির ডাকের মতো হাত-ছানি দিয়ে ডাকছে আমাকে!

বললাম, যা হয়ে গেছে, হয়ে গেছে। আজ থেকে আমরা বন্ধু।

—বন্ধু!—কুঞ্জর চোখ আবার মিটমিট করতে লাগল: তাহলে প্রমাণ দেখা।

—কী প্রমাণ দেবো?

—চা খাওয়া, চপ খাওয়া।

চা! চপ! চোখের সামনে অন্ধকার দেখলাম। বললাম, ভাই, পয়সা নেই।

—পয়সা নেই?—কুঞ্জ আমার শার্টের পকেটটা নাড়া দিলে: ঐ তো ঝন্‌ঝন্ করে উঠল। নেই মানে? ফাঁকি দিয়ে বন্ধুত্ব পাতিয়ে বই বাগাবার মতলব? সেটি হচ্ছে না চাঁদ!

—কিন্তু এ পয়সা তো—আমি ঢোক গিললাম: ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স কেনবার জন্য

www.boiRboi.blogspot.com

এনেছি।

কুঞ্জ খিঁচিয়ে উঠলো: তবে তাই কেন গে না। মন দিয়ে লেখাপড়া কর গে। গল্পের বই নিয়ে কী হবে? যা—পালা এখান থেকে!

পালাতে পারলে বাঁচতাম, কিন্তু কে যেন পা দুটো পাথর দিয়ে আটকে দিয়েছে আমার। বুকের মধ্যে যেন ঝড় বইছে! এত কষ্ট করেও পাব না বইটা? হাতের কাছে এসেও এমন করে ফসকে যাবে?

শুধু নেশা ধরাই নয়—আমার ঘাড়ে যেন ভূত চেপেছিল। না হলে, যে দুঃসাহস আমি জীবনে ভাবতে পারিনি—তাই করে ফেললাম। ফস্ করে বলে বসলাম, বেশ, খা তুই চা-চপ।

খুশির হাসিতে কুঞ্জর চোখ ভরে উঠল। আমার পিঠে জোরে একটা থাবড়া বসিয়ে দিলে সে।

—বাঃ, এই তো সত্যিকারের গুড বয়ের মতো কথা!—আমার হাত ধরে টেনে সে একটা লোহার চেয়ারে বসল। তারপর ডেকে বললে, বয়, দুখানা চপ আর দুটো চা।

সভয়ে বললাম, দোকানের চা তো আমি খাই না ভাই! চপও নয়।

—খাস না? তা বেশ। তাহলে দুটো চপই আমি খাই—কী বলিস? অদ্ভুত লোভে কুঞ্জর চোখ দুটো চিকচিক করে উঠল: কী বলিস—আ্যাঁ?

ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সের পরিণামের কথা ভাবতে ভাবতে শুকনো গলায় আমি বললাম, খা।

প্লেটে করে দুখানা ধূমায়িত চপ এনে বয় সামনে রাখল। গন্ধে ভরে গেল চারিদিক।

কুঞ্জ খাবার আগেই খানিকটা লালা গিলে নিলে গলায়। থাবা দিয়ে একটা চপ গরম অবস্থাতেই তুলে নিয়ে কামড় বসালো। তারপর তৃপ্ত মুখে বললে, বেঁচে থাক রঞ্জু! 'গহন বনের গল্প' তোর মারে কে? কিন্তু মাইরি বলছি, দৃষ্টি দিসনি মোদ্দা।

দৃষ্টি নয়—মুখ ফিরিয়ে বসে আমি ভাবতে লাগলাম ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্সের কথা। নিজের জমানো দু-আনা পয়সা দিয়ে বাকিটা পূরণ করা যাবে, তারপর ইস্কুলে যাওয়ার মুখে কিনে নিলেই হবে ওটা। কিন্তু বাড়ীর কেউ যদি দেখতে পায়? যদি শুনতে পায় কেউ?

এখান থেকে তাড়াতাড়ি উঠতে পারলে বাঁচি এখন। কিন্তু উঠবার জো নেই—তারিয়ে-তারিয়ে শব্দ করে-করে চপ খাচ্ছে কুঞ্জ। ওই শব্দটা যেন বুকের মধ্যে এসে বিঁধতে লাগল। ভয়ে কাঠ হয়ে আমি বসে রইলাম।

কতক্ষণ পরে—কত যুগ পরে কুঞ্জর চা আর চপ খাওয়া শেষ হল জানি না। তারপর বললে, পাঁচ আনা পয়সা দে।

দিলাম।

বয়টাকে পয়সা দিয়ে কুঞ্জ একটা ঢেঁকুর তুলল!

—বেড়ে খাওয়ালি রঞ্জু। অনেকদিন মনে থাকবে। এবার একটা সিগারেট খাওয়া।

—সিগারেট!—আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ বাবা, সিগারেট। আরো দুটো পয়সা ঝাড়ো দেখি!

আবার পালাতে চাইলাম, কিন্তু পা দুটো তখন যেন পাথর দিয়ে বাঁধা। মন্ত্র-মুগ্ধের মতোই দুটো পয়সা বের করে দিলাম। বয়টাকে দিয়ে কুঞ্জ সিগারেট আনাল। ধরিয়ে একটা টান দিয়ে বললে, আঃ!

ততক্ষণে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেছে! প্রাণপণে উঠে দাঁড়ালাম।

—সব তো হল ভাই। এবার বই?

কুঞ্জ খানিকটা ধোঁয়া ছেড়ে বললে, নিস কাল সকালে।

—কাল সকালে আবার কেন?—আমি প্রায় হাহাকার করে উঠলাম : বললি যে রাত্তিরেই!

—কুঞ্জ বাধা দিয়ে বললে, এখন কে বাড়ি ফিরবে? আমার যেতে সেই ন-টা। সিনেমায় যাব কিনা? যা—যা—কাল সকালে আসিস আমাদের বাড়ি। বই নিয়ে যাবি, ইচ্ছেমতো রাখতে পারবি দু-তিন দিন।

—কিন্তু সকালে যে মাস্টারমশাই আসবেন!

—তার আমি কী করব?—কুঞ্জ উঠে দাঁড়ালো—লম্বা একটা শিস টেনে বেরিয়ে এল চায়ের দোকান থেকে। পেছনে-পেছনে আমিও এলাম।

—চল না ভাই একবার, পাঁচ মিনিটের জন্য! আমি মিনতি করলাম।

—কেন বিরক্ত করছিস? কুঞ্জ চটে গেল : বললাম না, সকালে আসিস?—তারপরই সংক্ষেপে সব শেষ করে দিয়ে অন্য রাস্তায় পা চালিয়ে দিলে।

অস্বস্তি আর অপরাধ-বোধ নিয়ে বাড়ি ফিরলাম। অতটা না করলেও হত। এক-খানা বইয়ের জন্যে যে কাণ্ড করেছি, একবার তা জানাজানি হয়ে গেলে কী যে হবে, সেকথা ভাবতেও পারছি না।

তবু অপরাধের লজ্জা বেশিক্ষণ রইল না। চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে লাগল মোটা-মোটা সবুজ অক্ষরগুলো : 'গহন বনের গল্প'। সারা রাত ধরে আফ্রিকার জঙ্গলের স্বপ্ন দেখলাম আমি। বইয়ের পাতায় চকিতের জন্য দেখা ছবিগুলো যেন জীবন্ত হয়ে উঠে আমার সমস্ত চেতনাকে আশ্চর্য অপরূপ অ্যাডভেঞ্চার দিয়ে ঘিরে রাখল!

ভোরের আলো ফোটবার আগেই ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলাম। তারপর জামাটা গায়ে চড়িয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলাম কালীতলার উদ্দেশ্যে।

মা অবাক হয়ে বললেন, হ্যাঁরে, এত ভোরে কোথায় চললি এভাবে?

মায়ের কাছে কখনো মিথ্যা বলিনি। আজ প্রথম বলতে হল।—একটু মর্নিং-ওয়াক করে আসি মা।

উত্তরে মা কী বললেন সে কথা শোনবার সময় আমার ছিল না। আমি তখন দার্জিলিং মেলের মতো চলেছি কালীতলার দিকে। আমাদের বাড়ি থেকে কুঞ্জদের পাড়া প্রায় এক মাইল। মনে হচ্ছিল, যদি এক লাফে পৌঁছুতে পারতাম!

এখনি পাব! এখনি হাতে আসবে! কালকের সারা বিকেল, সারা সন্ধে, সারা রাত্রি যা নিয়ে স্বপ্নের ঘোরে কেটেছে—যার জন্যে চায়ের দোকানে ঢুকেছি, কুঞ্জকে সিগারেট খাইয়েছি—মিথ্যা কথা বলেছি মায়ের কাছে—এখনই সেই মহা-সম্পদ এসে যাবে আমার হাতের মুঠোয়! মনে হল, আমার পা চলছে না, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছি আমি!

ওদের বাড়ির সামনে গিয়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে চেঁচাতে লাগলাম : কুঞ্জ—কুঞ্জ—কুঞ্জ—

ঘুম-ভাঙা চোখ কচলাতে-কচলাতে বেরিয়ে এল কুঞ্জ। বিরক্তিভরা মুখে বললে, কি রে, কী হল? এই সাত-সকালে অমন চেঁচিয়ে মরছিস কেন?

—সেই বইটা?

—কোন্ বই?—কুঞ্জ যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—সেই 'গহন বনের গল্প'।

কুঞ্জ বললে, অ। তা, সে বই তো পাবি না!

—পাব না!—আমি যেন বুকফাটা আর্তনাদ করে উঠলাম।

কুঞ্জ নিরাসক্ত স্বরে বললে, বই তো আমার নয়—আমার মামাতো বোন রত্নার। রত্না কাল রাতের ট্রেনে কলকাতায় ফিরে চলে গেছে, বইটাও নিয়ে গেছে।

আর এক মিনিট সামনে থাকলে আমি কুঞ্জর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তাম, আফ্রিকার সিংহের মতোই ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে ফেলতাম ওকে। তার আগেই ও বাড়ির ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে।

আবার বাড়ি ফিরলাম। এবার আর হাওয়ায় উড়ে নয়। চোখ ফেটে আবার কান্না আসছে—পা যেন মাটির মধ্যে বসে যাচ্ছে। এইভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করল কুঞ্জ! পুরোনো শত্রুতার শোধ নিলে এমন করে!

যখন বাড়ি ফিরলাম তখন মাস্টারমশাই এসে বসে আছেন।

—এতক্ষণ কোথায় ছিলে রঞ্জু?—শান্ত, গম্ভীর গলায় মাস্টারমশাই জানতে চাইলেন।

—মর্নিং-ওয়াক করতে। বিবর্ণ মুখে জবাব দিলাম। পড়ার বই নামিয়ে আনলাম শেলফ থেকে।

কিছুক্ষণ আমার দিকে অদ্ভুত চোখে চেয়ে রইলেন মাস্টারমশাই। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, ইনস্ট্রুমেণ্ট বক্স কোথায়?

আমার বুকটা ধক্ করে উঠল একবার। আস্তে আস্তে বললাম, কাল বিকেলে ভুলে গিয়েছিলাম। আজ কিনে আনব।

—ভুলে গিয়েছিলে? মাস্টারমশাইয়ের চোখ আগুন হয়ে উঠল : কুঞ্জর সঙ্গে চায়ের দোকানে আড্ডা দিলে ভুলে যাওয়ারই কথা—কী বলো?

পরক্ষণেই একটি চড় এসে পড়ল আমার গালে। মাস্টারমশাই বজ্রের মতো গর্জে উঠলেন : চায়ের দোকানে ঢুকতে শিখছ। সিগারেট খেতে শিখছ? রাস্কেল—বাঁদর—

আর-একটা চড় এসে পড়ল গালে। মাথা ঘুরে গেল—একটা তীব্র ঝিঁঝির ডাকের মধ্যে যেন মিলিয়ে গেল পৃথিবীখানা।

* * *

চমক ভাঙল আমার। কুড়ি বছরের ওপার থেকে ফিরে এসেছি বর্তমানের মধ্যে। গড়ের মাঠে ঠাণ্ডা রাত নেমে এসেছে। কোলের ওপর 'গহন বনের গল্প' একাকার হয়ে গেছে অন্ধকারে।

বইটাকে তেমনি বুকে চেপে ধরে আমি হাঁটতে লাগলাম।

এতদিন পরে ফিরে এসেছে। এ বই এখন আমার। যতবার খুশি পড়তে পারি, ইচ্ছে করলে মুখস্থ করতে পারি—পাড়ার সকলকে ডেকে-ডেকে পড়ে শোনাতে পারি।

কিন্তু কিছুই করব না। আমার লাইব্রেরির পাঁচ হাজার বইয়ের ভিতর—দিশি-বিলিতি অজস্র বইয়ের মাঝখানে ওকে আমি লুকিয়ে রাখব। আমি এ বই পড়ব না। যদি আজ আর ভালো না লাগে? কুড়ি বছর আগেকার মনটা এর মধ্যে যদি বদলে গিয়ে থাকে—তাহলে? তাহলে?

www.boiRboi.blogspot.com

চরণামৃত

ক্রেপ সোল—ক্রোম লেদার—সম্রাট অ্যান্ড কোম্পানির ডি-লুক্স-দোকানদার আরো কী কী বলেছিল আমার মনে নেই। বাক্সে প্যাক করে দেবার আগে সে জুতোজোড়াকে পরম আদরে বারকয়েক থাবড়ালো। তারপর বললে, যাও বেটা যাও, বেশ ভাল করে বড়বাবুর চরণ সেবা কোরো!

বড়বাবু। আমি পটলডাঙার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসক পাতার রস খাই—আমাকে বড়বাবু বলা! ভাবলুম, মুখে যদি গোঁফ থাকত, তাহলে এই ফাঁকে তাতে বেশ করে তা দিয়ে নিতুম!

গম্ভীর হয়ে স্টাইলের মাথায় বললুম, জুতো টিকবে তো?

—টিকবে মানে? আপনি যতদিন টিকবেন, তার চাইতে বেশি টেকসই হবে এ জুতো। না না, আপনার আয়ুক্ষয় কামনা করছি না স্যার। বলছিলুম, এ জুতো পরা মানেই আপনার লাইফ ইন্‌সিয়োর, মানে, ঠ্যাং ইন্‌সিয়োর হয়ে গেল!

অগত্যা পকেট থেকে করকরে নগদ বারো টাকা বারো আনা বের করে দিলুম।

বেরোবার সময় দোকানদার বললে, হাঁটবেন আর আমার কথা মনে রাখবেন। দেখবেন, কী একখানা জুতো আপনাকে দিলুম।

একখানা জুতোই বটে!

পায়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গেই পায়া ভারি। সে কী ওজন! এক-এক পাটি বোধহয় দু-সেরের কম নয়! হাত-দশেক হাঁটতে-হাঁটতেই কোমর টন-টন করতে লাগল।

দোকানদারকে ভোলবার জো আর রাখল না। টোপা কুলের মতো এক-একটা ফোস্কা পড়ল পায়ে। তারপর, সেগুলো যখন গলে গেল, তখন ব্যাণ্ডেজ বেঁধে সাত দিন শুয়ে থাকতে হল বিছানায়।

সেই অবস্থাতেই বড়দা আমার মাথায় গোটা-দুই চাঁটি মেরে দিয়ে দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যেমন তোর মগজ নিরেট, তেমনি জুতোও কিনেছিস নিরেট! ফেলে দে রাস্তায়—কুকুরে-টুকুরে খেয়ে নিক!

আমার ছোট বোন ঝন্টি বললে, ও জুতো খেতে গেলে কুকুরও হার্টফেল করবে।

বড়দা ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে দেখে আমি ধাঁ করে ঝন্টির লম্বা বিনুনিটায় টান দিলুম। বললুম, পরিস তো আধ-ছটাক লেডীজ শু—এ সব সম্রাট ব্র্যান্ড জুতোর কদর বুঝবি কোত্থেকে!

ঝন্টি ভ্যাঁ-ভ্যাঁ করে কাঁদতে-কাঁদতে মা'র কাছে নালিশ করতে গেল।

কিন্তু মুখে যাই বলি, ও জুতো পায়ে দিয়ে আমার হৃৎকম্প হতে লাগল। অথচ নিজে পছন্দ করে কিনেছি, পায়ে না দিলেও বাড়িতে মান রাখা শক্ত। যা থাকে কপালে বলে আমি আবার জুতোর তোয়াজ করতে লেগে গেলুম।

চেষ্টা করলে নাকি ভগবানকে সুদ্ধ বশ করা যায়, কিন্তু এ জুতো বোধহয় ভগবানের ওপরেও এক কাঠি! আজ এক বছর ধরে রয়ে-সয়ে পরবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পায়ে দিলেই সেই দোকানদারকে মনে করিয়ে দেয়। বলতে গেলে জুতোজোড়া আমাকে জুতোতে থাকে। অনেক দাগা পাওয়ার পরে আজকাল একটা রেশনের থলে

www.boiRboi.blogspot.com

হাতে নিয়ে বেরোই—তাতে থাকে একজোড়া চটি। যখন দেখি জুতোর পাল্লায় পড়ে প্রাণ যাবার জো হয়েছে, তখন নিরিবিলি জায়গা দেখে ওটাকে পুরে ফেলি থলের মধ্যে। তারপর পায়ে চটি গলিয়ে গজেন্দ্র-গমনে হাঁটতে থাকি।

কেউ জিজ্ঞেস করলে বলি, মার্কেট থেকে ভালো আল্‌ফ্যানসো আম কিনে নিয়ে যাচ্ছি।

ঈশ্বরের দয়ায় কলকাতায় ঐ এক সুবিধে। আম, আপেল, আঙুর, বেদানা—নেহাত পক্ষে সিঙাপুরী কলা—বারো মাসই কিনতে পাওয়া যায়। বেশ ছিলুম, কিন্তু হাবুল সেন বাগড়া দিলে।

তিন পুরুষ কলকাতায় আছে, কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া কথাই বলবে না হাবুল। আমাকে দেখেই একগাল হেসে বললে, কি রে, থইল্যার মধ্যে লইয়া যাস কী?

নাক উঁচু করে বললুম, পেশোয়ারী মেওয়া।

—পেশোয়ারী মেওয়া? কত কইর‍্যা আনছস?

নাকটা আরো উঁচু করে বললুম, কুড়ি টাকা সের।

—কুড়ি টাকা সেরের মেওয়া?—হাবুল একটা হাঁ করল : আইজকাল তো তুই সোনা খাইতে আছস্! দেখি দেখি, কেমন তোর মেওয়া—

বলেই, আর আমাকে সামলাবার সময় দিলে না। খপ করে হাত পুরে দিলে থলের মধ্যে।

—আরে আরে, এই নি তোর মেওয়া? কার জুতো চুরি কইর‍্যা পলাইতে আছস—ক দেখি?

ব্যাপারটা সব মিলে এমন বিতিকিচ্ছি হয়ে দাঁড়ালো যে কী বলব! দেখতে-দেখতে রাস্তায় জড়ো হয়ে গেল লোক।

—কী মশাই, জুতো চুরি করে পালাচ্ছে নাকি?

—আজকাল চারিদিকে জুতো-চোরের মরশুম। ট্রাম থেকে পর্যন্ত সরাচ্ছে মশাই! সেদিন দুপুরবেলা শ্যামবাজার যেতে যেতে যেই চোখে একটু ঢুলুনি এসেছে, অমনি আর কথা নেই—আমার নতুন জুতো-জোড়া একেবারে ভোঁ-ভাঁ।

—দিন না ঘা কয়েক লাগিয়ে—

এই ফাঁকে একজন একটা ছাতাও তুলেছিল—আর একটু হলেই ধপাস করে আমার পিঠে বসিয়ে দিত। কিন্তু হাবুল সেনই রক্ষা করলে। বললে, না, মশয় না। ভদ্রলোকের পোলা, জুতা চুরি করব ক্যান? আমার বন্ধু কিনা, তাই মসকরা করতে আছিলাম। পায়ে ফোস্কা পড়ছে বইলা থইল্যায় কইর‍্যা—

লোকে সে-যাত্রা ছেড়ে দিল বটে, কিন্তু এতক্ষণে পুলিশের টনক নড়ল। একটু দূরেই তেলেভাজার দোকানে বসে যে ভোজপুরীটা আরামে ফুলুরি খাচ্ছিল, সে এতক্ষণে ধীরে-সুস্থে উঠে দাঁড়ালো। তারপরেই হাঁক দিয়ে বললে, আরে কৌন রে?

এর পরেই হয়ত লালবাজারে গিয়ে হাজতে রাত্রিবাস করতে হবে! সুতরাং আর আমি দাঁড়ালুম না। হতভম্ব হাবুল সেনকে ধাঁ করে একটা ধাক্কা দিয়ে সাঁ করে ঢুকে গেলুম পাশের গলিতে। তারপর সেখান থেকে একেবারে লম্বা!

কিন্তু হাবুল সেন ব্যাপারটাকে চারিদিকে রটিয়ে দিলে। আর রটালো বিলক্ষণ রঙ ফলিয়ে।

বিকেলে দেখি, ক্যাবলা, গদাই আর পন্টা এসে হাজির।

পন্টা বললে, আহা—চুক-চুক!

গদাই বললে, হাসপাতাল থেকে ছাড়ান পেলি কবে?

ক্যাবলা করুণ স্বরে জিজ্ঞেস করলে, পিঠের চামড়া বুঝি একপর্দা তুলে নিয়েছে?

হতভম্ব হয়ে বললুম, মানে?

পণ্ডা বললে, কেন লুকোচ্ছিস ভাই? আমরা তো তোর বন্ধু! না-হয় জুতো চুরি করতে গিয়ে দু' ঘা খেয়েইছিস, তাই বলে কি আমরা সে বন্ধুত্ব ভুলতে পারি?

ক্যাবলা বললে, যাই বলিস ভাই, কাজটা কিন্তু ভাল হয়নি। না-হয় চাঁদা করে একজোড়া জুতো তোকে কিনেই দিতুম! তাই বলে তুই ট্রাম থেকে অন্য লোকের জুতো সরাবি?

উঃ. কী শয়তান হাবুল সেন! বানিয়ে-বানিয়ে এইসব বলে বেরিয়েছে? একবার কাছে যদি পাই—

দড়াম করে ওদের নাকের ডগাতেই আমি দরজাটা বন্ধ করে দিলুম।

এই জুতো! এই জুতোই আমার সর্বনাশ করবে!

রাত্রে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লুম। সমস্ত মেজাজ খিচড়ে গেছে—জীবনটাকে একেবারে অভিশপ্ত বলে বোধ হচ্ছে!

ঘরের একপাশে জুতো-জোড়া আমার দিকে ড্যাব-ড্যাব করে তাকিয়ে আছে। যেন হাসছে আমার দুর্গতি দেখে। দোকানদারের কথাগুলো কানে বাজতে লাগল—আমি যদ্দিন টিকব, জুতোও তদ্দিন টিকবে! এখন দেখছি—জুতোই আমাকে আর টিকতে দেবে না।

বারো টাকা বারো আনার মায়ায় এতদিন অন্ধ হয়ে ছিলুম। কিন্তু আর নয়। হয় জুতো থাকবে নইলে আমি থাকব। এই পৃথিবীতে আমি আর জুতো—দুজনের জায়গা হতে পারে না। আজ জুতোর বিসর্জন!

শুধু বিসর্জন নয়! তার আগে প্রতিহিংসা নিতে হবে—নির্মম প্রতিশোধ!

কী করা যায়?

ভাবতেই দেখি, সামনে টেবিলের উপর কি একটা চকচক করছে। একটা ছোট কাঁচি। ওই কাঁচি দিয়ে মেজদা রোজ তরিবৎ করে গোঁফ ছাঁটে।

ইউরেকা! ওই কাঁচি দিয়ে জুতোটাকে আমি টুকরো-টুকরো করে কাটব! তারপর—

একলাফে কাঁচিটাকে অধিকার করলুম। তারপর জুতোর চামড়ায় বসিয়ে চাপ দিতেই—পট!

না, জুতো কাটল না। সম্রাট ব্র্যান্ড জুতোর কালান্তক চামড়ায় একটু আঁচড় লাগল না পর্যন্ত। মাঝখান থেকে কাঁচিটারই বারোটা বেজে গেল।

সর্বনাশ—সেরেছে!

কাল সকালে মেজদা গোঁফ ছাঁটতে এসে কাঁচির অবস্থা দেখে—! আমারই কান ছেঁটে দেবে! এমনিতেই আমার কান দুটো একটু লম্বা—ও দুটোর ওপর মেজদার লোভ আছে অনেকদিন থেকে। এবার আমি গেছি!

সামনে জুতো-জোড়া আমাকে যেন সামনে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে। আমার মনে হল, ওরা যেন স্পষ্ট বলতে চাইছে. এখুনি হয়েছে কী! তোমার নাক-কানের দফা নিকেশ করে তবে তোমায় ছাড়ব!

উঃ—কী ভয়ঙ্কর চক্রান্ত!

হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লুম।

সাত দিন পরে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আরম্ভ। অঙ্কটাকে কায়দা করে উঠতে পারিনি বলে পর পর দু'বার ম্যাট্রিকে ডিগবাজি খেয়েছি। এবার যদি-বা আশা ছিল—ওই জুতোই আমাকে আর পাশ করতে দেবে না।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু জ্বালার ওপর আর-এক জ্বালা!

পাড়ায় কোথায় ক'দিন থেকে এক উৎপাত শুরু হয়েছে! সন্ধে হলেই 'রামা হো—রামা হো!' কানের পোকা একেবারে বার করে দেবার জো করেছে। আর উৎপাতটা যেন আমার উপরেই বেশি—এ ঘরের জানলাটা খুললেই আওয়াজ যেন কানের পরদা ফাটিয়ে দিতে থাকে!

একে জুতোর জ্বালায় মরছি—তার ওপরে আবার 'রামা হো!' আমার মধ্যে যেন অ্যাটম বোমা ফেটে গেল গোটাকতক। যা হবার হোক। এস্পার কিংবা ওস্পার!

খাট থেকে নেমে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। তারপর ঐ জুতো-জোড়া তুলে নিয়ে একটার পর একটা নির্ঘাৎ ছুড়ে দিলুম ওই 'রামা হো' লক্ষ্য করে!

সঙ্গে সঙ্গে আকাশ-ফাটানো চিৎকার উঠল। আমি আর স্পীক্‌টি নট—! জানলা বন্ধ করে একলাফে খাটে চড়ে বসলুম, তারপর সোজা একদম লেপের তলায়।

আঃ. কী আরাম! এতদিন পরে শান্তিতে ঘুমুতে পারব!

দিন-দুই পরে বড়দার নজর পড়ল।

—হ্যাঁরে প্যালা, তোর সে জগঝম্প জুতোটা গেল কোথায়?

আমার বুক কেঁপে উঠল। 'রামা হো'-রা খুঁজে খুঁজে এসে হাজির হয়নি তো? তা হলেই গেছি!

ঘাড় চুলকে তো-তো করে বললুম, বিয়ের নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে চুরি হয়ে গেছে।

—চুরি হয়ে গেছে! সেই জুতো!—বড়দা এমন করে তাকালো যেন ভূত দেখেছে : এমন গাড়োল চোরও আছে নাকি?

আমি ফোঁস করে বললুম, কেন, জুতোটা বুঝি খারাপ ছিল? ক্রেপ সোল—ক্রোম লেদার—

বড়দা বললে, ক্রোম লেদার নয়, তোর লেদার, মানে তোর মত গোরুর লেদার! কিন্তু বলিহারি চোরের আক্কেল! দুনিয়ায় আর চুরি করার জিনিস পেলে না!

আমি নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচলুম।

তারপর ক'দিন আর কোনদিকে তাকাবার সময় ছিল না। সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা আর সেইসঙ্গে অঙ্কের করাল বিভীষিকা! দশমিক আর ভগ্নাংশ—ফ্যাক্টার আর ফরমুলা—প্রব্লেম আর একস্ট্রা—তার ভেতরে জুতো—'রামা হো'—সব বেমালুম তলিয়ে গেল।

অঙ্কের পরীক্ষার দিন তিনশো তেত্রিশ কোটি দেবতাকে ছশো ছত্রিশটা পাঁঠা মানত করে বেরুচ্ছি—এমন সময় পাশের বাড়ির পিসিমা এসে হাজির। হাতে মস্ত একটা জামবাটি।

পিসিমা ভারি ভালো লোক। বড্ড স্নেহ করেন আমাকে—যখন-তখন ব্রাহ্মণ-ভোজন করান, আর দেব-দ্বিজে পিসিমার বেজায় ভক্তি—প্রায়ই কালীঘাটের প্যাঁড়া এনে খাওয়ান আমাকে। প্রসাদে অরুচি আমার নেই—পেলেই পত্রপাঠ সেবা করে ফেলি।

—পরীক্ষা দিতে যাচ্ছিস? নে, ঢক করে এই চন্নামৃতটুকু খেয়ে ফ্যাল। একেবারে জাগ্রত দেবতার চন্নামৃত—খেলেই পাস হয়ে যাবি।

—কিসের চন্নামৃত পিসিমা? কেমন একটা বদখত গন্ধ!

পিসিমা শিউরে বললেন, অমন বলতে নেই রে, পাপ হয়। ওটা বাবার গায়ের গন্ধ।

—বাবা! কোন্ বাবা!

—জুতিয়া বাবা!

—জুতিয়া বাবা!—পরীক্ষার কথা ভুলে গিয়ে অবাক হয়ে বললুম : বিস্তর

দেবতার নাম শুনেছি, কিন্তু জুতিয়া বাবার নাম তো শুনিনি কোনদিন?

পিসিমা ফিসফিস করে বললেন, সে এক আশ্চর্য ব্যাপার! ওদিকের গলিতে হনুমানজীর একটা আখড়া আছে জানিস তো? ক'দিন আগে সেখানে রামলীলে হচ্ছিল। রাম বনবাসে গেছেন—ভরত নন্দীগ্রামে তাঁর জুতো পুজা করছেন বসে বসে। যেমনি জুতো পুজার গান শুরু হয়েছে—অমনি এক অলৌকিক ব্যাপার।—পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল : সঙ্গে সঙ্গে আকাশ থেকে ধপ-ধপ করে দুখানা জুতো পড়ল। সে কী জুতো! তার একখানার ওজনই হবে তিন সের! অমন পেল্লায় জুতো রামচন্দ্র ছাড়া কার হবে! ভক্তের ডাকে তিনি জুতো-জোড়া স্বর্গ থেকে ফেলে দিলেন।

আমি চমকে উঠলুম, বললুম, কিন্তু—

পিসিমা রেগে বললেন, কিন্তু আবার কী। তোরা সব নাস্তিক হয়েছিস—কিন্তু দেবতারা এখনো আছেন। আমি কত কষ্ট করে—দু-টাকা প্রণামী দিয়ে তোর জন্যে বাবার জুতো-ধোয়া জল—

হায় জুতিয়া বাবা। এখন চরণামৃতটা কী করে বমি করি!

একটি ফুটবল ম্যাচ

গোলটা আমিই দিয়েছি। এখনও চিৎকার শোনা যাচ্ছে ওদের—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুর্‌রে! এখন আমাকে ঘাড়ে করে নাচা উচিত ছিল সকলের। পেট ভরে খাইয়ে দেওয়া উচিত ছিল ভীমনাগের দোকানে কিংবা দেলখোস রেস্তোরাঁয়। কিন্তু তার বদলে একদল পিনপিনে বিদিকিচ্ছি মশার কামড় খাচ্ছি আমি। চটাস করে মশা মারতে গিয়ে নিজের নাকেই লেগে গেল একটা রাম-থাপ্পড়। একটু উঁ-আঁ করে কাঁদব তারও উপায় নেই। প্যাঁচপেঁচে কাদার ভেতরে কচুবনের আড়ালে মূর্তিমান কানাই সেজে বসে আছি, আর আমার চারিদিকে মশার বাঁশি বাজছে।

—থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম। আবার চিৎকার শোনা গেল। একটা মশা পটাস করে হুল ফোটালো ডান গালে। ধাঁ করে চাঁটি হাঁকালুম—নিজের চড়ে নিজেরই মাথা ঘুরে গেল। অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবুও কখনো এমন চড় হাঁকড়েছেন বলে মনে পড়ল না।

গেছি-গেছি বলে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে বাপ-বাপ করে সামলে নিলুম। দমদমার এই কচুবনে আপাতত আরো ঘন্টাখানেক আমার মৌনতার সাধনা। সন্ধ্যার অন্ধকার নামবার আগে এখান থেকে বেরুবার উপায় নেই আমার।

চিৎকারটা ক্রমশ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে : থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্

www.boiRboi.blogspot.com

হুর্‌রে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—পালাজ্বরে ভুগি আর বাসকপাতার রস খাই। কিন্তু পটলডাঙা ছেড়ে শেষে এই দমদমার কচুবনে আমার পটল তোলবার জো হবে—এ কথা কে জানত!

আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ফুটবল ক্লাবের আমি একজন উৎসাহী সদস্য। নিজে কখনো খেলি না, তবে সব সময়েই খেলোয়াড়দের প্রেরণা দিয়ে থাকি। আমাদের ক্লাব কোন্ খেলায় গোল দিলে সাত দিন আমার গলাভাঙা সারে না। হঠাৎ যদি কোন খেলায় জিতে যায়—যা প্রায় কোন দিনই হয় না—তাহলে আনন্দের চোটে আমার কম্প দিয়ে পালাজ্বর আসে।

সদস্য হয়েই ছিলুম ভাল। গোলমাল বাধল খেলোয়াড় হতে গিয়ে।

দমদমার ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের সঙ্গে ফুটবল ম্যাচ। তিনদিন আগে থেকে ছোটদির ভাঙা হারমোনিয়ামটা নিয়ে আমি ধ্রুপদ গাইতে চেষ্টা করছি। গান গাইবার জন্যে নয় —খেলার মাঠে যাতে সারাক্ষণ একটানা চেঁচিয়ে যেতে পারি—সেই উদ্দেশ্যে। তেতলার ঘর থেকে মেজদা যখন বড় একটা ডাক্তারির বই নিয়ে তেড়ে এল, তারপরেই বন্ধ করতে হল গানটা।

কিন্তু দমদমে পৌঁছেই একটা ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ শোনা গেল।

আমাদের দুই জাঁদরেল খেলোয়াড় ভন্টু আর ঘন্টু দুই ভাই। দুজনেই মুগুর ভাঁজে আর দমাদ্দম ব্যাকে খেলে। বলের সঙ্গে সঙ্গে উড়িয়ে দেয় অন্য দলের সেন্টার ফরোয়ার্ডকে। আজ পর্যন্ত দুজনে যে কত লোকের ঠ্যাং ভেঙেছে তার হিসেব নেই।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওরা পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবেরই ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাং ভাঙল। একেবারে দুটো ঠ্যাংই একসঙ্গে।

কাশীতে ওদের কুটিমামা থাকে। তা থাক—কাশি-সর্দি-পালাজ্বর—যেখানে খুশি থাক। কিন্তু কুটিমামা কি আর বিয়ে করার দিন পেল না? ঠিক আজ দুপুরেই টেলিগ্রামটা এসে হাজির। আর বিশ্বাসঘাতক ভন্টু আর ঘন্টু সঙ্গে সঙ্গে লাফাতে লাফাতে হাওড়া স্টেশনে। থান্ডার ক্লাবকে যেন দুটো আন্ডার-কাট ঘুসি মেরে চিৎ করে ফেলে দিয়ে গেল!

দলের ক্যাপ্টেন পটলডাঙার টেনিদা বাঘের মতো গর্জন করে উঠল।—মামার বিয়ের ঘ্যাঁট গেলবার লোভ সামলাতে পারলে না। ছোঃ। নরাধম—লোভী—কাপুরুষ। ছোঃ!

গাল দিয়ে গায়ের ঝাল মিটতে পারে, কিন্তু সমস্যার সমাধান হয় না। পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবের সদস্যেরা তখন বাসি মুড়ির মতো মিইয়ে গেছে সবাই। ভন্টু ঘন্টু নেই—এখন কে বাঁচাবে ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের হাত থেকে? ওদের দুঁদে ফরোয়ার্ড ন্যাড়া মিত্তির দারুণ ট্যারা। আমাদের গোলকিপার গোবরা আবার ট্যারা দেখলে বেজায় ভেবড়ে যায়—কোন দিক থেকে যে বল আসবে ঠাহর করতে পারে না। ওই ট্যারা ন্যাড়াই হয়ত একগন্ডা গোল ঢুকিয়ে দিয়ে বসে থাকবে।

এখন উপায়?

টেনিদার ছোকরা চাকর ভজুয়া গিয়েছিল সঙ্গে। বেশ গাট্টাগোট্টা চেহারা—মারা-মারি বাধলে কাজে লাগবে মনে করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেনিদা কটমট করে খানিকটা তার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে, এই ভজুয়া—ব্যাকে খেলতে পারবি?

ভজুয়া খৈনি টিপছিল। টপ করে খানিকটা খৈনি মুখে পুরে নিয়ে বললে, সেটা ফির কি আছেন ছোটবাবু?

—পায়ের কাছে বল আসবে—ধাই করে মেরে দিবি। পারবি না?

—হাঁ। খুব পারবে। বল ভি মারিয়ে দিবে—আদমি ভি মারিয়ে দিবে।—ভজুয়ার চোখে-মুখে জ্বলন্ত উৎসাহ।

—না না, আদমিকে মারিয়ে দিতে হবে না। শুধু বল মারলেই হবে। পারবি তো ঠিক?

—কেনো পারবে না? কাল রাস্তামে একঠো কুত্তা ঘেউ-ঘেউ করতে করতে আইল তো মারিয়ে দিলাম একঠো জোরসে লাথি। এক লরি যাইতেছিল—লাথ্ খাইয়ে একদম উস্‌কো উপর চড়িয়ে গেল। বাস্—সিধা হাওড়া টিশন।

—থাম থাম—মেলা বকিস নি—টেনিদা একটা নিশ্চিন্ত দীর্ঘশ্বাস ফেলল : একটা ব্যাক তো পাওয়া গেল! আর একটা—আর একটা—এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে হঠাৎ চোখ পড়ল আমার ওপরে :—ঠিক হয়েছে। প্যালাই খেলবে।

—আমি!

একটা চীনেবাদাম চিবুতে যাচ্ছিলুম, সেটা গিয়ে গলায় আটকালো।

—কেন—তুই তো বলেছিলি, শিমুলতলায় বেড়াতে গিয়ে কাদের নাকি তিনটে গোল দিয়েছিলি একাই? সে-সব বুঝি স্রেফ গুলপট্টি?

গুলপট্টি তো নির্ঘাৎ। চাটুজ্জেদের রকে বসে তেলে-ভাজা খেতে খেতে সবাই দুটো-চারটে গুল দেয়, আমিও ঝেড়েছিলুম একটা। কিন্তু টেনিদা দু'বার ম্যাট্রিকে গাড্ডা খেয়েছে, তার মেমোরি এত ভাল কে জানত?

বাদামটা গিলে ফেলে আমি বললুম, না না, গুলপট্টি হবে কেন! পালাজ্বরে কাহিল করে দিয়েছে—নইলে এতদিনে আমি মোহনবাগানে খেলতুম, তা জানো? এখন দৌড়োতে গেলে পিলেটা একটু নড়ে—এই যা অসুবিধে।

—পিলেই তো নড়াবি। পিলে নড়লে তোর পালাজ্বরও সরে পড়বে—এই বলে দিলুম। নে—নেমে পড়—

ফুর্—র্—র্—র্—

রেফারির বাঁশির আওয়াজ। আমি কী বলতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই এক ধাক্কায় টেনিদা আমাকে ছিটকে দিলে মাঠের ভেতরে। পড়তে-পড়তে সামলে নিলুম। ভেবে দেখলুম, গোলমাল বেশি বাড়ানোর চাইতে দু-একটা গোল দেওয়ার চেষ্টা করাই ভাল।

যা থাকে কপালে! আজ প্যালারামেরই একদিন কি পালাজ্বরেরই একদিন!

খেলা শুরু হল।

ব্যাকে দাঁড়িয়ে আছি। ভেবেছিলুম ভজুয়া একাই ম্যানেজ করবে—কিন্তু দেখা গেল, মুখ ছাড়া আর কোন পুঁজিই ওর নেই। একটা বল পায়ের কাছে আসতেই রাম শট হাঁকিড়ে দিলে। কিন্তু বলে পা লাগল না—উলটে ধড়াস করে শুকনো মাঠে একটা আছাড় খেল ভজুয়া। ভাগ্যিস গোলকিপার গোবরা তক্কে-তক্কে ছিল—নইলে ঢুকেছিল আর-কি একখানা!

হাই কিক্ দিয়ে গোবরা বলটাকে মাঝখানে পাঠিয়ে দিলে। রাইট আউট হাবুল সেন বলটা নিয়ে পাঁই-পাঁই করে ছুটল—ফাঁড়া কাটল এ যাত্রা।

কিন্তু ফুটবল মাঠে সুখ আর কতক্ষণ কপালে থাকে! পরক্ষণেই দেখি বল দ্বিগুণ বেগে ফিরে আসছে আমাদের দিকে—আর নিয়ে আসছে ট্যারা ন্যাড়া মিত্তির।

ভজুয়া বোঁ-বোঁ করে ছুটল—কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে ছুঁতেও পারল না। খুট করে ন্যাড়া পাশ কাটিয়ে নিলে, ভজুয়া একেবারে লাইন টপকে গিয়ে পড়ল লাইনস্‌ম্যান ক্যাবলার ঘাড়ে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু ভজুয়ার যা খুশি হোক—আমার তো শিরে সংক্রান্তি। এখন আমি ছাড়া ন্যাড়া মিত্তির আর গোলকিপার গোবরার ভেতরে আর কেউ নেই! আর গোবরাকে তো জানি। ন্যাড়ার ট্যারা চোখের দিকে তাকিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকবে—কোন দিক দিয়ে বল যে গোলে ঢুকছে টেরও পাবে না।

—চার্জ! চার্জ!—সেন্টারহাফ টেনিদার চিৎকার : প্যালা, চার্জ—

জয় মা কালী! এমনিও গেছি—অমনিও গেছি! দিলুম পা ছুড়ে! কিমাশ্চর্যম্!

ন্যাড়া মিত্তির বোকার মতো দাঁড়িয়ে—বলটা সোজা ছুটে চলে গেছে হাবুল সেনের কাছে।

—ব্রেভো, ব্রেভো প্যালা!—চারদিক থেকে চিৎকার উঠল : ওয়েল সেভ্‌ড্!

তাহলে সত্যিই আমি ক্লিয়ার করে দিয়েছি! আমি পটলডাঙার প্যালারাম, ছেলে-বেলায় টেনিস বল ছাড়া যে কখনো পা দিয়ে ফুটবল ছোঁয়নি—সেই আমি ঠেকিয়েছি দুর্ধর্ষ ন্যাড়া মিত্তিরকে! আমার চব্বিশ ইঞ্চি বুক গর্বে ফুলে উঠল। মনে হল, ফুটবল খেলাটা কিছুই নয়। ইচ্ছে করে এতদিন খেলিনি বলেই মোহনবাগানে চান্স পাইনি।

কিন্তু আবার যে ন্যাড়া মিত্তির আসছে! ওর পায়ে কি চুম্বক আছে! সব বল কি ওর পায়ে গিয়ে লাগবে?

দু'বার অপদস্থ হয়ে ভজুয়া ক্ষেপে গিয়েছিল। মরিয়া হয়ে চার্জ করল। কিন্তু রুখতে পারল না। তবু এবারেও গোল বাঁচল। তবে গোবরা নয়—একরাশ গোবর। ঠিক সময়মতো তাতে পা পিছলে পড়ে গেল ন্যাড়া মিত্তির, আর আমি ধাই করে শট মেরে ক্লিয়ার করে দিলুম। ওদের লেফট্ আউটের পায়ে লেগে থ্রো হয়ে গেল সেটা।

কিন্তু আত্মবিশ্বাস ক্রমেই বাড়ছে। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাবের চিৎকার সমানে শুনছি : ব্রেভো প্যালা—সাবাস! আরে, আবার যে বল আসে! আমাদের ফরোয়ার্ড-গুলো কি ঘোড়ার ঘাস কাটছে নাকি? গেল-গেল করতে করতে ওদের বেঁটে রাইট ইনটা শট করলে—আমার পায়ের তলা দিয়ে বল উড়ে গেল গোলের দিকে।

গো—ও—ও—

ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের চিৎকার। কিন্তু 'ওল' আর নয়, স্রেফ কচু। অর্থাৎ বল তখন পোস্ট ঘেঁসে কচুবনে অন্তর্ধান করেছে।

গোল কিক্।

কিন্তু এর মধ্যেই একটা কান্ড করেছে ভজুয়া। বলকে তাড়া করতে গিয়ে শট করে দিয়েছে গোল-পোস্টের গায়ে। আর তার পরেই আঁই-আঁই করতে করতে বসে পড়েছে পা চেপে ধরে।

ভজুয়া ইনজিওর্ড! ধরাধরি করে দু-তিনজন তাকে বাইরে নিয়ে গেল।

আপদ গেল! যা খেলছিল—পারলে আমিই ওকে ল্যাং মেরে দিতুম। গোল-পোস্টটাই আমার হয়ে কাজ সেরে দিয়েছে। কিন্তু এখন যে আমি একেবারে একা! 'একা কুম্ভ রক্ষা করে নকল বুঁদিগড়—! এলোপাথাড়ি কাটল কিছুক্ষণ। ভগবান ভরসা—তাকে আর বল ছুঁতে হল না। গোটা দুই শট্ গোবরা এগিয়ে এসে লুফে নিলে, গোটা তিনেক সামলে নিলে হাফ-ব্যাকেরা। তারপর হাফ-টাইমের বাঁশি বাজল।

আঃ—কোনমতে ফাঁড়া কাটল এ পর্যন্ত। বাকি সময়টুকু সামলে নিতে পারলে হয়!

পেটের পিলেটা একটু টনটন করছে—বুকের ভেতরও খানিকটা ধড়ফড়ানি টের পাচ্ছি। কিন্তু চারদিক থেকে তখন থান্ডার ক্লাবের অভ্যর্থনা : বেড়ে খেলছিস প্যালা, সাবাস! এমনকি ক্যাপ্টেন টেনিদা পর্যন্ত আমার পিঠ থাবড়ে দিলে : তুই দেখছি

রেগুলার ফার্স্ট ক্লাস প্লেয়ার! নাঃ—এবার থেকে তোকে চান্স্ দিতেই হবে দু-একবার!

এতে আর কার পিলে-টিলের কথা মনে থাকে? বিজয়গর্বে দু-গ্লাস লেবুর সরবৎ খেয়ে নিলুম। শুধু ভজুয়া কিছু খেল না—পায়ে একটা ফেটি বেঁধে বসে রইল গোঁজ হয়ে। টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শুধু এক-নম্বরের বাকি-নরেশ! এক লাথ্সে কুত্তাকো লরিমে চড়া দিয়া! তবু একটা বল ছুঁতে পারলে না—ছোঃ—ছোঃ?

ভজুয়া দু' চোখে জিঘাংসা নিয়ে তাকিয়ে রইল।

আবার খেলা শুরু হল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে ভজুয়া আবার নামল মাঠে। আমার কানের কাছে মুখ এনে বললে, দেখিয়ে প্যালাবাবু—ইস্ দফে হাম মার ডালেঙ্গে!

ভজুয়ার চোখ দেখে আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সর্বনাশ—আমাকে নয় তো?

—সে কী রে! কাকে?

—দেখিয়ে না—

কিন্তু আবার সে আসছে! 'ওই আসে—ওই অতি ভৈরব হরষে'! আর কে? সেই ন্যাড়া মিত্তির! টাঁরা চোখে সেই ভয়ঙ্কর দৃষ্টি! এবার গোল না দিয়ে ছাড়বে বলে মনে হয় না!

ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটল ভজুয়া। তারপরই 'বাপ' বলে এক আকাশ-ফাটা চিৎকার! বল ছেড়ে ন্যাড়া মিত্তিরের পাজরায় লাথি মেরেছে ভজুয়া, আর ন্যাড়া মিত্তির ঝেড়েছে ভজুয়ার মুখে এক বোম্বাই ঘুষি। তারপর দুজনেই ফ্ল্যাট এবং দুজনেই অজ্ঞান। ভজুয়া প্রতিশোধ নিয়েছে বটে, কিন্তু এটা জানত না যে ন্যাড়া মিত্তির নিয়মিত বক্সিং লড়ে।

মিনিট-তিনেক খেলা বন্ধ। পটলডাঙার থান্ডার ক্লাব আর দমদম ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের মধ্যে একটা মারামারি প্রায় বেধে উঠেছিল—দু-চারজন ভদ্রলোক মাঝখানে নেমে থামিয়ে দিলেন। ফের খেলা আরম্ভ হল। কিন্তু ভজুয়া আর ফিরল না—ন্যাড়া মিত্তিরও না।

বেশ বোঝা যাচ্ছে, ন্যাড়া বেরিয়ে যাওয়াতে দলের কোমর ভেঙে গেছে ওদের। তবু হাল ছাড়ে না ভ্যাগাবন্ড ক্লাব। বারবার তেড়ে আসছে। আর, কী হতচ্ছাড়া ওই বেঁটে রাইট-ইনটা!

—অফ সাইড। রেফারির হুইসল। আর-একটা ফাঁড়া কাটল।

পটলডাঙা ক্লাবের হাফ-ব্যাকেরা এতক্ষণে যেন একটু দাঁড়াতে পেরেছে। আমার পা পর্যন্ত আর বল আসছে না। খেলার প্রায় মিনিট-তিনেক বাকি। এইটুকু কোনো-মতে কাটাতে পারলেই মানে মানে বেঁচে যাই—পটলডাঙার প্যালারাম বীরদর্পে ফিরতে পারে পটলডাঙায়।

এই রে! আবার সেই বেঁটেটা! কখন চলে এসেছে কে জানে! এ যে ন্যাড়া মিত্তিরের ওপরেও এক-কাঠি! নেংটি ইঁদুরের মতো বল মুখে করে দৌড়তে থাকে! আমি কাছে এগোবার আগেই বেঁটে কিক করেছে। কিন্তু থান্ডার ক্লাব বাঁয়ে শেয়াল নিয়ে নেমেছিল নির্ঘাৎ! ডাইভ করে বলটা ধরতে পারলে না গোবরা—তবু এবারেও বল পোস্ট ঘেঁষে বাইরে চলে গেল।

কিন্তু ন্যাড়া মিত্তিরকে যে গোবরটা কাত করেছিল—সেটা এবার আমায় চিৎ করল। একখানা পেল্লায় আছাড় খেয়ে যখন উঠে পড়লুম তখন পেটের পিলেটায় সাইক্লোন হচ্ছে। মাথার ভেতরে যেন একটা নাগরদোলা ঘুরছে বোঁ-বোঁ করে। মনে

www.boiRboi.blogspot.com

হচ্ছে, কম্প দিয়ে পালাজ্বর এল বুঝি!

আর এক মিনিট। আর এক মিনিট খেলা বাকি। রেফারি ঘড়ির দিকে তাকাচ্ছে বারবার। ড্র যাবে নির্ঘাৎ। যা খুশি হোক—আমি এখন মাঠ থেকে বেরুতে পারলে বাঁচি! আমার এখন নাভিশ্বাস! গোবরে আছাড় খেলে মাথা এমন বোঁ-বোঁ করে ঘোরে কে জানত!

গোল-কিক।

আবছাভাবে গোবরার গলার স্বর শুনতে পেলুম: কিক কর, প্যালা—

শেষের বাঁশি প্রায় বাজল। চোখে ধোঁয়া দেখছি আমি। এইবার প্রাণ খুলে একটা কিক করব আমি! মোক্ষম কিক! জয় মা কালী—

প্রাণপণে কিক্ করলুম। গো—ও-ওল—গো—ও-ও-ল—! চিৎকারে আকাশ ফাটার উপক্রম! প্রথমটা কিছুই বুঝতে পারলুম না। এত জোরে কি শট মেরেছি যে আমাদের গোল-লাইন থেকেই ওদের গোলকিপারকে ঘায়েল করে দিয়েছি?

কিন্তু সত্য-দর্শন হল কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই। গোবরা হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাদের গোলের নেটের ভেতরেই বলটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে। যেন আমার কীর্তি দেখে বলটাও হতভম্ব হয়ে গেছে।

তারপর?

তারপর খেলার মাঠ থেকে এক মাইল দূরের এই কচুবনে কানাই হয়ে বসে আছি। দূর থেকে এখনো ভ্যাগাবন্ড ক্লাবের চিৎকার আসছে: থ্রি চিয়ার্স ফর প্যালারাম—হিপ্ হিপ্ হুররে!

দুরন্ত নৌকা-ভ্রমণ

কতগুলো কসাই মরলে একটা মাসিকপত্রের সম্পাদক হয়ে জন্মায়—কে জানে!

আমি—পটলডাঙার প্যালারাম—আমার জানা তো দূরে থাক, আমাদের 'দুরন্ত দুর্বার ইরম্মদ কবি' হারাধন হাওলাদার অবধি জানেন না। দেশে অস্ত্র-আইন না থাকলে তিনি একটা পিস্তল কিনতেন এবং তাই দিয়ে দিনে একটা করে সম্পাদক সাবাড় করতেন—এই তাঁর বাসনা। এবং সে বাসনাটা তিনি প্রকাশ করেছেন আমারই ঘরের তক্তাপোষে বসে—উত্তেজনায় একটা প্রচন্ড চাঁটি হাঁকড়েছেন এক পেয়ালা গরম চায়ের ওপর এবং হাত পুড়িয়ে 'গেছি-গেছি' রবে আর্তনাদ তুলে লাফাতে লাফাতে নেমে গেছেন সদর রাস্তায়।

একে প্রাণের জ্বালা, তার ওপর হাতের জ্বলা! হারাধন হাওলাদার মরিয়া হয়ে গেলেন।

দৈনিক গোটা-দশেক করে কবিতা লেখেন। ভাবের আবেগ যেদিন দুর্বার বেগে বেরিয়ে আসে, সেদিন পঁচিশ-তিরিশটা পর্যন্ত লিখে ফেলেন। যেদিন প্রথম স্বাধীনতা এল, সেদিন মারাত্মক প্রেরণায় সাড়ে-পঁয়তাল্লিশটা কবিতার জন্ম দিয়েছিলেন। বাকি আধখানা আর লেখা হয়নি—তাঁর ছোট ছেলে মণ্টু হামাগুড়ি দিয়ে এসে সেটাকে চিবিয়ে ফেলেছিল। ওই সাড়ে-পঁয়তাল্লিশ তাঁর রেকর্ড।

কিন্তু কৃতঘ্ন নরাধম সম্পাদকেরা কি একটা কবিতাও ছাপল! ছাপল না। না ছাপুক, বন্ধু-বান্ধবেরা? তাদের ওপরেও ঘেন্না ধরে গেছে তাঁর। বিস্তর চপ-কাটলেটের লোভ দেখিয়ে যদি-বা কবিতা শোনাতে ডেকে আনলেন—ভরপেট খাওয়ার পরে তাদেরই নাক ডাকতে লাগল। তাদের নাক কাকে ডাকতে লাগল কে জানে, কিন্তু হারাধনের কবিতাকে যে নয়—এ ব্যাপারে সন্দেহমাত্র নেই।

সুতরাং মরিয়া হয়ে হারাধন দেশত্যাগ করলেন।

যাওয়ার আগে শুধু আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন : সংসারে আমার ব্যথা একমাত্র তুই-ই বুঝলি, প্যালা। একমাত্র তোকেই আমার সাত হাজার সাতষট্টিটা কবিতা শোনাতে পেরেছি। মাঝে-মাঝে তুইও ঝিমিয়েছিস বটে, কিন্তু কখনো নাক ডাকাসনি। তাই তোকেই দেখা দিয়ে গেলাম।

কিন্তু কেন যে হারাধনের ওই সাত হাজার সাতষট্টিটা কবিতাকে হজম করে গেছি, সে তো আমি জানি! অনুরোধে লোকে একটা ঢেঁকি গিলতে পারে—কিন্তু কবি হারাধনের প্রতিটি কবিতাই এক-একটি ঢেঁকি—কেরোসিন কাঠের নয়—রেগুলার শালকাঠের ঢেঁকি। কতবার শুনতে শুনতে কান বোঁ-বোঁ করে উঠেছে, মাথা ঝিম-ঝিম করেছে, বুক ধড়ফড় করে হার্ট বন্ধ হবার জো হয়েছে—তবু তাঁর কবিতা শুনেছি আমি। কেন আর? একবার ওঁর কাছ থেকে পঁচিশ টাকা ধার করেছিলাম—পাছে ফস্ করে সে টাকাটা চেয়ে বসেন—সেই ভয়ে।

আজ শুধু উনি দেশ ছাড়ছেন তাই নয়। মনকে ডেকে বললাম : হে আত্মারাম, এতদিনে তোমারও ভূত ছাড়ল। আরো কিছুদিন তাহলে বেঁচে রইলে। ফস্ করে হার্ট-ফেল হবার ভয় রইল না।

মুখখানাকে যতদূর সম্ভব করুণ করে, করুণতর স্বরে বললাম : আর ফিরবেন না, হারাধনদা?

—ফিরব না মানে? হারাধনদার চোখ দপদপ করে উঠল। আমার বুকভরা আশা ধুক করে নিবিয়ে দিয়ে বললেন, ফিরব—এই বাঙলা দেশেই ফিরব—প্রতিভার লেলিহান আগুন জেবলে ফিরব! কবিতার অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে পুড়িয়ে মারব হতচ্ছাড়া সম্পাদক আর বিশ্বাসঘাতক বন্ধুদের! শুধু তুই বেঁচে যাবি, প্যালা। বলতে বলতে হারাধনদার সর্বাঙ্গ ম্যালেরিয়ার রোগীর মতো কাঁপতে লাগল, গলার স্বর সরস্বতী পুজোর অ্যামপ্লিফায়ারের মতো গগনভেদী হয়ে উঠল : ফিরব সূর্যের মতো, উল্কার মতো, ধূমকেতুর মতো—

বলতে বলতে উড়ন-তুবড়ির মতো মিলিয়ে যেতে চাইলেন তিনি। কিন্তু তার আগে ফুটপাথে একটা পচা আমে পা দিয়ে ধপাস করে আছাড় খেলেন, তারপর লোকে আহা-আহা করে ওঠার আগেই ট্রামে চড়ে দিগন্তে—মানে, শিয়ালদা স্টেশনের দিকে বিলীন হয়ে গেলেন।

ফিরেছেন মাস-দুই পরে।

প্রলয়ের আগুন হয়ে নয়, সূর্য ধূমকেতু উল্কা—নিদেনপক্ষে একটা তুবড়ি হয়েও নয়। তুবড়ে একটা নেংটি ইঁদুর হয়ে ফিরেছেন হারাধন হাওলাদার—সাতদিন কলে আটকে-থাকা নেংটি ইঁদুর।

—ব্যাপার কী, হারাধনদা?—আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

—ব্যাপার? ব্যাপার সাংঘাতিক—হারাধনদা চিঁচিঁ করে বললেন, সব খুলে বলছি। তার আগে এক কাপ চা—আর দুটো ম্যাপাক্কীন!

—ম্যাপাক্কীন!

—হ্যাঁ হ্যাঁ—ম্যাপাক্কীন। আর বকাসনি প্যালা। আগে নিয়ে আয়—তারপরে বলছি।

চা আর ম্যাপাক্কীন আনলাম। চায়ে একটা চুমুক দিয়ে কোঁৎ-কোঁৎ করে দুটো ম্যাপাক্কীন গিললেন হারাধনদা। খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন বুঁদ হয়ে। তারপর শুরু করলেন এক মর্মভেদী করুণ কাহিনী। সে কাহিনী হারাধনদার ভাষাতেই আমি তুলে দিলাম। (শুধু প্রেসের সুবিধের জন্যে অতিরিক্ত চন্দ্রবিন্দুগুলো বাদ দিয়ে দিলাম—তোমরা ইচ্ছেমতো বসিয়ে নিতে পার।)

হারাধনদা বললেন :

ভাবলাম, কলকাতায় থেকে আমার কিচ্ছু হবে না। রবি ঠাকুরেরও হয়নি। এখানে জ্বালাতন হয়ে তিনি নৌকো করে পদ্মায় চলে গেলেন—আর বোটে বসে এনতার কবিতা লিখলেন। তাইতেই অতো নাম আর নোবেল প্রাইজ।

সঙ্গে-সঙ্গে পটাং করে জ্ঞানচক্ষুর উন্মোচন হল। আমিও যদি ঐরকম নৌকো চড়ে নদীতে বেড়াতে পারি, তাহলে আমাকে পায় কে! এমন দুরন্ত দুর্ধর্ষ বেগে কবিতা বেরুতে থাকবে যে পড়ে হৃদ্‌কম্প হবে লোকের! একেবারে লম্ফ দিয়ে উঠবে দেশটা!

কিন্তু সে কম্প আর লম্ফ যে আমারই কপালে লেখা ছিল—তা কি আমিই জানতাম?

জানিস তো—সাতপুরুষ কলকাতায় থাকি। কলকাতা থেকে মাইল-তিরিশেক দূরে আমাদের পৈতৃক বাড়ি। আমি তো আমি—ম্যালেরিয়ার ভয়ে আমার ঠাকুর্দা-ইস্তক কেউ কোনদিন ও তল্লাট মাড়ায়নি।

এতদিনে বুঝলাম, কী ভুলটাই করেছি! দেশে নদী-নালা-খানা-খন্দ বিস্তর—ওখানে গেলেই কবিতা মগজের ভেতরে বিজবিজ করে গজাতে থাকবে। আহা-হা, দেশের মতো কি আর জিনিস আছে? খাল-বিল বন-বাদাড়—ও-ই তো কবিতার ডিপো! সাধে কি কবি লিখেছেন, 'ও আমার দেশের মাটি, তোমার পায়ে ঠেকাই মাথা'? কার লাইন রে? রবি ঠাকুরের? বিদ্যাসাগরের লেখা নাকি? না 'মেঘনাদ বধ'-এ আছে?

যার লাইনই হোক—সে এক-নম্বরের ধাপ্পাবাজ। নির্ঘাৎ ধাপ্পাবাজ! তোকে একটা কথা বলে রাখি প্যালা, দেশের মাটিতে কখনো মাথা নোয়াতে যাসনি। নুইয়েছিস কি শুইয়ে ছাড়বে—মাটি নেওয়াবে একদম!

ছ' রীম কাগজ, ছ'টা ফাউন্টেন পেন আর ছ' বোতল কালি নিয়ে আমি দেশে গেলাম।

গিয়ে দেখি—সারা গাঁ ভোঁ-ভোঁ। জন-মনিষ্যির বালাই নেই বললেই চলে। চারিদিকে ভাঙাচুরো বাড়ি আর কোমর-ভর আসামলতার জঙ্গল। যে দু-চারজন

www.boiRboi.blogspot.com

আছে, তারা তো হাঁটে না—যেন বাদাড়ে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। ভাবলাম—খাসা! কানের কাছে ভাঁপ ভাঁপ করে মোটরের হর্ন বাজবে না, পাশের বাড়ির লোক্যাল সেট রেডিওটা পেত্নীর কান্না জুড়বে না, পথে-ঘাটে পকেট কাটা যাবে না। নিশ্চিন্ত মনে, নির্লিপ্ত হয়ে কবিতার নিরঙ্কুশ স্রোতে ভেসে যাব।

কিন্তু রাত্রেই টের পেলাম—আরো কিছু আছে।

মশারি ফুটো করে সারারাত মশারা আনন্দে বিউগল বাজাতে লাগল। গায়ের থেকে এক পর্দা চামড়াই খুবলে নিল বলতে গেলে। কোত্থেকে গোটা দুই আরশোলা এসে নাকে সুড়সুড়ি দিতে লাগল, আর রাত জেগে শুনতে লাগলাম বাড়ির উঠোনে সাপে ব্যাং ধরেছে।

প্রথম রাতেই দমে গেলাম খানিকটা। কিন্তু জানিস তো—দশ হাজার সাড়ে-বাহাত্তরটা কবিতা লিখেছি—এত সহজেই হটবার বান্দা নই আমি। ঠিক করলাম—না, ঘর আমার জন্যে নয়। কালই নৌকো নিয়ে নদীতে ভেসে পড়ব। তারপর রবি ঠাকুরের একদিন কি আমারই একদিন!

সকালেই বেরুলাম নদী আর নৌকোর সন্ধানে।

নদী? হ্যাঁ—পাওয়া গেল বৈকি। হাত-বিশেক চওড়া। হাঁটু-সমান কাদার ভেতরে আঁজলা-আঁজলা জল। নৌকো চড়ে পার হওয়া যায় না, নৌকোকে কাঁধে চড়িয়ে পার করতে হয়।

দুত্তোর ছাই—এর জন্যে কাল সারারাত মশার সঙ্গে ধস্তাধস্তি করলাম! চুলোয় যাক—কালই কলকাতায় ফিরব।

প্যালা রে, তাই যদি ফিরতাম!

পরদিন সকালে বাগ্দিদের এক ছোকরা বাগিয়ে ফেলল আমাকে। সকালে ঘর থেকে বেরুতেই দেখি, একমুখ দন্তবিকাশ করে দোরগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে। রোগা ডিগডিগে, পেটভরা পিলে, একমাথা ধামার মতো চুল।

সম্ভাষণটা সে-ই করল।

—কর্তার বুঝি নৌকোয় বেড়াবার সাধ হয়েছে?

সাধ! হতভাগা বলে কী! জ্বলন্ত কাব্য লেখবার দুরন্ত আবেগে আমি ফুটন্ত কেটলির মতো টগবগ করছি, আর বলে কিনা সাধ!

কিন্তু মুর্খটাকে সেকথা বোঝানো যাবে না। সংক্ষেপে বললাম, হুঁ। তোর নৌকো আছে?

—আজ্ঞে।

—সেটার চাকা আছে তো?

—আজ্ঞে কী যে বলেন!—ছোকরা জিভ কাটল : আপনি দেখছি এক-লম্বরের ভোম্বল! রেলগাড়ির চাকা থাকেন আজ্ঞে, লৌকোর নয়।

সাহস কত—আমাকে বলে ভোম্বল। আমি চটে গেলাম : রেলগাড়ির যে চাকা থাকেন, তা আমিও জানেন। কিন্তু তোদের দেশের নদীতে তো জল নেই—নৌকো ডাঙা দিয়ে চলেন। চাকা নইলে যাবেন কী করে?

—আজ্ঞে, এ তো মরা লদী। উদিকে বড় লদী রয়েছে।

—তাই নাকি? কত বড় নদী?

—খুব বড়। চলুন না একবার। গেলেই বুঝতে পারবেন।

মনে-মনে খুশি হয়ে উঠলাম। বললাম, তোর নদী যদি পছন্দ হয়, তাহলে একদিন-দুদিন নয়, একদম তিন মাস নৌকোয় থেকে যাব, বুঝলি? যা ভাড়া চাস,

www.boiRboi.blogspot.com

তাই পাবি।

শুনে ছোকরা হাঁ করল : তিন মাস লৌকোয় থাকবেন?

—হুঁ।

ছোকরা শেয়ালের মতো খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল : তিন মাস খামোকা লৌকোয় থাকবেন! আপনি কর্তা এক লম্বরের ভোম্বল!

—চুপ কর, বকবক করিসনি। চল্ দেখি তোর নদী।

ছ'রীম কাগজ, ছ'টা ফাউন্টেন পেন আর ছ' বোতল কালি নিয়ে আমি ছোকরার পেছনে পেছনে বেরুলাম।

ছোকরার নাম ঝাটু। ঝাঁটার অপভ্রংশ বোধহয়। পরে বুঝেছিলাম, আমাকে ঝাঁটানোর জন্যেই তার আবির্ভাব!

সেই সাত-সকালে পাক্কা সাতটি মাইল হাঁটালো। কচুবন আর বিছুটির জঙ্গল মাড়িয়ে সারা গা চিড়বিড়িয়ে জ্বলতে লাগল, জুতোর ফোস্কা পড়ল, পায়ের জুতো হাতে চড়ল। খালি বলে : উই দেখা যাচ্ছে।

হাঁপাতে-হাঁপাতে বললাম, উই আমি বিস্তর দেখেছি, তোর নদী গেল কোথায়?

—উই তো লোদী।

সাত মাইল পরে 'উই লদী' পাওয়া গেল। ততক্ষণে আমার আধ হাত জিভ বেরিয়ে পড়েছে। কিন্তু নদী দেখে মনটা আশ্বাস পেল। বেশ বড়ই বলতে হবে। স্রোত আছে কি নেই বোঝা যায় না—দিব্যি টলটলে জল। একধারে আসশ্যাওড়ার বন, আর একদিকে ধানের ক্ষেত। ঝাটুর ছোট নৌকোটা পারেই বাঁধা। ঝাটু কোঁচড় থেকে এক-খাবলা মুড়ি নিয়ে চিবোতে-চিবোতে নৌকোয় উঠল। বললে, উঠুন কর্তা। কত বেড়াতে পারেন, দেখব।

ছ'টা কলম একসঙ্গে বাগিয়ে আমি নৌকোয় চড়লাম। ঝাটু লগি তুলে নৌকো ছাড়ল।

—হ্যাঁরে প্যালা, তোদের রবি ঠাকুর গুল্ দেয়নি তো? নৌকোয় বসে সত্যিই কখনো লেখা যায় নাকি? এই দুলছে তো সেই দুলছে! কলম একবার ঘ্যাঁচ করে এদিকে যাচ্ছে, আর একবার ওদিকে। খানিক বাদেই দেখি, এক লাইনও লেখা হয়নি—একরাশ ছবি আঁকা হয়ে গেছে খাতার ওপর।

বললাম, ওরে ঝাটু, নৌকো থামা। যেজন্যে এত খেদমদ, তাই যে হচ্ছে না! এক লাইনও লিখতে পারছি না!

ঝাটু শেয়ালের মতো খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হাসল।

—লৌকোয় বসে কেউ লেখাপড়া করে নাকি! আপনি কর্তা এক-লম্বরের—

ভোম্বল বলার আগেই আমি একটা বোম্বাই ধমক দিলাম ওকে—একেবারে খাম্বাজ রাগিণীতে। বললাম, তুই চুপ কর্ বলছি! নৌকো বাঁধ্!

ঝাটু ম্রিয়মাণ হয়ে বললে, আপনার পাঁটা আপনি ল্যাজেই কাটুন আর মুড়োতেই কাটুন, আমার কী।—এই বলে লগি ডুবিয়ে মাঝ-নদীতে সে নৌকো থামালো। তারপরেই সোজা তালগোল পাকিয়ে শুয়ে পড়ল গলুইয়ের ওপর। আর কী আশ্চর্য, জানিস প্যালা, দু-মিনিটের মধ্যে তার নাক ডাকতে লাগল! আমার কবিতা শোনবার আগেই ওর নাক ডাকতে লাগল!

ওর নাক ডাকুক—দুনিয়াসুদ্ধ লোকের নাক ডাকতে থাকুক, আমার কিছু আর আসে যায় না। আমি লিখতে লেগে গেলাম। ধান-ক্ষেত, মাঠ, নদী, আকাশ, বাতাস—এর ভেতর থেকে কবিতা যেন দলে-দলে 'মার-মার' করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

আমাকে মারে আর-কি!

দিস্তে-ছয়েক কাগজ যখন শেষ করেছি, তখন খেয়াল হল, আর চোখে দেখা যাচ্ছে না। চারদিকে অন্ধকার নেমেছে। রাত ঘনিয়েছে নির্জন নদীর ওপর।

আচমকা নাক-ডাকা বন্ধ হল ঝাঁটুর—তড়াক করে উঠে পড়ল।

—এই সেরেছে! রাত হয়ে গেল যে! আমাকে জানাননি কেন? কর্তা, আপনি এক লম্বরের—

—থাম্ তো তুই। চল্, এবার ঘরে ফিরি। রাত হয়ে গেছে। বড্ড ক্ষিদেও পেয়েছে।

—ঘরে ফিরবেন? ঝাঁটু খ্যাক-খ্যাক করে হেসে উঠল: আজ রেতে লয় আজ্ঞে। আর খিদে পেয়েছে? পেটে কিল মেরে পড়ে থাকুন।

বলে কী! শুনে কবিতা মাথায় উঠল!

—মস্করা করিসনি, ফিরে চল শিগগির! ক্ষিদেয় প্রাণ যায়—ব্যাটা ইয়ার্কি জুড়েছে!

—ইয়ার্কি লয় আজ্ঞে! ঝাঁটু জলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, আপনি কর্তা বসে-বসে ভ্যারাণ্ডা ভেজেছেন, আর এই ফাঁকে কচুরির ঝাঁক ভেসে এসে চারদিক ছেয়ে ফেলেছে! পেল্লায় ঝাঁক—সারা রাতেও ফুরবে না। আর এই ঝাঁক ঠেলে লৌকো নিয়ে যাওয়া—আমি তো আমি, গোটা বাগ্দিপাড়ার সাধ্যি লয়, কর্তা!

খেয়াল করে দেখি, সত্যিই তাই! নদীর আর চিহ্নমাত্র নেই। অন্ধকারে যদ্দুর চোখ যায়—তিন হাত প্রমাণ উঁচু কচুরির ঝাঁক মাথা নাড়ছে।

ক্ষিদের জ্বালায় আমার কান্না পেল: কী হবে ঝাঁটু?

ঝাঁটু একটা বিড়ি ধরাল।

—বিশেষ কিছু লয় আজ্ঞে। সারারাত এখন এখানে বসে মশার ফলার হবেন। মাঝরাতে আবার ডাকাতও পড়তে পারেন।

—অ্যাঁ—ডাকাত! আমার হৃৎপিণ্ড ততক্ষণে বরফ হয়ে গেছে।

—আজ্ঞে।

—কাটে-টাটে না তো?

—তা কাটেন। ঝাঁটু নিশ্চিন্তে বিড়িতে টান দিল: প্রায়ই কাটেন। কিন্তু আমার আর কী লেবে—এই ভাঙা লৌকোই সম্বল; ভয়টা আপনারই কর্তা—জায়গাটাও ডাকাতে-হাতিপুর।

আমি কেঁদে ফেললাম।

—হ্যাঁরে ঝাঁটু, এখান থেকে পালাবার কোন উপায় নেই?

—আজ্ঞে না। শান্ত গলায় জবাব দিয়ে সে আবার শোয়ার উদ্যোগ করল।

ইচ্ছে করছিল, ডাকাতের হাতে সাবাড় হওয়ার আগে ঝাঁটুকেই সাবাড় করি আমি। কিন্তু পৈতৃক প্রাণের মায়া কাটানো অত সহজ নয়! আমি ঝাঁটুকে জাপটে ধরলাম: দশ টাকা দেব, পনেরো টাকা দেব, পঁচিশ টাকা দেব ঝাঁটু—আমাকে অপঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচা, বাপধন!

—পঁচিশ টাকা দেবেন? ঝাঁটু উঠে বসল—চোখ মিটমিট করতে লাগল তার।

—কালীর দিব্যি! তোর গা ছুঁয়ে বলছি!

শুনেই লৌকো থেকে গুণের দড়ি গুছিয়ে নিয়ে ঝাঁটু ঝপাং করে সেই কচুরি-বনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

—এই, পালাচ্ছিস নাকি?—আমি আর্তনাদ করে উঠলাম।

www.boiRboi.blogspot.com

—পালাব কেন? আপনি কত্তা এক-লম্বরের ভোম্বল! আমি ডাঙায় চড়ে গুণ টানি—আপনি লগি ঠেলুন। লৌকো ঠিক বার করে নিয়ে যাব।

—লগি ঠেলব? আচ্ছা! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি লগি তুললাম।

—কখনো লগি ঠেলেছিস, প্যালা? আমি বলছি, ঠেলিসনি। লগির মতো বিশ্বাসঘাতক কিছু নেই! হেঁইয়ো করে যেই ঠেলা দিয়েছি, পায়ের তলা থেকে লৌকোটা সাঁৎ করে বেরিয়ে গেল। আর আমি? লগির ওপর শূন্যে সেকেন্ড-দুই ঝুলে থেকেই ঝপাং করে একেবারে কচুরিবনের মধ্যে। তারপর এক-বুক জলে। ডাঙা থেকে ঝাঁটুর খ্যাক-খ্যাক হাসি শোনা গেল।

—আপনি কর্তা—কী আর বলব! নিন—উঠে পড়ুন ঝটপট।

লৌকোর একটা মজা দেখেছিস, প্যালা? ডাঙা থেকে পা বাড়ালেই চড়া যায়—কিন্তু জল থেকে উঠতে গেলেই দেখবি, সেটাই মাথার ওপরে চড়তে চায়। সেই বিচ্ছিরি কচুরিবনের মধ্যে ভিজে ভূত হয়ে গেছি, নাকে-মুখে পির্-পির্ করে মশা আর পোকা ঢুকছে, কিন্তু যেই চড়তে যাই—লৌকোটা কাত হয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে বেরিয়ে যায়।

ঝাঁটু পাড় থেকে চিৎকার ছাড়ল: আপনার জন্যে কি সারা রাত দাঁড়িয়ে মশার কামড় খাব? উঠুন—উঠে পড়ুন—

মরীয়া হয়ে লৌকোয় ভর দিয়ে চড়তে গেছি—ব্যাস, আর কথা নেই! সঙ্গে সঙ্গে লৌকো কাত হয়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফস্ করে সেই কচুরিবনের মধ্যে ডুবে গেল।

—হায়—হায়—ডুবিয়ে দিলেন লৌকোটা? ঝাঁটু গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে উঠল: আপনি দেখছি এক-লম্বরের গম্বোল! (গম্বোল মানে কী রে, প্যালা?)

কিন্তু শুধু কি লৌকো ডুবল? সেইসঙ্গে ডুবল ছ' রীম কাগজ, ছ'টা ফাউন্টেন পেন, ছ' বোতল কালি আর ছত্রিশটা কবিতা! ডুবে গেল বাঙলা সাহিত্যের ছত্রিশটা অ্যাটম বোমা!

আমি ঠাণ্ডায় কাঁপতে-কাঁপতে বললাম, চুলোয় যাক লৌকো, আমি ডাঙা দিয়ে হেঁটেই চলে যাব।

—হেঁটে যাবেন মানে? আমার লৌকো ডুবিয়ে দিয়ে হেঁটে যাবেন? চালাকি নয়—লৌকো তুলে দিতে হবে!

—কী করে তুলব?

—ডুবে-ডুবে। আমিও ধরছি।—বলে ঝাঁটু ঝপাং করে জলে নামল।

—আমি পারব না।

—পারবেন না মানে? আপনি দেখছি এক-লম্বরের ডম্বোল! (ডম্বোল মানে বুঝি আরও খারাপ, না রে, প্যালা?) ওসব চলবে না কর্তা! এখনি তবে হাঁক ছাড়ব—আর লাঠি-সড়কি রাম-দা নিয়ে লোক জড়ো হয়ে যাবে। এ গাঁয়ের নাম ডাকাতে-হাতিপুর!

—থাক বাপু, আর হাঁক ছাড়তে হবে না। তুলে দিচ্ছি লৌকো।

তার পরেরটুকু বর্ণনা করবার ভাষা আমার নেই প্যালা! সমস্ত রাত সেই কচুরি-বনের মধ্যে ডুবে-ডুবে লৌকো তুললাম ভোরবেলায়। সে সুখের তুলনা নেই! মশা, ঠাণ্ডা জল আর কাদার মধ্যে এক রাত ডুবে থাকতে কী আরাম—সে শুধু আমিই জানি। আর জানতে ইচ্ছে করছে সেই লোকটাকে—যে লিখেছিল: 'ও আমার দেশের মাটি'—

সকালে ডাঙায় উঠে বেহুঁস হয়ে শুয়ে পড়লাম। আর সঙ্গে সঙ্গে কম্প দিয়ে জ্বর এল। একশো পাঁচ ডিগ্রি জ্বর! দেশের ম্যালেরিয়া—একসঙ্গে লম্ব আর কম্প দুই-ই।

আজ দেড়মাস পরে জ্বর থেকে উঠে কলকাতায় ফিরেছি, প্যালা। না, আর কবিতা নয়। যে কবিতা লেখে সে শুধু ভোম্বল নয়—এক নম্বরের ডম্বোল!

হারাধনদা থামলেন। তারপর চেয়ারে হাত-পা ছড়িয়ে দিয়ে চিঁ-চিঁ করে বললেন : আর এক কাঁপ চা, প্যালা—আর দুটো ম্যাপাক্টীন!

দুর্ধর্ষ মোটর-সাইকেল

খিচুড়ি খেতে আমার ভালোই লাগে, কিন্তু খিচুড়ি জাতের জিনিস একদম পছন্দ করি না আমি।

যেমন, আলুবখরা। সেটা আলুও নয়—দাম না দিয়ে বখরাও তাতে পাওয়া যায় না। ওদিকে রাঁধতে গেলে বিস্তর বখেরা—চিনি চাই, কিসমিস চাই—এ চাই ও চাই। আর কাঁচা খেলে 'বোখার' হওয়ার সম্ভাবনা প্রচুর। কিংবা ধর কাঠবেড়ালি। সে কাঠ নয় যে তাকে দিয়ে রান্না হবে, আবার বেড়ালিও নয় যে ভাড়ার ঘরের ইঁদুরকে একটু সায়েস্তা রাখবে।

সেইজন্যেই মোটর-সাইকেল দেখলেই আমার কেমন খটকা লাগে। মোটরের তলায় চাপা পড়া যায়, আর সাইকেল চাপা দেওয়া যায়। কিন্তু যা এও নয়—ও-ও নয়, তা যে কখন কী করে বসবে, সে-সম্বন্ধে আমার মনে একটা গভীর দুশ্চিন্তা আছে। তাই মোটর-সাইকেলের কাছ থেকে সব সময় আমি দূরে থাকতে চেষ্টা করি।—কিন্তু ভূমিকা বাদ দিয়ে কাহিনীটা বলি এইবার।

তোমরা আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে দ্যাখোনি। অমন ভয়ঙ্কর লোক যে সংসারে একজনের বেশি জন্মায় না—পৃথিবীর পক্ষে একটা বাঁচোয়া বলতে হয় সেটাকে।

বছর-তিনেক এক নাগাড়ে ম্যালেরিয়ায় ভুগে ফুচুদার পিলেটা হয়ে উঠেছিল জয়ঢাকের মতো। চুলগুলো দেখলে মনে হত, ঠিক ব্রহ্মতালু বরাবর কেউ একখানা মুড়ো ঝাঁটা বসিয়ে রেখেছে।

মিকশ্চার আর কুইনিন খেয়ে-খেয়ে ফুচুদার পেটের মধ্যে যখন দস্তুরমতো একটা ডিসপেনসারি তৈরি হয়ে গেল, তখন একদিন একশো চার জ্বর গায়ে নিয়েই ফুচুদা

'দুত্তোর ম্যালেরিয়ার নিকুচি করেছে' বলে লাফিয়ে উঠলেন। তারপর সোজা ভাঁড়ারে গিয়ে কড়মড় করে খানিক ছোলা চিবিয়ে খেয়ে উঠোনে নেমে ডন দিতে শুরু করলেন।

—ওগো, আমার ফুচু যে পাগল হয়ে গেল—বলে কান্না জুড়লেন পিসিমা। কিন্তু সে কান্নায় ফুচুদার হৃদয় আর গললো না। ব্যায়ামবীর ফুচুদা ব্যায়ামবীর হওয়ার জন্যে আদা-নুন খেয়ে লেগে গেলেন।

বললে বিশ্বাস করবে না—ম্যালেরিয়া তাড়িয়ে তবে তিনি থামলেন। শুধু তাড়ালেন তাই নয়—চেহারাখানা যা বাগালেন সে দশজনকে ডেকে দেখাবার মতো। তখন শুরু হল আমার ওপর দিনরাত উপদেশ-বর্ষণ : কী ছাগলের মতো দিনরাত পালাজ্বরে ভুগিস প্যালা—ছ্যাঃ—ছ্যাঃ!

—ছাগলে বুঝি খুব পালাজ্বরে ভোগে ফুচুদা?—আমি জানতে চাইলাম।

—তোর সঙ্গে কথা বলাই ধাষ্টামো!—বিরক্তিতে ফুচুদা নাক কুঁচকোলেন।—শোন প্যালা—যদি রোজ সকালে তিনশো ডন আর তিনশো বৈঠক দিতে পারিস, তোর পালাজ্বর পালাতে পথ পাবে না।

তিনশো ডন আর তিনশো বৈঠক!—শুনেই আমার দম আটকে এল : পালাজ্বর পালাবার আগেই যে তবে আমাকে পালাতে হবে ফুচুদা! মানে, আমার দেহ ছেড়ে চম্পট দিতে হবে আত্মারামকে।

ফুচুদা আর কিছু বললেন না। দুমদাম করে বেরিয়ে গেলেন বাড়ি থেকে। আমিও স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। তিনশো ডন আর তিনশো বৈঠক! তার চেয়ে তিনশো বছর জ্বরে ভোগা ভালো।

কিন্তু ফুচুদা আমায় ছাড়লেন না।

রবিবারের সকালে অঙ্ক নিয়ে বসেছি।

এমন সময় দোরগোড়ায় ভট-ভট করে একটা সন্দেহজনক আওয়াজ পাওয়া গেল। আঁতকে লাফিয়ে উঠতেই দেখি—মোটর-বাইকই বটে। আর তার ওপর ফুচুদা বসে আছেন চেঙ্গিস খাঁর ভঙ্গিতে। চেঙ্গিস খাঁকে আমি দেখিনি—কিন্তু ফুচুদার মুখের চেহারা দেখেই মনে হল চেঙ্গিস খাঁ নিশ্চয়ই এই ভঙ্গিতে ঘোড়ায় চাপতেন।

ফুচুদা বললেন, প্যালা—চলে আয়।

আমি বললাম, কোথায়?

—নতুন বাইক কিনেছি, তোকে একটা রাইড দেব।

আমার বুকটা ধড়ফড় করে উঠল। সভয়ে বললাম, অঙ্কটা মিলছে না ফুচুদা, আজ থাক।

ফুচুদা ভ্রূকুটি করলেন : জ্বরে ভুগে-ভুগে আর ঘরে বসে-বসে থেকে তোর মগজে মরচে পড়ে গেছে। অঙ্ক মিলবে কোত্থেকে? দরকার হল ফ্রেশ এয়ার। চল, তোকে হাওয়া খাইয়ে আনি।

—হাওয়া খেতে আমার একদম ইচ্ছে করছে না—আমি জানালাম।

—তোর ইচ্ছে করুক আর না করুক, তাতে কার কী আসে যায় র‍্যা? ভারি আমার ওস্তাদ এসেছে।

আমি আরো কি বলতে যাচ্ছিলাম—কিন্তু সুযোগ আর পেলাম না। তার আগেই ফুচুদার পালোয়ানী হাত আমাকে এক হ্যাঁচকা টানে মোটর-সাইকেলে তুলে ফেলল।

আমি বললাম : গেলাম—গেলাম—

ফুচুদা বললেন, এখনো যাসনি, এইবার চললি—

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে-সঙ্গেই ভট-ভট করে মোটর-সাইকেলের আওয়াজ উঠল।

আমি আর্তনাদ করে উঠলাম : পড়ে যাব যে।

—যাস তো যাবি। জ্বরে না মরে অন্যভাবে মরলে এমন কিছু লোকসান হবে না।

আমি প্রাণপণে ফুচুদার কোমর জাপটে ধরলাম।

ডায়মণ্ডহারবার রোড দিয়ে মোটর-বাইক ছুটল।

চোখ বুজে দুর্গানাম জপ করে চলেছি আমি। হু-হু করে হাওয়া বইছে কানের পাশ দিয়ে—মনে হচ্ছে, এখুনি আমাকে উড়িয়ে নিয়ে চলে যাবে। আর ছিটকে যদি একবার পড়ি—তাহলে আর চ্যাঁ-ফ্যাঁ করতে হবে না, একেবারেই ঠাণ্ডা।

ফুচুদা আমার দিকে ঘাড় ফেরালেন : কেমন লাগছে প্যালা? গ্র্যান্ড—না?

আমি চোখ মেলে বললাম, গ্র্যান্ডই বটে। তবে শেষ পর্যন্ত গ্রাউণ্ডে গড়াগড়ি না খাই।

ফুচুদা চটে কি বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই 'সামাল-সামাল' বলে রব উঠল। একটুর জন্যে ধাক্কা লাগল না একটা মোষের গাড়ির সঙ্গে।

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ফুচুদা।

ফুচুদা রুখে বললেন, হয়েছে কী? অমন করে ষাঁড়ের মতো চেঁচিয়ে উঠলি কেন কানের কাছে?

—এখুনি যে অ্যাকসিডেণ্ট হত।

—হত—বয়েই যেত। ট্রেনে অ্যাকসিডেণ্ট হয় না? এরোপ্লেন ক্র্যাশ করে না? মোটর উল্টে যায় না? আর মোটর-বাইক অ্যাকসিডেণ্ট করতে পারবে না? ভেবেছিস কী তুই?

এমন সময় 'গেল-গেল' রব উঠল আবার।

তাকিয়ে দেখি—সর্বনাশ। দৈত্যের মতো একটা বোঝাই লরি প্রায় আমাদের কাঁধের ওপর এসে পড়েছে। আমি আতঙ্কে একটা হাঁ করলাম, কিন্তু মুখ দিয়ে আওয়াজ আর বেরুল না।

কী মন্ত্রে লরি-ড্রাইভার গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে নিলে সে আমি আজও জানি না। দু'হাত এগিয়েই সে ঘস্ করে ব্রেক করল, তারপর লাফিয়ে নেমে ফুচুদাকে জিজ্ঞেস করলে, ই ক্যা হ্যায়?

ফুচুদা বললে, মোটর-বাইক হ্যায়—

ড্রাইভার কি বলতে গেল, তার আগেই পঁচিশ মাইল বেগে আমাদের মোটর-বাইক ছুট লাগালো—আমার কানের পাশ দিয়ে বোঁ করে বেরিয়ে গেল একটুকরো ইঁট—লরি-ড্রাইভার ঢিল ছুঁড়ছে।

খানিক চুপচাপ। প্রাণের আশা ছেড়ে দিয়েছি। দু-দুটো ফাঁড়া কাটল—তিনেরটা কাটলে হয়। রাস্তার দু'ধারের গাছগুলো শন্-শন্ শব্দে ছিটকে যেতে লাগল পেছনে।

ফুচুদা বললে, বড় রাস্তায় একটা রিস্ক আছে দেখছি—না রে প্যালা?

স্বরটা এবার নরম ঠেকল। ফুচুদার কঠিন হৃদয় যেন কোমল হয়ে উঠছে একটু একটু করে।

বললাম, রিস্ক আর বিশেষ কী—প্রাণটুকু চলে যেতে পারে এই যা।

ফুচুদা তেড়ে উঠলেন : গেলেই বা। তোর প্রাণের আবার দাম কী। ও তো পুঁটিমাছের প্রাণ। মরুক গে—বাজে বকাসনি আমাকে। চল্, বড় রাস্তা ছেড়ে মাঠের রাস্তায় নামা যাক। চারিদিকে মুক্ত প্রকৃতি—লরি-ফরির হাঙ্গামা নেই—বেশ আরামে

যাওয়া যাবে।

সেটা মন্দ কথা নয়—আমি খানিকটা আশ্বাস পেলাম।

আরো খানিক এগোতেই ডানদিকে মাঠের ভেতর একটা গোরুর গাড়ির রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তায় ফুচুদা মোটর-বাইক নামালেন।

কিন্তু গোরুর গাড়ির পথ—তার সঙ্গে চালাকি নয়। মনে হল যেন 'রিলিফ ম্যাপের' ওপর দিয়ে চলছি। একবার ধপ করে পড়ছি প্রশান্ত মহাসাগরে—আর এক-বার ঠেলে উঠছি এভারেস্টের কাঁধের ওপর। কত বছর ধরে একটানা লাগুল ঠেললে অমন কায়দার একখানা রাস্তা তৈরি করা যায়—একমাত্র করুণাময় পরমেশ্বরই তার খবর দিতে পারেন।

—ফুচুদা, কোমর যে গেল!

—কোমর যাবে কী রে! কেমন একসারসাইজ হচ্ছে বল্ দেখি? কী গ্র্যান্ড ঝাঁকুনি লাগছে!

—পেটের পিলে নড়ে গেল যে!

ফুচুদা বললেন, নড়বেই তো! পিলেই তো নড়ানো চাই! বুঝলি, তোর ঐ বাসকপাতার রসের চাইতে এ-ওষুধ অনেক বেশি জোরালো। তিনদিন এই রাস্তায় আমার বাইকে চেপে আসবি—দেখবি পালা জ্বর, কালা জ্বর, সর্দি জ্বর, ডেঙ্গু জ্বর—

কিন্তু জ্বরের তালিকাটা শেষ হওয়ার আগেই বাইক ছেড়ে আমি প্রায় আড়াই হাত শূন্যে ছিটকে উঠলাম। এবং ফুচুদাও। মোটর-সাইকেলটা প্রায় দেড় হাত উঁচু থেকে একটা গর্তের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল। একরাশ পাঁক ছিটকে এল চোখেমুখে।

—ফুচুদা, মাঠ যে আরও ভয়াবহ!—আমি চেঁচিয়ে উঠলাম।

—এক-আধটু লাগে বটে—ফুচুদা স্বীকার করলেন : কিন্তু মোটর-সাইকেল চড়া কি সোজা কাজ রে! খাটনি আছে বৈকি! তবে ভাবিসনি, আস্তে আস্তে সইয়ে নেব এখন।

—কিন্তু সইয়ে নেবার আগে যদি মাঠ-সই হতে হয়?

—হয় তো হবে।—ফুচুদা দাঁত খিঁচোলেন : তুই বড্ড বক্—

কিন্তু বক্ পর্যন্ত বলেই টক্ করে বকুনি বন্ধ করলেন ফুচুদা। ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, পা তোল প্যালা, এক্ষুনি—

—পা তুলব? কোথায় তুলব?

ফুচুদা তাড়া দিলেন : তা আমি কী জানি? কাঁধের ওপর—মাথার ওপর—তালগাছের ওপর—যেখানে খুশি! দেখছিস নে—তেড়ে আসছে?

—কে?—জিজ্ঞেস করতেই দেখতে পেলাম। খ্যাঁক-খ্যাঁক করে বিদিকিচ্ছি আওয়াজ তুলে তীরবেগে আমাদেরই দিকে ছুটে আসছে একটা খেঁক কুত্তা!

দু' চোখে তার জিঘাংসা! আমি পা তুলে ফেললাম, একেবারে ফুচুদার কাঁধের ওপর। ফুচুদাও হ্যাণ্ডেলে পা তুলে আমায় বললেন, তাড়া প্যালা—কুকুর তাড়া—

—কী করে তাড়াব?

—ঢিল মার।

—কোথায় পাব ঢিল?

—তাও তো বটে। ফুচুদা বললেন : তবে মিষ্টি কথায় ভোলা। বাড়ি যেতে বলে দে। আঃ—বল্ না একটা ছড়া-টড়া।

ছড়া-টড়া! আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : হাট্টিমা টিম টিম—তারা মাঠে পাড়ে ডিম—

শুনে কী হল বলা যায় না, কুকুরটা থমকে গেল। আর-একবার খ্যাঁক করে ডাক

www.boiRboi.blogspot.com

দিয়েই উল্টোমুখে ছুটে চলে গেল।

ফুচুদা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন : যাক, বাঁচা গেল এ-যাত্রা। পালালো।

আমি বললাম, পালাবে কেন? মাঠের ভেতরে হাট্টিমা টিম টিমের ডিম খুঁজতে গেল বোধহয়।—বুঝতে পেরেছে, তোমার পায়ের চেয়ে সেটা বেশি সুখাদ্য হবে।

ফুচুদা রেগে বললেন, পাকামি করিসনি। আমার পা তোদের মতো বাজে পা নয়। কিন্তু কী মনে করে তুই এখনো গুরুজনের কাঁধে ঠ্যাং ছড়িয়ে রেখেছিস শুনি?

পা নামিয়ে নিয়ে আমি বললাম, ওহো, মনে ছিল না। বাড়ি ফিরে গুণে-গুণে একশো প্রণাম করব তোমাকে।—বোধহয় একশো প্রণামের নাম শুনে মাঠে গোরুগুলোও ভক্তিতে মাথা নিচু করল। হঠাৎ দেখা গেল, একপাল গোরু আমাদের দিকেই আসছে। মাথা নিচু দেখে আশ্বাস পাওয়া গেল না, কারণ নত মস্তকের ওপর উঁচিয়ে আছে বড় বড় শিং।

ফুচুদা বললেন, এই সেরেছে। গোরু আসছে যে।

আমি বললাম, শুধু গোরু নয়—মোষও আসছে ওদিক থেকে। প্রায় সাত-আটটা মোষ। কোথায় ডোবার মধ্যে বসেছিল—মোটর-বাইকের আওয়াজ শুনে ছুটে আলাপ করতে আসছে আমাদের সঙ্গে। তাদের শিংয়ের দিকে তাকালেই বোঝা যায় কেন শাস্ত্রে তাদের বলা হয়েছে যমের বাহন।

—ফুচুদা, এইবার গেছি।—গুঁতিয়ে যে স্যান্ডউইচ বানিয়ে দেবে। ঘটাং করে ব্রেক কষলেন ফুচুদা। বললেন, আর সময় নেই প্যালা। চোঁচা ছুট দে। দেখছিস না—এসে পড়ল।

—জয় মা কালী—রাস্তার ওপর সাইকেল ফেলে আমরা ছুট লাগালাম। সামনেই একটা উঁচু ঢিবি। তার ওপরে উঠে নিচের দিকে লাফ দিতেই দুজনে জড়াজড়ি করে একটা পচা ডোবার মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

ফুচুদা বললেন, ডোবা—ডোবাই সই। এর ভেতরেই নাক ডুবিয়ে বসে থাক এখন।

—কী বিচ্ছিরি গন্ধ জলে।—আমি থু—থু করে খানিক পেঁকো জল ফেলে দিলাম। ফুচুদা ফ্যাচ করে উঠলেন : গন্ধ তো কী হয়েছে। ডোবার জলে কি এসেন্সের সুবাস থাকে নাকি?

—আর, কী মশা।

—মশা-ই তো থাকবে। মশার বদলে কি শশা ফলবে? কচকচ করে খাবি?

—গায়ের ওপর ব্যাঙ লাফাচ্ছে যে।

—নইলে যে মোষ লাফাত। সেটা বুঝি বড্ড আরামের হত? নে চুপ করে থাক। একদম স্পীকটি নট।

দুম করে বন্দুকের মতো আওয়াজ উঠল।

ফুচুদা বুকভাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, টায়ার গেল একটা।

—তা গেল—আমিও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। তাকিয়ে দেখি, ফুচুদার ঠিক মাথার ওপর উঠে বসে একটা সোনা-ব্যাঙ ড্যাবডেবে চোখে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।

দু ঘণ্টা পরে যখন উঠে এলাম, তখন সাইকেলটা আর চেনা যায় না! স্পোকগুলো ভাঙা—টায়ার ফাটা—যেন অ্যাটম বোমায় বিধ্বস্ত হিরোশিমা।

ফুচুদা বললেন, কী আর হবে।—চল এটাকে ঠেলে নিয়ে যাই।

আর আমি ঠেলি? অনেক ভুগিয়েছ—এবার তোমাকে আমি একটু ভোগাই।

বললাম—মিথ্যে করেই বললাম,—আমার পা মচকে গেছে, এক পা-ও হাঁটতে

পারব না।

—তবে তুই সাইকেলে চেপে বোস, আমি তোকে ঠেলে নিয়ে যাই।

সারা গায়ে কাদা, নাকের ওপর একরাশ শ্যাওলা—পালোয়ান ফুচুদা হেঁইয়ো-হেঁইয়ো করে সেই এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ভেতর দিয়ে আমাকে ঠেলে নিয়ে চললেন ভাঙা সাইকেল-সুদ্ধ। আর এতক্ষণে—সত্যি বলতে কী, মোটর-সাইকেল চড়াটা আমার একেবারে মন্দ লাগল না।

www.boiRboi.blogspot.com

কুট্টিমামার হাতের কাজ

চিড়িয়াখানার কালো ভালুকটার নাকের একদিক থেকে খানিকটা রোঁয়া উঠে গেছে। সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে আমাদের পটলডাঙার টেনিদা বললে, বল্ তো প্যালা—ভালুকটার নাকের ও-দশা কী করে হল?

আমি বললাম, বোধহয় নিজেদের মধ্যে মারামারি করেছে, তাই—

টেনিদা বললে, তোর মুণ্ডু!

—তাহলে বোধহয় চিড়িয়াখানার লোকেরা নাপিত ডেকে কামিয়ে দিয়েছে। মানুষ যদি গোঁফ কামায়, তাহলে ভালুকের আর দোষ কী?

—থাম থাম—বাজে ফ্যাক-ফ্যাক করিসনি! টেনিদা চটে গিয়ে বললে : যদি এখন এখানে কুট্টিমামা থাকত, তাহলে বুঝতিস সব জিনিস নিয়েই ইয়ার্কি চলে না।

—কে কুট্টিমামা?

—কে কুট্টিমামা?—টেনিদা চোখ দুটোকে পাটনাই পেঁয়াজের মতো বড় বড় করে বললে : তুই গজগোবিন্দ হালদারের নাম শুনিসনি?

—কখনো না—আমি জোরে মাথা নাড়লাম : কোনদিনই না! গজগোবিন্দ। অমন বিচ্ছিরি নাম শুনতে বয়ে গেছে আমার।

—বটে। খুব যে তড়পাচ্ছিস দেখছি। জানিস আমার কুট্টিমামা আস্ত একটা পাঁঠা খায়! তিন সের রসগোল্লা ফুঁকে দেয় তিন মিনিটে?

—তাতে আমার কী? আমি তো তোমার কুট্টিমামাকে কোনদিন নেমন্তন্ন করতে যাচ্ছি না। প্রাণ গেলেও না।

—তা করবি কেন? অমন একটা জাঁদরেল লোকের পায়ের ধুলো পড়বে তোর বাড়িতে—অমন কপাল করেছিস নাকি তুই? পালাজ্বরে ভুগিস আর শিঙি মাছের ঝোল খাস—কুট্টিমামার মর্ম তুই কী বুঝবি র‍্যা? জানিস, কুট্টিমামার জন্যেই

ভালুকটার ঐ অবস্থা?

এবারে চিন্তিত হলাম।

—তা তোমার কুট্টিমামার এসব বদ-খেয়াল হল কেন? কেন ভালুকের নাক কামিয়ে দিতে গেল থামাকা? তার চাইতে নিজের মুখ কামালেই তো ঢের বেশি কাজ দিত।

—চুপ কর প্যালা, আর বাজে বকালে রন্দা খাবি—টেনিদা সিংহনাদ করল! আর তাই শুনে ভালুকটা বিচ্ছিরি-রকম মুখ করে আমাদের ভেংচে দিলে।

টেনিদা বললে, দেখলি তো? কুট্টিমামার নিন্দে শুনে ভালুকটা পর্যন্ত কেমন চটে গেল।

এবার আমার কৌতূহল ঘন হতে লাগল।

—তা ভালুকটার সঙ্গে তোমার কুট্টিমামার আলাপ হল কী করে?

—আরে সেইটেই তো গল্প। দারুণ ইন্টারেস্টিং!—হুঁ-হুঁ বাবা, এসব গল্প এমনি শোনা যায় না—কিছু রেস্ত খরচ করতে হয়। গল্প শুনতে চাস—আইসক্রীম খাওয়া।

অগত্যা কিনতেই হল আইসক্রীম।

চিড়িয়াখানার যেদিকটায় অ্যাটলাসের মূর্তিটা রয়েছে, সেদিকে বেশ একটা ফাঁকা জায়গা দেখে আমরা এসে বসলাম। তারপর সারসগুলোর দিকে তাকিয়ে আইসক্রীম খেতে-খেতে গল্প শুরু করল টেনিদা :

আমার মামার নাম গজগোবিন্দ হালদার। শুনেই তো বুঝতে পারছিস ক্যায়সা লোক একখানা। খুব তাগড়া জোয়ান ভেবেছিস বুঝি? ইয়া ইয়া ছাতি—অ্যায়সা হাতের গুলি? উঁহু, মোটেই নয়। মামা একেবারে প্যাকাটির মতো রোগা—দেখলে মনে হয় হাওয়ায় উল্টে পড়ে যাবে। তার ওপর প্রায় ছ' হাত লম্বা—মাথায় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, দূর থেকে ভুল হয় বুঝি একটা তালগাছ হেঁটে আসছে। আর রং! তিন পোঁচ আলকাতরা মাখলেও অমন খোলতাই হয় না। আর গলার আওয়াজ শুনলে মনে করবি—ডজনখানেক নেংটি ইঁদুর ফাঁদে পড়ে চিঁ চিঁ করছে সেখানে।

সেবার কুট্টিমামা শিলিগুড়ি স্টেশনের রেলওয়ে রেস্তোরাঁয় বসে বসে দশ প্লেট ফাউল কারি আর সের-তিনেক চালের ভাত খেয়েছে, এমন সময় গোঁ-গোঁ করে একটা গোঙানি। তার পরেই চেয়ার-ফেয়ার উল্টে একটা মেমসাহেব ধপাৎ করে পড়ে গেল কাটা কুমড়োর মতো।

হৈ-হৈ—রৈ-রৈ। হয়েছে কী জানিস? চা-বাগানের এক দঙ্গল সাহেব-মেম রেস্তোরাঁয় বসে খাচ্ছিল তখন। মামার খাওয়ার বহর দেখে তাদের চোখ তো উল্টে গেছে আগেই, তারপর আর দশ প্লেট খাওয়ার পরে মামা যখন আর দু' প্লেটের অর্ডার দিয়েছে, তখন আর সইতে পারেনি।

—ও গড। হেল্প মি, হেল্প মি।—বলে তো একটা মেম ঠায়-অজ্ঞান। আর তোকে তো আগেই বলেছি—মামার চেহারাখানা—কী বলে—তেমন 'ইয়ে' নয়!

মামার চক্ষুস্থির।

দলে গোটা-চারেক সাহেব—কাশীর ষাঁড়ের মতো তারা ঘাড়ে-গর্দানে ঠাসা। কুট্টিমামা ভাবলে, ওরা সবাই মিলে পিটিয়ে বুঝি পাটকেল বানিয়ে দেবে। মামা জামার ভেতর হাত ঢুকিয়ে পৈতে খুঁজতে লাগল—দুর্গানাম জপ করবে। কিন্তু সে পৈতে কি আর আছে, পিঠ চুলকোতে চুলকোতে কবে তার বারোটা বেজে গেছে।

ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে দুটো সায়েব তখন এগিয়ে আসছে তার দিকে। প্রাণপণে দেঁতো হাসি হেসে মামা বললে, ইট ইজ নট মাই দোষ স্যার—আই একটু বেশি ইট স্যার—

www.boiRboi.blogspot.com

কুট্টিমামার বিদ্যে ক্লাশ ফাইভ পর্যন্ত কিনা, তাও তিনবার ফেল। তাই ইংরেজি আর এগুলো না।

তাই শুনে সায়েবগুলো ঘোঁ—ঘোঁ—ঘুক—ঘুক—হোয়া—হোয়া করে হাসল। আর মেমেরা খি—খি—পিঁ—পিঁ—চিঁ—হিঁ করে হেসে উঠল। ব্যাপার দেখেশুনে তাজ্জব লেগে গেল কুট্টিমামার। অনেকক্ষণ হোয়া-হোয়া করবার পরে একটা সাহেব এসে কুট্টিমামার হাত ধরল। কুট্টিমামা তো ভয়ে কাঠ—এই বুঝি হ্যাঁচকা মেরে চিত করে ফেলে দিলে। কিন্তু মোটেই তা নয়, সায়েব কুট্টিমামার হ্যান্ড শেক করে বললে, মিস্টার বাঙালী, কী নাম তোমার?

কুট্টিমামার ধড়ে সাহস ফিরে এলো। যা থাকে কপালে ভেবে বলে ফেলল নামটা।

—গাঁজা-গাবিণ্ডে হালদার? বাঃ, খাসা নাম। মিস্টার গাঁজা-গাবিণ্ডে, তুমি চাকরি করবে?

চাকরি! এ যে মেঘ না-চাইতে জল। কুট্টিমামা তখন টো-টো কোম্পানির ম্যানেজার—বাপের, অর্থাৎ কিনা আমার দাদুর বিনা-পয়সার হোটেলে রেগুলার খাওয়া-দাওয়া চলেছে। কুট্টিমামা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইল।

সায়েবটা তাই দেখে হঠাৎ পকেট থেকে একটা বিস্কুট বের করে কুট্টিমামার হাঁ-করা মুখের মধ্যে গুঁজে দিলে। মামা তো কেশে বিষম খেয়ে অস্থির। তাই দেখে আবার শুরু হল ঘোঁ-ঘোঁ—হোঁয়া-হোঁয়া—পিঁ-পিঁ—চি চি—হি-হি। এবারে ও মেম পড়ে গেল চেয়ার থেকে।

হাসি-টাসি থামলে সেই সায়েবটা আবার বললে, হ্যালো মিস্টার বাঙালী, আমরা আফ্রিকায় গেছি, নিউগিনিতে গেছি, পাপুয়াতেও গেছি। গরিলা, ওরাং, শিম্পাঞ্জি সবই দেখেছি। কিন্তু তোমার মতো একটি চিজ কোথাও চোখে পড়েনি। তুমি যদি আমাদের চা-বাগানে চাকরি নাও—তাহলে এক্ষুনি তোমায় দেড়শো টাকা মাইনে দেব। খাটনি আর কিছু নয়, শুধু বাগানের কুলিদের একটু দেখবে আর আমাদের মাঝে-মাঝে খাওয়া দেখাবে।

এমন চাকরি পেলে কে ছাড়ে? কুট্টিমামা তক্ষুনি এক পায়ে খাড়া। সায়েবরা মামাকে যেখানে নিয়ে গেল, তার নাম জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট। মংপু নাম শুনেছিস—মংপু? আরে, সেই যেখানে কুইনিন তৈরি হয় আর রবীন্দ্রনাথ যেখানে গিয়ে কবিতা-টবিতা লিখতেন! জঙ্গলঝোরা টী এস্টেট তারই কাছাকাছি।

মামা তো দিব্যি আছে সেখানে। অসুবিধের মধ্যে মেশবার মতো লোকজন একেবারে নেই, তাছাড়া চারিদিকেই ঘন পাইনের জঙ্গল। নানারকম জানোয়ার আছে সেখানে। বিশেষ করে ভাল্লুকের আস্তানা।

তা, মামার দিন ভালোই কাটছিল। সস্তা মাখন, দিব্যি দুধ, অঢেল মুরগি। তা ছাড়া সায়েবরা মাঝে-মাঝে হরিণ শিকার করে আনত, সেদিন মামার ডাক পড়ত খাওয়ার টেবিলে। একাই হয়ত একটা সম্বরের তিন সের মাংস সাবাড় করে দিত, তাই দেখে টেবিল চাপড়ে উৎসাহ দিত সায়েবরা—হোঁয়া—হোঁয়া—হিঁ—হিঁ করে হাসত।

জঙ্গলঝোরা থেকে মাইল-তিনেক হাঁটলে একটা বড় রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা চলে গেছে দার্জিলিঙে—বাসও পাওয়া যায় এখান থেকে। কুট্টিমামাকে বাগানের ফুট-ফরমাস খাটাবার জন্যে প্রায়ই দার্জিলিঙে যেতে হত।

সেদিন মামা দার্জিলিঙ থেকে বাজার নিয়ে ফিরছিল। কাঁধে একটা বস্তায় সের-তিনেক শুঁটকী মাছ, হাতে একরাশ জিনিসপত্তর। কিন্তু বাস থেকে নেমেই মামার

মেজাজ খারাপ হয়ে গেল।

প্রথম কারণ, সন্ধে ঘোর হয়ে এসেছে—সামনে তিন মাইল পাহাড়ি রাস্তা। এই তিন মাইলের দু' মাইল আবার ঘন জঙ্গল। দ্বিতীয় কারণ, হিন্দুস্থানী চাকর রামভরসার বাস-স্ট্যান্ডে লণ্ঠন নিয়ে আসার কথা ছিল, সেও আসেনি। মামা একটু ফাঁপরেই পড়ে গেল বৈকি।

কিন্তু আমার মামা গজগোবিন্দ হালদার অতো সহজেই দমবার পাত্র নয়। শুঁটকী মাছের বস্তা কাঁধে নিয়ে জঙ্গলের পথ দিয়ে মামা হাঁটতে শুরু করে দিলে। মামার আবার আফিং খাওয়ার অভ্যেস ছিল, তারই একটা গুলি মুখে পুরে দিয়ে ঝিমুতে ঝিমুতে পথ চলতে লাগল।

দু' ধারে পাইনের নিবিড় জঙ্গল আরো কালো হয়ে গেছে অন্ধকারে। রাশি-রাশি ফার্নের ভেতরে ভূতের হাজার চোখের মতো জোনাকি জ্বলছে। ঝিঁ-ঝিঁ করে ঝিঁঝিরা ডাক উঠছে। নিজের মনে রামপ্রসাদী সুর গাইতে-গাইতে কুট্টিমামা পথ চলছে:

নেচে নেচে আয় মা কালী
আমি যে তোর সঙ্গে যাবো—
তুই খাবি মা পাঁঠার মুড়ো
আমি যে তোর প্রসাদ পাবো!

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে টুকরো-টুকরো জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়েছিল তখন। হঠাৎ মামার চোখে পড়লো, কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে একটা লোক সেই বনের ভেতর বসে কোঁ-কোঁ করছে।

আর কে! ওটা নির্ঘাৎ রামভরসা!

রামভরসার ম্যালেরিয়া ছিল। যখন-তখন যেখানে-সেখানে জ্বর এসে পড়ত। কিন্তু ওষুধ খেত না—এমনকি এই কুইনিনের দেশে এসেও তার রোগ সারাবার ইচ্ছে ছিল না। রামভরসা তার ম্যালেরিয়াকে বড্ড ভালোবাসত। বলত, উ আমার বাপ-দাদার ব্যারাম আছেন। উকে তাড়াইতে হামার মায়া লাগে!

কুট্টিমামার মেজাজ যদিও আফিং-এর নেশায় বুঁদ হয়ে ছিল, তবু রামভরসাকে দেখে চিনতে দেরি হল না। রেগে বললে, তোকে না আমি বাস-স্ট্যান্ডে যেতে বলে-ছিলুম? আর তুই এই জঙ্গলের মধ্যে কোঁ-কো করছিস? নে—চল—

গোঁ-গোঁ আওয়াজ করে রামভরসা উঠে দাঁড়ালো।

কুট্টিমামা নাক চুলকে বললে, ইঃ, গায়ের কম্বলটা দ্যাখো একবার! কী বদখৎ গন্ধ! কোনদিন ধুসনি বুঝি? শেষে যে উকুন হবে ওতে! নে—চল ব্যাটা গাড়োল! আর এই শুঁটকি মাছের পুঁটলিটাও নে। তুই থাকতে ওটা আমি বয়ে বেড়াব নাকি?

এই বলে মামা পুঁটলিটা এগিয়ে দিলে রামভরসার দিকে।

—এঃ, হাত তো নয়, যেন নুলো বের করেছে! যাক, ওতেই হবে।

মামা রামভরসার হাতে পুঁটলিটা গুঁজে দিলে জোর করে।

রামভরসা বললে, গোঁ—গোঁ—ঘোঁক্!

—ইস! সায়েবদের সঙ্গে থেকে খুব যে সায়েবি বুলি শিখেছিস দেখছি! চল্—এবার বাসামে ফিরে কুইনিন ইনজেকশন দিয়ে তোর ম্যালেরিয়া তাড়াবো। দেখব কেমন সায়েব হয়েছিস তুই!

রামভরসা বললে, ঘুঁক্-ঘুঁক্!

—ঘুঁক্-ঘুঁক্? বাংলা-হিন্দি বলতে বুঝি আর ইচ্ছে করছে না? চল্—পা চালা—

কুট্টিমামা আগে-আগে, পিছে-পিছে শুঁটকি মাছের পুঁটলি নিয়ে রামভরসা। মামা

www.boiRboi.blogspot.com

একবার পেছনে তাকিয়ে দেখলে, কেমন থপাস থপাস হাঁটছে রামভরসা।

—উঃ, খুব যে কায়দা করে হাঁটছিস! যেন বুট পরে বড় সায়েব হাঁটছেন!

রামভরসা বললে, ঘঁচাং!

—ঘঁচাং? চল বাড়িতে, তোর কান যদি কচাং করে কেটে না নিয়েছি, তবে আমার নাম গজগোবিন্দ হালদার নয়!

মাইল-খানেক হাঁটবার পর কুট্টিমামার কেমন সন্দেহ হতে লাগল।

পেছনে-পেছনে থপ-থপ করে রামভরসা ঠিকই আসছে, কিন্তু কেমন কচর-মচর করে আওয়াজ হচ্ছে যেন! মনে হচ্ছে, কেউ যেন বেশ দরদ দিয়ে তেলেভাজা আর পাঁপর চিবুচ্ছে। রামভরসা শুঁটকি মাছ খাচ্ছে নাকি? তা কী করে সম্ভব? রামভরসা রান্না-করা শুঁটকির গন্ধেই পালিয়ে যায়—কাঁচা শুঁটকি সে খাবে কী করে!

মামা একবার পেছনে তাকিয়ে দেখল—কিন্তু বিশেষ কিছু বোঝা গেল না। একে তো নেশায় চোখ বুজে এসেছে, তার ওপর এদিকে একেবারে চাঁদের আলো নেই, ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। শুধু দেখা গেল, পেছনে-পেছনে সমানে থপথপিয়ে আসছে রাম-ভরসা,—ঠিক তেমনি গদাইলস্করি চালে।

পায়ের নিচে পাইনের অজস্র শুকনো কাঁটাওয়ালা পাতা ঝরে রয়েছে। মামা ভাবলে, হয়ত তাই থেকেই আওয়াজ উঠেছে এইরকম।

তবু মামা জিজ্ঞেস করলে, কি রে রামভরসা, শুঁটকি মাছগুলো ঠিক আছে তো?

রামভরসা জবাব দিলে, ঘুঁ—ঘুঁ!

—ঘুঁ—ঘুঁ? ইস, আজ যে খুব ডাঁটে রয়েছিস দেখছি—যেন আদত বাস্তুঘুঘু।

রামভরসা বললে,—হুঁ—হুঁ।

কুট্টিমামা বললে, সে তো বুঝতেই পারছি। আচ্ছা, চল্ তো বাড়িতে, তারপর তোরই একদিন কি আমারই একদিন।

আরো খানিকটা হাঁটবার পর মামার বড্ড তামাকের তেষ্টা পেল। সামনে একটা খাড়া চড়াই, তারপর প্রায় আধমাইল নামতে হবে। একটু তামাক না খেয়ে নিলে আর চলছে না।

মামার বাঁ কাঁধে একটা চৌকিদারি গোছের ঝোলা ঝুলত সব সময়ে; তাতে জুতোর কালি, দাঁতের মাজন থেকে শুরু করে টিকে-তামাক পর্যন্ত সব থাকত। মামা জুত করে একখানা পাথরের ওপর বসে পড়ল, তারপর কল্কে ধরাতে লেগে গেল। রাম-ভরসাও একটু দূরে ওত পেতে বসে পড়ল—আর ফোঁস-ফোঁস নিশ্বাস ছাড়তে লাগল।

—কি রে, একটান দিবি নাকি?

—হুঁ—হুঁ।

—সে তো জানি, তামাকে আর তোমার অরুচি আছে কবে? আচ্ছা দাঁড়া, আমি একটু খেয়ে নিই, তারপর প্রসাদ দেব তোকে।

চোখ বুজে গোটা-কয়েক সুখটান দিয়েছে কুট্টিমামা—হঠাৎ আবার সেই কচর-মচর শব্দ। শুঁটকি মাছ চিবোবার আওয়াজ—নির্ঘাৎ।

কুট্টিমামা একেবারে অবাক হয়ে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর রেগে ফেটে পড়ল:

—তবে রে বেল্লিক, এই তোর ভণ্ডামি?—শুঁটকি মাছ হাম ছুঁতা নেই, রাম রাম। —দাঁড়া, দেখাচ্ছি তোকে।

বলেই হুঁকো-টুকো নিয়ে মামা তেড়ে গেল তার দিকে।

তখন হঠাৎ আকাশ থেকে মেঘ সরে গেল, জলজলে একটা চাঁদ দেখা গেল সেখানে।

একরাশ ঝকঝকে দাঁত বের করে রামভরসা বললে, ঘোঁক—ঘরর—ঘরর—

আর যাবে কোথায়! হাতের আগুন-সুদ্ধ হুঁকোটা রামভরসার নাকের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে 'বাপ রে—গেছি রে'—বলে কুট্টিমামার চিৎকার। তারপরই ফ্ল্যাট, একদম অজ্ঞান।

রামভরসা নয়, ভালুক। আফিং-এর ঘোরে মামা কিচ্ছুটি বুঝতে পারেনি। ভালুকের জ্বর হয় জানিস তো? তাই দেখে মামা ওকে রামভরসা ভেবেছিল। গায়ের কালো রোঁয়াগুলোকে ভেবেছিল কম্বল। আর শুটকি মাছের পুঁটলিটা পেয়ে ভালুক বোধহয় ভেবেছিল, এও তো মজা মন্দ নয়। সঙ্গে সঙ্গে গেলে আরো বোধহয় পাওয়া যাবে। তাই খেতে-খেতে পেছনে আসছিল। খাওয়া শেষ হলেই মামার ঘাড় মটকাতো।

কিন্তু ঘাড়ে পড়বার আগেই নাকে পড়ল টিকের আগুন। ঘোঁৎ—ঘোঁৎ আওয়াজ তুলে ভালুক তিন লাফে পগার পার।

বুঝলি প্যালা—ওইটেই হচ্ছে সেই ভালুক।

গল্প শুনে আমি ঘাড় চুলকোতে লাগলুম।

—কিন্তু ওইটেই যে সে ভালুক—বুঝলে কী করে?

—হুঁ—হুঁ, কুট্টিমামার হাতের কাজ, দেখলে কি ভুল হওয়ার জো আছে? আরে—আরে, ঐ তো ডালমুট যাচ্ছে। ডাক—ডাক শিগগির ডাক—

উপন্যাস

www.boiRboi.blogspot.com

অন্ধকারের আগন্তুক

॥ এক ॥

বেঙ্গল-আসাম রেলপথের একটা ছোট স্টেশনের ওপর কৃষ্ণপক্ষের রাত ঘুটঘুট্ করছিল। স্টেশনটা কিন্তু বাঙলা দেশে নয়, আসামেও নয়। তোমরা হয়তো জানো, বাঙলাদেশের ঠিক প্রতিবেশী, উত্তর বিহারে একটা জেলা আছে—নাম পূর্ণিয়া। অনেকদিন আগে পূর্ণিয়াকে বাঙলার মধ্যে ধরা হত—পরে এটাকে বিহারের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। আজও এ জেলার একটা অংশের মানুষ পুরোপুরি বাঙালী—হাটে-বাজারে বন্দরে-গঞ্জে অসংখ্য বাঙালীর বসতি।

এই জেলাটার ভিতর দিয়ে বেঙ্গল-আসাম রেলপথের অনেকগুলো শাখা প্রকাণ্ড একটা বটগাছের ডালপালার মত ছড়িয়ে রয়েছে। তারই কোন একটা শাখাপথের ওপরে ছোট্ট একটি স্টেশন—ধরা যাক তার নাম মানিকপুর।

রাত বারোটা পেরিয়ে গেছে। স্টেশনমাস্টার গণেশবাবু টেবিলে একটা পা তুলে দিয়ে হাঁ করে নাক ডাকাচ্ছেন আর মাঝে মাঝে চমকে জেগে উঠেই গালে ও কপালে প্রাণপণে থাবড়া মেরে মশা মারবার চেষ্টা করছেন। কিন্তু মাঠের বেপরোয়া মশা চড়-চাপড়ে ভয় তো পাচ্ছেই না, চারিদিক থেকে আরও মরিয়া হয়ে ছেঁকে ধরেছে।

কিন্তু ধৈর্যেরও সীমা আছে মানুষের।

শেষ পর্যন্ত চেয়ার থেকে তড়াক করে নেমে পড়লেন গণেশবাবু।

খানিকক্ষণ অভদ্র ভাষায় মশাদের বাপ-বাপান্ত করলেন, তারপর কোণের কুঁজো থেকে ঢক্‌ঢক্ করে গেলাস তিনেক জল গড়িয়ে খেয়ে একটা বিড়ি ধরালেন।

ঢং। ঘড়িতে সাড়ে বারোটা।

জল খেয়ে গরম লাগছিল। কোটটা খুলে গণেশবাবু বাইরে বেরিয়ে এলেন।

অদ্ভুত গুমোট রাত। আকাশের তারাগুলোকে নিভিয়ে দিয়ে মেঘ এসে জমেছে—যেন অন্ধকারের একটা বিরাট ডাইনি মূর্তি চারদিকে তার গুচ্ছ-গুচ্ছ কালো কালো চুল মেলে দিয়েছে। স্টেশনের পেছনে ফাঁকা মাঠ—তার ভেতর দিয়ে একটা ধুলোভরা মেঠো রাস্তা তারার আলোয় খানিকটা আবছা আভাস দিয়ে মিলিয়ে গেছে। একটু দূরে সেই পথের ওপর ঝাঁকড়া একটা বটগাছ অন্ধকারকে আরও কালো করে ওত পেতে বসে আছে—যেন আদ্যিকালের বদ্যিবুড়ির মত। একফোঁটা বাতাস নেই কোথাও—গাছের একটা পাতা অবধি নড়ছে না।

সামনে মিটার গেজের ছোট ছোট তিনটি লাইন। ওপারে একটা অন্ধকার ফাঁকা মালগুদাম—তার পেছনে মাটিটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে বিল আর শ্যাওড়াবনের মধ্যে। ওখানে শেয়াল আছে, বুনো শুয়োর আছে, কখনো কখনো নাকি চিতাবাঘও এসে আস্তানা গাড়ে শীতের সময়। আশেপাশে দু-তিন মাইলের মধ্যে জনমানুষের বসতি নেই—শুধু রেল-কোম্পানির বাবু আর কুলিদের ছোট ছোট তিন-চারটে কোয়ার্টার ছাড়া।

সৃষ্টিছাড়া জায়গা—তার চেয়ে সৃষ্টিছাড়া একটা ইস্টেশন!

www.boiRboi.blogspot.com

অত্যন্ত বিরক্ত মনে গণেশবাবু প্ল্যাটফর্মের উপর পায়চারি করতে লাগলেন। তাঁর ডিউটি রাত তিনটে পর্যন্ত—অথচ এখন মোটে সাড়ে-বারোটা। অর্থাৎ আরও অন্তত আড়াই ঘণ্টা এখানে নরক-যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। আর যা মশা—সন্ধ্যে থেকেই কানের কাছে যেন ক্ল্যারিয়োনেট বাজাচ্ছে।

ভুঁড়িটার ওপর হাত বুলোতে বুলোতে গণেশবাবু ভাবতে লাগলেন, এখন ম্যালেরিয়া না ধরলেই বাঁচা যায়! বরাবর কলকাতায় মানুষ—কলকাতার ছেলে, সাপ, ব্যাঙ, জোঁক, ম্যালেরিয়ার নামে তাঁর গায়ের রক্ত শুকিয়ে আসবার উপক্রম করে। অথচ সেই গণেশবাবুকেই কিনা শিয়ালদা থেকে একেবারে এই অজগর বিজেবনে বদলি করে দিলে! রাগে-দুঃখে গণেশবাবুর মাথার মধ্যে রক্ত চন্‌চন্‌ করতে লাগল।

সব দোষ ওই ব্যাটা ফিরিঙ্গির—ওই গোমেজটার। গোমেজ তো নয়—এক সঙ্গে গো এবং মেষ। তারই লোভের প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে গণেশবাবুকে। বন্ধু তো নয়, শনি!

একঝুড়ি ভাল ল্যাংড়া আম যাচ্ছিল কলকাতা থেকে জলপাইগুড়িতে। গোমেজের বুদ্ধিতে পড়ে তারই গোটাকয়েক দুজনে মিলে ভাগাভাগি করে নির্বিবাদে সেবা করেছিলেন, তারপর ইঁট-পাটকেল দিয়ে ঝুড়ির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আম যাচ্ছিল জলপাইগুড়ি কলেজের ফিজিক্সের প্রফেসার ভাদুড়ীমশায়ের নামে। তিনি দুদে লোক—শ্রাদ্ধ অনেক দূর গড়ালো, গেল আদালত পর্যন্ত।

গোমেজ নিরাপদে স্রেফ কেটে গেল, কিন্তু জালে পড়লেন গোবেচারা পেটুক মানুষ গণেশবাবু। ফলে, এক ধাক্কায় গণেশবাবু কলকাতা থেকে এই মাঠ আর জঙ্গলের মধ্যে এসে পড়লেন। পাপের ভোগ আর কাকে বলে!

আগুন হয়ে গণেশবাবু ভাবতে লাগলেন, গোমেজকে এখন হাতের কাছে পেলে এক চাঁটিতে তিনি তার গলাসুদ্ধ উড়িয়ে দিতেন। উঃ, এখানে মানুষ থাকতে পারে! কোন্‌দিন যে বাঘে মুখে করে নেয় ঠিক নেই। আর তাও যদি না হয়—যা মশার অত্যাচার—তিনদিনেই রক্ত শুষে ছিবড়ে করে দেবে তারা। গণেশবাবুর কান্না পেতে লাগল।

রাত থম্‌থম্‌ করছে! কোনখানে একটু হাওয়া নেই—শুধু যেন চারিদিক থেকে রোদ-পোড়া মাটির গন্ধ উঠছে। আকাশে জমেছে কালো মেঘের রাশ। ঝড়-বৃষ্টির লক্ষণ দেখা দিচ্ছে ঈশানের কোণায় কোণায়।

হঠাৎ গণেশবাবুর ভয়ানক ভয় করতে লাগল। কেমন আশ্চর্য লাগছে রাতকে—অদ্ভুত লাগছে পৃথিবীকে। মনে হল, এমন রাত্রে সম্ভব-অসম্ভব কত কী যে ঘটতে পারে! হালুম করে অন্ধকার মালগুদামটার ওপাশ থেকে একটা বাঘ এসে লাফিয়ে পড়তে পারে, রেললাইনের ওপর থেকে একটা শঙ্খচূড় সাপ ফণা উঁচু করে তেড়ে আসতে পারে, দূরের ওই বটগাছটা থেকে গোটা কয়েক কালো কালো, মোটা রোগা, লম্বা বেঁটে, মামদো কিংবা হেঁড়ে ভূত এসে নাচানাচি শুরু করতে পারে!

কাঁপা গলায় গণেশবাবু ডাকলেন, গিরিধারী!

ছোট স্টেশনের একমাত্র পয়েন্টসম্যান গিরিধারী স্টেশনের বারান্দায় একটা লোহার খুঁটিতে ঠেসান দিয়ে ঝিমুচ্ছিল। হাতের পাশেই তার লাল-নীল লণ্ঠনটা রাখা, তা থেকে দু'দিকে দু'-রঙা আলোর রশ্মি ছড়িয়ে পড়েছে। তার মাথাটা বুকের ওপর ঝুঁকে নেমেছে গিরিধারী গভীর ঘুমে মগ্ন।

—এই ব্যাটা গিরিধারী—

বিরক্ত গণেশবাবু গিরিধারীকে সজোরে একটা ঠোক্কর লাগালেন। আঁই-আঁই করে

গিরিধারী উঠে বসল। বললে, কী হুজুর, কোন মালগাড়ির কি ঘণ্টি হল?

—না না, কোথায় মালগাড়ি! একা-একা বড় ভয় করছে রে গিরিধারী, আয় একটু গল্প করা যাক।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও গিরিধারী উঠে বসল।

ঢং—আর একটা শব্দ হল ঘাঁড়তে। রাত একটা।

প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলো সব বেরিয়ে গেছে, শেষরাতের আগে আর ট্রেন নেই। কোয়ার্টারে গিয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমোনো চলে এখন। কিন্তু যুদ্ধের সময়! যখন-তখন একটা মিলিটারি স্পেশ্যাল কিংবা গুডস্‌ ট্রেন এসে পড়তে পারে।

প্যাসেঞ্জারদের জন্যে রাখা লোহার বেঞ্চে গা এলিয়ে দিয়ে একটা হাই তুললেন গণেশবাবু।

—আচ্ছা, এই মাঠ আর জঙ্গলের মধ্যে কোম্পানি একটা স্টেশন কেন বসালে বলতে পারিস?

লাল-নীল লণ্ঠন থেকে একটা রক্ত-রঙিন আভা গিরিধারীর মুখের ওপর এসে পড়েছিল, আর সেই আলোয় তার চামড়া-কুঁচকে-যাওয়া বুড়ো মুখখানাকে কেমন নূতন রকমের লাগছিল দেখতে। গণেশবাবুর প্রশ্নে তার চোখ দুটো হঠাৎ যেন চক্‌চক্‌ করে উঠল।

—সে অনেক কথা বাবু। অনেক ব্যাপার।

গণেশবাবু কৌতূহলী হয়ে উঠলেন।

—বল্‌, শোনা যাক। বিতিকিচ্ছি রাতটা খানিক গল্প শুনেই কাটুক।

আকাশটা মেঘে আড়ষ্ট হয়ে আছে। রেল-লাইনের সরু-সরু রেখাগুলো প্ল্যাট-ফর্মের অল্প-অল্প আলোয় ঝিকিয়ে উঠেছে, যেন অন্ধকারের আড়াল থেকে কোন অশরীরীর একটা নিষ্ঠুর হাসি ঠিকরে পড়েছে তাই থেকে। দূরের বিল আর শ্যাওড়া-বনের ভিতর থেকে কতকগুলো শেয়াল একসঙ্গে 'ক্যা হুয়া ক্যা হুয়া' বলে ডেকে উঠল।

সেদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে গিরিধারী বললে, অনেককাল—সে বহুদিন হয়ে গেল বাবু—এখান থেকে তিনকোশ দূরে নীলকর সায়েবদের একটা ঘাঁটি ছিল। তারা দেশের গরীব চাষাভুষোদের ওপরে যেমন খুশি অত্যাচার করত। জোর করে জমিতে নীল চাষ দেওয়াতো,—যে প্রজা রাজী হত না, চাবুক মেরে তার পিঠের চামড়া তুলে দিত, ঘর-বাড়ি আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দিত। সাক্ষাৎ শয়তানের অবতার ছিল তারা।

কিন্তু দেশের লোকের রক্তও একদিন গরম হয়ে উঠল বাবুজী। মানুষ কতদিন পড়ে পড়ে খালি মার খাবে? গোরু-ঘোড়াকেও বেশি খোঁচালে তারা গুঁতো মারতে কিংবা চাঁট ছুড়তে চেষ্টা করে, আর এরা তো মানুষ। আশেপাশে দশখানা গাঁয়ের মাথা ছিল বিশাই মণ্ডল, সেই প্রথম বলে বসল, আর আমরা নীলের চাষ করব না। ওতে যা হওয়ার তাই হল, বিশাই মণ্ডলকে আর পাওয়া গেল না। খবর এল, সায়েবের লোকেরা নাকি তার ধড়ের থেকে মুণ্ডু আলাদা করে মহানন্দা নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছে।

শুকনো খড়ের মত মানুষগুলো তাতিয়ে ছিল, তাতে যেন দেশলাইয়ের আগুন ধরল। আরম্ভ হয়ে গেল প্রলয় কাণ্ড। নীলকরদের সঙ্গে প্রজাদের লড়াই লাগল। ওদের বন্দুক, পিস্তল, এদের তীর-ধনুক, ল্যাজা, টাঙি। দেশের মানুষ সব এককাট্টা হয়ে দাঁড়িয়েছে—গুলি খেয়ে মরল, তবু হার মানল না। ক'দিন পরেই নীলকরেরা

www.boiRboi.blogspot.com

তল্পি-তল্পা তুলে পালিয়ে বাঁচল।

কিন্তু সেখানেই জের মিটল না। সরকারের ফৌজ এল। দেশের মানুষগুলো তখন লড়ায়ে পল্টন হয়ে গেছে—দিনের পর দিন বন-জঙ্গলে লুকিয়ে থেকে লড়াই করতে লাগল। বিপদ দেখে সরকার এখানে ইন্টিশন বসিয়ে দিলে—যাতে ফৌজ আমদানি করতে অসুবিধে না হয়। তখন ধীরে ধীরে অবস্থা ঠাণ্ডা হয়ে এল, কতক ফৌজের গুলিতে মরে গেল, কতককে ধরে ফাঁসিতে লটকে দিলে।

—আর নীলকুঠি?—গণেশবাবু সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

—তারাও সেখানেই শেষ হল বাবুজী—গিরিধারী হাসল। বললে, অনেক মানুষ জান দিলে বটে, কিন্তু সে শয়তানেরও দফা নিকেশ করে দিয়ে গেল। সায়েবরা সেই যে পালালো আর এমুখো হয়নি—গিরিধারী একটা নিশ্বাস ফেললে : সে-সব মানুষ আর নেই বাবুজী। এখন যারা আছে তারা ভয়েই কাবু, গায়ে তাকত নেই, বুকে পাটাও নেই।

গণেশবাবু বললেন, সে নীলকুঠির বাড়িটা?

—এখন জঙ্গল হয়ে পড়ে আছে নদীর ধারে। ভয়ানক ভূতের আস্তানা। লোকে সেদিকে এগোয় না।

গণেশবাবু চুপ করে ভাবতে লাগলেন। ভূতের কথা নয়—সেইসব মানুষের কথা—যারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্যে একদিন বন্দুক-পিস্তলের মুখে অসঙ্কোচে বুক পেতে দিয়েছিল আর সেই অন্যায়কে দূর করে দিয়ে তবেই ক্ষান্ত হয়েছিল। সে-রকম দরাজ চওড়া-বুকওয়ালা মানুষ দুনিয়া থেকে কি লোপাট হয়ে গেল নাকি? তারা কি আর ফিরবে না!

ঘরের মধ্যে টেলিফোনটা ঘটাং করে উঠল। গণেশবাবুর চিন্তার জাল ছিঁড়ে গেল, তিনি ফোন ধরলেন।

হ্যালো, হ্যালো, থ্রি-নাইন্টি-থ্রি? ফাইভ নাইন—

ঘর থেকে বেরিয়ে বললেন, ঘণ্টা দে গিরিধারী, মিলিটারি স্পেশ্যাল আসছে, পাখা নামিয়ে দে।

ঝন্‌ঝন্‌ করে রেল-লাইনের পাশে সিগন্যালের তারে টান পড়ল—সিগন্যালের সবুজ চোখ মিলিটারি স্পেশ্যালকে জানালো আসবার সঙ্কেত। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই সার্চলাইটের আলোয় বান ডাকিয়ে আর লোহায় লোহায় যেন ঝড় তুলে মিলিটারি স্পেশ্যাল ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোট স্টেশন মানিকপুরে তার থামবার কথা নয়, সে থামলও না।

গিরিধারী বললে, বাবু, আমি একটু মাঠ থেকে আসছি।

—আচ্ছা যা।

গণেশবাবু একা বসে বিড়ি ফুঁকছেন—হঠাৎ বাইরে প্রকাণ্ড দীর্ঘশ্বাসের মত একটা শব্দ উঠল। আর সঙ্গে-সঙ্গেই এক ঝলক দম্‌কা হাওয়া প্ল্যাটফর্ম থেকে একরাশ ধুলো-বালি কাঁকর এনে যেন গণেশবাবুর চোখে-মুখে ছড়িয়ে দিলে। ঝড় এল নাকি? ধড়ফড় করে উঠে বসতেই গণেশবাবু ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠলেন। আধখোলা দরজার পিতলের হাতলের ওপরে একখানা কালো হাত। সে হাতের মালিককে দেখা যাচ্ছে না—বাইরের অন্ধকারে সে মিশিয়ে আছে অথবা আদৌ তার কোন অস্তিত্ব আছে কি না সেটাই সন্দেহের বিষয়। অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর সে-হাত। তাতে বাঘের মত বড় বড় নখ, জানোয়ারের মত রাশি রাশি লোম। গণেশবাবুর মনে হল যেন তিনি ভয়ানক একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন।

সেই হাতটাই যেন রুক্ষ কর্কশ গলায় বললে, সুন্দরপুরের নিতাই সরকারের বাড়ি কোন্ পথে যেতে হয় বলতে পার?

গণেশবাবু বললেন, তু-তু-তুমি কে?

হাতটা তেমনি রূঢ় গলায় বললে, তা দিয়ে দরকার নেই তোমার। শুধু আমাকে পথটা বলে দাও, নইলে.....

কালো হাতের নখগুলো যেন বাঘের থাবার মত গণেশবাবুর দিকে এগিয়ে আসতে চাইল।

গণেশবাবুর ধড়ে আর প্রাণ নেই!

—ওই বটগাছের তলা দিয়ে যে রাস্তা, সেই পথ দিয়ে সোজা এগোলেই—

—ধন্যবাদ—এর পুরস্কার তুমি পাবে।

পরক্ষণেই ভীতি-বিহ্বল চোখ মেলে গণেশবাবু দেখলেন, রোমশ কর্কশ কালো হাতখানা দরজার হাতলের ওপর থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে।

॥ দুই ॥

সুন্দরপুরের নিতাই সরকার অঘোরে ঘুমুচ্ছিল।

মেঘের জমাট রাত। ঝড় বৃষ্টির একটা কিছু ঘনিয়ে আসছে, কিন্তু এখনো স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। শুধু বাতাস বন্ধ হয়ে গেছে—বাইরে নিমগাছে একটি পাতাও নড়ছে না। আর দূরের একটা বটগাছে যেখানে বকের বাসা আছে, সেখানে হঠাৎ ঘুমভাঙা ছানাগুলো থেকে থেকে মানুষের গলায় ককিয়ে কেঁদে উঠছে।

নতুন দোতলা বাড়ি করেছে নিতাই সরকার। তারই দোতলার একটা কোণের ঘরে নিতাই ঘুমুচ্ছে দক্ষিণের জানলাটা খুলে দিয়ে। অসহ্য গরম বলেই জানলা খুলে রাখতে হয়েছে, নইলে যে এতক্ষণে প্রায় সেদ্ধ করে ফেলত। তবে সাধারণত জানলা বন্ধ করে শোওয়াই তার অভ্যাস।

আরও একটা অভ্যাস তার আছে। কিছুদিন আগে বন্দুকের লাইসেন্স নিয়েছে—তার মাথার কাছে সব সময় সেটা দাঁড়িয়ে থাকে। থাকে টোটাভরা অবস্থাতেই—যাতে হাত বাড়ালেই বন্দুকটাকে সে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরতে পারে, বিছানায় শুয়েই গুলি ছুঁড়তে পারে শত্রুর ওপর।

অবশ্য পাড়াগাঁয়ে যার অবস্থা একটু ভাল, তার চোর-ডাকাতের ভয় অল্প-বিস্তর থাকবেই। তাছাড়া, দেশেও এখন আকাল চলেছে। নিতাইয়ের মত দু'চার-জনের হাতে পয়সা কড়ি এসেছে বটে, কিন্তু বেশির ভাগই পেট ভরে খেতে পায় না আজকাল। ক্ষিদের জ্বালায় চুরিচামারির চেষ্টা তারা তো করেই—কখনো কখনো দুটো-একটা ডাকাতি যে হয় না তাও নয়।

তবু নিতাই সরকারের ভয়টা একটু বাড়াবাড়ি ঠেকে বৈকি।

বাড়াবাড়ি ছাড়া কী আর?

সরকারি থানা আছে এখানে। নিতাইয়ের বাড়ি থেকে সে থানা আট-দশ মিনিটের রাস্তাও নয়। বেশ বড় গঞ্জ—বহু লোকজনের ঘন বসতি আছে। তাছাড়া সুন্দরপুর ইউনিয়ন বোর্ডের বেশ মাতব্বর লোক নিতাই সরকার—দারোগা ইয়াসিন মিঞার সঙ্গে তার দহরম-মহরমের খবরটাও সকলেরই জানা। এহেন নিতাই সরকারের বাড়িতে সহজে মাথা গলাবার সাহস হবে না চোর-ডাকাতের।

www.boiRboi.blogspot.com

তবু লোকটা সতর্ক হয়ে থাকে অতিরিক্ত মাত্রায়।

কোথায় তার মনের মধ্যেই একটা নিঃশব্দ ভয় ঢুকে বসে আছে কে জানে! সন্ধ্যার পরে কোন নির্জন রাস্তায় একা হাঁটে না। রাত একটু বেশি হয়ে গেলে কোন অচেনা মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করে না। শোবার আগে প্রত্যেকটা দরজায় সে নিজের হাতে তালা লাগায়—ভারী ভারী শক্ত তালা।

লোকে কানাঘুষো করে। বলে, অনেক টাকা করেছে লোকটা। জমিয়েছে যকের ধন। সেই টাকার জন্যেই এত সব বাতিক দেখা দিয়েছে তার।

কত টাকা? কেউ বলে দশ হাজার, কেউ বিশ হাজার, কেউ পঞ্চাশ হাজার, কারো কারো মতে আরো ঢের বেশি। মোটের ওপর পাঁচ বছর আগেকার গোলদারি দোকানদার নিতাই সরকারের ভাগ্য যে ফিরেছে তা নিয়ে কারুর ভেতরে মতভেদ নেই।

লোকে হিংসায় জ্বলে। আর সেই হিংসাটা ভোলবার জন্যেই নানাভাবে সান্ত্বনা দেয় নিজেদের।

—আমার টাকাও নেই, ভাবনাও নেই।

—তা যা বলেছ! টাকা থাকলেই আতঙ্ক। খেয়ে সোয়াস্তি নেই, ঘুমিয়ে নিশ্চিন্তি নেই। তার চেয়ে আমরাই বেশ আছি। চোর-ডাকাত আমাদের ফুটোফাটা ঘটি-বাটি কোনদিন ছুঁতেও আসবে না।

—সে তো ঠিক কথা। একটা জিনিস তবুও কিছুতেই বোঝা যাচ্ছে না। এত টাকা কোথায় পেল নিতাই সরকার?

ঠিক ওই একটি জিজ্ঞাসাই সকলের মনে ঘুরপাক খায়। কোত্থেকে এত টাকা এল লোকটার? একতলা মাটির ঘর তার পাকা দোতলা হয়ে উঠল। দু-সের ডাল, এক-সের চিনি, পোয়াটাক কাঁচা লঙ্কা আর গোটাকয়েক পেঁয়াজ বেচেই কি কেউ এমন করে লক্ষ্মীর অনুগ্রহ পায়? গ্রামের তারু মুদির দোকান তো অনেক বড়, কিন্তু সেও তো আজ পর্যন্ত মাট-কোঠার ওপর টিনের চালা তুলতে পারল না।

দোকান থেকে নিতাইয়ের যে এই অর্থ-সৌভাগ্যটা ঘটেনি—এটা জলের মত সরল। পাঁচ বছর আগে নিতাই সেই যে দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে কলকাতায় চলে গেল, তারপর মাত্র গত বছর সে গ্রামে ফিরেছে। আর ফিরেই গড়ে তুলেছে লোকের-তাক-লাগানো এই দালান; সেইসঙ্গে এমন একখানা মনোহারির দোকান দিয়েছে সে সাতখানা গাঁয়ের মানুষকে ডেকে দেখানোর মত! বিলিতি সেনা থেকে হ্যারিকেন লণ্ঠন পর্যন্ত সেখানে কিনতে পাওয়া যায়—শহরকে একেবারে টেক্কা দিয়ে চলে গেছে বলা যেতে পারে। তাহলে আসল রহস্য এই গ্রামে নেই, আছে কলকাতায়। এ তল্লাটের লোক পারতপক্ষে সুদূর কলকাতা কখনো চোখে দেখিনি। দু-একজন যারা কালীঘাটে পুজো দিতে গেছে, তারা গাড়ি-ঘোড়ার উৎপাত দেখে যেতে না যেতেই পালিয়ে এসেছে পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে নিয়ে।

এহেন ভয়ঙ্কর কলকাতার পথঘাট কি সোনা দিয়ে মোড়া? সেখানে কি টাকা পয়সা এমন করে ছড়িয়ে রেখেছে যে ইচ্ছে করলেই মুঠোভরা কুড়িয়ে আনা যায়? কে জানে! নিতাই সরকারকে দু-একজন হাবেভাবে কথাটা জিজ্ঞেস করতে গিয়েছিল। কিন্তু নিতাই একেবারে গাঁক্ গাঁক্ করে তেড়ে এসেছে।

—ওসব বাজে কথা আলোচনা করতে এস না আমার কাছে। নিজেদের কাজকর্ম না থাকে, তারু মুদির দোকানে গিয়ে তামাক টানো গে।

লোকে তাই মনে মনে বিলক্ষণ চটে আছে নিতাইয়ের ওপর। আড়ালে আবডালে

নানারকম সমালোচনা করে।

—ইস্,—তেজটা দ্যাখ না একবার!

—সেদিনের নেতাই ছোকরা—ন্যাড়া মাথা, পেটে পিলে! এক পো জিনিস মাপতে আধছটাক ওজনে ফাঁকি দিত—সে একেবারে লাট সায়েব হয়ে উঠেছে!

কান থেকে বিড়ি নামিয়ে সেটা ধরাতে ধরাতে একজন বলে, ও আর কিছু নয়—বুঝলে না, গরম! টাকার গরম!

—টাকার গরম! অত গরম কোনদিন থাকবে নাকি?

আরে বাপু, তাই কি থাকে নাকি কোনদিন? অহঙ্কার বেশি বাড়লে তার পতন অনিবার্য—এই স্পষ্ট কথাটা জেনে রাখো। সেইজন্যেই তো শাস্ত্রে বলছে, 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা অতি মানে চ কৌরবাঃ!'

কিন্তু যাই বলুক—এখন পর্যন্ত নিতাই সরকারের সর্বনাশ হবার মত কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না, বরং দস্তুরমত বহাল তবিয়তেই সে আছে—চারপাশের গ্রাম থেকে খদ্দেরের ভিড় বাড়ছে তার মনোহারি দোকানে। যেখানে থেকে সে যাই করুক, আর অহঙ্কার তার যতই বাড়ুক, তার অবস্থা এখন উঠতির দিকেই; পতন হওয়ার মত কোন লক্ষণ এখন কোথাও তার চোখে পড়ছে না।

নিতাই সরকারের কিন্তু শান্তি নেই। কী একটা প্রচ্ছন্ন ভয় আছে তার, একটা গোপন আশঙ্কা আছে মনের ভেতর। ঘুমের মধ্যে কখনও যদি দেওয়ালের গায়ে একটা টিকটিকিও টক্ টক্ করে ডেকে ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতটা চলে যায় বন্দুকের ঠাণ্ডা কঠিন নলটার গায়ে। ওই বকের ছানাগুলোর কান্না শুনতে শুনতে আচ্ছন্ন চেতনার ভেতরে তার মনে হয় যেন কোথায় কার গোঙানি শুনতে পাচ্ছে সে।

সঙ্গে সঙ্গে সে বিছানার ওপর উঠে বসে। কার মৃত্যু-যন্ত্রণার গোঙানি? কোন্ অশরীরী ছায়া-মূর্তির কান্না? আচমকা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বেড়ে যায় তার—সারা গায়ে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে বেরোয়।

ভুল ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজেই লজ্জা পায়। না! অসম্ভব! মরা মানুষ আর কখনো ফিরতে পারে না। ফেরার কোন উপায়ই নেই তার। কোথায় কবে ঘুম-জড়ানো চোখে কিসের একটা ছায়া দেখেছিল, তারই অর্থহীন বিভীষিকা তার সব কিছুকে এমনভাবে বিস্বাদ করে রেখেছে।

তবু কি মন মানে?

আজও মাথার কাছে হাতের নাগালের মধ্যে বন্দুকটা রেখে সে শুয়েছিল। ঘুমুচ্ছিল অকাতরে।

দূরের বাঁশবনে শেয়াল ডাকল—রাত বারোটা। সঙ্গে সঙ্গে এতক্ষণের দমকা গুমোট ভাবটা গেল কেটে, কোত্থেকে একরাশ ধুলোবালির তরঙ্গ তুলে একঝাপটা ঝোড়ো হাওয়া এল ঘরের মধ্যে। শাঁ-শাঁ করে উঠল স্তব্ধ নিমগাছটা—ঝর্ঝর্ করে বটগাছটার ডালপালায় দোলা লাগতেই ছানাগুলো আর্তনাদ তুলল সমস্বরে।

নিতাই সরকারের ঘুম ভাঙল। ভাঙল আকস্মিকভাবে। আর সঙ্গে সঙ্গেই সে দেখতে পেল.....

কিন্তু যা দেখল তাতে সে বিছানার মধ্যে পাথর হয়ে পড়ে রইল। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে পারল না বন্দুকটা—দুটো হাতই যেন তার পক্ষাঘাতে অসাড় হয়ে গেছে!

ঘরের মধ্যে একটা মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ—তারই ঘরে। তার চারটে দরজায় শক্ত লোহার তালা সত্ত্বেও দোতলার এই বন্ধ ঘরে সে এসেছে। তার সর্বাঙ্গ একটা কালো আলখাল্লা দিয়ে মোড়া—লণ্ঠনের ক্ষীণ শিখাতে দেখা গেল, আলখাল্লার ফাঁকে

www.boiRboi.blogspot.com

তার দুটো চোখ যেন দু-টুকরো জ্বলন্ত কয়লার মত দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে।

মানুষ, না প্রেতাত্মা? চোর, না খুনী?

নিতাই চিৎকার করে উঠতে চাইল, পারল না। গলা থেকে তার সমস্ত স্বর কে যেন একটা ব্লটিং কাগজ দিয়ে শুষে নিয়েছে। শুধু নির্বাক অসহায় চোখে সমস্ত ব্যাপারটা সে দেখতে লাগল। কিছুই করবার উপায় নেই তার—করবার মত শক্তিও নেই কোথাও। সে এখন এই অদ্ভুত আগন্তুকের হাতে সম্পূর্ণ অসহায় শিকার।

মূর্তিটা হঠাৎ একখানা হাত থাবার মত করে তুলে ধরল। লণ্ঠনের আবছা আলোতেই নিতাই দেখতে পেল—সে হাত মানুষের নয়। তীক্ষ্ণধার তার নখ, রোমশ, কর্কশ তার রূপ, আর—আর সে হাত টকটকে তাজা রক্তে মাখানো।

সেই হাতখানা বাড়িয়ে মূর্তিটা তার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল।

নিতাই আবার চিৎকার করতে চেষ্টা করল—মনে হল মাত্র তিন হাত দূরেই দাঁড়িয়ে আছে তার মৃত্যু। কিন্তু এবারও সে কোন স্পষ্ট আওয়াজ করতে পারল না, কেবল গলার মধ্যে তার ঘড়্‌ঘড়্‌ করে উঠল। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে পলকহীন চোখে তাকিয়ে রইল। আর খোলা জানলা দিয়ে ক্রমাগত ঘরে এসে ঢুকতে লাগল গোঁ-গোঁ করা ঝোড়ো হাওয়ার এক-একটা উদ্দাম ঝাপট।

মূর্তিটা কাছে এল—এল একেবারে বিছানার কাছে। তারপর রক্তমাখা সেই হাতখানা নিতাইয়ের বুকের ওপর চেপে ধরল। সে-হাতের ছোঁয়ায় তার গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে গেল বরফের মত।

ফিস্‌-ফিস্‌ করে লোকটা বললে, আমায় চিনতে পারো?

নিতাই জবাব দিলে না। জিভটা তার টাকরার সঙ্গে আঠার মত লেপটে গেছে।

—আমি শ্রীমন্ত রায়।—তেমনি ফিস্‌ফিস্‌ করে বললে লোকটা, তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিংস্র একটা হাসির রেশও যেন বেজে উঠল।

বিদ্যুতের চমক খাওয়ার মত করে নিতাইয়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিউরে গেল।

—আমায় এখানে তুমি আশা করোনি—না?

নিতাইয়ের ঠোঁট দুটো একবার নড়ে উঠল। কিছু বলতে চেষ্টা করল।

—কিন্তু আশা না করলেও অযাচিতভাবেই দেখা দিতে এসেছি। এতদিনের এমন নিবিড় বন্ধুত্ব—মায়া কাটানো কি এতই সহজ? উৎসবে, ব্যসনে, শ্মশানে—সব জায়গাতেই বন্ধুর কাছাকাছি থাকা উচিত—কী বলো?

কে বলবে? বলবার মত অবস্থা নিতাই তখন হারিয়েছে। তার সমস্ত চেতনা যেন লুপ্ত হয়ে যাওয়ার উপক্রম।

—ভেবেছিলে, পালাবে? পালিয়ে বাঁচবে তিনশো মাইল দূরের এই পাড়াগাঁয়ে? কিন্তু অত সহজেই কি আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায়? আমার জন্যে যা তুমি করেছ, সে ঋণ শোধ করবার জন্যে দরকার হলে তোমাকে খুঁজতে আমি নরকে পর্যন্ত যেতে রাজী ছিলাম, বন্ধু! এই সুন্দরপুর আর কতটুকুই বা রাস্তা সে তুলনায়?

নিতাইয়ের একটা হাত নড়তে লাগল। বন্দুকটা ধরবার অন্তিম চেষ্টা করল যেন। কিন্তু আলখাল্লার ফাঁকে দুটো চোখের জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে ক্রমেই সম্মোহিত হয়ে যাচ্ছে। শরীরের একটি স্নায়ুপেশীও তার বশে নেই।

শ্রীমন্ত রায় বললে, শোন। আমার পাওনা গণ্ডা এই মুহূর্তে মিটিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু তা আমি করব না। অপ্রস্তুত অবস্থায় শোধ নেওয়াটা তোমাদের মত কাপুরুষের ধর্ম হতে পারে, কিন্তু তা আমার নয়। তিন দিন সময় আমি

www.boiRboi.blogspot.com

তোমাকে দিলাম। অনুতাপের যা কিছু সুযোগ এর মধ্যেই তুমি পাবে। তারপর আমি আবার আসব। সেদিন জেনে রেখো, আমার হাত থেকে কিছুতেই তোমার পরিত্রাণ নেই।

বাইরে আবার হাওয়া গোঁ-গোঁ করে উঠল। গোঙিয়ে উঠল বকের ছানারা। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ জানলার কাছে সরে এল শ্রীমন্ত রায়। অসাড় চোখের দৃষ্টি ঘুরিয়ে নিতাই দেখতে পেল, খোলা জানালা দিয়ে বিদ্যুদ্বেগে শ্রীমন্ত হারিয়ে গেল অন্ধকারে; শুধু অনেক নিচে ধুপ্‌ করে শব্দ হল।

কড়্‌ কড়্‌ করে বাজ ডেকে গেল আকাশে। চোখ ধাঁধিয়ে গেল একরাশ অতি-তীব্র বিদ্যুতের আলোয়। সেই আলোয় নিতাই দেখলে, অমানুষিক শক্তির সাহায্যে লোহার শক্ত গরাদে দুধারে বাঁকিয়ে দিয়ে তার ভেতর দিয়ে কেউ ঘরে ঢোকবার পথ করে নিয়েছে।

প্রায় দশ মিনিট পরে বাঁশপাতার মত কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসল নিতাই। হাত বাড়িয়ে চড়িয়ে দিল লণ্ঠনের আলো।

॥ তিন ॥

সকালে স্টেশনে কাজ ছিল না। নাইট-ডিউটির পরে বেলা বারোটা পর্যন্ত কোয়ার্টারে টানা ঘুম লাগালেন গণেশবাবু। কিন্তু নিশ্চিন্ত নিদ্রা নয়—থেকে থেকে কেমন একটা দুঃস্বপ্নে যেন তিনি আঁতকে উঠছিলেন। অন্ধকার অমাবস্যার রাত—প্ল্যাটফর্মে মিটমিটে আলোয় দরজার হাতলের ওপরে একখানা হাত এসে জেঁকে বসেছে বাঘের থাবার মত। রোমশ—কর্কশ—ভয়ংকর।

একখানা কালো হাত। পৃথিবীর যত হিংসা আর বিভীষিকা যেন সেই হাতে। যেন সামনে যাকে পাবে, তারই গলা টিপে ধরবে।

বেলা বারোটার সময়ে এই অস্বস্তিকর ঘুম থেকে গণেশবাবু উঠে বসলেন। হাত-মুখ ধুয়ে পুরো দু পেয়ালা চা আর চারটে ডিম খেয়ে প্রাতরাশ করলেন। মোটা মানুষ, বেশ খেতে পারেন—খেতে ভালোও বাসেন। আর লোভের জন্যেই না তাঁর এই দুর্গতি! দিব্যি ছিলেন শিয়ালদা স্টেশনে, কী কুক্ষণেই যে হতভাগা গোমেজের পাল্লায় পড়ে প্রফেসার ভাদুড়ীমশায়ের ল্যাংড়া আমেই তাঁর নজর গেল—

কিন্তু রাত্রে তিনি ও কী দেখলেন! স্বপ্ন, না সত্যি? গণেশবাবু ব্যাপারটা এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারছেন না। জেগে জেগে স্বপ্ন দেখা তো তাঁর অভ্যেস নয়। গাঁজা তিনি খান না—কোন ভদ্রলোকেই খায় না। অল্প বয়সে দেশের বাড়িতে বিজয়া দশমীর দিন একবার সিদ্ধি খেয়েছিলেন। সিদ্ধির লোভে নয়—এক এক গ্লাস সিদ্ধির সঙ্গে দুটো করে নাটোরের রসগোল্লা বরাদ্দ ছিল। তারই আকর্ষণে গ্লাস-তিনেক সিদ্ধি টেনে যে দুর্গতি তাঁর হয়েছিল সে-কথা আজও স্পষ্ট মনে আছে। দুদিন বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিলেন, আর স্বপ্ন দেখেছিলেন—একটা পাটকিলে রঙের মস্ত রামছাগল শিং নেড়ে তাঁর ভুঁড়িতে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। দুদিন ধরে এমনি ভয়ঙ্করভাবে তিনি হেসেছিলেন যে তারপরে এক হপ্তা তিনি ভাত পর্যন্ত খেতে পারেননি—এত ব্যথা হয়েছিল চোয়ালে।

কাল রাত্রে তিনি তো সিদ্ধি খাননি! তবে কী ব্যাপার! গণেশবাবু বারকয়েক মাথা ঝাঁকড়ালেন। নাঃ—স্বপ্নই বটে! — ব্যাপার কখনো সত্যি হতে পারে!

সত্যি হওয়া অসম্ভব। মিছিমিছি ও নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না। দেওয়াল-ঘড়িতে সাড়ে বারোটা বেজেছে। পৌনে একটায় দুখানা গাড়ির ক্রসিং হয় মানিক-পুরে। একবার স্টেশনে যাওয়া দরকার।

কোম্পানির নাম লেখা চাঁদির-বোতাম-আঁটা শাদা জিনের কোটটা গায়ে চড়ালেন গণেশবাবু। তারপর চটিটা পায়ে দিয়ে গজেন্দ্রগমনে এগিয়ে চললেন স্টেশনের দিকে। স্টেশনের পাশেই সিগন্যাল নেমে পড়েছে—ট্রেনের আর দেরি নেই।

স্টেশনের পেছন দিয়েই একটা মেটে পথ। তার দুধারে উঁচু উঁচু টিলা. ডান দিকে একটি ঝুরি-নামা বটগাছ ছায়ার অন্ধকার করে চিত্রগুপ্তের মত দাঁড়িয়ে। কোন্ আদ্যিকালের গাছ—তার বয়েসের যেন ঠিক-ঠিকানা নেই। সেই গাছের নিচে সিঁদুর-লেপা একটা থান। হাত-পা-ভাঙা কালো কষ্টিপাথরের একটা মূর্তি। কার্তিকী অমাবস্যায় দূর দূর গ্রাম থেকে লোক এসে রক্ষিণী-কালীকে পুজো করে যায়।

গাছটার দিকে তাকিয়েই আজ যেন গা ছম্-ছম্ করে উঠল। ওর তলা দিয়েই মেটে রাস্তাটা চলে গেছে সুন্দরপুর পর্যন্ত। আশেপাশে আর জন-মানুষের বসতি নেই। ওই পথ দিয়েই কালো হাতখানা গেছে কোথায়? সুন্দরপুরের নিতাই সরকারের বাড়িতে।

গণেশবাবুর মাথাটা আবার ঝিম্ঝিম্ করতে লাগল। স্টেশনের ওপাশে মালগুদাম, তার নিচে দিয়ে বন জঙ্গল ঢালু হয়ে নেমে গেছে—কাদায় আর গোখরো সাপে ভরা এলোমেলো বিল আর বুনো ঘাসের একটা উচ্ছৃঙ্খল জগৎ। মাঝে মাঝে পেত্নীর মত তেঠেঙে চেহারার শ্যাওড়া গাছের সারি। ওখানে—ওই জলার জঙ্গলে কী যে নেই, এক ভগবানই বোধকরি সে কথা বলতে পারেন; শেয়াল আছে, বুনো শুয়োর আছে, শোনা যায় বাঘও আছে। আর হয়ত দলে দলে মামদো আছে, স্কন্ধকাটা আছে—যারা খুশিমত এক একখানা কালো হাত বাড়িয়ে—

গণেশবাবু আর ভাবতে পারলেন না।

বাঁকের মুখে আচমকা একটা তীক্ষ্ণ রেলের বাঁশি। গণেশবাবু হঠাৎ চমকে উঠলেন। ঝরাং ঝরাং ঝিপ্ ঝিপ্ শব্দ করতে করতে একখানা গাড়ি এসে স্টেশনে ভিড়ল। ওদিকে আর-একটা হুইসেল। আর একখানা ট্রেনও এসে পড়ল বলে।

গণেশবাবু জোর পা চালিয়ে দিলেন।

স্টেশনে ঢুকতেই গিরিধারীর সঙ্গে দেখা।

—মাস্টারবাবু, দুজন লোক আপনাকে খুঁজছে।

—আমাকে? গণেশবাবু ভ্রু কুঁচকোলেন।—কারা রে?

—তা তো জানি না। দুজন ভদ্রলোক।

—ভদ্রলোক! সেকি! কোথায়?

—ওয়েটিং রুমে বসে আছে। ডাউন গাড়ি থেকে নেমেছে।

গণেশবাবু দাঁড়িয়ে পড়লেন। মনটা চিন্তায় ভরে উঠেছে মুহূর্তে। এই অজগর জঙ্গলে কারা তাঁকে খুঁজতে এল? এমন আত্মীয়ই বা তাঁর কে আছে? কলকাতা থেকে আত্মীয়স্বজন যদি কেউ খুঁজতে এসে থাকে—তারাই বা চিঠিপত্র না দিয়ে এমন করে চলে আসবে কেন? আর যদি বা এসেও থাকে তাহলে সোজা তাঁর কোয়ার্টারেই তো চলে যেতে পারে—এখানে বসে থাকবে কোন্ দুঃখে?

www.boiRboi.blogspot.com

সাত-পাঁচ ভেবে গণেশবাবু ওয়েটিং রুমে ঢুকলেন।

নামেই ওয়েটিং রুম। একটা পুরোনো ওভাল-শেপ কাঠের টেবিল, তার ওপরে আধ ইঞ্চি ধুলো জমে আছে। একটা ডেক-চেয়ার আছে বছর ত্রিশেক আগেকার, তার বেতের ছাউনি বারো আনার মত খসে পড়ে গেছে। আর একটা বেঞ্চি আছে একপাশে—দরকার হলে সেখানে পড়ে পড়ে গিরিধারী নাক ডাকায়।

দুটি যুবক সেখানে বসে সিগারেট টানছিল।

গণেশবাবু ঘরে ঢুকতেই তারা উঠে দাঁড়াল, তারপর নমস্কার করলে। গণেশ-বাবুও প্রতি-নমস্কার জানালেন।

একজন সাহেবী পোশাক পরা, চোখে সোনার চশমা। বেশ প্রিয়দর্শন চেহারা—চোখে তীক্ষ্ণধার বুদ্ধির আলো। সেই-ই আলাপ আরম্ভ করলে।

—আপনি গণেশবাবু?

গণেশবাবু সবিনয়ে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ।

—এখানকার স্টেশনের ইনচার্জ বুঝি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনারা?

—বলছি।—সাহেবী পোশাক পরা যুবকটি বললে, বসুন না। সিগারেট নিন। আপনার সঙ্গে একটু জরুরী ব্যাপার আছে।

জরুরী ব্যাপার! গণেশবাবুর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে লাগল। এরা কারা? এইরকম একটা জংলি স্টেশনে দুটি বিশিষ্ট লোকের হঠাৎ আসবার হেতুই বা কী? কেমন যেন সন্দেহে গণেশবাবুর মাথাটা ঘুরতে লাগল।

গণেশবাবু বেঞ্চিটার ওপরে বসলেন। দ্বিধাভরে একটা সিগারেট নিয়ে ধরালেন। তারপর আবার জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা আসছেন কোত্থেকে?

এবার জবাব দিলে দ্বিতীয় যুবকটি। এ সাহেবী পোশাক পরা নয়, কিন্তু এরও বেশবাসে যথেষ্ট পারিপাট্য আছে। তাছাড়া এ লোকটির একটা একটা বিশেষত্বও এতক্ষণে গণেশের চোখে পড়ল। মস্ত জোয়ান। পাতলা সিল্কের পাঞ্জাবির নিচে তার শরীরের লোহার মত মাস্‌ল্‌গুলো ফুলে ফুলে উঠেছে। মাথার চুলগুলো কড়া, তামাটে। গাল দুটো ভাঙা, চোয়ালের হাড় খোলার মতো খাড়া হয়ে আছে। মুখের হাঁকড়াটা যেন একটু বেশি বড়—সব মিলিয়ে যেন একটা ভয়ানক চেহারার বুলডগের আদল আসে। প্রথম লোকটির চাইতে এর বয়সও একটু বেশি মনে হল।

গম্ভীর গমগমে গলায় সে বললে, কলকাতা।

—কলকাতা? তা এখানে কী কাজে? কোথায় যাবেন?

—দাঁড়ান. ব্যস্ত হবেন না—দ্বিতীয় লোকটি সিগারেটের ধোঁয়া উড়িয়ে বেশ রহস্যমণ্ডিত হাসি হাসল: কাছাকাছি কোথাও ডাকবাংলা আছে বলতে পারেন?

—আছে, সুন্দরপুরে। মাইল পাঁচেক দূর হবে।

—সুন্দরপুর! নতুন লোক দুটি যেন একসঙ্গে চমকে উঠল। সাহেবী পোশাক পরা যুবকটি সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খানিকক্ষণ অন্যমনস্কের মত তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে। বললে, না, সেখানে চলবে না। এই ওয়েটিং রুমেই আমরা দিন-কয়েক কাটাতে চাই। কী বলেন গণেশবাবু?

গণেশবাবু বিব্রত হয়ে বললেন, তা কেমন করে হবে? রেল কোম্পানির আইন আছে তো একটা। থাকতে দেবে কেন?

দ্বিতীয় লোকটি সশব্দে হেসে উঠল। বাইরে ট্রেন দুটো অনেকক্ষণ আগেই স্টেশন ছাড়িয়ে চলে গেছে. দুপুরের রোদে ঝাঁ-ঝাঁ করছে নির্জনতা। তার হাসির শব্দে

চারিদিকের স্তব্ধতা যেন দুলে উঠল।

—আইন আপনাকে কিছু বলবে না। আমরাও আইনের তাগিদেই এসেছি। পুলিশের লোক আমরা—ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ।

গণেশবাবু সভয়ে উঠে দাঁড়ালেন।—অ্যাঁ—তাই নাকি! মাপ করবেন, বুঝতে পারিনি। কিছু মনে করবেন না, স্যার।

প্রথম যুবকটি বললে, না না, মনে করব কেন! আপনাকে আমাদের চাই, একটা অত্যন্ত গুরুতর ব্যাপারে আপনি আমাদের হেল্‌প্‌ করবেন। একটা সাস্‌পেক্টেড খুন, প্রচুর টাকা চুরি এবং তার সঙ্গে কিছু রাজনৈতিক গণ্ডগোল—সব মিলিয়ে জিনিসটা পুলিশ-বিভাগে মস্ত একটা গোলক-ধাঁধা হয়ে আছে। আপনি আমাদের সাহায্য করবেন নিশ্চয়ই?

গণেশবাবুর ঘাম ছুটতে লাগল। সাস্‌পেক্টেড খুন, প্রচুর টাকা চুরি এবং রাজনৈতিক গণ্ডগোল! ভয়ে তাঁর তোতলামি বেরিয়ে গেল: আ—আ—আমি ক্‌-ক্‌-কী সাহায্য করব?

—সে আমরা দেখব। ভাবনার কোন কারণ নেই আপনার। যদি কাজটা করে ফেলতে পারি, আপনিও পুরস্কারের অংশ পাবেন।

পুরস্কারের অংশ! সঙ্গে সঙ্গে গণেশবাবু শিউরে উঠলেন। পুরস্কার। কালো হাতও তাঁকে বলে গেছে পুরস্কার দেবে। কিন্তু পুরস্কারের নমুনা যা দেখা যাচ্ছে, এখন ব্রহ্মতালু ফুঁড়ে প্রাণটা বেরিয়ে না গেলেই তিনি বাঁচেন। উঃ গোমেজ...হতভাগা গোমেজ! তার জন্যেই না তাঁকে আজ এই দুর্বিপাক ভোগ করতে হচ্ছে!

গণেশবাবু দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহেবী পোশাক পরা যুবকটি বললে, আমাদের পরিচয়টাও আপনার জানা দরকার। আমি এ লাইনে ইন্সপেক্টর, অনাদি ঘোষাল আমার নাম। আর ইনি বিরিঞ্চি চক্রবর্তী, আমার সহকর্মী।

গণেশবাবু এতক্ষণে যেন কথা খুঁজে পেলেন।

—তাহলে আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার বন্দোবস্তটা—

—কিচ্ছু ব্যস্ত হবেন না, আমাদের সঙ্গে চাল-ডাল, আলু আর কুকার আছে, ওতেই চলে যাবে। আপনি একটু জলের বন্দোবস্ত—

—না, না—সে কি হয়!—হন-হন করে গণেশবাবু চলে গেলেন। ভয়, অস্বস্তি আর অশান্তিতে তাঁর সমস্ত মনটা কলাপাতার মত কাঁপছে।

গণেশবাবু বেরিয়ে যেতে অনাদি আর বিরিঞ্চি ঘন হয়ে বসল।

অনাদি বলল, কেমন দেখলে হে ভদ্রলোককে?

বিরিঞ্চি চট্‌ করে উঠে গেল। একবার মুখ বাড়িয়ে দেখে নিলে কেউ আছে কি না। তারপর দরজাটা বন্ধ করে ফিরে এল অনাদির কাছে।

—গণেশবাবুর কথা বলছিলে তো? লোকটা একেবারে গবেট!

—কাজ হবে?

—হুঁ, অনায়াসে। মাথায় কাঁটাল তো দূরের কথা, নারকেল আছড়ে ভাঙলেও 'টুঁ' করবে না।

—এক ঢিলে দু পাখি মারতে হবে। শেয়ারে অন্তত পাঁচ হাজার করে আমাদের পাওয়া উচিত, কী বল?

—নিশ্চয়, আর মেল ট্রেন থেকে যা পাওয়া যায় সেটা উপরি।

অনাদি আর-একটা সিগারেট ধরালো। চিন্তিত মুখে বললে, কিন্তু বড্ড

www.boiRboi.blogspot.com

দুঃসাহসিক হচ্ছে। শেষরক্ষা করতে পারলে হয়! তাছাড়া, আমার মনে হয় শ্রীমন্ত রায় বেঁচে আছে।

—অসম্ভব! আমার সামনেই সে ছোরা খেয়ে পড়ে গিয়েছিল মাটিতে—রক্তে ভেসে গিয়েছিল সব। আর বেঁচেই যদি থাকে—তাতেই বা ক্ষতি কী। পঞ্চাশ রাউন্ড করে রিভলবারে গুলি আছে আমাদের, ভুলো না—হাঃ—হাঃ—হাঃ! বিরিঞ্চি রাক্ষসের মত হেসে উঠল।

—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

পরক্ষণেই বাইরে থেকে তেমনি একটা হাসির প্রতিধ্বনি।

অনাদি আর বিরিঞ্চি একসঙ্গেই লাফিয়ে উঠল দুজনে। মুহূর্তের মধ্যে পকেট থেকে একটা রিভলবার বার করলে বিরিঞ্চি। দুজনের মুখ থেকেই সমস্বরে বেরল: কে হাসল অমন করে?

সবেগে দুজনে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছাইয়ের মত বিবর্ণ হয়ে গেছে তাদের চেহারা।

নির্জন স্টেশন। দুপুরের রোদে তার কাঁকর আর লাইনের ইস্পাত জ্বলছে। ওপাশে ঢালু জমিতে যতদূর চোখ যায় বিল আর জঙ্গল। স্টেশনমাস্টারের ঘরে লোক নেই, শুধু একটা রেলের কুলি প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিচ্ছে মন দিয়ে। বুড়ো মানুষ, মাথার চুলগুলো শাদা। এত নির্বিকার, যে...

বিরিঞ্চি বাঘের মত গলায় ডাকল, এই কুলি!

কুলিটা দাঁড়িয়ে উঠে একটা সেলাম ঠুকল। বললে, ক্যা হুকুম হুজুর।

—কে এখানে হাসল?

—কোই নেই হুজুর!

—কোই নেই?

—না হুজুর।

—হাসি শোননি?

—নেহি হুজুর। আপ্‌লোক্‌কা ভুল হুয়া হোগা।

—ভুল হুয়া হোগা! দুজনেই সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কুলিটার দিকে। ভুল হবে? দুজনেরই একসঙ্গে? কেমন করে সম্ভব! তবে কি প্রতিধ্বনি? কিন্তু—

—তোমার নাম কী?

—গিরিধারী হুজুর। আজ দশ বছরের বেশি হল এই টিশনে আছি।

—আচ্ছা যাও।

—সেলাম হুজুর!—ঝাঁটাটা তুলে নিয়ে গিরিধারী চলে গেল।

ওয়েটিং রুমের বাইরে অনাদি আর বিরিঞ্চি এ-ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। পাথরের গড়া মূর্তির মত। ভাষা জোগাচ্ছে না।

॥ চার ॥

মিনিট পাঁচেক প্ল্যাটফর্মে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি আর বিরিঞ্চি। দুজনেই কি একসঙ্গে ভুল শুনল? তাও কি সম্ভব? সিল্কের পাঞ্জাবির নিচে হুলো বেড়ালের মত বিরিঞ্চির মাংসল পেশল শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে। হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারটা কেমন একটা শব্দ করল—যেন দাঁত কড়কড় করছে। যাকে সামনে পাবে

চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে তাকে।

অনাদির মুখটা যেন পাঙাশ হয়ে গেছে। হাঁটু দুটো কাঁপছে ঠকঠক করে। ফিস-ফিস করে অনাদি বললে, ও কে হাসল? শ্রীমন্ত রায়?

কিন্তু বিরিঞ্চি নিজেকে সামলে নিলে। হঠাৎ অনাদির কাঁধে মস্ত বড় থাবড়া দিলে একটা।

—ক্ষেপেছ তুমি? যে-লোক আমার সামনে মরে গেছে সে এখানে আসবে কেমন করে?

—কিন্তু সত্যিই মরেছে তো?

বিরিঞ্চি যেন ধমক দিয়ে উঠল, ওসব কী কুসংস্কার তোমার? মরেনি তো মরেনি। তাই বলে সে এখানে এসে জুটবে কেমন করে?

—তাহলে ও হাসি কার?

—কোন পাগল-টাগলের হবে বোধহয়।

—বোধহয়।

মনের দিক থেকে এ ছাড়া সান্ত্বনা পাওয়ার কিছু ছিল না।

মেঘের মত মুখ নিয়ে দুজনে ওয়েটিং রুমে ঢুকল। বিরিঞ্চির সমস্ত কপাল চিন্তায় রেখায়িত হয়ে উঠেছে—অনাদির চেহারায় এখনো স্বাভাবিকতা ফুটে ওঠেনি। ঘরে ঢুকে অনাদি ডেক-চেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে ক্লান্তের মতো শুয়ে পড়ল আর বিরিঞ্চি একটা টেবিলের ওপরে পিঠ খাড়া করে বসে কি যেন চিন্তা করতে লাগল।

বাইরে রোদ ঝাঁ-ঝাঁ করছে। রেল-লাইনের পাশে টেলিগ্রাফের তারে একটা শঙ্খচিল চ্যাঁ চ্যাঁ করে উঠল—ভারি অলক্ষুণে ডাক। রঙ্কিণী-কালীন থানের ওপরে ঝাঁকড়া বটগাছটা অন্ধকার করে দাঁড়িয়ে—বাতাসে তার পাতাগুলো ঝরঝর করছিল।

নিরুত্তরে দুজনে দুটো সিগারেট ধরালো। হাসির কথাটা মন থেকে মুছে ফেলবার চেষ্টা করছে, কিন্তু পারছে না।

অনাদি বললে, আমার ভাই ভাল লাগছে না একটুও।

বিরিঞ্চি ভ্রূকুঞ্চিত করলে : কেন?

—মনে হচ্ছে সুবিধে হবে না। বিপদে পড়ব।

—বিপদ?—বিরিঞ্চি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল : দুটো রিভলবার আর দুশো কার্তুজ আছে সঙ্গে। এই মেড়োর দেশে এসেও যদি কাজ গুছিয়ে নিতে না পারি, তাহলে মানুষ হয়ে জন্মেছি কেন বলতে পার?

—হুঁ।—অনাদি গম্ভীর হয়ে রইল।

নির্জন স্টেশনের ওপরে দুপুরের রোদ জ্বলছে। চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে লাইন পেরিয়ে একটা ঢালু জমি প্রসারিত হয়ে গেছে দিগন্ত পর্যন্ত। তার ওপর জঙ্গল আর জঙ্গল। কালো কালো ডানা আকাশে মেলে দিয়ে উড়ে চলেছে 'শামকল' পাখির ঝাঁক।

হাতের রিভলবারটা নিয়ে বিরিঞ্চি খেলা করতে লাগল। একবার তাকাল বাইরের দিকে। বললে, হাতে দুটো কাজ এখন। নিতাই সরকারের কাছ থেকে দশ হাজার টাকা আদায় করতে হবে। দু নম্বর—মেল ট্রেন।

অনাদি বললে, তিন নম্বর কাজেরও দেখা পাবে। মনে কর যদি শ্রীমন্ত রায় এসে সামনে দাঁড়ায়—বলে—

—হ্যাং ইয়োর শ্রীমন্ত রায়!—বাঘের মত গর্জন করে বিরিঞ্চি মাটিতে দাঁড়িয়ে পড়ল। বল'ল আসে আসুক—এই রিভলবারের মুখে—

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু এবারেও বিরিঞ্চির কথা শেষ হল না।

সমস্ত স্টেশনটা কাঁপিয়ে হঠাৎ একটা প্রচণ্ড অট্টহাসির ঝড় উঠল। হোঃ—হোঃ—হোঃ! অমানুষিক, নৃশংস আর ভয়ংকর হাসি! সে হাসিতে এই দিন-দুপুরেও দুজনের গায়ের লোম খাড়া হয়ে গেল সজারু-কাঁটার মত।

চকিত হয়ে দুজনে পেছন ফিরে তাকাল। যা দেখল তা বিশ্বাস করবার মত নয়। ওয়েটিং রুমের কাঁচের জানলার পাল্লার ওপর থেকে নক্ষত্র-গতিতে একখানা হাত সরে গেল। সে হাত সাধারণ মানুষের হাতের প্রায় দ্বিগুণ। তার রঙ কালির মত কালো, রোমশ, কর্কশ আর ভয়ংকর।

বিস্ফারিত চোখ মেলে দুজনে তাকিয়ে রইল সেদিকে।

পরক্ষণেই আর-একটা। আতঙ্কের উপর আতঙ্ক।

খোলা জানলা দিয়ে প্রকাণ্ড একটা শাদা গোলার মতো কি ছিটকে এল ওদের দিকে—ক্র্যাশ করে আছড়ে পড়ল মেঝেতে, তারপর ঘরময় গড়িয়ে গেল ফুটবলের মত।

একটা নরমুণ্ড। তার বিকট দাঁতগুলো ছরকুটে আছে—যেন কামড়াতে চায়। আর তার সঙ্গে আঁটা একটা শাদা কাগজ—তার ওপরে প্রকাণ্ড একখানা হাতের ছাপ—রক্তমাখা হাতের ছাপ।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত। তারপরেই জানলার দিকে পাগলের মত ছুটে গেল বিরিঞ্চি। বাইরে হাত বাড়িয়ে ট্রিগার টিপল রিভলবারের।

—গুড়ুম—গুড়ুম—

সমস্ত স্টেশনটা থর্‌থর্‌ করে উঠল। আর দূরে প্ল্যাটফর্মের একপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নির্বিষ্ট মনে খৈনি টিপতে লাগল গিরিধারী।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সমস্ত লোক জমা হয়ে গেল ওয়েটিং রুমে। অনাদি মূর্ছিতের মতো বসে পড়েছে ডেক-চেয়ারে, তার মাথাটা যেন কুমোরের চাকার মতো বোঁ-বোঁ করে ঘুরছে। কিন্তু বিরিঞ্চি অত সহজে বিচলিত হয়নি। শুধু মুহূর্তের জন্যে তারও শরীরটা কেমন করে উঠেছিল, কিন্তু নিজেকে সামলে নিয়েছে। বোঝা যাচ্ছে শত্রু আছে কাছাকাছি। কিন্তু সেজন্যে পিছিয়ে গেলে চলবে না, দুশো রাউণ্ড কার্তুজ তারা এনেছে রিভলবারে ব্যবহার করার জন্যে।

ওয়েটিং রুমে লোক জড়ো হওয়ার আগেই সে মড়ার মাথাটা থেকে কাগজখানা খুলে নিলে, নিঃশব্দে সেটাকে পুরলে নিজের পকেটে। তারপরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

হৈ হৈ করতে করতে ছুটে এলেন গণেশবাবু, স্টেশনের ছোকরা বুকিং ক্লার্ক রহমান আর পানিপাঁড়ে রাম সিং। গণেশবাবুর অবস্থা দেখলে দুঃখ হয়। স্নানের উদ্যোগ করছিলেন ভদ্রলোক, হাতে গাড়ু, কানে পৈতে, পরনে গামছা। সেই অবস্থাতে ছুটে এসেছেন তিনি। মোটা মানুষ, এমনিতেই হার্ট দুর্বল! এই দিন-দুপুরে রিভলবারের দু-দুটো আকাশ-ফাটানো শব্দে তাঁর বুকের মধ্যে যে কেমন করছে সে তিনিই জানেন।

—কী হয়েছে? ব্যাপার কী?

সমস্বরে সকলের প্রশ্ন।

অনাদি কোন কথা বলতে পারল না, জবাব দিলে বিরিঞ্চি। আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওইটে দেখুন।

সর্বনাশ! মড়ার মাথা! তিনজনেই লাফ দিয়ে দরজার দিকে সরে গেল আতঙ্কে। সবচাইতে প্রচণ্ড লাফ দিলেন গণেশবাবু। অমন মোটা শরীর নিয়ে অতবড় লাফ তিনি যে কী করে দিলেন এ একটা আশ্চর্য ব্যাপার! তাঁর সেই লম্ফদান দেখলে ক্যাঙারুরও লজ্জা হত। হাতের গাড়ুটা ঠাঁই করে গিয়ে লাগল পানিপাঁড়ে রাম সিংয়ের কাঁকালে, সেও 'আঁই আঁই আঁই দদ্দা' বলে মেঝেতে বসে পড়ল।

মিনিট-খানেক পরে একটু সামলে নিল সকলে।

কাঁপা গলায় গণেশবাবু বললেন, ওটা কী করে এল?

বিরিঞ্চি সংক্ষেপে উত্তর দিলে, জানলা দিয়ে।

—জানলা দিয়ে? কোন লোকজন—?

—নাঃ—ডেক-চেয়ারে বসে এতক্ষণ পরে সাড়া দিলে অনাদি। দুটো ঘোলাটে চোখ মেলে বললে: শুধু একখানা হাত! যেমন বিশ্রী কালো, তেমনি ভয়ঙ্কর! একখানা কালো হাত!

গণেশবাবুর বুকের রক্ত চন্-চন্ করে উঠল। হাত দুটো থর-থর করে কাঁপতে লাগল।

রাম সিং কাঁকালের ব্যথাটা সামলে নিয়ে বললে, রাম, রাম—ই তো কোই জিন কা কারবার হোগা মালুম হোতা!

ঠাঁই! গণেশবাবুর কাঁপা হাত আবার গাড়ুর ধাক্কা লাগাল রাম সিংয়ের হাঁটুতে।

—আঁই হো দাদা—মর্ গেই রে—আর একলাফে রাম সিং বাইরে চলে গেল। গাড়ুটার গতিবিধি তার সুবিধাজনক মনে হচ্ছিল না।

রহমান বললে, দিন-দুপুরে ভূত! এ হতেই পারে না।

বিরিঞ্চি বললে, নিশ্চয়ই না। এ কোন বদলোকের কাজ। ভাল কথা, আপনাদের স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান গিরিধারীকে একবার ডাকুন তো!

—গিরিধারী!—গণেশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, তাকে কেন?

বিরিঞ্চি কঠিন গলায় বললে, ডাকুন না! দরকার আছে।

কিন্তু স্টেশনে গিরিধারীকে পাওয়া গেল না। এদিক-ওদিক খুঁজে এসে রহমান বললে, কোয়ার্টারে গেছে।

হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারটা শক্ত করে ধরে বিরিঞ্চি বললে, অনাদি, তুমি ঘর পাহারা দাও। আমি একবার গিরিধারীর সঙ্গে মোলাকাতটা করে আসি।

অনাদি বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইল, কোন জবাব দিলে না।

তিনজনে প্ল্যাটফর্ম পেরিয়ে গিরিধারীর কোয়ার্টারের দিকে চলল। বিরিঞ্চি আগে আগে। প্রখর সূর্যের আলোয় জ্বলতে লাগল তার খাড়া চোয়াল আর আগুনের মত চোখ। হাতের মুঠোর মধ্যে রিভলবারের কুঁদোটা ক্রমেই গরম হয়ে উঠতে লাগল। আর গণেশবাবুর মনে হতে লাগল তাঁর চারপাশে একখানা অলক্ষ্য কালো হাত ঘুরে বেড়াচ্ছে—যখন-তখন সে তার ভয়ঙ্কর থাবাটা ক্যাঁক করে তাঁর গলায় বসিয়ে দিতে পারে। হৃৎপিণ্ডের ভেতর তখন থেকে ধড়াস ধড়াস করছে, আচমকা হার্টফেল করে বসবেন না তো গণেশবাবু?

একটা ছোট তামাকের ক্ষেত পেরিয়ে গিরিধারীর কোয়ার্টার। সামনে খুঁটোয় বাঁধা একটা গরু জাবনা চিবোচ্ছে। জনমানুষ কোথাও নেই।

—গিরিধারী, গিরিধারী!

কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

অসহিষ্ণু হয়ে গণেশবাবু দরজায় ধাক্কা দিলেন: এই ব্যাটা, করছিস কী? মরে

আছিস নাকি ঘরের ভেতরে?

গণেশবাবুর ধাক্কায় সঙ্গে সঙ্গে দরজাটা খুলে দু-ফাঁক হয়ে গেল। আর পরক্ষণেই সকলের চোখে পড়ল—

একটা দড়ির খাটিয়ার ওপরে একজন লোক পড়ে আছে। তার হাত-মুখ শক্ত করে কাপড় দিয়ে বাঁধা, চোখ দুটো অস্বাভাবিক বিস্ফারিত। আর তার বাঁধা মুখের ভেতর থেকে গোঁ-গোঁ করে একটা যন্ত্রণার চাপা শব্দ বেরিয়ে আসছে।

॥ পাঁচ ॥

গিরিধারী যা বললে তা অত্যন্ত বিস্ময়কর ব্যাপার।

আপ আর ডাউন গাড়ি ক্রসিং হওয়ার পরে সে কোয়ার্টারে ফিরে আসে। ভারি খিদে পেয়েছিল তার। সকালে রান্না করে রেখে গিয়েছিল, ভেবেছিল ফিরে গিয়ে নিশ্চিন্তে খাবারটা খেয়ে নেবে। কিন্তু দু-গ্রাস ভাত মুখে দিতেই তার কি যে হল সে জানে না। হঠাৎ মাথাটা বোঁ করে ঘুরে উঠল, তারপর সব অন্ধকার। যখন জ্ঞান হল সে দেখলে, এই খাটিয়াটার সঙ্গে কে তাকে শক্ত করে বেঁধে রেখে গেছে। তার গায়ে যে কোম্পানির পোশাক ছিল, তাও উধাও।

—আমি পুলিশের লোক। আমার কাছে সত্য কথা বলবে। তাহলে বেলা বারোটার সময় তুমি প্ল্যাটফর্ম ঝাঁট দিচ্ছিলে না?

—না হুজুর।

—হঠাৎ একটা হাসির শব্দ তুমি শুনতে পাওনি?

—না হুজুর।

—হুঁ!—বিরিঞ্চি আর কথা বাড়াল না। গণেশবাবুকে বললে, চলুন—হয়েছে।

গণেশবাবু যেমন ভীত, তেমনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কী স্যার? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

—বোঝবার দরকার নেই—বিরিঞ্চি যেন তীব্রভাবে একটা ধমক দিলে: আপনি শুধু মুখ বুজে চুপ করে থাকুন। অনেক রহস্য আছে এর ভেতরে। যদি কোন কথাবার্তা বলেন, তাহলে কিন্তু সব মাটি হয়ে যাবে—বুঝেছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ—শুকনো ঠোঁটটা চেটে গণেশবাবু জবাব দিলেন: আমি কোন বিপদে পড়ব না তো?

—বলা যায় না। তবে, আপনি চুপ করে থাকলে সেটাই নিরাপদ হবে।

—আ্যাঁ—বলা যায় না! গণেশবাবুর বুকের ভেতরটা ডাঙায় তোলা মাছের মত ধড়ফড় করে খাবি খেতে লাগল। মনের সামনে এখনো ভাসছে অন্ধকার রাত্রিটার ছবি, দরজার হাতলের ওপরে একখানা ভয়ঙ্কর কালো হাত। তারপর মড়ার মাথা, বিরিঞ্চির পিস্তলের শব্দ আর গিরিধারীর দুর্গতি—সব মিলে কী যে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটতে যাচ্ছে, গণেশবাবু তা কল্পনাই করতে পারলেন না।

উঃ, হতভাগা গোমেজ! কী কুক্ষণেই ভাদুড়ীমশায়ের আমের ওপর তাঁর নজর পড়েছিল! এখন তার ঠ্যালা সামলাতে প্রাণ যায়! নাঃ—চাকরি ছেড়ে দিয়ে ঘরের ছেলে ঘরেই ফিরে যাবেন তিনি। প্রাণ আগে, না চাকরি আগে?

বিরিঞ্চির মাথার ভেতর তখন ধু-ধু করে আগুন জ্বলছে। সেও কিছু বুঝতে পারছে না। এ কী করে হল—এ কেমন করে সম্ভব! নিজের চোখে সে দেখেছে

www.boiRboi.blogspot.com

মেঝের উপর উবুড় হয়ে পড়ে আছে শ্রীমন্ত রায়। রক্তে ঘর ভেসে যাচ্ছে। নিখুঁত-ভাবে ছোরার ঘা-টা যে তার বুকে লেগেছিল তাতেও সন্দেহ নেই। তবে?

তবে? বিরিঞ্চি মুঠোর মধ্যে শক্ত করে রিভলবারটা চেপে ধরল : তবে এ কী ব্যাপার? অনাদিকে আশ্বাস দিয়েছে বটে, কিন্তু ও-হাসি যে শ্রীমন্ত রায়ের, তাতে কোন সন্দেহ নেই। হ্যাঁ—নিঃসন্দেহে শ্রীমন্ত রায়। কিন্তু শ্রীমন্ত রায় কেমন করে আসবে এখানে? তাহলে এটা কি কোন ভৌতিক ব্যাপার? একটা অশরীরী আত্মা? —গায়ের ভেতর শির-শির করে শিউরে গেল।

কিন্তু না—নিজেকেই একটা ধমক দিলে বিরিঞ্চি। ভূত-টুত ওসব নিতান্ত গাঁজাখুরি—ছেলে-ভোলানো ব্যাপার। ভূতে বিশ্বাস করে না বিরিঞ্চি। তাছাড়া এ তো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, গিরিধারীকে খাটিয়ার সঙ্গে বেঁধে রেখে একটা লোক গিরিধারী সেজে তাদের ওপর বেশ এক চাল চেলে গেল, এবং সে লোক যে শ্রীমন্ত রায়, এ কথা বিরিঞ্চি কাগজে-কলমে লিখে দিতে পারে।

অতএব আর দেরি করা চলবে না। যা করবার আজকের রাত্রের মধ্যেই তা শেষ করে ফেলতে হবে। বেশ বোঝা যাচ্ছে, শিকার নিতাই সরকার। আর শিকারী দুজন —বিরিঞ্চি আর শ্রীমন্ত রায়। দেখা যাক—কে জেতে।

মুখের ভেতর দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠল বিরিঞ্চির। দুটো চোখ আগুনের দুটো গোলার মত ধ্বক্-ধ্বক্ করে জ্বলতে লাগল।

রাত অন্ধকার।

আকাশে মেঘ জমে আছে, তার তলায় ডুব দিয়ে তারাগুলো মিলিয়ে গেছে দৃষ্টির বাইরে। স্টেশনের আলোটা মিটমিট করে জ্বলছে, কিন্তু তাতে দু'হাত দূরের অন্ধকারও আলো হয়ে উঠছে না। আর ওপারের ঢালু বিলের বুক থেকে তেমনি শন-শন হাওয়া দিচ্ছে। সমস্ত পরিবেশটাই যেন কেমন অস্বস্তিকর আর অস্বাভাবিক।

একটু পরেই মেল ট্রেন আসবে। আশেপাশে দু-তিনটে পোস্ট-অফিস থেকে কতগুলো মেল-ব্যাগ এসে জমে আছে—সেগুলো তুলে দিয়ে নতুন ব্যাগ নামাতে হবে। রাতে আর রানার যাবে না, সেগুলো জমা থাকবে স্টেশনে—তারপর সকালে—

রহমান খেতে গেছে, বাইরে বসে আছে গিরিধারী। ঠিক কালকের রাতটার মত। গণেশবাবু ভাবছিলেন, এই শান্ত নির্বিরোধ স্টেশনটায় এই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কত কী ঘটে গেল! কালো হাত থেকে আরম্ভ করে গিরিধারীর এই দুর্গতি পর্যন্ত সবই একটা রহস্যের সূত্রে গাঁথা। গণেশবাবুর ভয় করছিল, কিন্তু সেইসঙ্গে এও মনে হচ্ছিল যে এর ভেতরে নিশ্চয় কোন লোকের শয়তানি আছে।

বিশেষ করে বিরিঞ্চি আর অনাদিকে তাঁর এতটুকু ভাল লাগছে না। বললে, ওরা নাকি 'আই-বি'র লোক। কিন্তু ভাব-ভঙ্গী দেখে গণেশবাবুর কেমন সন্দেহ জাগছে। ওদের ভঙ্গী ঠিক ভাল লোকের মতো নয়—কেমন যেন—

গণেশবাবু থানায় খবর পাঠাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বিরিঞ্চি তা হতে দেয়নি। বলছে যে, তাতে নাকি কাজের ক্ষতি হবে। কিন্তু পুলিশের লোকের কাজের কী ক্ষতি হবে তা গণেশবাবু বুঝতে পারলেন না। নাঃ—তিনি টেলিফোন করে সদর স্টেশনে

www.boiRboi.blogspot.com

খবর দেবেন, সেখান থেকে তারা যা খুশি করুক। শেষে একটা অঘটন ঘটলে তাঁর কাঁধের ওপর যে সমস্ত দায়িত্বটা এসে খাঁড়ার মত নেমে পড়বে তা তিনি কিছুতেই হতে দেবেন না। গোমেজের পাল্লায় পড়ে তাঁর সে শিক্ষা হয়ে গেছে।

ঢং করে সাড়ে নটা বাজল। আর সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকে ঝন-ঝন করে সাড়া উঠল টেলিফোন থেকে। নটা চল্লিশে ডাক-গাড়ি আসবে, তারই সূচনা।

স্টেশনে যাত্রী বেশি নেই—যে দু-চারজন আছে, তাদের আগেই টিকিট দেওয়া হয়ে গেছে। টেলিফোন ধরে খানিকক্ষণ সাঙ্কেতিক ভাষায় আলাপ করলেন গণেশবাবু। তারপর বললেন, ঘণ্টি লাগা গিরিধারী—সিগন্যাল দে। গাড়ি আসছে।

ঠিক আছে হুজুর—হাতের লাল-নীল লণ্ঠনটা তুলে নিয়ে গিরিধারী সিগন্যাল দিতে গেল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই অন্ধকারের ভেতর থেকে উড়ে এল আলোকের ঝড়। ডাক-গাড়ি এসে দু-মিনিটের জন্যে দম নিলে মানিকপুরে। খানিকক্ষণ হৈ-চৈ, যাত্রীদের ওঠা-নামা। এর মধ্যেই মেল-ব্যাগ নামানো হয়ে গেল।

স্টেশন যখন আবার নিঃসাড় আর নিঝুম হয়ে গেল, তখন রাত দশটা। সাড়ে দশটা থেকে রহমানের ডিউটি। এই আধঘণ্টা সময়টুকু ভালোয় ভালোয় কেটে গেলে হয়। মেলব্যাগগুলো ছোট একটা ঘরের ভেতর বন্ধ করে ভাল করে তালা-চাবি দিয়ে গণেশবাবু চেয়ারে এসে বসলেন, তারপর বিড়ি ধরালেন একটা।

হঠাৎ মনে পড়ল, এখানকার ব্যাপারটা সদরে জানানো দরকার।

গণেশবাবু টেলিফোনটা তুলে নিলেন।

আর সেই মুহূর্তেই পিস্তলের শব্দে স্টেশনটা থর্থর্ করে কেঁপে উঠল। গণেশবাবুর কাঁপা হাত থেকে রিসিভারটা ঠক করে টেবিলের ওপর পড়ে গেল।

টলতে টলতে ঘরের মধ্যে চলে এল গিরিধারী। ঘরের বড় আলোটায় গণেশবাবু যা দেখলেন তাতে তাঁর দম আটকে আসবার উপক্রম করল। গিরিধারীর বুকের বাঁ পাশ দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তার নীল উর্দি লাল হয়ে গেছে রক্তে। এক হাতে ক্ষত-চিহ্নটাকে চেপে ধরে গিরিধারী মেঝের ওপর পড়ে গেল।

অমানুষিক ভয়ে গণেশবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, গিরিধারী, একি! কিন্তু তাঁর কথাটাও শেষ হতে পেল না।

খোলা দরজার পথে দুটি মূর্তি এসে দেখা দিয়েছে। দুটি মূর্তি—পিশাচের মতো জ্বলছে তাদের চোখ। তাদের দুহাতে দুটি পিস্তল গণেশবাবুর বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে আছে, যেন এই মুহূর্তে তাঁকে গুলি করবে।

আর্তনাদ করে গণেশবাবু বললেন, বিরিঞ্চিবাবু, অনাদিবাবু! আপনারাই শেষে গিরিধারীকে—

—হ্যাঁ, আমরাই গিরিধারীকে খুন করেছি, দরকার হলে আপনাকেও খুন করব। —বাঘের মতো চাপা গলায় হিংস্র গর্জন করে বিরিঞ্চি জবাব দিলে।

গণেশবাবুর মুখ দিয়ে অব্যক্তভাবে বেরুল : কেন?

চুপ কোন কথা নয়! তোমাকে মেরে আমাদের লাভ নেই। তোমরা দুজন ছিলে—আমাদের কাজের অসুবিধে হতে পারত, তাই একটাকে নিকাশ করে দিয়েছি।

দুটো উদ্যত রিভলবারের মুখে দাঁড়িয়ে ঘামে গণেশবাবুর সর্বাঙ্গ ভিজে যেতে লাগল। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ড যেন পাথর হয়ে গেছে তাঁর।

—চাবি দাও শিগগির—অনাদি পাগলা শেয়ালের মত খেঁকিয়ে উঠল।

—কিসের চাবি—

—যে ঘরে ডাকের ব্যাগ রেখেছ সেই ঘরের।

গণেশবাবুর কথা কইবার শক্তি যেন লোপ পেয়েছে। তিনি শুধু নিঃশব্দে আঙুল বাড়িয়ে টেবিলের ওপরকার চাবির গোছাটা দেখিয়ে দিলেন।

অনাদির পিস্তলটা তেমনি গণেশবাবুর দিকে মুখ করে আছে, বিরিঞ্চি একটা থাবা দিয়ে চাবিগুলো তুলে নিলে। আতঙ্ক-বিহ্বল আচ্ছন্ন দৃষ্টির সাহায্যে গণেশ-বাবু স্পষ্টই দেখতে পেলেন, বুনো জানোয়ারের ক্ষুধিত মুখের মতো একটা উগ্র লোভ বিরিঞ্চি আর অনাদির চোখে-মুখে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

—কোন্ চাবি? শিগগির বলে দাও—আমাদের সময় নেই।

—ওই তো বড় পিতলেরটা।

—এইবারে হঠাৎ পিশাচের মতো হেসে উঠল বিরিঞ্চি। সেই হাসিতে অনাদিও যোগ দিলে—পাগলা শেয়ালের গোঙানির মতো সে টেনে টেনে হাসতে লাগল।

বিরিঞ্চি বললে, শোন গোবর-গণেশ, তোমাকে আমরা খুন করব।

—কেন? গণেশবাবু শেষ চেষ্টায় নিজেকে সংযত করলেন। বিপদের সময় অতি বড় কাপুরুষের বুকেও সাহস জেগে ওঠে, গণেশবাবুরও তাই হল।

গণেশবাবু বললেন, আমি চাবি তো দিয়েছি।

—কিন্তু তুমি আমাদের মুখ চেন।

—সে তো রহমান চেনে, রাম সিংও চেনে।

—সকলকেই সাবাড় করব—এবং আজ রাত্রেই করব।

যেটুকু শক্তি মনের মধ্যে জেগে উঠেছিল, সেটুকু লোপ পেয়ে গেল নিঃশেষে। এরা খুনে, এরা ডাকাত! গণেশবাবু কেঁদে উঠলেন: টাকা নিয়ে যাও, আমাকে বাঁচাও!

আবার অনাদি আর বিরিঞ্চি তেমনি অমানুষিকভাবে হাসতে শুরু করলে।

—বাঁচাতে পারতুম, কিন্তু উপায় নেই। তাহলে আমরাই বিপদে পড়ব।

—তোমরা আমাকে মারবেই?

—নিশ্চয়! রেডি হও। ইচ্ছে হলে শেষবারের মতো ভগবানকেও ডেকে নিতে পার।

গণেশবাবুর মনের সামনে ছবির মত ভেসে গেল তাঁর কলকাতার বাড়ি। বুড়ি মা, স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে। তারা যখন এই খবর পাবে—

শেষ চেষ্টায় গণেশবাবু বললেন, আমাকে বাঁচাও!

অনাদির হাতের পিস্তলটা কাঁপতে লাগল: অসম্ভব! ওয়ান—টু—

গণেশবাবু চোখ বুজলেন।

কিন্তু অনাদি থ্রি বলবার আগেই জানলা-পথে একটা বিদ্যুতের ঝলক। গুড়ুম করে পিস্তলের শব্দ—যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে অনাদি বসে পড়ল। তারপর আরো শব্দ—আরো, আরো। ঝন্‌ঝন্ করে ঘরের আলোটা ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, একটা সীমাহীন অন্ধকারে প্লাবিত হয়ে গেল সমস্ত। বাইরে থেকে উৎকট হাসির তরঙ্গ উঠল: হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—

অন্তিম চেষ্টায় প্রবল একটা চিৎকার করে গিরিধারীর রক্তাক্ত মৃতদেহের ওপরে গণেশবাবু মূর্ছিত হয়ে পড়লেন।

॥ ছয় ॥

বুকের ওপর গেঞ্জিটার গায়ে রক্তমাখা একটা হাতের ছাপ জ্বলজ্বল করছে।

নিতাই সরকার পাথরের মূর্তির মতো বসে রইল খানিকক্ষণ। ভাববার বা কথা বলার শক্তি তার একেবারে লোপ পেয়ে গেছে। মাথার ভেতরে কি একটা চাকার মতো ঘুরছে প্রচণ্ড বেগে, কানের কাছে ভোমরার ডাকের মতো নিরবচ্ছিন্নভাবে বোঁ-বোঁ করে শব্দ হচ্ছে। বাইরে বাতাসের গোঙানি চলেছে অশ্রান্তভাবে—যেন অশরীরী শ্রীমন্ত রায় আহত হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে। ঘরের ভেতরে ছোট আলোকটা জ্বলছে, কোন ক্রুদ্ধ ক্ষুব্ধ একচক্ষু দানবের চোখ থেকে যেন হিংসার আগুন পিছলে পড়ছে।

কতক্ষণ কেটে গেছে নিতাইয়ের খেয়াল ছিল না। হঠাৎ এক সময় সচেতন হয়ে সে আর্তনাদ করে উঠতে চাইল। কিন্তু গলা দিয়ে স্বর ফুটল না—কে যেন তার জিভটাকে গলার ভেতর দিয়ে একেবারে সোজা পেটের মাঝখানে টেনে নিয়ে গেছে।

শ্রীমন্ত রায়! শ্রীমন্ত রায় সত্যিই মরেনি! না—না, তা কী করে সম্ভব! তার হাতের ছোরা তো ব্যর্থ হয়নি! মনে পড়ছে কাশী মিত্র ঘাটের পাশে সেই নির্জন গলি আর শূন্য পাটগুদাম। বাইরে ঝাঁ-ঝাঁ রাত। গ্র্যান্ড রোড ঘুমিয়ে পড়েছে, গঙ্গার বুক থেকে কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না—শুধু দূর থেকে ভেসে আসছে একটা মাতালের চিৎকার আর মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক। একটা পেটা ঘড়িতে রাত দুটো বাজল।

শূন্য পাটগুদামের নির্জন তেতালা। বিদ্যুতের বাতি নেই, শুধু একটা লণ্ঠন মিটমিট করছিল। ঘরে ছিল তারা দুজন। কেশবদাস মাগনীরামের গদি থেকে লুট করে আনা পনেরো হাজার টাকার নোটের তাড়াটা তাদের সামনেই পড়েছিল। আধা-আধি ভাগ হবে। দুজনের চোখই লোভে জানোয়ারের মতো জ্বলছিল।

হঠাৎ নিতাই বলেছিল, ওই জানলাটা বন্ধ করে দাও ভাই শ্রীমন্ত। এত রাত্রে এখানে আলো দেখে কোন ব্যাটা পুলিশ যদি—

—ঠিক কথা।—শ্রীমন্ত উঠে পড়েছিল, বন্ধ করতে গিয়েছিল জানলা।

আর এই মুহূর্তের জন্যেই অপেক্ষা করছিল নিতাই। বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়িয়ে সে টেনে বার করেছিল একখানা ধারালো ছোরা, লণ্ঠনের আলোয় সেটা ক্ষুধার্ত বাঘের জিভের মতো লক্‌লক্ করে উঠেছিল। শ্রীমন্ত তখনো পেছন ফিরে আছে, ঘাসের ভেতরে লুকিয়ে-থাকা বিষধর গোখরো সাপের মতো যে বিপদ তার দিকে এগিয়ে আসছে তা কল্পনাও করতে পারেনি। চোখের পলকে নিতাই হাতখানাকে ওপরে তুলেছিল, বাঘের জিভটায় লেগেছিল একটা তীব্র ঝলক, তারপরেই সেটা সবেগে গিয়ে বিঁধেছিল শ্রীমন্ত রায়ের পিঠে।

—বিশ্বাসঘাতক—

কথাটা সম্পূর্ণও বেরুতে পারেনি শ্রীমন্ত রায়ের মুখ দিয়ে। টলতে টলতে সে মাটিতে উবুড় হয়ে পড়ে গিয়েছিল, ফোয়ারার মতো খানিক রক্ত উছলে এসে নিতাইয়ের জামায় ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু নিতাই আর এক মুহূর্ত দেরি করেনি। বিদ্যুতের মতো নোটের তাড়াটা পকেটে পুরে নিয়ে এবং ঘরের আলোটা নিবিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে দরজায় শিকল বন্ধ করে দিয়েছিল: পথে বেরিয়ে এসে সোজা গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গায়ের রক্তাক্ত জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল গঙ্গার খরধারার মধ্যে। তারপর—

www.boiRboi.blogspot.com

তারপর আজ সেই শ্রীমন্ত রায় ফিরে এসেছে!

অশরীরী! ভূত! কে জানে? নিতাই কিছু ভাবতেও পারছে না, বুঝতেও পারছে না। ছয় মাস আগে এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল, যার পর থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে যে মরবার পরেই শ্রীমন্ত রায় ফুরিয়ে যায়নি। দেহীই হোক আর অশরীরীই হোক, সে যে নিতাইকে খুঁজে বেড়াচ্ছে এ নিঃসন্দেহে সত্য, এবং একদিন সে যে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করবে, তাতেও কোন সংশয় তার নেই।

হ্যাঁ—এক বছর আগেকার ঘটনা। পটলডাঙার এক মেসবাড়িতে সে তখন আস্তানা নিয়েছিল। হঠাৎ নিশিরাতে ঘুম ভেঙে গিয়ে খোলা জানলায় তার চোখ পড়েছিল। রাস্তা থেকে অল্প অল্প গ্যাসের আলো আসছিল, সেই আলোয় দেখেছিল, ছায়ামূর্তির মতো একজন মানুষ ওখানে দাঁড়িয়ে।

আর এক লহমায় সে মানুষটাকে চিনতে পেরেছিল—আবছা আলোতে তার ভুল হয়নি একবিন্দু। সে আর কেউ নয়—শ্রীমন্ত রায়। নিজের চোখ দুটোকে ভাল করে বিশ্বাস করবার আগেই মূর্তিটা মিলিয়ে গিয়েছিল হাওয়ায়—মিলিয়ে গিয়েছিল ব্ল্যাক-আউটের কলকাতার রহস্যময় অন্ধকারে।

সেই থেকে একটা আশ্চর্য ভয় সঞ্চারিত হয়ে গেছে নিতাইয়ের চেতনায়। ভূতের ভয়, অশরীরীর ভয়। তারপরেই নিতাই কলকাতা ছেড়ে চলে এসেছিল। রাত্রির অন্ধকার এলেই তার শরীর ছম্‌ছম্‌ করে উঠত, ধম্‌ধম্‌ করে উঠত মন। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হত, গভীর রাত্রে তার ঘরের চারপাশে যেন শিকারী বিড়ালের মতো পা ফেলে শ্রীমন্ত রায় চলে বেড়াচ্ছে। তার সর্বাঙ্গ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে, তার চোখে দপ্‌ দপ্‌ করে জ্বলছে প্রতিহিংসার আগুন।

অবশেষে বিভীষিকা কিনা সত্যি-সত্যিই এসে দেখা দিল! বাইরে বাতাস গোঙাচ্ছে—অন্ধকার আমবাগান যেন আছাড়ি-পিছাড়ি করছে একটা প্রবল আক্রোশে। হঠাৎ ধড়াস করে একটা শব্দ হয়ে পেছনের জানলাটা খুলে গেল, ঘরের ভেতর ঢুকল একটা মাতাল বাতাস, আর—

আর সমস্ত ঘরটার মধ্যে ধুলোর ঘূর্ণির একটা পাক দিয়ে সেই বাতাস দপ্‌ করে আলোটাকে নিবিয়ে দিলে। মনে হল খোলা জানলার পথে শ্রীমন্ত রায় আবার এসে ঘরে ঢুকেছে।

এতক্ষণে—এইবার ঘর ফাটানো আর্ত একটা চিৎকার বেরুল নিতাইয়ের গলা দিয়ে। মুহূর্তে সমস্ত বাড়ি জেগে উঠল, হৈ-চৈ করে লোক ছুটে এল।

পরের দিনটা তার কি ভাবে যে কাটল সে-কথা ভগবানই বলতে পারেন।

গত রাত্রিতে এ কী ঘটল? এমন দুঃস্বপ্ন যে কখনো সম্ভব হতে পারে এ কথা কি সে কোনদিন কল্পনাই করতে পেরেছিল নাকি? কিন্তু তবুও তো এ সম্ভব হল! স্বপ্ন মনে করে একে উড়িয়ে দেওয়া চলবে না, বুকের ওপরে হাতের লাল ছাপখানাই তার প্রমাণ।

কী করবে সে? কী উপায় তার? পালিয়ে যাবে? কিন্তু পালিয়েই বা লাভ কী? যার দেহ আছে তাকে ফাঁকি দেওয়া চলে, কিন্তু অশরীরীর দৃষ্টিকে অতিক্রম করবার কোন উপায় নেই। যেখানেই যাও—ঠিক তোমাকে খুঁজে বার করবে, প্রতিশোধ নেবে। আকাশে-বাতাসে প্রেতাত্মার আগুন-ভরা রাশি-রাশি চোখ ভেসে বেড়াচ্ছে। অন্ধকারের আড়ালে আড়ালে ঘুরছে তার হিংস্র থাবা, তার রক্তাক্ত নখর।

সমস্ত দিন সে অসুস্থের মতো ঘরের মধ্যে পড়ে রইল। কানের কাছে ক্রমাগত বাজছে রাত্রির সেই ভবিষ্যদ্বাণী—তিনদিন মাত্র সময়। তার একটা দিন তো কেটে গেল। তারপর আর একদিন কাটবে, তারপরে আরো একটা দিন। নিতাই কিছুই করতে পারে না। কোন প্রতিকার করতে পারে না, শুধু একান্ত অসহায়ভাবে, একান্ত মূঢ়ের মতো একটা ভয়ঙ্কর বীভৎস পরিণামের জন্যে প্রতীক্ষা করে থাকবে।

উঃ, অসহ্য।

নিতাই যেন পাগল হয়ে যাবে! মাথার ভেতরে তার আগুনের একটা কুণ্ড যেন খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে। অন্যায় করেছিল সে—এই তার শাস্তি। অন্যায় কখনো ঢাকা থাকবে না, পাপ কখনো চাপা থাকবে না। অনেক টাকার মালিক হয়েছে সে—বড়লোক হয়েছে। কিন্তু শান্তি কই? সুখ কোথায়? শুধু এক শ্রীমন্ত রায়কেই তো ছোরা মারেনি। যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে সে ধান-চালের ব্লাক-মার্কেট করেছে। শুধু এক শ্রীমন্ত রায়ই নয়—দুর্ভিক্ষে যারা অনাহারে মরেছে, তারা সবাই কি এই সুযোগে তার ওপরে প্রতিশোধ নিতে আসবে?

মর্মান্তিক যন্ত্রণায় আর একটা দিন কেটে গেল। এইবারে ট্রেনের একখানা টিকিট কিনে সে দিল্লী-আগ্রা কোথাও চম্পট দেবে কি না ভাবছে, এমন সময় দারোগা সাহেব এসে উপস্থিত।

এত বন্ধুত্ব, এত খাতির, তবু নিতাইয়ের বুকটা হঠাৎ ধড়ফড় করে উঠল। আচমকা মনে হল, যেন সে যে শ্রীমন্ত রায়কে খুন করেছে এ খবরটা জানাজানি হয়ে গেছে পৃথিবীর সব জায়গায়। আর সেই অপরাধে দারোগাসাহেব তাকে গ্রেপ্তার করতে এসেছেন।

নিতাই চমকে উঠে দাঁড়াল। হাত থেকে হুঁকোটা ঠকাস করে পড়ে গেল মাটিতে। দারোগা হো হো করে হেসে উঠলেন।

—তোমার হল কী সরকার? এমন আঁতকে উঠলে কেন?

নিজেকে সামলে নিয়ে নিতাই বললে, না, কিছু হয়নি তো?

—তবে অমন ভয় পেলে কেন?

—না—না—ভয় পাইনি। কিন্তু এই সাত-সকালে অমন ধরাচুড়ো পরে কোথায় চললেন দারোগাসাহেব!

—শোননি কিছু? মানিকপুর স্টেশনে কাল রাত্রে ভয়ঙ্কর কাণ্ড হয়ে গেছে যে!

নিতাইয়ের মাথার মধ্যে রক্ত চলকে গেল।

—কী হয়েছে মানিকপুরে?

—খুন! পয়েন্টস্‌ম্যানকে খুন করে দুজন ভদ্র ডাকাত স্টেশনের মেল-ব্যাগ লুট করতে চেয়েছিল। স্টেশনমাস্টার গণেশবাবুকেও তারা খুন করতে যাচ্ছিল—এমন সময় বাইরে থেকে কে পিস্তলের গুলি ছুঁড়ে একজন ডাকাতকে আহত করে। ডাকাত দুটো পালিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য, যে গুলি ছুঁড়ে ডাকাত তাড়াল, তার কোন সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

—কী ভয়ানক!

—হ্যাঁ, ভয়ানক ব্যাপার বৈকি! শুনে তো আমারই হাত-পা পেটের ভেতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে! আছি বাবা ধাধোড়ে গোবিন্দপুরের এক জঙ্গলের ভেতর পড়ে, এখানে ও-সব বোমা-পিস্তলের কারবার কেন? সিধে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করুক, লাঠি-পেটা করে দু-একটার মাথা ভাঙুক, গ্রামকে গ্রাম ধরে চালান করে দিই সদরে।

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু এ সব কী রে বাপ্‌!

পিস্তল! ভদ্র ডাকাত!—নিতাইয়ের সমস্ত মুখটা ছাইয়ের মতো বিবর্ণ হয়ে গেল। এই ঘটনাটা যেন বিচ্ছিন্ন একটা আকস্মিক ব্যাপার নয়। আচমকা তার মনে হল যেন এর সঙ্গে কোন একটা অলক্ষ্য সূত্রে তার ভাগ্যটাও জড়িয়ে আছে।

দারোগা বললেন, আরে সেই তো বলছি। এর ভেতরে মস্ত একটা রহস্য আছে, বিস্তর ঘোরপ্যাঁচ আছে। এ নিয়ে ধস্তাধস্তি করা আমাদের মতো পুঁটিমাছ দারোগার কর্ম নয় বাবা! সিঁধেল চোর দু-চারটে ধরতে পারি, দাগীকে এনে ঠ্যাঙানি লাগাতে পারি; অর্থাৎ সেরেফ খাই-দাই আর কাঁশি বাজাই। জয়ঢাক বাজাতে হলে কেমন করে ঠ্যালা সামলাই!

হঠাৎ নিতাই চুপ করে রইল।

একটা বিড়ি ধরিয়ে দারোগা বললেন, যাচ্ছি তো এন্‌কোয়ারিতে। ওখান থেকে সোজা সদরে চিঠি লিখব: দু-চারটে ডিটেকটিভ-ফিভ পাঠিয়ে দাও। এসব ভদ্র ডাকাতের ব্যাপারে ইয়াসিন মিঞা নেই। শেষকালে রাত-বেরেতে দু-চারটে পিস্তলের গুলি মেরে দিলে কোন্ আফাজুদ্দিন চাচা আমাকে বাঁচাতে আসবে!

ঘোড়া ছুটিয়ে দারোগা চলে গেলেন। যাবার আগে বলে গেলেন, তুমিও সাবধান হয়ে থেকো সরকার—লক্ষণ আমার ভাল ঠেকছে না।

—অ্যাঁ—অ্যাঁ—আমি! আমি কেন?

দারোগা ঘোড়া থামালেন। ভয়ানক একটা গুরুগম্ভীর চেহারা করে তাকালেন নিতাইয়ের দিকে।

—বিশ্বাস কী! তুমি তো অনেক টাকা করেছ—বাজারে জোর গুজব। ভদ্র ডাকাতেরা একবার তোমার ঘরে যদি হানা দেবার চেষ্টা করে তাতে অন্যায়টা কোথায় আছে!

নিতাইয়ের পিলে-যকৃতে ভূমিকম্প জাগিয়ে হিতৈষী ইয়াসিন দারোগা প্রস্থান করলেন।

নিতাই সরকার উঠে দাঁড়াল। কী করবে কিছু বুঝতে পারছে না। হাতে আর একদিন মাত্র সময়। অশরীরী শ্রীমন্ত রায়ের আগুন-ভরা চোখ থেকে কোনখানে সে নিস্তার পাবে না। বুকের গেঞ্জিতে রক্তরাঙা হাতের ছাপ তার ভয়ঙ্কর পরোয়ানা জানিয়ে গেছে।

—রাধেকৃষ্ণ—

নিতাই চমকে উঠল। সামনে একজন বুড়ো বৈরাগী এসে দাঁড়িয়েছে। একটা গোপীযন্ত্র বাজাচ্ছে টং টং করে। বলছে: হরেকৃষ্ণ—দুটি ভিক্ষে পাই?

নিতাইয়ের সমস্ত রাগ নিরীহ বৈরাগীটার ওপরে গিয়েই ফেটে পড়ল। জানোয়ারের মতো দাঁত খিঁচিয়ে বললে, হ্যা-রা কৃষ্ণ! ভিক্ষে করতে এসেছে! যাও, ভাগো এখান থেকে! বোষ্টম না আরো কিছু, যত [redacted] জোচ্চোর!

—তোমার এত টাকা, গরিব বোষ্টমকে তাড়িয়ে দিচ্ছ বাবা?

—আমার এত টাকা! কে তোমাকে খবরটা দিলে হ্যা? ইয়ার্কি পেয়েছো, মামা-বাড়ির আবদার, না? যাও, নিকালো হিঁয়াসে!—রাগের চোটে নিতাইয়ের মুখ দিয়ে হিন্দি বেরুতে লাগল: নেহি যায়গা তো এক ঘুষি দেকে মুন্ডু উড়ায়ে দেগা!

পাকা দাড়ির আড়ালে বুড়ো বৈরাগীর চোখ একবার ধক্ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেল। বৈরাগী বললে, আচ্ছা বাবা চলে যাচ্ছি, বুড়ো মানুষকে ঘুষি মেরে তোমায় আর বীরত্ব দেখাতে হবে না। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। হরেকৃষ্ণ!

www.boiRboi.blogspot.com

টং টং করে গোপীযন্ত্র বাজিয়ে বৈরাগী দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে গেল।

আর বৈরাগী চলে যাওয়ার পরেই একটা আশ্চর্য ব্যাপার চোখে পড়ল নিতাইয়ের। সামনে ঘাসের ওপরে একখানা নীল রঙের খাম পড়ে আছে।

ক্ষিপ্র হাতে খামটা তুলে নিতেই তার ভেতর থেকে একটুকরো চিঠি বেরিয়ে পড়ল। রুদ্ধশ্বাসে চিঠিটা পড়ে গেল নিতাই:

'তোমার বিপদের কথা আমরা জানি। কোন ভয় নাই। শ্রীমন্ত রায়ের প্রেতাত্মার হাত হইতে যদি রক্ষা পাইতে চাহ, তাহা হইলে এই চিঠির আদেশ পালন করিও। আজ সন্ধ্যার পরে নীলকুঠির জঙ্গলে আসিও—একা। কোন ভয় করিও না—তোমার সমস্ত বিপদের যাহাতে অবসান হয় সেই পথ তোমাকে বাতলাইয়া দিব। যদি অবহেলা করিয়া না আস, তাহা হইলে জানিও যে ভয়ঙ্কর দুর্ভাগ্য তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে, তাহা হইতে কেহ তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না। ইতি—

'তোমার বন্ধু।'

॥ সাত ॥

ব্যাপার দেখে ইয়াসিন দারোগা খানিকক্ষণ হাঁ করে রইলেন। খুনী আর দাগী নিয়ে কারবার করেছেন বিস্তর, কিন্তু এমন অভিজ্ঞতা জীবনে বিশেষ ঘটেনি। একে অজ পাড়া-গাঁ, এই ছোট স্টেশন—বিহারের একটা নিরিবিলি অঞ্চল। এখানেও যে এমন সব ঘটনা ঘটতে পারে, এ কি কল্পনাও করা যায় কখনো? জার্মান-যুদ্ধের চাইতেও এ ভয়ানক—জাপানী বোমার চাইতেও এ যে মারাত্মক!

অফিস ঘরের মেঝেতে তেমনি পড়ে আছে গিরিধারীর লাসটা। গলা আর বুকের ভেতর দিয়ে দু-দুটো পিস্তলের গুলি পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে গিয়েছে। খুব কাছে থেকেই গুলি করা হয়েছিল। নীল উর্দি রক্তে একেবারে ভিজে গেছে। মেঝের ওপর দিয়ে অনেকটা গড়িয়ে গেছে রক্ত—শুকিয়ে গিয়ে সে-রক্ত আঠার মতো কালো হয়ে আছে। দেওয়ালের গায়েও সে-রক্তের ছিটে। গিরিধারীর পর্দা-পড়া নিষ্পলক হলদে চোখ দুটো তখনো ভয়ে আর বিস্ময়ে অস্বাভাবিকভাবে বিস্ফারিত হয়ে আছে, যেন ব্যাপারটা কী ঘটেছে ভাল করে বোঝবার আগেই মৃত্যু তার প্রেতছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে তার চেতনার ওপরে।

একপাশে টেলিফোনের রিসিভারটা ঝুলে পড়েছে টেবিল থেকে নিচেতে। একটা গুলি তার মাউথপিসে লেগেছিল—খানিকটা উড়ে গেছে তার থেকে। শক্ত দেয়ালের গা থেকে খানিকটা চুন-সুরকি ঝরিয়ে দিয়ে একটা কালো বুলেট প্রায় এক ইঞ্চি ভেতরে ঢুকে শক্ত হয়ে আটকে বসেছে—যেন একটা বড় পেরেককে জোরে ঠুকে ওখানে বসিয়ে দিয়েছে কেউ। ঘরটার দিকে একবার তাকালেই বুঝতে পারা যায় কাল রাত্রে কী ভয়ঙ্কর প্রলয় কান্ড ঘটে গিয়েছে ওখানে—বয়ে গেছে কী ভয়ঙ্কর একটা দুর্যোগ!

অনেকক্ষণ কোন কথা বলতে পারলেন না ইয়াসিন দারোগা। সামনে গিরিধারীর দেহটা একটা পৈশাচিক বিভীষিকার মতো পড়ে রয়েছে। হঠাৎ চোখে পড়ল, দেওয়ালের কোণ ঘেঁষে ছোট গোলমতো কি একটা পড়ে আছে।

দারোগা লাফিয়ে উঠে ওটাকে তুলে আনলেন। একটা পিস্তলের খালি কার্তুজ।

সেটাকে মন দিয়ে নাড়াচাড়া করে তিনি বললেন, হুঁ!

অর্থাৎ যেন মস্ত একটা সমস্যার সমাধান তিনি চোখের সামনে দেখতে পেয়েছেন। এর পরে চটপট আসামীদের ধরে ফেলতে তাঁর কোন অসুবিধেই ঘটবে না।

খানিকটা ধাতস্থ হয়ে ইয়াসিন দারোগা একটা বিড়ি ধরালেন। আর যাই হোক, দিনের বেলা। চারিদিকে ঝকঝক করছে রোদ। স্টেশন ভরা লোক। একটা বিচিত্র ঘটনার গন্ধ পেয়ে আশপাশ থেকে কিছু কৌতূহলী লোকও এসে জড়ো হয়েছে। রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে সঙ্গে তার অজানা ভয় আর আশ্চর্য বিভীষিকাটাও মিলিয়ে গিয়েছে। এখন কোন আনাচ-কানাচ থেকে একটা বেখাপ্পা পিস্তলের গুলি এসে তাঁর টুঁপিটাকে উড়িয়ে দিতে পারবে না—এ সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত আর নিশ্চিন্ত বোধ করলেন ইয়াসিন দারোগা।

অতএব এবার নিশ্চিন্ত চিত্তে কর্তব্য পালনে মনোযোগী হওয়া যায়।

তাঁর মতো একটা ভারিক্কি দারোগার যে রকম পদমর্যাদা থাকা উচিত, সেইরকম চোখমুখের একটা ভয়ঙ্কর ভঙ্গি করে তিনি বিড়ির ধোঁয়া ছাড়লেন। জিজ্ঞাসা করলেন, তারপর—শহরে খবর দিয়েছেন নিশ্চয়?

একটা চেয়ারে বিহ্বলের মতো বসে ছিলেন গণেশবাবু। তাঁর কপালে একটি পটি বাঁধা, কেমন করে যেন কেটে রক্ত বেরিয়েছিল ওখান থেকে। অন্ধকার ঘরের ভেতর যে-সব ধস্তাধস্তি ঘটেছিল—তার ফলেই ওটা হয়ে থাকবে বোধহয়।

গণেশবাবু সেই রাত থেকে দারুভূত মুরারির মতো ঠায় বসে আছেন। ভয়ে আতঙ্কে আর ঘটনার অস্বাভাবিক আকস্মিকতায় তাঁর কথাই বন্ধ হয়ে গেছে তখন থেকে। ইয়াসিন দারোগার কথায় শুধু তাঁর ঠোঁটটা একবার নড়ে উঠল। তিনি কি একটা বলবার চেষ্টা করলেন, বলতে পারলেন না।

জবাব দিলে এ-এস-এম রহমান।

—হ্যাঁ স্যার, টেলিফোন করেছি।

—কোন খবর এল?

—হ্যাঁ, খবর পাঠিয়েছে। বারোটার ট্রেনে লোক আসছে।

—যাক—বাঁচা গেল। ইয়াসিন দারোগা দায়মুক্ত। তবু যতটা পারা যায় নিজের কর্মক্ষমতার পরিচয়টা এই ফাঁকে দিয়ে দেওয়া দরকার।

—তা বেশ। ওরা এলে ভালোই হবে। কিন্তু এ সামান্য ব্যাপার—আমিই এর কিনারা করতে পারতাম। কত খুন-জখম জল করে ফেলল এই ইয়াসিন দারোগা—কত ফেরারীকে ধরে চালান করে দিলে, আর এ তো—হুঁ!—

গলার স্বরে উচ্ছ্বসিত গর্ব আর গৌরব ফুটে বেরুল।

রহমান বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ—স্যার।

ইয়াসিন খুশি হয়ে গর্বভরে পা নাচাতে লাগলেন।

রহমান জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারটা আপনার কী মনে হয় স্যার?

দারোগা অত্যন্ত বিচক্ষণের মতো একবার ডাইনে আর একবার বাঁয়ে হেলালেন ঘাড়টা। মুখের ওপর মুরুব্বিয়ানার একটা গুরু-গম্ভীর ছায়া পড়ল: আমার তো মনে হয় এ একেবারে জলের মতো পরিষ্কার কেস। আসামীকে আমি চোখের সামনেই দেখতে পাচ্ছি—ইচ্ছে করলেই অ্যারেস্ট করতে পারি। কিন্তু শহরের কর্তাদের কেরামতিই এবারে দেখা যাক। তারপরে যা করবার আমি করব।

—আচ্ছা স্যার—একবার কেশে নিয়ে রহমান জিজ্ঞাসা করলে: দুজন লোক ডাকাতি করবার জন্যে এসেছিল এ তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তাদের গুলি করে

তাড়ালেই বা কে, আর অমন করে হাসলেই বা কেন? তাছাড়া কালো হাতখানা বা কার? আর তাছাড়া ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা গড়িয়ে দেওয়া—

ইয়াসিন দারোগা একেবারে দস্তুরমতো বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

—আরে মশাই, আপনি তো আচ্ছা লোক? বলি, দারোগা কে? আপনি না আমি?

রহমান সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে গেল: আজ্ঞে আপনি।

—তবে?

উত্তরে কী বলা যায় রহমান ভেবে পেল না।

—দারোগা না হলে কি বোঝা যায় মশাই? রেল-কোম্পানির ঘণ্টা বাজিয়ে আর মালগাড়ির হিসেব নিয়ে কি পুলিশের ব্যাপার বুঝতে পারা যায়? এর জন্যে আলাদা মগজ চাই—হুঁহুঁ! সরকার আমাদের মুখ দেখে বহাল করেনি, বুঝলেন? ভেতরে অনেক বস্তু আছে বলেই একটা থানার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা করে দিয়েছে। মানেন কি না?

—আজ্ঞে মানি বৈকি!

—তাহলে? তাহলে এতো সহজেই বুঝতে চাইছেন কেন সব? ধৈর্য ধরে থাকুন, সময়ে সব জানতে পারবেন।

ঘরের সবাই একেবারে চুপ মেরে রইল।

দারোগা একখানা খাতা বার করলেন। বললেন, এনকোয়ারি-রিপোর্টটা তৈরি করে ফেলা যাক। খুন-জখম, পিস্তলের কাণ্ড—গুরুতর ব্যাপার! আপনারা যে যা জানেন সব ঠিক করে বলবেন। যদি সত্যি কথা একবিন্দু গোপন করেন তাহলে সকলকে জেলে যেতে হবে—মনে থাকে যেন!

—আজ্ঞে মনে থাকবে বৈকি।

মহা আড়ম্বরে দারোগা সাক্ষ্য নিতে বসলেন। এক ঘণ্টার মধ্যে তিনবার চা এল, দুটো ডাব এল। সেইসঙ্গে যেমন তর্জন, তেমনি গর্জন। ভাব দেখে মনে হল হাতের কাছে আসামীকে না পেলে তিনি এঁদের ফাঁসিকাঠে নিয়ে লটকে দেবেন। গণেশবাবু একেই হতভম্ব হয়ে বসে ছিলেন, দারোগার ধমক-ধামকে তাঁর প্রায় হার্টফেল করবার উপক্রম হল।

রিপোর্ট লেখা হল।

চতুর্থ পেয়ালা চা আর তিন নম্বর ডাব নিঃশেষ করে ইয়াসিন দারোগা উঠতে যাবেন, এমন সময় ঘরে ঢুকল স্টেশনের ঝাড়ুদার রামগিন্ধড়। দারোগাকে সেলাম দিয়ে বললে, হুজুর, আপ্‌কা চিঠ্‌ঠি!

—আমার চিঠি? সবিস্ময়ে দারোগা বললেন, আমার চিঠি? কোত্থেকে এল?

—একঠো বাবু দিয়া। মাস্টারবাবু, আপ্‌কো ভি একঠো দিয়া।

—কোন্ বাবু?

—মালুম নেহি। একঠো গোরা বাবু, নয়া আদমি কোই হোগা।

কী ব্যাপার! কথা নেই বার্তা নেই, কোত্থেকে এক নতুন বাবু এসে স্টেশন-মাস্টার আর দারোগাকে চিঠি দিয়ে গেল!

ক্ষিপ্রগতিতে খাম ছিঁড়তে ছিঁড়তে দারোগাবাবু বলল, কিধার হ্যায় বাবু?

—চলা গিয়া।

—বটে!

খাম খুলে দুজনেই চিঠি বার করলেন। আর চিঠি পড়বামাত্র দুজনেরই মুখের

www.boiRboi.blogspot.com

ভাব এক রকম হয়ে গেল—মড়ার মতো বিবর্ণ আর পাণ্ডাশে।

দারোগার চিঠিতে লেখা ছিল সংক্ষেপে মাত্র এই ক'টি কথা :

'বেশি চালিয়াতি না করে বাড়ি যাও—নইলে বেঘোরে মারা পড়বে।—হিতৈষী।'

আর গণেশবাবুর চিঠিতে লেখা ছিল :

'মাস্টারমশাই, অন্ধকার রাত্রে আমায় পথ দেখিয়ে দিয়েছিলেন—আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আপনি ভাল এবং নিরীহ লোক। তাই কাল রাত্রে আমি সামান্য কিছু কর্তব্য করে আপনাকে রক্ষা করেছি। আজ এই পর্যন্ত।—কালো হাত।'

॥ আট ॥

নীলকুঠির জঙ্গল।

আগে জঙ্গল ছিল না, পাশ দিয়ে যে মরা নদীটা বালির মধ্যে লুকিয়ে গিয়েছে, ওরও অবস্থা ছিল এরকম—দূরের মহানন্দা তখন কানায় কানায় ঘোলা জল নিয়ে ঘূর্ণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বয়ে যেত, আর তারই জলে ছায়া ফেলত নীলকুঠির ব্যারাকের মতো সমকোণের ধরনে গড়া মস্ত বাড়িটা।

আশেপাশের দশখানা গ্রামে সাহেবরা জোর করে নীলের চাষ করাতো, বুকের রক্ত আর চোখের জলে মাটি ভিজিয়ে চাষারা ফলাতো সেই সর্বনেশে ফসল। পেটের ভাত জুটত না—জুটত সাহেবের লাথি আর চাবুক। যারা অস্বীকার করত, সাহেবরা তাদের ধরে নিয়ে গিয়ে গুম্ করে ফেলত, পৃথিবীতে কেউ আর কোনদিন তাদের দেখতে পেত না। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া হত, আত্মীয়-স্বজনেরা ত্রাহি-ত্রাহি করে যেদিকে পারে পালিয়ে বাঁচত।

তারপর এল প্রজা-বিদ্রোহ। অত্যাচারে জর্জরিত মানুষগুলো মাথা তুলে দাঁড়াল। যবনিকা পড়ল নীলকরদের ভয়াবহ অত্যাচারের ওপরে। নীলকুঠি খালি হয়ে গেল।

নীলকুঠি খালি হল বটে, কিন্তু তবু মানুষ সহজে সেদিকে আসতে পারত না। সকলের মনের ভেতর জায়গা করে নিয়েছিল একটা বিচিত্র ভয়, একটা আশ্চর্য আতঙ্ক। দুপুরের বাতাসে ওই বাড়িটার দিক থেকে যেন কাদের দীর্ঘশ্বাস হু-হু করে ভেসে আসত, মনে হত রাত্রের অন্ধকারে কারা যেন ওখানে গুমরে গুমরে কাঁদছে। লোকে ভয়ে ওদিকে হাঁটাই ছেড়ে দিল।

চলতে লাগল সময়ের স্রোত।

পাশের নদীটা আস্তে আস্তে মরে গেল—একটা বিকট ভয়ের মূর্তি নিয়ে নীলকুঠির জঙ্গল নিমগ্ন হয়ে রইল। মাঝে মাঝে জ্যোৎস্না রাত্রে নাকি দেখা যায়, কারা যেন ঘোড়া ছুটিয়ে ওই জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তারা মানুষ নয়—মানুষের ছায়ামূর্তি। কত লোক যে ওখানে ভয় পেয়েছে তার আর সীমাসংখ্যা নেই।

মাঝরাত্তিরে ওই জঙ্গলে যেতে হবে নিতাই সরকারকে! তাও আবার একা! এমন কথা কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে নাকি কেউ?

সারাটা দিন নিতাই ঘরের মধ্যে আফিংখোরের মতো বসে বসে ঝিমোতে লাগল। কী যে হবে বুঝতে পারছে না। ওদিকে শরীরী হোক আর অশরীরী হোক, রাত্রে শ্রীমন্ত রায়ের সেই বিভীষিকা তাকে মাত্র তিন দিনের সময় দিয়ে গেছে—আজকে শেষ রাত্রি। কালকে যে তার অদৃষ্টে কী ঘটবে এক ভগবানই বলতে পারে সে কথা।

কিন্তু এই বন্ধুটি কে? শ্রীমন্ত রায়ের কথাই বা জানবে কী করে? মানিকপুর

www.boiRboi.blogspot.com

স্টেশনে যে ঘটনাগুলো ঘটে গেল তারই বা অর্থ কী? সবকিছু একসঙ্গে মিলিয়ে সে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিল।

পালিয়ে যাবে? পালিয়ে যাবে এখান থেকে? কিন্তু কোথায়? যে অশরীরী, তার হাত থেকে কোথাও কি নিস্তার আছে? তার চাইতে বন্ধুর উপদেশটাই কানে তোলা যাক। দেখা যাক—যদি কিছু হয়।

রাত এগারোটা। শুক্লা তৃতীয়ার চাঁদ বনের আড়ালে অস্ত গেছে। চারদিক থমথমে অন্ধকার। আকাশে যে নক্ষত্রগুলো জ্বলছিল তারাও যেন কী-একটা ভয়ে আড়ষ্ট আর পাণ্ডুর হয়ে গেছে। দূরের মাঠে আলেয়ার আগুন থেকে-থেকে স্কন্ধ-কাটার রাক্ষুসে হাসির মতো দপ-দপ করে উঠছিল—আর কোথায় যেন ককিয়ে ককিয়ে কাঁদছিল একটা কুকুর। অমন করে কুকুর কাঁদলে নাকি গৃহস্থের অমঙ্গল হয়।

নানা দুশ্চিন্তায় নিতাই এতক্ষণে যেন বেপরোয়া হয়ে গেছে। যা হওয়ার তা হোক, ব্যাপারটার একটা শেষ দেখবে সে। এমনিও ডুবছে, অমনিও ডুবছে—কাজেই যা-হয় একটা হেস্তনেস্ত করে নিতেই হবে।

কাপুরুষ সে নয়। কোন কিছুকেই সে ভয় করে না, খুনখারাপিতে সে ভয় পায় না। তা যদি পেত তাহলে শ্রীমন্ত রায়ের পিঠে অমন করে ছোরা বিঁধিয়ে সে টাকা-গুলো নিয়ে সরে পড়তে পারত না। ভয় তার মানুষকে নয়—অপদেবতাকে; শ্রীমন্ত রায়কে নয়—তার প্রেতাত্মাকে। মানুষের সঙ্গে একহাত মহড়া সে নিতে পারে, কিন্তু ভূতের সঙ্গে লড়াই করবে কেমন করে?

কিন্তু এখন মনে হচ্ছে শ্রীমন্ত রায় মরেনি। যদি না-মরে থাকে, তাহলে তাকে আর ভয় কিসের? তার সঙ্গে যদি চালাকি করতে আসে তাহলে সেও দেখে নেবে—সহজে ছাড়বে না। হিংস্র উত্তেজনায় নিতাইয়ের দাঁত কড়মড় করে বেজে উঠল।

কাঠের একটা পুরোনো বাক্সের ভেতর থেকে নিতাই একটা রিভলবার বের করে আনল। দোনলা বন্দুকের কাজ নয়। রিভলবারের লাইসেন্স তার নেই, এটা বেআইনী অস্ত্র। দরকার হতে পারে বলে এটাকে সে কাছে রেখেছে। রিভলবারের পাঁচটা ঘরে সে কার্তুজ ভরে নিল, সঙ্গে নিল আরো কিছু বাড়তি কার্তুজ আর তিন শেল-এর একটা টর্চ। তারপর ঘাড়ে মাথায় একটা কালো রুমাল জড়িয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল।

বুকটা ঢিপ্-ঢিপ্ করছিল—কিন্তু নিতাই সংযত করল নিজেকে। নাঃ, ভয় পেলে তার চলবে না, ঘাবড়ে গেলে সব মাটি হয়ে যাবে। হয় শ্রীমন্ত রায়ের আজ একদিন, অথবা তার শেষ। এস্পার কিংবা ওস্পার।

কিন্তু এই বন্ধুটি কে?

সবই রহস্যময়। তবু দেখা যাক। হাতের মধ্যে রিভলবারটা শক্ত করে বাগিয়ে ধরে সে এগুতে লাগল।

অন্ধকার, নির্জন গ্রামের পথ। চারদিক থমথম করছে, পাতাটি কোথাও নড়ছে না। শুধু আকাশের তারাগুলো যেন হিংস্রভাবে জ্বলছে, আর দূরে দূরে জ্বলছে আলেয়া। একটা কুকুর তাকে দেখে খেঁকিয়ে উঠল।—নিতাই ভ্রূক্ষেপ না করে এগিয়ে চলল।

কিন্তু সে যে টের পায়নি—অন্ধকারের ভেতরে একটি ছায়ামূর্তি তাকে নিঃশব্দে অনুসরণ করে আসছে। সে থামলে থামছে, এগুলে এগুচ্ছে। সে মূর্তির মুখ মানুষের নয়—নরকঙ্কালের। তার অস্থিময় মুখের কোটরের ভেতরে দুটো চোখ আগুনের হলকার মত ঝিলিক দিচ্ছে। তার হাত মানুষের হাত নয়—সে-হাত

গরিলার হাতের মতো বড়,—এক ইঞ্চি পরিমাণ ধারালো বড় বড় তার নখ, আর কুচ-কুচে কালো সেই হাতখানা টকটকে রক্তে রাঙানো।

॥ নয় ॥

নীলকুঠির জঙ্গল।

নীলকুঠির ভুতুড়ে বাড়িটা ভেঙেচুরে শেষ হয়ে গেছে। বেশির ভাগ ঘরেরই দেওয়াল আছে, ছাত নেই। দরজা জানলাগুলো ভেঙে কবে যে ধুলোয় মিশে গেছে কেউ তা বলতে পারে না। বাড়িটার এখানে-ওখানে সর্বত্র শিকড় জেগেছে, মাথা তুলেছে ছোট-বড় অশ্বত্থ গাছের সারি। কালো অন্ধকারে ঢাকা সেইসব অশ্বত্থের থেকে মাঝে মাঝে একটা কালপ্যাঁচা ভুতুড়ে গলায় 'ধু-ধু-ধু-ম' শব্দ করে ডেকে উঠছে।

এই বাড়ির একটা ভাঙা ঘরের ভেতরে একটা মোমবাতির আলো মিটমিট করে জ্বলছে। দেওয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিরিঞ্চি তার হাতে একখানা ধারালো ছোরার আঠারো ইঞ্চি ফলা মোমবাতির আলোয় রাক্ষসের জিভের মতো লক্‌লক্ করছে। মেঝেতে শুয়ে আছে অনাদি—তার একটা পায়ে ময়লা ন্যাকড়ার ব্যাণ্ডেজ বাঁধা, তা থেকে চুইয়ে চুইয়ে তখনো রক্ত পড়ছে। দুটো হাত শক্ত করে বাঁধা অনাদির —চোখ দুটো ভয়ে যেন কোটর থেকে ছিটকে বেরিয়ে আসছে।

কাতর অসহায় কণ্ঠে অনাদি বললে, আমাকে মেরো না!

বিরিঞ্চি হেসে উঠল। জোরে নয়—চাপা, নিষ্ঠুর তার হাসি। তারপর অনাদির কথার জবাব না দিয়ে আঙুলের মাথায় ছোরাটার ধার পরীক্ষা করতে লাগল। এক ঘায়ে একেবারে এফোঁড় ওফোঁড় করে দেওয়া যাবে কি না সেটাই দেখছে।

অনাদি আবার কাতর স্বরে বললে, কেন আমাকে মারবে? আমি কী করেছি?

—তোমাকে না মারলে আমার উপায় নেই।

—কেন?

—তোমার পায়ে চোট লেগেছে—শ্রীমন্ত রায়ের গুলি উরুর ভেতর দিয়ে বেরিয়ে গেছে। তুমি পালাতে পারবে না—ধরা পড়বেই। তারপর তোমার দৌলতে আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে। কাজেই আগেভাগে নিশ্চিন্ত হতে চাই।

—মিথ্যাবাদী, শয়তান!—অনাদি গর্জে উঠল : তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি। নিতাই সরকারের কাছ থেকে যে-টাকা আদায় করবে ভেবেছ তার ভাগ আমাকে দিতে চাও না। তাই তোমার এইসব ছুতো! শ্রীমন্ত রায়ের গুলি না লাগলেও তুমি আমাকে খুন করতে!

—তা করতাম—নির্বিকার নিরাসক্ত গলায় বিরিঞ্চি জবাব দিল।

—এই তোমার বন্ধুত্ব?

—শয়তানে শয়তানে বন্ধুত্ব এইরকমই হয় বন্ধু—আবার হিংস্র চাপা গলায় বিরিঞ্চি হেসে উঠল : স্বার্থসিদ্ধি হলে সবটা একা গ্রাস করবার জন্যে হয় তুমি আমায় খুন করবে, নইলে আমি তোমায় খুন করব। ভাগ্যবলে চান্সটা আমি পেয়েছি —ছাড়ব কেন?

—রাক্ষস, শয়তান—অনাদি আর্তনাদ করে উঠল।

—যা খুশি বলতে পার, নির্বিকারভাবেই বিরিঞ্চি জবাব দিল—মেল-ট্রেনের

টাকাগুলো বাগানোর চেষ্টা বৃথা হয়ে গেল—বাগড়া দিল শ্রীমন্ত রায়। নিতাইয়ের কাছ থেকে যা পাওয়া যাবে, তাতে আমার নিজেরই কুলোবে না। কাজেই তোমাকে আর ভাগিদার রাখতে চাই না। এবার শ্রীমন্ত আর নিতাইকে কাবার করতে পারলেই আমার পথ পরিষ্কার।

অনাদি আবার বলল, শয়তান, বিশ্বাসঘাতক!

—বড্ড গালাগাল দিচ্ছ, আর বেশিক্ষণ তোমার বাঁচা উচিত নয়। রেডি হও। ওয়ান—টু—

ছুরি হাতে বিরিঞ্চি এগুতে লাগল।

বিস্ফারিত ভীত চোখে অনাদি পালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু কিছুতেই উঠতে পারল না।

—আমাকে মেরো না, তোমার পায়ে পড়ি—মেরো না, আমি ভাগ চাই না, আমাকে ছেড়ে দাও! অনাদির অসহায় চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

—তা হয় না—বিরিঞ্চির গলার স্বর পাথরের মতো কঠিন।

—আমাকে মেরো না—আমাকে মে—

মোমবাতির আলোয় ছোরাতে বিদ্যুৎ ঝল্‌কে উঠল। ধপ্ করে সেটা নেমে এল অনাদির বুকের ওপরে, বসে গেল বাঁট পর্যন্ত। আঁ—আঁ—আঁ।

অন্তিম আর্তনাদ। বারকয়েক হাত-পা ছুঁড়েই শান্ত হয়ে গেল। অনাদির বিস্ফারিত চোখের ওপর নেমে এল শাদা কাপড়ের একটা পর্দা। আর বিরিঞ্চি ছোরাটা ফস্ করে সজোরে টেনে বার করে আনতেই এক হাত উঁচু হয়ে ছিটকে বেরুল রক্তের ফোয়ারা। লাগল দেয়ালে, লাগল বিরিঞ্চির গায়ে।

অনাদির জামাটাতে ছোরার রক্ত মুছে নিয়ে বিরিঞ্চি সোজা হয়ে দাঁড়াল। মুখে নিশ্চিন্ততার একটুকরো হাসি। একটা আপদ গেছে, আরো দুটো বাকি। তাদের অবস্থাও এমনিই হবে।

ফুঁ দিয়ে মোমবাতিটা সে নিবিয়ে দিল। ঘরে ঘনিয়ে এল ভৌতিক কৃষ্ণ ছায়া। প্যাঁচাটা আবার ডেকে উঠল : ধু-ধু-ধুম-ধু-ধু-ধুম!

এমন সময় জঙ্গলের ভেতরে একটা তীব্র টর্চের আলো এসে পড়ল—যেন তলোয়ারের ফলার চিরে দিল নীলকুঠির জঙ্গলের প্রেতাচ্ছন্ন রাত্রিকে।

আর কেউ নয়—নিতাই সরকার।

॥ দশ ॥

নিতাই খানিকক্ষণ বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকার নীলকুঠির সামনে। বাতাস উঠেছে। চারদিকের বন-জঙ্গলে বাজছে একটা ভৌতিক মর্মর—যেন অতীত যুগের যত প্রেতাত্মা আজ এই অন্ধকার রাত্রে নীলকুঠির জঙ্গলে হানা দিয়েছে। অসংখ্য জোনাকি জ্বলছে ঝোপে-ঝাড়ে—তাদের হিংস্র চোখ থেকে ঠিকরে-পড়া আগুনের স্ফুলিঙ্গ যেন।.....

নিতাইয়ের বুক কাঁপতে লাগল। এ কোথায় এল—কার সর্বনাশা আকর্ষণে এখানে এসে পড়ল সে? জঙ্গলের কোলে ঘন অন্ধকার যেন তাকে ঠেসে ধরেছে, যেন তার দম আটকে আসছে! কে এই বন্ধু—এমন অস্থানে এমন অসময়ে তাকে ডেকে আনল? সে কি সত্যি-সত্যিই বন্ধু, না কোন শত্রুর ফাঁদ?

www.boiRboi.blogspot.com

নিতাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ, ভয়ব্যাকুল চোখ দুটো বুলিয়ে নিল পোড়ো নীলকুঠির ভয়াবহ রহস্যময়তার ওপরে। তারপর চেপে ধরল পকেটের রিভলবারটা। নিজের অস্ত্রটার নিষ্ঠুর শীতল স্পর্শে তার নিজের শরীরটাই যেন শিউরে উঠল।

ফিরে যাবে? বোধহয় ফিরে যাওয়াই ভাল, কিন্তু—যাবে কি যাবে না ভাবতে ভাবতেই সে চমকে লাফিয়ে উঠল। তার কাঁধের ওপর কার একখানা হাত পড়েছে। যেন মানুষের হাত নয়, চারিদিকের আঁধারই একখানা লম্বা হাত বার করে তার কাঁধের ওপর রেখেছে!

অস্বাভাবিক গলায় নিতাই বলল, কে?

আঁধারের ভেতর থেকেই জবাব এল, এস—

নিতাই পকেটের রিভলবারটা ধরবার চেষ্টা করতে লাগল, কিন্তু ভয়ে আর উত্তেজনায় তার হাতটা থরথর করে কাঁপছে। তেমনি বিকৃত গলায় সে জিজ্ঞাসা করল, তুমি কে?

জবাব এল, বন্ধু!

ওরা কেউ দেখতে পায়নি, একটু দূরে আর একটি ছায়ামূর্তি দাঁড়িয়ে। তার মুখ মানুষের নয়, কঙ্কালের। তার হাত মানুষের নয়, গরিলার মত বড় আর সেই হাতখানা টকটকে রক্তে রঙিন।

কঙ্কাল-মূর্তিটা নিঃশব্দে হাসছিল—হঠাৎ তার হাড়ের দাঁতগুলো খটখট করে বেজে উঠল।

নিতাই চমকে বলল, ওকি!

বন্ধু জবাব দিল, কিছু না—বোধহয় কটকটে ব্যাঙ।

ঘরে ঢুকে মোমবাতির আলোটা জ্বালালো বিরিঞ্চি। তারপর নিজের পিস্তলটা নিতাইয়ের দিকে ঘুরিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। নিঃশব্দে একটা ভয়ঙ্কর হাসি হেসে বলল, চিনতে পারছ?

ততক্ষণে আতঙ্কে পাথর হয়ে গেছে নিতাই। মোমবাতির মৃদু আলোয় চোখে পড়ছে ঘরের ভেতরের বীভৎস সেই অমানুষিক দৃশ্যটা, মেঝেতে তাজা রক্তের স্রোত বইছে—নিতাইয়ের পায়ের নিচে সে রক্ত আঠার মত চটচট করে উঠল। আর রক্তের সেই পৈশাচিক সমারোহের মধ্যে পড়ে আছে একটা মৃতদেহ—মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। প্রসারিত হাতের দুটো মুঠি শক্ত করে আঁটা, অন্তিম যন্ত্রণায় পায়ের আঙুলগুলো পর্যন্ত দোমড়ানো।

কিন্তু তার চাইতেও বড় বিভীষিকা নিতাইয়ের সামনেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। তার হাতের ছোট রিভলবারের নলটা তারই বুকের দিকে উদ্যত হয়ে আছে—তার শাদা শাদা বড় বড় দাঁতগুলো ক্ষুধার্ত জানোয়ারের মতো যেন তাকে তাড়া করে আসছে।

নিতাই অস্ফুট গলায় বলল, বিরিঞ্চি!

বিরিঞ্চি আঙুল বাড়িয়ে দেখিয়ে দিল মৃতদেহটার দিকে: আর অনাদি।

নিতাইয়ের সমস্ত জ্ঞান যেন লুপ্ত হয়ে গেল—মাথা ঘুরে রক্তাক্ত মেঝের ওপরেই বসে পড়ল সে। শুধু তেমনি করেই সামনে দাঁড়িয়ে পিশাচের মতো হাসতে লাগল বিরিঞ্চি।...কয়েক মিনিট পরে নিতাই উঠে দাঁড়াল। কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল অনাদিকে কে খুন করেছে?

—আমি।

—কেন?

—দরকার ছিল। কিন্তু—বিরিঞ্চি বিকটভাবে সেইরকম শব্দহীন হাসি হাসল: ভয় নেই, তোমাকে খুন করব না। বলছি তো, আমি তোমার বন্ধু।

—বন্ধু! কী রকম বন্ধু তা আমি জানি! নিতাইয়ের হাত-পা কাঁপছে: আমার কাছে তুমি কী চাও?

—কিছুই না—পুরোনো বন্ধু, একটু আলাপ-পরিচয় আর-কি! বিরিঞ্চি নিশ্চিতভাবে দেয়ালে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল: তাছাড়া একটু দাবিও আছে। আশা করি বন্ধুকে বিমুখ করবে না!

—কী দাবি?

—কিছু টাকা—

—কিসের টাকা?

—কেশবদাসের সিন্দুক থেকে নেওয়া হাজার টাকার অর্ধেক—

—সে টাকার আমি কিছু জানি না—

—জান না? বিরিঞ্চি তেমনি হাসতে লাগল: এ কথা তোমার কাছ থেকে একেবারে আশা করিনি, তা নয়। লজ্জা কী বন্ধু, সত্যি কথাটা সবাই জানে। সবই চাই না, মাত্র সাড়ে সাত হাজার পেলেই আমি চলে যাব—

—মিথ্যে কথা, আমার টাকা নেই।

—নেই? নিশ্চিতভাবে বিরিঞ্চি বললে, তোমার টাকা নেই? আমার রিভলবারে ঢোটা আছে। অনর্থক কেন বন্ধুবিচ্ছেদ ঘটাচ্ছ বল দেখি? রাজী হয়ে যাও—

—সে টাকায় তোমার দাবি নেই, আছে শ্রীমন্ত রায়ের—

—একই কথা। দাও, টাকাটা দিয়ে ফেল চটপট—

—না।

—দেবে না? বিরিঞ্চি অনাদির মৃতদেহটা দেখিয়ে দিল, ক্ষুব্ধস্বরে বলল, তাহলে আমাকে আর-একটা খুন করতেই হল দেখা যাচ্ছে—

নিতাই আর্তনাদ করে উঠল, হাতটা চলে গেল পকেটের ভেতর।

—খবরদার!

হঠাৎ আকাশ-ফাটানো গলায় চেঁচিয়ে উঠল বিরিঞ্চি: খবরদার, আমি জানি তোমার পকেটে পিস্তল আছে। কিন্তু বার করবার চেষ্টা কোরো না—তার আগেই মিছিমিছি প্রাণটা খোয়াবে।

বিরিঞ্চির পিস্তলটা নিতাইয়ের প্রায় বুকের কাছাকাছি এসে ঠেকেছে—ট্রিগারে একটা আঙুল তৈরি হয়ে আছে।

হাল ছেড়ে দিল নিতাই। হতাশভাবে বলল, কিন্তু আমার কাছে তো টাকা নেই—

—না, তোমার ব্যাঙ্কে আছে। সে আমি জানি। তা, ভাল ছেলের মত এটা সই করে দাও দেখি—

—কী এ?

—চেকবই।

—চেকবই! এ যে আমার ব্যাঙ্কের চেকবই! এ কোথায় পেলে?

বিরিঞ্চি মুচকি হাসল: কোন্ ব্যাঙ্কে টাকা আছে জানলে চেকবই জোগাড় করা এমন আর শক্তটা কী! নাও—সই কর—

—আমি সই করব না।

কালো রিভলবারটা নাচিয়ে বিরিঞ্চি বললে, করবে না?

www.boiRboi.blogspot.com

—না!

—তাহলে অনাদির দিকে একবার তাকাও।

—দাও সই করছি—নিতাই হাত বাড়াল : কিন্তু কলম?

—এই নাও—পকেট থেকে ফাউন্টেন পেন বার করে দিল বিরিঞ্চি।

—কত টাকা লিখব?

রিভলবারটা নাচিয়ে বিরিঞ্চি বললে, লিখতে হবে না—শুধু সই কর।

—তার মানে? ব্ল্যাঙ্ক চেক?

—হ্যাঁ—ব্ল্যাঙ্ক চেক।

সভয়ে নিতাই বলল, তুমি যদি আমার সব টাকা তুলে নাও?

—বন্ধুকে বিশ্বাস কর।

—না, সই করব না!

—তাহলে—বিরিঞ্চি পিস্তল বাগিয়ে ধরল।

—দাও সই করছি—খসখস করে চেকে স্বাক্ষর করে দিল নিতাই। তারপর মাথায় হাত দিয়ে মেঝেয় বসে পড়ল। আজ তার সর্বস্ব গেল—আজ সে পথে বসেছে। কিন্তু—কিন্তু—নিতাইয়ের চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। এর শোধও সে নিতে পারবে! ও টাকা হজম করবার ক্ষমতা বিরিঞ্চির হবে না।

নিতাই বলল, এবার আমাকে যেতে দাও—

—হ্যাঁ দিচ্ছি, বিরিঞ্চি রক্তমাখা ছোরাটা হাতে তুলে নিলে। মোমবাতির আলোয় ঝিকিয়ে উঠল রাক্ষসের জিভ। ছোরাটা শক্ত করে মুঠোর মধ্যে আঁকড়ে ধরে বিরিঞ্চি এগুতে লাগল নিতাইয়ের দিকে।

নিতাই সভয়ে চেঁচিয়ে উঠল—একি!

এবার বিরিঞ্চি শব্দ করে হাসল, টেনে টেনে হাসল।

—নিতাই সরকার, ভেবেছ তুমিই সবচেয়ে চালাক, তাই নয়? আজ চেকে সই করে দিয়েছ, কালই কলকাতায় ব্যাঙ্কে তুমি টেলিগ্রাম করে দেবে, তারপর চেক ভাঙাতে গেলেই আমার হাতে দড়ি পড়বে। না—অত বোকা আমি নই!

পাংশু পাণ্ডুর মুখে নিতাই বলল, তুমি কী করতে চাও?

—শত্রুর শেষ রাখব না—

তীরের মত বেগে নিতাই দাঁড়িয়ে উঠল, টেনে বার করে আনল রিভলবারটা। কিন্তু তার আগেই বিরিঞ্চির ছোরা তার বুকে এসে বিঁধেছে। নিঃশব্দে একটা ভারি বস্তার মত অনাদির রক্তাক্ত দেহের ওপর গড়িয়ে পড়ল নিতাই—একটা আর্তনাদ করবারও সময় পেল না।

বিরিঞ্চি গর্জে উঠল—কেল্লা ফতে!

আর সেই মুহূর্তেই কঠিন ভয়াবহ গলায় কে বলল, একটু দাঁড়াও বিরিঞ্চি—সবটা এখনো শেষ হয়নি।

সাপের ছোবল খাওয়ার মতো লাফ দিয়ে উঠল বিরিঞ্চি। শ্রীমন্ত রায়ই বটে! কোন সন্দেহ নেই—শ্রীমন্ত রায়েরই কণ্ঠস্বর!

তীরবেগে বিরিঞ্চি রক্তমাখা ছোরাখানা তুলে ধরল।

কিন্তু কোথাও কেউ নেই। চারদিকের অন্ধকার সীমাহীন সমুদ্রের মতো। তার ভেতর কিছুই চোখে পড়ল না। অন্ধকারের মধ্যে আবার সেই ভয়ঙ্কর স্বর উঠল : রিভলবারটা হাত থেকে ফেলে দাও বিরিঞ্চি।

—শ্রীমন্ত রায়! বিকট গলায় বিরিঞ্চি চেঁচিয়ে উঠল। তারপর শব্দ লক্ষ্য করে ছোরা তুলে ঝাঁপ দিতেই দুম্ করে এল একটা গুলির আওয়াজ। অসহ্য যন্ত্রণায়

www.boiRboi.blogspot.com

কঁকিয়ে উঠল বিরিঞ্চি—আহত হাত থেকে শব্দ করে ছোরাখানা ঝন্‌ঝন্ করে মেঝের ওপর খসে পড়ল!

বাঁ হাতে বিরিঞ্চি রক্তঝরা ডান হাতখানা চেপে ধরল, তারপর আতঙ্কে বিহ্বল চোখ মেলে চেয়ে রইল রহস্যময় অন্ধকারের ভেতর। সামনেই কোথাও তার অদৃশ্য শত্রু মৃত্যুর পরোয়ানা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ্য করছে তার প্রত্যেকটি চাল-চলন, তার প্রত্যেকটি কাজ। এই অলক্ষ্য আততায়ীর কাছে অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই।

সহসা শ্রীমন্ত রায় আবার বলল, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাক বিরিঞ্চি! যা বলি, তা মন দিয়ে শোন। অনেক অপরাধ তুমি করেছ, তার জন্যে আজ তোমায় দণ্ড নিতে হবে। কিন্তু বিনা বিচারে শাস্তি তোমায় দেব না। তোমার কী জবাবদিহি করবার আছে, আগে তাই শুনে নিতে চাই।

বিকৃত স্বরে বিরিঞ্চি বলল, সাহস থাকে তো সামনে এসে দাঁড়াও শ্রীমন্ত রায়। অমন করে কাপুরুষের মত আড়ালে থেকো না!

—কাপুরুষ!—হা—হা করে একটা বীভৎস হাসির আওয়াজ পোড়ো বাড়িটার থমথমে ভৌতিক রাত্রিকে কাঁপিয়ে তুলল—এ কথা অন্তত তোমার মুখে মানায় না বিরিঞ্চি! হাটলোর ফাঁকা পাটগুদামে পেছন থেকে আমার পিঠে ছোরা মারবার সময় এ বীরত্ব তো তোমার ছিল না!

বিরিঞ্চি বলল, থাম থাম, শুধু একটা কথার জবাব দাও। তুমি কি মানুষ—অথবা প্রেত? মৃত্যুর ওপার থেকেই তুমি প্রতিশোধ নিতে এসেছ?

শ্রীমন্ত রায়ের অলক্ষ্য কণ্ঠ আবার তীক্ষ্ণ ভয়ঙ্কর মুখর হয়ে উঠল, বলল, সে প্রশ্ন অবান্তর। কিন্তু ডান হাতটা খুইয়েছ বিরিঞ্চি, আবার বাঁ হাতটাও খোয়াতে চাও? হ্যাঁ, তোমায় স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি। পকেটে হাত দিতে চেষ্টা কোরো না—ওখানে তোমার পিস্তল আছে তা আমি জানি। এও জানি যে, বাঁ হাতেও তুমি সব্যসাচীর মতো গুলি চালাতে পার।

সভয়ে বাঁ হাতটা পকেট থেকে টেনে বার করে আনল বিরিঞ্চি। কাঁপা গলায় বলল, তুমি কী বলতে চাও?

—সেটা বলতেই তো চেষ্টা করছি, কিন্তু তার আগে তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে। অস্থির হয়ে উঠলে নিজের ক্ষতি নিজেই আরো বেশি করবে—আশা করি সেটা বুঝতে পারছ।

—কী করতে হবে?—হতাশ স্বরে বিরিঞ্চি জানতে চাইল।

—বসো ওই মেঝের ওপর।

বিরিঞ্চি বসল। টের পেল তলায় একটা ঠাণ্ডা আঠার স্রোত। মুহূর্তে বিরিঞ্চির সারা শরীর কুঁকড়ে উঠল। নিতাই অথবা অনাদির রক্ত—অথবা দুজনেরই। কিন্তু একতিল নড়ে বসতে তার সাহস হল না।

অদৃশ্য স্বর বলল, মনে আছে বিরিঞ্চি, একদিন এই শ্রীমন্ত রায় আদর্শ ভাল ছেলে ছিল? বন্ধু হয়ে তার কাছে তুমি এগিয়ে এলে, তারপর—

বিরিঞ্চি বলল, ওসব কথা কেন?

—বাধা দিয়ো না। মনে রেখো, আজ তোমার বিচার। গোড়া থেকে সব কথাই তোমায় শুনতে হবে।

বিরিঞ্চি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, বলল, বলে যাও।

—আমার টাকা ছিল—আমি ছিলাম সরল, ছিলাম নির্বোধ। নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিয়ে তুমি আমাকে নিয়ে ভিড়িয়ে দিলে রেসের মাঠে। যত বাজি হারতে লাগলাম,

টাকাগুলো যত পাখনা মেলে উড়ে যেতে লাগল—যত আমি পালাতে চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই আমায় তুমি আঁকড়ে রাখলে। দুঃখ ভোলাবার জন্যে ধরালে মদ—সর্বনাশের রাস্তা সহজ করে দিলে।

বিরিঞ্চি আবার উস্‌খুস্‌ করে উঠল।

—দাঁড়াও বিরিঞ্চি, দাঁড়াও—শ্রীমন্ত রায়ের তিক্ত গলা শুনতে পাওয়া গেল : সেদিন ভিক্ষুক করে যদি তুমি আমায় ছেড়ে দিতে তাহলেও আমি তোমায় ক্ষমা করতাম। কিন্তু সেইখানেই তুমি থামলে না। যখন তুমি আমাকে নিঃস্ব করে দিলে, তখন নিয়ে এলে লোভ। আর সেই লোভের ফাঁদে আমি অসহায়ের মতো পা দিলাম।

বিরিঞ্চি জবাব দিল না।

—মদের নেশায় তখন আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান ছিল না। সেই সুযোগে একটা জালিয়াতির ব্যাপারে তুমি আমায় জড়িয়ে দিলে। তখন আমার ঘোর ভাঙল। দেখলাম, এখন আমায় যে করে হোক তোমার হাত থেকে পালাতেই হবে। কিন্তু সে-পথ তুমি আমার রাখনি। আমার মৃত্যুদণ্ড তোমার মুঠোর মধ্যে। যে সব কাগজপত্র তোমার কাছে ছিল তা দিয়ে অনায়াসে তুমি আমাকে সাত বছর জেল খাটাতে পারতে। নিরুপায় হয়ে তোমার দয়াতেই নিজেকে আমি স'পে দিলাম।

কাতর গলায় বিরিঞ্চি বললে, ভুলে যাও শ্রীমন্ত, ভুলে যাও। ওসব পুরোনো কথা কেন টেনে তুলছ?

—বলেছি তো, আজ তোমার বিচার। সব শুনতে হবে বিরিঞ্চি। সংক্ষেপেই বলব, কিন্তু একটা শব্দও বাদ দেওয়া চলবে না। পৃথিবীতে অনেক শয়তান জন্মেছে, কিন্তু তাদের মধ্যেও কিছু না কিছু মনুষ্যত্ব ছিল। কিন্তু ওসবের বিন্দুমাত্র বালাই তোমার ছিল না বিরিঞ্চি। এদিক থেকে তুমি নিরঙ্কুশ—তোমার তুলনা হয় না।

—শ্রীমন্ত?

—আজ তোমার গলা কাঁপছে কেন বিরিঞ্চি? কোন অন্যায়—কোন পাপেই তো কখনো তুমি এতটুকু টলোনি! আজ এ দুর্বলতা কেন তোমার! এখন যা বলছি—নিঃশব্দে শুনে যাও।

বিরিঞ্চি নিরুত্তর হয়ে রইল। আহত ডানহাতের তালুতে তীব্র যন্ত্রণা। বুড়ো আঙুলের তলাকার হাড়টা গুঁড়ো হয়ে গেছে, এখনো রক্ত পড়ছে গড়িয়ে। সেটাকে প্রাণপণে টিপে ধরে বিরিঞ্চি বসে রইল।

—তারপর—অদৃশ্য শ্রীমন্ত বলে চলল : তার পর থেকে আত্মরক্ষার কোনও উপায় আমার আর রইল না। নিরাপদে পেছনে বসে থেকে আমায় পাপের পথে ঠেলে দিতে লাগলে। চুরি, জুয়াচুরি, জালিয়াতি, ডাকাতি—কিছুই বাদ গেল না। আর এমনি কায়দায় তুমি কাজগুলি করতে যে, ধরা পড়লে আমি জেলে যাব, তোমার গায়ে কুটোটির আঁচড়ও লাগবে না। খুব বুদ্ধিমানের মতো ব্যবস্থা সন্দেহ কী! নির্বাক মুখে আমি তোমার প্রত্যেকটি আদেশ পালন করে চললাম। জানতাম, এক-বার যদি তোমার হুকুম অমান্য করি, তুমি আমায় সাত বছরের মতো জেলখানায় ঘানি ঘুরোতে পাঠিয়ে দেবে।

—থাম শ্রীমন্ত!—বিরিঞ্চি আর্ত হয়ে বলল, আর কেন ওসব? যেতে দাও ওসব কথা। যা হওয়ার হয়ে গেছে। এবার এস—নিতাইয়ের টাকাটা আমরা ভাগাভাগি করে নিই—রফা হয়ে যাক সর্বকিছু।

—ঘুষ?—শ্রীমন্তর হাসি শোনা গেল : লোভ দেখাচ্ছ আমাকে! কিন্তু ও চালাকি পুরোনো হয়ে গেছে বিরিঞ্চি হালদার, ওতে আর আমায় ভোলাতে পারবে না। তোমার কথার দাম কতখানি, একটু আগেই অনাদি তার পরিচয় পেয়ে গেছে। আমাকে

অত বোকা তুমি ভেব না।

—বিশ্বাস কর, একবার সুযোগ দাও আমাকে—বিরিঞ্চি প্রার্থনা করল।

—সুযোগ তুমি অনেক পেয়েছ বিরিঞ্চি, আর নয়। সব সুযোগেরই একটা সীমা আছে। ওসব কথা এখন থাক। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। আমার প্রতি শেষ কর্তব্য তুমি পালন করলে কেশবদাস মাগনিরামের ব্যাপারে। আমাকে ছোরাটা ঠিকই মেরেছিলে তোমরা, কিন্তু কপাল-জোরে আমি বেঁচে গেলাম। কী করে? সে অনেক কথা। কিন্তু তারপরেই মনে হল, তোমরা তিনজন—তুমি, অনাদি আর নিতাই—তোমাদের কাছে আমার অনেক ঋণ। সে-ঋণ আমায় শোধ করতেই হবে। বিশেষ করে তুমি আমার সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজন!

বিরিঞ্চি চিৎকার করে উঠল : আমায় ছেড়ে দাও শ্রীমন্ত! এ টাকার সবটা তুমিই নাও—শুধু আমাকে মুক্তি দাও, আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইছি!

—ক্ষমা?—শ্রীমন্ত আবার সেই ভয়ঙ্কর হাসি হাসল : তোমাকে ক্ষমা করবার পরিণাম কী, আমি কি তা জানিনে বন্ধু? গোখরোর মতো তুমি আমায় খুঁজে বেড়াবে—তোমাকে হাড়ে-হাড়ে আমি চিনি। আর আমাকে যদি তুমি না-ই পাও, আমার মতো আরও কতজনের সর্বনাশ যে তুমি করবে তার হিসেব নেই। আইন তোমায় ধরতে পারবে না—এতই তুমি সতর্ক। কাজেই আজ আমার কাছ থেকে তোমায় দণ্ড নিতে হবে।

—শ্রীমন্ত!

—উঠে দাঁড়াও বিরিঞ্চি!—বজ্রের মতো আদেশ এল।

—শ্রীমন্ত!

—উঠে দাঁড়াও, নইলে গুলি করব!

বিরিঞ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো উঠে দাঁড়াল।

—ডান দিকে ঘুরে দাঁড়াও।

—আমাকে কোথায় নিয়ে যেতে চাও শ্রীমন্ত?

—এখুনি জানতে পারবে। ডান দিকে ফের। হ্যাঁ—আরো, আরো দু-পা। এবার হাঁটতে আরম্ভ কর। পালাতে চেষ্টা কোরো না বিরিঞ্চি। মনে রেখো, আমার অশরীরী চোখ আর হাতের রিভলবার তোমার সবকিছু লক্ষ্য করছে।

বিরিঞ্চি অন্ধকারে অন্ধের মতো হাঁটতে লাগল।

—আর একটু ডাইনে, হ্যাঁ, আরো দু-পা চল—চল বিরিঞ্চি।

বিরিঞ্চি চলতে লাগল পোড়ো বাড়ির আবর্জনায় হোঁচট খেতে খেতে—পায়ের তলায় জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে।

—দাঁড়াও—আবার কঠোর কণ্ঠের আদেশ এল।

বিরিঞ্চি মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়াল।

—আমি অশরীরী কি না জানতে চেয়েছিলে। এইবার জানতে পারবে। তোমার কাছে টর্চ আছে?

বিরিঞ্চি বিহ্বল স্বরে বলল, আছে।

—এবার সেটা জ্বালাতে পার।

পকেট থেকে আড়ষ্ট হাতে টর্চ বের করে বিরিঞ্চি। আলো ফেলল অদৃশ্য স্বর যেদিক থেকে আসছিল সেইদিকে।

কিন্তু মুহূর্তের সেই আলোতেই বিরিঞ্চির মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে গেল।

মাত্র চার-পাঁচ হাত দূরেই যে দাঁড়িয়ে আছে সে শ্রীমন্ত রায় নয়। একটা নর-কঙ্কালের মুখ—ভয়ঙ্কর কালো রন্ধ্রান্ত হাতে একটা উদ্যত পিস্তল। তার মুখের

www.boiRboi.blogspot.com

অস্থিসার দাঁতগুলোয় খট্‌খট্‌ করে প্রেতের হাসি বাজছে।

হাত থেকে টর্চটা পড়ে গেল—একটা বোবা আর্তনাদ করে পিছিয়ে গেল বিরিঞ্চি। সঙ্গে সঙ্গেই আর একটা আর্তনাদ চারিদিক মুখর করে দিলে। ঠিক পেছনেই পোড়ো কুয়োটার মধ্যে সে উলটে পড়ল—আছড়ে পড়ল বারো হাত নিচের শুকনো পাটকেল-ভরা গর্তটার মধ্যে : পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘাড়টা মটকে গেল তার।

কালো হাত তার পড়ে-যাওয়া টর্চটা তুলে নিয়ে কুয়োর মধ্যে ফেলল। ওই সে চেয়েছিল। বিরিঞ্চির বিষাক্ত রক্ত নিজের হাতে আর সে ঝরাতে চায়নি।

ঘাড় মটকে পড়ে কুয়োর তলায় ঝুলে আছে বিরিঞ্চি। আর টর্চের আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল, ভাঙা ইটের ভেতর থেকে সক্রোধে গলা বার করে এক বিশাল, দুধরাজ গোখরো বিরাট ফণা তুলে বিরিঞ্চির অসাড় দেহে একটার পর একটা ছোবল মেরে চলেছে। টর্চের আলোয় তার হিংস্র চোখ দুটো ঝিলিমিল করে উঠল একবার।

॥ এগারো ॥

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ করছিল রোদ।

নিজের কোয়ার্টারে হাঁ করে ঘুমুচ্ছেন গণেশবাবু। মুখের সামনে অনেকগুলি মাছি উড়ছিল ভনভন করে, তাদের জ্বালায় বিরক্ত হয়ে মাঝে মাঝে জেগে উঠেই আবার ঝিমিয়ে পড়ছিলেন তিনি। সামনে টেবিলের ওপরে একখানা কাগজে কি সব লেখা রয়েছে, এখান থেকে বদলি হবার জন্যে গণেশবাবু দরখাস্ত লিখছিলেন, লিখতে লিখতেই ঘুমিয়ে পড়েছেন।

ভেজানো দরজাটা খুলে নিঃশব্দ পায়ে একজন লোক ঢুকল। রেলের খালাসির মতো জাঙিয়া পরা, দেখলে সাধারণ একজন কুলি ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। একবার আড় চোখে সে নিদ্রিত গণেশবাবুর দিকে তাকাল, তারপরে একখানা খাম আর একটা ছোট প্যাকেট বিছানার ওপরে রেখে তেমনি নিঃশব্দে বার হয়ে গেল।

একটু পরেই মানিকপুর স্টেশনে এল দেড়টার ট্রেন, স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে চলে গেল। আর গণেশবাবুর ঘুম ভাঙল তারও প্রায় আড়াই ঘণ্টা পরে, প্রায় বেলা চারটের সময়।

তখনই তাঁর চোখে পড়ল সেই প্যাকেটটা, আর সেই চিঠিখানা।

গণেশবাবু সবিস্ময়ে বললেন, একি! এগুলো এখানে কে রেখে গেল! আগে তিনি প্যাকেটটা খুললেন। আর খোলবামাত্র ভীত বিস্ময়ে তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেল। প্যাকেটের ভেতর থেকে পড়ল রবারের মস্ত মস্ত দুটো দস্তানা, কঙ্কালের মাথা আঁকা একটা মুখোশ। দস্তানা দুটো সাধারণ হাতের প্রায় দ্বিগুণ, তার উলটো পিঠে গাঁদের আঠায় কতগুলো লোম আটকানো, আর তার মাঝে মাঝে লাল রঙ দেওয়া—সবটা মিলে মনে হয় সেটা যেন রক্তরঞ্জিত।

গণেশবাবু জিনিসগুলোর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আড়ষ্ট হাতে খুললেন খামখানা। তার ভেতরে এই চিঠিখানা ছিল :

"প্রিয় গণেশবাবু,

গত এক সপ্তাহের মধ্যে আপনাদের এখানে অনেকগুলো ব্যাপার ঘটে গেছে, যেগুলো আপনাদের কাছে একটা বিচিত্র রহস্য মাত্র। কয়েকজন মানুষের প্রাণ গেছে—ঘটেছে কতগুলো শোচনীয় দুর্ঘটনা। দুর্ভাগ্যক্রমে আপনিও সে-দুর্ঘটনার হাত একেবারে এড়াতে পারেননি। সেদিন আমি সময়মত এসে পড়তে না পারলে ও

শয়তান দুটোর গ্রাস থেকে কিছুতেই আপনাকে বাঁচাতে পারতাম না।

কিন্তু আমি কে? সেই পরিচয়টা দেবার জন্যেই এই চিঠিখানা আপনাকে লেখা—এ থেকেই যা-কিছু ঘটেছে তার রহস্যভেদ হয়ে যাবে। আমি এখানকার সকলের বিভীষিকা—আমি 'কালো হাত'।

চমকে উঠবেন না। আমি ভূত নই, প্রেত নই, কিছুই নই। নই যে, তার প্রমাণ ওই আলতা-রাঙানো রবারের দস্তানা আর ওই মুখোশ। আজ ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে, তাই আজ থেকে আবার আমি আপনাদের মতোই রক্ত-মাংসের মানুষ—আমি শ্রীমন্ত রায়।

'কালো হাত' রূপে একটা মানুষকে আমি খুন করেছি। একটা মানুষকে? না—একটা হিংস্র ভয়ঙ্কর পশুকে। তবু আমি নরহত্যা করেছি। এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আমি করব। কেমন করে—আপনাকে তা জানিয়ে লাভ নেই। শুধু যেটুকু জানাবার, সেটুকুই লিখছি।

আমি শ্রীমন্ত রায়। ভদ্রলোকের ছেলে, বিশিষ্ট বনেদী পরিবারে আমার জন্ম, লেখাপড়াও যথেষ্ট শিখেছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোকের মতো জীবন যাপন আমি করতে পারিনি, কুসঙ্গে পড়ে অধঃপাতে গেলাম। সুনাম গেল—সব গেল। অথচ টাকার অভাব। দুশ্চরিত্র লোকের কোথাও জায়গা জোটে না, আমারও জুটল না। দেনার জ্বালায় মাথার চুল অবধি বিকিয়ে যাচ্ছে, অথচ কোন উপায় নেই। আমি যেন উন্মাদ হয়ে উঠলাম।

এই পতনের মূলে ছিল বিরিঞ্চি। আর নিতাই সরকার—শয়তান, বিশ্বাসঘাতক। এরা দুজনেই আমাকে পাপের পথ দেখিয়ে দিল। অধোগতির যেটুকু বাকি ছিল তাও পূর্ণ হয়ে গেল—চুরি বাটপাড়ি বদমায়েসি সব শুরু করলাম। শেষে কেশবদাস মাগনিরামের সিন্দুক ভেঙে পঁচিশ হাজার টাকা লুঠ করলাম।

সেই টাকার বখরা নিয়ে গণ্ডগোল দেখা দিল। বিরিঞ্চি আর নিতাই যে শয়তান তা আমি জানতাম, কিন্তু কত বড় শয়তান তা আমার জানা ছিল না। বাইরে থেকে আরো একটা বদমায়েসকে সে জুটিয়ে আনল—সে অনাদি। এই অনাদি ও বিরিঞ্চিকে আপনি চেনেন। সেই দুজন—পুলিস-অফিসার সেজে আপনার স্টেশনে এসে জাঁকিয়ে বসেছিল, তারপর আপনাকে খুন করে মেল লুঠ করবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা—আগের ঘটনাই বলা যাক।

ওই তিনটে কাপুরুষ মিলে একটা পোড়ো বাড়িতে পেছন থেকে আমাকে ছোরা মারল। তারপর দরজায় শিকল টেনে দিয়ে পালিয়ে গেল। ওরা নিশ্চিত ভেবেছিল আমি মরে গেছি। আমার আঘাত সাঙ্ঘাতিক হয়েছিল—মরে যাওয়াই ছিল স্বাভাবিক। তবু আমি বাঁচলাম। ভাগ্যক্রমে একটু পরেই ও-বাড়িতে আমার একটি বন্ধু এসে পড়ে, বহু সেবাযত্ন করে সে আমাকে বাঁচিয়ে তোলে।

আমি বেঁচে উঠলাম। কিন্তু প্রতিশোধের কথা ভুলতে পারলাম না। খুঁজতে লাগলাম রাক্ষস তিনটেকে। নিতাই সরকার সবচাইতে ধূর্ত, বিরিঞ্চি আর অনাদিকেও সে কলা দেখিয়েছিল। তাই নিতাইয়ের শত্রু দাঁড়াল তিনজন—আমারও তিনজন। আজ আমারই জিত হয়েছে, তিন শত্রুই নিপাত হয়েছে।

আমি নিতাইয়ের খোঁজে এলাম, সে-রাত্রির কথা নিশ্চয় আপনার মনে আছে। তারপর অনাদি আর বিরিঞ্চি এল তাদের কার্যোদ্ধার করতে। আমি দেখলাম, আশ্চর্য যোগাযোগে তিন শত্রুই আমার মুঠোর মধ্যে এসে পড়েছে। ওরা ওয়েটিং রুমে এসে আস্তানা গাড়ল, ওদের কথাবার্তা শোনবার জন্যে আমাকে কৌশল করে গিরিধারীর পোশাকটা জোগাড় করতে হল। শুনলাম সব, বুঝলাম ওদের মতলব। সেইসঙ্গে এও

www.boiRboi.blogspot.com

ঠিক করলাম, হয় ওদের একদিন, নয় আমারই একদিন।

কোথায় থাকতাম আমি? সুন্দরপুর বাজারে—মুসলমান ফকির সেজে রাত্রে বেরোতাম অভিযানে। যেদিন বিরিঞ্চি আর অনাদি ডাক লুঠ করতে এবং আপনাকে খুন করতে চেষ্টা করে, সেদিন বাইরে থেকে গুলি করে আমিই ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ করেছিলাম। গিরিধারীকে বাঁচাতে পারিনি, সে-দুঃখ আমার রয়ে গেল। কিন্তু গণেশবাবু, হয়ত আপনার মনে আছে, প্রথমদিন ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলাম আপনাকে পুরস্কার দেব। সে-পুরস্কার দিয়েছি—আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি সেদিন। আমি খুনী বটে—আমাকে আপনি ঘৃণা করতে পারেন, কিন্তু আপনাকে যে দুটো পিশাচের হাত থেকে বাঁচাতে পেরেছি, এ গৌরব চিরদিন আমার থাকবে। দুটো পিশাচ। হ্যাঁ, পিশাচ বৈকি। কিন্তু পিশাচ হিসেবে বিরিঞ্চির তুলনা হয় না। পাছে বখরা নেবে এইজন্যে আহত অনাদিকে নীলকুঠির জঙ্গলে সে খুন করল। তার মত বিশ্বাস-ঘাতক পৃথিবীতে খুব বেশি জন্মেছে বলে মনে হয় না। তারপর ওই নীলকুঠিতেই নিতাই সরকারকে ভয় দেখিয়ে সে চেক লিখিয়ে নিল, নিষ্ঠুরভাবে তাকেও হত্যা করল। ভালই হল, ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মারল। নইলে ও-দুটোকে খুন করার অপরাধও আমাকেই বইতে হত।

তারপর আমার কাজ আমি করলাম। আমি শেষ করলাম বিরিঞ্চিকে। এজন্য অনুতাপ করি না। ও পাষণ্ডকে ইংরেজের আইন কোনদিন ছুঁতে পারত না, কাজেই আমাকেই ওর বিচার করতে হল। অপরাধী হতে পারি, কিন্তু মনে আমার কোন গ্লানি নেই। যে পনেরো হাজার টাকার জন্যে এত রক্তপাত, সে-টাকা আমার হাতের মুঠোয়।

কিন্তু ও পাপের ধনে আমার লোভ নেই। আমি বুঝেছি অন্যায়ের টাকা কত অন্যায়কে টেনে আনে, একটা পাপ কত পাপকে জমিয়ে তোলে। নিতাইয়ের বিশ্বাস-ঘাতকতায় আমার চোখ খুলে গেছে। ও টাকা জনহিতকর প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমি বিলিয়ে দেব—বিলিয়ে দেব মন্বন্তরে মুমূর্ষু বাঙলাদেশের ক্ষুধিতদের ভেতরে।

'কালো হাতের' আজ থেকে মৃত্যু হল। শ্রীমন্ত রায় নতুন রূপে আজ বাঁচতে চেষ্টা করবে, বাঁচতে চেষ্টা করবে দেশের আর দশের সেবায়। জীবনে কোনদিন আর আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে না; যদি হয়ও, আপনি আমাকে চিনতে পারবেন না।

আমি জানি এর পরে ওখানে পুলিশী তদন্তের ঢেউ এসে যাবে, বহু নিরীহ লোক অনর্থক হয়রান হবে। আপনি এই চিঠি তাদের দেখাবেন, বলবেন তিনটি মৃতদেহ পাওয়া যাবে নীলকুঠির জঙ্গলে, একটিকে পাওয়া যাবে পুরোনো কুয়োটার মধ্যে। সেই-ই বিরিঞ্চি—পাপচক্রের নেতা। আর জানবেন, আজ থেকে মানিকপুর সুন্দরপুরের সমস্ত রহস্যের ওপর শেষ যবনিকা পড়ে গেল। আপনাকে আবার ধন্য-বাদ—আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার। আশীর্বাদ করবেন, শ্রীমন্ত রায়ের হাত থেকে, মন থেকে যেন এই রক্তের দাগ মুছে যায়, যেন সহজ স্বাভাবিক মানুষ হয়ে মানুষের কল্যাণে সে বেঁচে থাকতে পারে। ইতি—

শ্রীমন্ত রায়।"

চিঠিখানা শেষ করে গণেশবাবু দু'হাত তুলে নমস্কার করলেন।

চার মূর্তি

www.boiRboi.blogspot.com

এক

মেসোমশায়ের অট্টহাসি

স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা শেষ হয়ে গেল।

চাটুজ্জেদের রোয়াকে আমাদের আড্ডা জমেছে। আমরা তিনজন আছি। সভাপতি টেনিদা, হাবুল সেন, আর আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে—পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই। আমাদের চতুর্থ সদস্য ক্যাবলা এখনো এসে পৌঁছয়নি।

চারজনে পরীক্ষা দিয়েছি। লেখাপড়ায় ক্যাবলা সবচেয়ে ভালো—হেডমাস্টার বলেছেন ও নাকি স্কলারশিপ পাবে। ঢাকাই বাঙাল হাবুল সেনটাও পেরিয়ে যাবে ফার্স্ট ডিভিশনে। আমি দু-বার অঙ্কের জন্যে ডিগবাজি খেয়েছি—এবার থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও করতে পারি। আর টেনিদা—

তার কথা না বলাই ভালো। সে ম্যাট্রিক দিয়েছে—কে জানে এন্ট্রান্সও দিয়েছে কি না। এখন স্কুল ফাইন্যাল দিচ্ছে—এর পরে হয়তো হায়ার সেকেন্ডারিও দেবে। স্কুলের ক্লাস টেন-এ সে একেবারে মনুমেন্ট হয়ে বসে আছে—তাকে সেখান থেকে টেনে এক ইঞ্চি নড়ায় সাধ্য কার!

টেনিদা বলে, হেঁ—হেঁ—বুঝলি নে? ক্লাসে দু-একজন পুরানো লোক থাকা ভালো—মানে, সব জানে-টানে আর কি! নতুন ছোকরাদের একটু ম্যানেজ করা চাই তো!

তা নতুন ছেলেরা ম্যানেজ হচ্ছে বৈকি। এমনকি টেনিদার দুঁদে বড়দা—যাঁর হাঁক শুনলে আমরা পালাতে পথ পাই না, তিনি শুদ্ধু ম্যানেজড্ হয়ে এসেছেন বলতে গেলে। তিন-চার বছর আগেও টেনিদার ফেলের খবর এলে চেঁচিয়ে হাট বাধাতেন, আর টেনিদার মগজে ক-আউন্স গোবর আছে তাই নিয়ে গবেষণা করতেন। এখন তিনিও হাল ছেড়ে দিয়েছেন। টেনিদার ফেল করাটা তাঁর এমনি অভ্যাস হয়ে গেছে যে, হঠাৎ যদি পাশ করে ফেলে তাহলে সেইসঙ্গে তিনি একেবারে ফ্ল্যাট হয়ে পড়বেন।

অতএব নিশ্চিন্তে আড্ডা চলছে।

ওরই মধ্যে হতভাগা হাবুলটা একবার পরীক্ষার কথা তুলেছিল, টেনিদা নাক কুঁচকে বলেছিল, নেঃ—নেঃ—রেখে দে! পরীক্ষা-ফরীক্ষা সব জোচ্চুরি! কতকগুলো গাধা ছেলে গাদা-গাদা বই মুখস্থ করে আর টকাটক পাশ করে যায়। পাশ না করতে পারাই সবচেয়ে শক্ত। দ্যাখ না—বছরের পর বছর হলে গিয়ে বসছি, সব পেপারের অ্যানসার লিখছি—তবু দ্যাখ কেউ আমাকে পাশ করাতে পারছে না। সব এগজামিনারকে ঠান্ডা করে দিয়েছি! বুঝলি, আসল বাহাদুরি এখানেই!

আমি বললাম, যা বলেছ। এইজন্যেই তো দু-বছর তোমার শাকরেদি করছি। ছোটকাকা কান দুটো টেনে-টেনে প্রায় আধ হাত লম্বা করে দিয়েছে—তবু ইস্কুল কামড়ে ঠিক বসে আছি!

টেনিদা বললে, চুপ কর, মেলা বকিসনি! তোর ওপরে আমার আশা-ভরসা ছিল—ভেবেছিলুম, আমার মনের মতো শিষ্য হতে পারবি তুই। কিন্তু দেখছি তুই এক-নম্বর বিশ্বাসঘাতক! কোন্ আক্কেলে অঙ্কের খাতায় ছত্রিশ নম্বর শুদ্ধ করে ফেললি?

www.boiRboi.blogspot.com

আর ফেললিই যদি, ঢ্যারা দিয়ে কেটে এলিনে কেন?

আমি ঘাড়-টাড় চুলকে বললাম, ভারি ভুল হয়ে গেছে!

টেনিদা বললে, দুনিয়াটাই নেমকহারাম! মরুক গে! কিন্তু এখন কী করা যায় বল দিকি? পরীক্ষার পর স্রেফ কলকাতায় বসে ভ্যারেণ্ডা ভাজব? একটু বেড়াতে-টেড়াতে না গেলে কি ভালো লাগে?

আমি খুশি হয়ে বললাম, বেশ তো চলো না। লিলুয়ায় আমার রাঙা-পিসিমার বাড়ি আছে—দুদিন সেখানে বেশ হৈ-হল্লা করে—

—থাম্ বলছি প্যালা—ঘামলি?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যেমন তোর ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি ছাগলের মতো বুদ্ধি! লিলুয়া! আহা ভেবে-চিন্তে কী একখানা জায়গাই বের করলেন! তার চেয়ে হাতিবাগান বাজারে গেলে ক্ষতি কী? ছাতের ওপরে উঠে হাওয়া খেলেই বা ঠ্যাকাচ্ছে কে? যতসব পিলে রুগি নিয়ে পড়া গেছে, রামোঃ!

হাবুল সেন চিন্তা করে বললে, আর অ্যাকটা জায়গায় যাওন যায়। বর্ধমানে যাইবা? সেইখানে আমার বড়মামা হইল গিয়া পুলিশের ডি. এস. পি—

দুন্দুর। সেই ধ্যাড়ধেড়ে বর্ধমান?—টেনিদা নাক কোঁচকালো : ট্রেনে চেপেছিস কি রক্ষে নেই—বর্ধমানে যেতেই হবে। মানে, যে-গাড়িতেই চড়বি—ঠিক বর্ধমানে নিয়ে যাবে। সেই রেলের ঝক্-ঝক্ আর পিঁ পিঁ—প্ল্যাটফর্মে যেন রথের মেলা! তবে—চাঁদির ওপরটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বললে—তবে হ্যাঁ—সীতাভোগ মিহিদানা পাওয়া যায় বটে। সেদিক থেকে বর্ধমানের প্রস্তাবটা বিবেচনা করা যেতে পারে বৈকি। অন্ততঃ লিলুয়ার চাইতে ঢের ভালো।

রাঙা-পিসিমার বাড়িকে অপমান! আমার ভারি রাগ হল।

বললাম, সে তো ভালোই হয়। তবে, বর্ধমানের মশার সাইজ প্রায় চড়ুই পাখির মতো, তাদের গোটাকয়েক মশারিতে ঢুকলে সীতাভোগ মিহিদানার মতো তোমাকেই ফলার করে ফেলবে। তাছাড়া—আমি বলে চললাম—আরো আছে। শুনলে তো, হাবুলের মামা ডি. এস. পি। ওখানে যদি কারুর সঙ্গে মারামারি বাধিয়েছ তাহলে আর কথা নেই—সঙ্গে-সঙ্গে হাজতে পুরে দেবে।

টেনিদা দমে গিয়ে বললে, যাঃ—যাঃ—মেলা বকিসনি! কী রে হাবুল—তোর মামা কেমন লোক?

হাবুল ভেবে-টেবে বললে, তা, প্যালা নিতান্ত মিথ্যা কথা কয় নাই! আমার মামায় আবার মিলিটারিতে আছিল—মিলিটারি মেজাজ—

—এই সেরেছে! নাঃ—এ ঢাকার বাঙালটাকে নিয়ে পারবার জো নেই! ওসব বিপজ্জনক মামার কাছে খামোকা মরতে যাওয়া কেন? দিব্যি আছি—মিথ্যে ফ্যাচাঙের ভেতরে কে পড়তে চায় বাপু!

আলোচনাটা এ-পর্যন্ত এসেছে—হঠাৎ বেগে ক্যাবলার প্রবেশ। হাতে একঠোঙা আলু-কাবলি।

—এই যে—ক্যাবলা এসে পড়েছে। বলেই টেনিদা লাফিয়ে উঠল, তারপরেই চিলের মতো ছোঁ মেরে ক্যাবলার হাত থেকে কেড়ে নিলে আলু-কাবলির ঠোঙাটা। প্রায় আধখেকটা একেবারে মুখে পুরে দিয়ে বললে, কোত্থেকে কিনলি রে? তোফা বানিয়েছে তো!

আলু-কাবলির শোকে ক্যাবলাকে বিমর্ষ হতে দেখা গেল না। বরং ভারি খুশি হয়ে বললে, মোড়ের মাথায় একটা লোক বিক্রি করছিল।

—এখনো আছে লোকটা? আরো আনা-চারেক নিয়ে আয় না!

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা বললে, ধ্যাৎ, আলু-কাবলি কেন? পোলাও—মুরগি—চিংড়ির কাটলেট—আনারসের চাটনি—দই—রসগোল্লা—

টেনিদা বললে, ইস্, ইস্,—আর বলিসনি! এমনিতেই পেট চুঁই-চুঁই করছে, তার ওপরে ওসব বললে একদম হার্টফেল করব!

ক্যাবলা হেসে বললে, হার্টফেল করলে তুমিই পস্তাবে! আজ রাত্তিরে আমাদের বাড়িতে এ-সবই রান্না হচ্ছে কিনা! আর মা তোমাদের তিনজনকে নেমন্তন্ন করতে বলে দিয়েছেন।

শুনে আমরা তিনজনেই একেবারে থ! পুরো তিন মিনিট মুখ দিয়ে একটা রা বেরুলো না।

তারপর তিড়িং করে একটা লাফ দিয়ে টেনিদা বললে, সত্যি বলছিস ক্যাবলা—সত্যি বলছিস? রসিকতা করছিস না তো?

ক্যাবলা বললে, রসিকতা করব কেন? রাঁচি থেকে মেসোমশাই এসেছেন যে! তিনিই তো বাজার করে আনলেন।

—আর মুরগি? মুরগি আছে তো? দেখিস ক্যাবলা—বামুনকে আশা দিয়ে নিরাশ করিসনি! পরজন্মে তাহলে তোকে কিন্তু মুরগি হয়ে জন্মাতে হবে—খেয়াল থাকে যেন!

—সে ভাবনা নেই। আধ-ডজন দড়ি-বাঁধা মুরগি উঠোনে ক্যাঁ-কাঁ করছে দেখে এলাম।

স্ট্রিম—ট্রিম—ট্রা—লা—লা—লা—লা—

টেনিদা আনন্দে নেচে উঠল। সেইসঙ্গে আমরা তিনজন কোরাস ধরলাম। গলি দিয়ে একটা নেড়ি-কুকুর আসছিল—সেটা ঘ্যাঁক করে একটা ডাক দিয়েই ল্যাজ গুটিয়ে উল্টোদিকে ছুটে পালালো।

রাত্তিরে খাওয়ার যা ব্যবস্থা হল—সে আর কী বলব! টেনিদার খাওয়ার বহর দেখে মনে হচ্ছিল. এর পরে ও আর এমনি উঠতে পারবে না—ক্রেনে করে তুলতে হবে। সের-দুই মাংসের সঙ্গে ডজন খানেক কাটলেট তো খেলোই—এর পরে প্লেট-স্লেট শুদ্ধু খেতে আরম্ভ করবে এমনি আমার মনে হল।

খাওয়ার টেবিলে আর-একজন মজার মানুষকে পাওয়া গেল। তিনি ক্যাবলার মেসোমশাই। ভদ্রলোক কত গল্পই না জানেন! একবার শিকার করতে গিয়ে বুনো মোষের ল্যাজ ধরে কেমন বন্-বন্ করে ঘুরিয়েছিলেন, সে গল্প শুনে হাসতে-হাসতে আমাদের পেটে খিল ধরবার জো হল। আর-একবার নাকি গাছের ডাল ভেঙে সোজা বাঘের পিঠের উপর পড়ে গিয়েছিলেন—বাঘ তাঁকে টপাৎ করে খেয়ে ফেলা দূরের কথা—সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান! বোধহয় ভেবেছিল, তাকে ভূতে ধরেছে। এমনকি সবাই মিলে জলজ্যান্ত বাঘকে যখন খাঁচায় পুরে ফেলল—তখনো তার জ্ঞান হয়নি। শেষ-কালে নাকি স্মেলিং সল্ট শুঁকিয়ে আর মাথায় জলের ছিটে দিয়ে তবে বাঘের মূর্ছা ভাঙাতে হয়।

খাওয়ার পরে ক্যাবলাদের ছাতে বসে এইসব গল্প হচ্ছিল। ইজি-চেয়ারে বসে একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে গল্প বলছিলেন ক্যাবলার মেসোমশাই—আর আমরা মাদুরে বসে শুনছিলাম। মেসোমশাইয়ের টাকের ওপর চাঁদের আলো চিকচিক করছিল—থেকে-থেকে লালচে আগুনে অদ্ভুত মনে হচ্ছিল তাঁর মুখখানা।

মেসোমশাই বললেন, ছুটিতে বেড়াতে যেতে চাও? আমি এক জায়গায় যাওয়ার কথা বলতে পারি। অমন সুন্দর স্বাস্থ্যকর জায়গা আশেপাশে বেশি নেই।

ক্যাবলা বললে, রাঁচি?

মেসোমশাই বললেন, না—না, এখন বেজায় গরম পড়ে গেছে ওখানে। তাছাড়া বড্ড ভিড়—ও সুবিধে হবে না।

টেনিদা বললে, দার্জিলিং, না শিলং?

মেসোমশাই বললেন, বেজায় শীত। গরমে পুড়তে কষ্ট হয় বটে, কিন্তু শীতে জমে যেতেই বা কী সুখ, সে আমি ভেবে পাইনে। ও-সব নয়।

আমার একটা কিছু বলা দরকার এখন। কিন্তু কিছুই মনে এল না। ফস্ করে বলে বসলাম, তাহলে গোবরডাঙা?

—চুপ কর বলছি প্যালা—চুপ কর!—টেনিদা দাঁত খিঁচোলো—নিজে এক-নম্বর গোবর-গণেশ—গোবরডাঙা আর লিলুয়া ছাড়া আর কী বা খুঁজে পাবি?

মেসোমশাই বললেন, থামো—থামো। ও-সব নয়। আমি যে জায়গার কথা বলছি, কলকাতার লোকে তার এখনো খবর রাখে না। জায়গাটা রাঁচির কাছাকাছি বটে—হাজারিবাগ আর রামগড় থেকে সেখানে যাওয়া যায়। বাস থেকে নেমে গোরুর গাড়ি চড়ে মাইল-তিনেক পথ। ভারি সুন্দর জায়গা—শাল আর মহুয়ার বন, একটা লেক রয়েছে—তাতে টলটলে নীল জল। দিনের বেলাতেই হরিণ দেখা যায়—খরগোস আর বন-মুরগি ঘুরে বেড়ায়। কাছেই সাঁওতালদের বস্তি, দুধ আর মাংস খুব সস্তায় পাওয়া যায়—লেকেও কিছু মাছ আছে—দু-পয়সা চার পয়সা সের। আর সেইখানে পাহাড়ের একটা টিলার ওপর একটা খাসা বাংলো আমি কিনেছি। বাংলোটা এক সাহেব তৈরি করিয়েছিল—বিলেত যাওয়ার আগে আমাকে বেচে দিয়ে গেছে। চমৎকার বাংলো! তার বারান্দায় বসে কতদূর পর্যন্ত যে দেখতে পাওয়া যায় ঠিক নেই। পাশেই ঝরনা—বারো মাস তির-তির করে জল বইছে। ওখানে গিয়ে যদি একমাস থাকো—এই রোগা প্যাকাটির দল সব একেবারে ভীম-ভবানী হয়ে ফিরে আসবে।

টেনিদা পাহাড়-প্রমাণ আহার করে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে পড়েছিল, তড়াক করে উঠে বসল।

—আমরা যাবো! আমরা চারজনেই!

মেসোমশাই আর-একটা সিগারেট ধরিয়ে বললেন, সে তো ভালো কথাই। কিন্তু একটা মুস্কিল আছে যে!

—কী মুস্কিল?

—কথাটা হল—ইয়ে—মানে বাড়িটার কিছু গোলমাল আছে।

—গোলমাল কিসের?

—ওখানকার সাঁওতালেরা বলে, বাড়িটা নাকি দানো-পাওয়া। ওখানে নাকি অপদেবতার উপদ্রব হয় মধ্যে-মধ্যে। কে যেন দুম-দাম করে হেঁটে বেড়ায়—অদ্ভুত-ভাবে চেঁচিয়ে ওঠে—অথচ কাউকে দেখতে পাওয়া যায় না। আমি অবশ্য বাড়িটা কেনবার পরে মাত্র বার তিনেক গেছি—তাও সকালে পৌঁছেছি, আর সন্ধ্যেবেলায় চলে এসেছি। কাজেই রাত্তিরে ওখানে কী হয় না হয় কিছুই টের পাইনি। তাই ভাবছি—ওখানে যেতে তোমাদের সাহসে কুলোবে কি না।

টেনিদা বললে, ছোঃ! ওসব বাজে কথা! ভূত-টুত বলে কিছু নেই মেসোমশাই। আমরা চারজনেই যাব। ভূত যদি থাকেই, তাহলে তাকে একেবারে রাঁচির পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়ে তবে ফিরে আসব কলকাতায়। আর—

কিন্তু তারপরেই আর কিছু বলতে পারল না টেনিদা—হঠাৎ থমকে গিয়ে দু'হাতে হাবুল সেনকে প্রাণপণে জাপটে ধরল।

হাবুল ঘাবড়ে গিয়ে বললে, আহা-হা—কর কী, ছাইড়্যা দাও, ছাইড়্যা দাও! গলা

পর্যন্ত খাইছি, প্যাটটা ফ্যাইটা যাইবো যে!—

টেনিদা তবু ছাড়ে না। আরো শক্ত করে হাবুলকে জাপটে ধরে বললে, ওকি—ওকি—বাড়ির ছাতে ও কী!

আকাশে চাঁদটা ঢাকা পড়েছে একফালি কালো মেঘের আড়ালে। চারিদিকে একটা অদ্ভুত অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারে পাশের বাড়িতে ছাতে কার যেন দুটো অমানুষিক চোখ দপ্-দপ্ করে জ্বলছে।

আর সেই মুহূর্তে ক্যাবলার মেসোমশাই আকাশ ফাটিয়ে প্রচণ্ড অট্টহাসি করে উঠলেন। সে হাসিতে আমার কান বোঁ-বোঁ করে উঠল, পেটের মধ্যে খটখটিয়ে নড়ে উঠল পালাজ্বরের পিলে—মনে হল মুরগি-টুরগিগুলো বুঝি পেট-ফেট চিরে ক'ক-ক'ক করতে করতে বেরিয়ে আসবে।

এমন বিরাট কিম্ভূত অট্টহাসি জীবনে আর কখনো শুনিনি।

দুই

যোগ-ভ্রষ্টের হাঁড়ি

একে তো ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের ঐ উৎকট অট্টহাসি—তারপর আবার পাশের বাড়ির ছাতে দুটো আগুন-মাখা চোখ! 'জয় মা কালী' বলে সিঁড়ির দিকে ছুট লাগাবো ভাবছি, এমন সময়—মিয়াঁও—মিয়াঁও—মিয়াঁও—

সেই জ্বলন্ত চোখের মালিক এক লাফে ছাতের পাঁচিলে উঠে পড়ল, তারপর আর-এক লাফে আর-এক বাড়ির কার্নিশে।

পৈশাচিক অট্টহাসিটা থামিয়ে মেসোমশাই বললেন, একটা হুলো-বেড়াল দেখেই চোখ কপালে উঠল, তোমরা যাবে সেই ডাক-বাংলোয়!—ভেংচি কাটার মতো করে আবার খানিকটা খাঁকখেঁকে হাসি হাসলেন ভদ্রলোক : বাঁর কি আর গাছে ফলে!

আমাদের ভেতর ক্যাবলাটা বোধহয় ভয়-টয় বিশেষ পায়নি—এক নম্বরের বিচ্ছু ছেলে। তাই সঙ্গে সঙ্গেই বললে, না—পটোলের মতো পটলডাঙায় ফলে।

টেনিদার কাছ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে হাবুল হাঁসফাঁস করে বললে, কিংবা ঢ্যাঁড়সের মতন গাছের ওপর ফলে।

এবার আমাকেও কিছু বলতে হল : কিংবা চালের ওপর চাল-কুমড়োর মতো ফলে।

টেনিদা দম নিচ্ছিল এতক্ষণ, এবার দাঁত খিঁচিয়ে উঠল,—থাম্ থাম্ সব—বাজে বকিসনি! সত্যি বলছি মেসোমশাই—ইয়ে—আমরা একদম ভয় পাইনি। এই প্যালাটা

www.boiRboi.blogspot.com

বেজায় ভীতু কিনা, তাই ওকে একটু ঠাট্টা করছিলাম।

বা রে, মজা মন্দ নয় তো! শেষকালে আমার ঘাড়েই চালাবার চেষ্টা! আমার ভীষণ রাগ হল। আমি ছাগলের মত মুখ করে বললাম, না মেসোমশাই, আমি মোটে ভয় পাইনি। টেনিদার দাঁত-কপাটি লেগে যাচ্ছিল কিনা তাই চেঁচিয়ে ওকে সাহস দিচ্ছিলাম।

—ইঃ, সাহস দিচ্ছিল! ওরে আমার পাকা পালোয়ান রে!—টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে মুখটাকে আমের মোরব্বার মতো করে বললে, দ্যাখ প্যালা, বেশি জ্যাঠামি করবি তো এক চড়ে তোর কান দুটোকে কানপুরে পাঠিয়ে দেব!

মেসোমশাই বললেন, আচ্ছা থাক, থাক। তোমরা যে বীরপুরুষ এখন তা বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু আসল কথা হোক। তোমরা কি সত্যিই ঋষ্টিপাহাড়ে যেতে চাও?

ঋষ্টিপাহাড়! সে আবার কোথায়? যা-বাবা, সেখানে মরতে যাব কেন?—টেনিদা চটাং করে বলে ফেলল।

মেসোমশাই বললেন, কী আশ্চর্য—এক্ষুনি তো সেখানে যাওয়ার কথা হচ্ছিল।

—তাই নাকি?—টেনিদা মাথা চুলকে বললে, বুঝতে পারিনি। তবে কিনা—ঋষ্টিপাহাড় নামটা, কি বলে—ইয়ে—তেমন ভালো নয়।

হাবুল বললে, হ, বড়ই বদখৎ।

আমি বললাম, শুনলেই মনে হয় ব্রহ্মদৈত্য আছে।

মেসোমশাই আবার খ্যাঁক-খ্যাঁক করে হেসে বললেন, তার মানে তোমরা যাবে না? ভয় ধরছে বুঝি?

টেনিদা এবার তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। তারপর সাঁ করে একটা বুক-ডন দিয়ে বললে, ভয়? দুনিয়ায় আছে বলে আমি জানিনে!—নিজের বুকে একটা থাপ্পড় মেরে বললে, কেউ না যায়—হাম জায়েঙ্গা! একাই জায়েঙ্গা!

ক্যাবলা বললে, আর যখন ভূতে ধরেঙ্গা?

—তখন ভূতকে চাটনি বানিয়ে খায়েঙ্গা!—টেনিদা বীররসে চাগিয়ে উঠল: সত্যি, কেউ না যায় আমি একাই যাব!

হঠাৎ আমার ভারি উৎসাহ হল।

—আমিও যাব!

ক্যাবলা বললে, আমিও!

হাবুল সেন ঢাকাই ভাষায় বললে, হ, আমিও জামু।

মেসোমশাই বললেন, তোমরা ভয় পাবে না?

টেনিদা বুক চিতিয়ে বললে, একদম না!

আমিও ওই কথাটা বলতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ হতভাগা ক্যাবলা একটা ফোড়ন কেটে দিলে—তবে, রাত্তিরবেলা হুলোবেড়াল দেখলে কী হবে কিছুই বলা যায় না।

মেসোমশাই আবার ছাত-ফাটানো অট্টহাসি হেসে উঠলেন। টেনিদা গর্জন করে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, বেশি বকবক করবি তো এক ঘুষিতে তোর নাক—

আমি জুড়ে দিলাম: নাসিকে পাঠিয়ে দেব!

—যা বলেছিস! একখানা কথার মত কথা!—এই বলে টেনিদা এমনভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলে যে, আমি উহু-উহু শব্দে চেঁচিয়ে উঠলাম।

তার পরের খানিকটা ঘটনা সংক্ষেপে বলে যাব। কেমন করে আমরা চার মূর্তি

বাড়ি থেকে পারমিশন আদায় করলাম সে-সব কথা বলতে গেলে মহাভারত হয়ে যাবে। সে-সব এলাহি কাণ্ড এখন থাক। মোট কথা এর তিনদিন পরে, কাঁধে চারটে সুটকেশ আর বগলে চারটে সতরঞ্চি-জড়ানো বিছানা নিয়ে আমরা হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলাম।

ট্রেন প্রায় ফাঁকাই ছিল। এই গরমে নেহাত মাথা খারাপ না হলে আর কে রাঁচি যায়? ফাঁকা একটা ইন্টার ক্লাস দেখে আমরা উঠে পড়লাম, তারপর চারটে বিছানা পেতে নিলাম।

ভাবলাম, বেশ আরামে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ি, হঠাৎ টেনিদা ডাকল—এই প্যালা!

—আবার কী হল!

—ভারি খিদে পেয়েছে মাইরি! পেটের ভেতর যেন একপাল ছুঁচো বক্সিং করছে!

বললাম, সে কি! এই তো বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে প্রায় তিরিশখানা লুচি আর সের-টাক মাংস সাবাড় করে এলে! গেল কোথায় সেগুলো?

হাবুল বললে, তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইক্যা বসছে!

টেনিদা বললে, যা বলেছিস! ভস্মকীটই বটে! যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায়! বলেই দরাজভাবে হাসল: বামুনের ছেলে, বুঝলি—সাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর! বাতাপি ও ইল্বল-ফিল্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যান্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে! হুঁ-হুঁ!—এরই নাম ব্রহ্মতেজ!

ক্যাবলা বলে বসল: ঘোড়ার ডিমের বামুন তুমি! পৈতে আছে তোমার?

—পৈতে? টেনিদা একটা ঢোক গিলল: ইয়ে ব্যাপারটা কী জানিস? গরমের সময় পিঠ চুলকোতে গিয়ে কেমন পটাং করে ছিঁড়ে যায়। তা আদত বামুনের আর পৈতের দরকার কী, ব্রহ্মতেজ থাকলেই হল। কিন্তু সত্যি, কী করা যায় বল তো? পেটের ভেতর ছুঁচোগুলো যে রেগুলার হাডু-ডু খেলছে!

ক্যাবলা বললে, তা আর কী করবে! তুমি রেফারিগিরি করো।

—কী বললি ক্যাবলা?

—কী আর বলব—কিছুই বলিনি—বলেই ক্যাবলা বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ল।

হাবুল সেন এর মধ্যে বলে বসল, প্যাটে কিল মাইরা বইস্যা থাকো।

—কার পেটে কিল মারব? তোর?—বলে ঘুষি বাগিয়ে টেনিদা উঠে পড়ে আর কি!

হাবুল চটপট বলে বসল, আমার না—আমার না—প্যালার।

বা-রে, এ তো বেশ মজা দেখছি! মিছিমিছি আমি কেন পেটে কিল খেতে যাই? তড়াক করে একটা বাঙ্কের ওপর উঠে বসে আমি বললাম, আমি কেন কিল খাব? কী দরকার আমার?

টেনিদা বললে, খেতেই হবে তোকে! হয় আমায় যা-হোক কিছু খাওয়া, নইলে শুধু কিল কেন—রাম-কিল আছে তোর বরাতে। ঐ তো কত ফিরিওলা যাচ্ছে—ডাক্ না একটাকে। পুরি-কচৌরি, কমলালেবু চকোলেট—ডালমুট—

—আমি তো দেখছি একটা জুতো-ব্রাশ যাচ্ছে। ওকেই ডাকব?—আমি নিরীহ গলায় জানতে চাইলাম।

—তবে রে—বলে টেনিদা প্রায় তেড়ে আসছিল আর আমি জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব কি না ভাবছিলুম, এমন সময় ঢনাঢন ঢন করে ঘণ্টা বাজল। এঞ্জিনে ভোঁ করে আওয়াজ হল—আর গাড়ি নড়ে উঠল।

সঙ্গে সঙ্গে দরজা খুলে আর-একজন ঢুকে পড়ল কামরায়, তার হাতে এক প্রকাণ্ড সন্দেহজনক চেহারার হাঁড়ি। আর তক্ষুনি পেছন থেকে কে যেন কি-একটা ছুঁড়ে দিলে গাড়ির ভেতর। সেটা পড়বি তো পড়, একেবারে টেনিদার ঘাড়ের ওপর।

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা হাঁই-মাই করে উঠল।

তারপরে চোখ পাকিয়ে 'এটা কী হল মশাই'—বলতে গিয়েই স্পীকটি নট! সঙ্গে সঙ্গে আমরাও!

গাড়িতে যিনি ঢুকেছেন তাঁর চেহারাখানা দেখবার মতো। একটি দশাসই চেহারার সাধু। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল, দাড়িগোঁফে মুখ একেবারে ছয়লাপ। গলায় অ্যাই মোটা মোটা রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে লাল টক্‌টকে সিঁদুরের তিলক আঁকা, পায়ে শুঁড়-তোলা নাগরা।

হাতের সন্দেহজনক হাঁড়িটা নামিয়ে রেখে সাধুবাবা বললেন, ঘাবড়ে যেও না বৎস—ওটা আমার বিছানা। তাড়াহুড়োতে আমার শিষ্য জানালা গলিয়ে ছুঁড়ে দিয়েছে। তোমার বিশেষ লাগেনি তো?

—না, তেমন আর কী লেগেছে বাবা! তবে সাতদিনে ঘাড়ের ব্যথা ছাড়লে হয়! —টেনিদা ঘাড় ডলতে লাগল। আমি কিন্তু ভারি খুশি হয়ে গেলাম সাধুবাবার ওপরে। যেমন আমার পেটে কিল মারতে এসেছিল—বোঝো এবার!

সাধুবাবা হেসে বললেন, একটা বিছানার ঘায়েই কাবু হয়ে পড়লে বৎস, আর আমার কাঁধে একবার একটা আস্ত কাবুলিওয়ালা এক মণ হিংয়ের বস্তা নিয়ে বাঙ্ক থেকে পড়ে গিয়েছিল। তবু আমি অক্কা পাইনি—সাতদিন হাসপাতালে থেকেই সামলে নিয়েছিলুম। বুঝেছ বৎস—এরই নাম যোগবল!

—তবে তো আপনি মহাপুরুষ স্যার—দিন দিন, পায়ের ধুলো দিন!—বলেই টেনিদা ঝাঁ করে সাধুবাবাকে একটা প্রণাম ঠুকে বসল।

সাধু বললেন, ভারি খুশি হলুম—তোমার সুমতি হোক। তা তোমরা কারা? এমন দল বেঁধে চলেছই বা কোথায়?

—প্রভু, আমরা রামগড়ে যাচ্ছি। বেড়াতে। আমার নাম টেনি—থুড়ি, ভজহরি মুখুজ্জে। এ হচ্ছে প্যালারাম বাঁড়ুজ্জে—খালি জ্বরে ভোগে আর পেটে মস্ত একটা পিলে আছে। এ হল হাবুল সেন—যদিও ঢাকাই বাঙাল, কিন্তু আমাদের পটলডাঙা থান্ডার ক্লাবে অনেক টাকা চাঁদা দেয়। আর ও হল ক্যাবলা মিত্তির, ক্লাসে টকাটক ফার্স্ট হয় আর ওদের বাড়ীতে আমাদের বিস্তর পোলাও মাংস খাওয়ায়।

—পোলাও মাংস! আহা—তা বেশ—দাড়ির ভেতরে সাধুবাবা যেন নোলার জল সামলালেন মনে হল : তা বেশ—তা বেশ!

—বাবা, আপনি কোন্ মহাপুরুষ—হাবুল সেন হাত জোড় করে জানতে চাইল।

—আমার নাম? স্বামী ঘুটঘুটানন্দ।

—ঘুটঘুটানন্দ! ওরে বাবা!—ক্যাবলার স্বগতোক্তি শোনা গেল।

—এতেই ঘাবড়ালে বৎস ক্যাবল? আমার গুরুর নাম কী ছিল জান? ডমরু-ঢক্কা-পটুনানন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল উচ্চণ্ড-মার্তণ্ড-কুক্কুটডিম্বভর্জাননন্দ; তাঁর গুরুর নাম ছিল—

—আর বলবেন না প্রভু ঘুটঘুটানন্দ—এতেই দম আটকে আসছে! এরপর হার্টফেল করব!—বাঙ্কের ওপর থেকে এবার কথাটা বলতেই হল আমাকে।

শুনে ঘুটঘুটানন্দ করুণার হাসি হাসলেন : আহা—নাবালক! তা, তোমাদের আর দোষ কী—আমার গুরুদেবের ঊর্ধ্বতন চতুর্থ গুরুর নাম শুনে আমারই দু-দিন ধরে সমানে হিক্কা উঠেছিল। সে যাক—তোমরা চারজন আছ দেখছি, যাবেও রামগড়ে। আমি নামব মুরিতে—সেখান থেকে রাঁচি। তা বৎসগণ, আমার যোগনিদ্রা একটু প্রবল—চট করে ভাঙতে চায় না। মুরিতে গাড়ি ভোরবেলায় পৌঁছয়—যদি উঠিয়ে দাও—বড় ভাল হয়।

—সেজন্যে ভাববেন না প্রভু, ঘাটশিলাতেই উঠিয়ে দেব আপনাকে।—ক্যাবলা আশ্বাস দিলে।

—না—না বৎস, অত তাড়াতাড়ি জাগাবার দরকার নেই। ঘাটশিলায় মাঝরাত।

—তাহলে টাটানগরে?

—সেটা শেষরাত, বৎস—অত ব্যস্ত হয়ো না। মুরিতে উঠিয়ে দিলেই চলবে।

টেনিদা বললে, আচ্ছা তাই দেব। এবার আপনি যোগনিদ্রায় শুয়ে পড়তে পারেন।

—তা পারি।—ঘুটঘুটানন্দ এবার চারিদিকে তাকালেন : কিন্তু শোবো কোথায়? চারজনে তো চারটে নিচের বেঞ্চি দখল করে বসেছ। আমি সন্ন্যাসী মানুষ—বাঙ্কে উঠলে যোগনিদ্রার ব্যাঘাত হবে।

টেনিদা বললে, আপনি উঠবেন কেন প্রভু—প্যালা বাঙ্কে শোবে। ও বাঙ্কে শুতে ভীষণ ভালবাসে।

দ্যাখো তো—কী অন্যায়! বাঙ্কে ওঠা আমি একদম পছন্দ করি না, খালি মনে হয় কখন ছিটকে পড়ে যাব—আর টেনিদা কিনা আমাকেই—

আমি বললাম, কক্ষনো না—বাঙ্কে শুতে আমি মোটেই ভালোবাসি না!

টেনিদা চোখ পাকালো।

—দ্যাখ্ প্যালা—সাধু-সন্ন্যাসি নিয়ে ফাজলামো করিসনি—নরকে যাবি! প্রভু, আপনি প্যালার বিছানা ফেলে দিয়ে ঐখানেই লম্বা হোন—প্যালা যেখানে হোক শোবে।

—আহা, বেঁচে থাকো বৎস—বলে ঘুটঘুটানন্দ আমার বিছানা ওপরে তুলে দিয়ে নিজের বিছানাটা পাতলেন। আমি জ্বলজ্বল করে চেয়ে রইলাম।

তারপর শোয়ার আগে সেই সন্দেহজনক হাঁড়িটি নিজের বেঞ্চির তলায় টেনে নিলেন। টেনিদা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করছিল, জিজ্ঞেস করল, হাঁড়িতে কী আছে প্রভু?

শুনেই ঘুটঘুটানন্দ চমকে উঠলেন; হাঁড়িতে? হাঁড়িতে বড় ভয়ঙ্কর জিনিস আছে বৎস! যোগসর্প!

—যোগসর্প?—হাবুল বললে, সেইটা আবার কী প্রভু?

ঘুটঘুটানন্দ চোখ কপালে তুলে বললেন, সে বড় সাংঘাতিক ব্যাপার! ভীষণ সমস্ত বিষধর সাপ—তপস্যাবলে আমি তাদের বন্দী করে রেখেছি। তারা দুধকলা খায় আর হরিনাম করে।

—সাপে হরিনাম করে!—আমি জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলুম না।

—তপস্যায় সব হয় বৎস! ঘুটঘুটানন্দ হাসলেন : তা বলে তোমরা ওর ধারে-কাছে যেও না! যোগবল না থাকলে বোঁ করে ছোবল মেরে দেবে! সাবধান!

—আজ্ঞে আমরা খুব সাবধানে থাকব—টেনিদা গোবেচারির মতো বললে।

ঘুটঘুটানন্দ আর-একবার সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমাদের দিকে তাকালেন। বললেন, হ্যাঁ, খুব সাবধান! ঐ হাঁড়ির দিকে ভুলেও তাকিও না।—তাহলে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে পড়ি?

—পড়ুন।

তারপর পাঁচ মিনিটও কাটল না। ঘর্-ঘর্ ঘরাৎ করে ঘুটঘুটানন্দের নাক ডাকতে লাগল।

—বাঙ্কের উপরে দুলুনি খেতে খেতে আমি কখন ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নাই। হঠাৎ কার যেন খোঁচা খেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, টেনিদা আমার পাঁজরায় সুড়-সুড়ি দিচ্ছে।

—নেমে আয় না গাধাটা! সাধুবাবা জেগে উঠলে তখন লবডঙ্কা পাবি।

চেয়ে দেখি, টেনিদার বিছানার ওপর যোগসর্পের হাঁড়ি। আর তার ঢাকনা খুলে

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা আর হাবুল সেন পটাপট রসগোল্লা আর লেডিকেনি সাবড়ে দিচ্ছে।

টেনিদা আবার ফিসফিসিয়ে বললে, হাঁ করে দেখছিস কী? নেমে আয় শীগ্‌গির! যোগসর্পের হাঁড়ি শেষ করে আবার তো মুখ বেঁধে রাখতে হবে!

আর বলবার দরকার ছিল না। একলাফে নেমে পড়লুম এবং এক থাবায় দুটো লেডিকেনি তুলে ফেললুম।

টেনিদা এগিয়ে এসে বললে, দাঁড়া দাঁড়া—সবগুলো মেরে দিসনি! দুটো-একটা আমার জন্যেও রাখিস!

ট্রেন টাটানগর ছেড়ে আবার অন্ধকারে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানে ডেকে চলল : ঘরাৎ—ফোঁ—ফর্‌র্‌ ফোঁ—ফুরৎ—ফুর্‌র্‌—

চারজনে মিলে যেভাবে আমরা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের হাঁড়ির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, তাতে সেটা চিচিং ফাঁক হতে পাঁচ মিনিট সময় লাগল না। অর্ধেকের ওপর টেনিদা সাবড়ে দিলে—বাকিটা আমি আর হাবুল সেন ম্যানেজ করে নিলুম। বয়েসে ছোট ক্যাবলাই বিশেষ জুত করতে পারল না। গোটা-দুই লেডিকেনি খেয়ে শেষে হাত চাটতে লাগল।

টেনিদা তবু হাঁড়িটাকে ছাড়ে না। শেষকালে মুখের ওপর তুলে চোঁ করে রসটা পর্যন্ত নিকেশ করে দিলে। তারপর নাক-টাক কুঁচকে বললে, দুত্তোর, গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়েও খেয়ে ফেললুম রে! জ্যান্তও ছিল দু-তিনটে! পেটের ভেতরে গিয়ে কামড়াবে না তো?

হাবুল বললে, কামড়াইতেও পারে।

—কামড়াক গে, বয়ে গেল! একবার ভীমরুল-শুদ্ধ একটা জামরুল খেয়ে ফেলেছিলুম, তা সে-ই যখন কিছু করতে পারলে না, তখন ক'টা পিঁপড়েতে আর কী করবে!

—ইচ্ছে করলে গোটাকয়েক বাঘ-শুদ্ধ সুন্দরবন পর্যন্ত তুমি খেয়ে ফেলতে পার—তোমাকে ঠেকাচ্ছে কে!—হাত চাটা শেষ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল ক্যাবলা।

এর মধ্যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের নাক সমানেই ডেকে চলছিল। যোগসিদ্ধ নাক কিনা—সে নাকের ডাকবার কায়দাই আলাদা! ঘর্‌-র্‌-ঘোঁ-ঘুরৎ!

টেনিদা বললে, যতই ঘুরুৎ-ঘুরুৎ করো না কেন—তোমার হাঁড়ি ফুড়ুৎ! চালাকি পেয়েছ! কাঁধের ওপর দেড়মণি বিছানা ফেলে দেওয়া! ঘাড়টা টনটন করছে এখনো! প্রতিশোধ ভালোই নেওয়া হয়েছে—কী বলিস প্যালা?

আমি বললুম, প্রতিশোধ বলে প্রতিশোধ! একেবারে নির্মম প্রতিশোধ!

যোগসর্পের শূন্য হাঁড়িটার মুখ টেনিদা বেশ করে বাঁধল। তারপর বিছানায় লম্বা হয়ে পড়ে বললে, এবার একটু ঘুমোনো যাক। পেটের জ্বলুনিটা এতক্ষণে একটু কমেছে।

আমার আর হাবুলেরও তাতে সন্দেহ ছিল না। কেবল ক্যাবলাই গজগজ করতে লাগল : তোমরাই সব খেয়ে নিলে, আমি কিছু পেলুম না।

টেনিদা বললে, যা যা, মেলা বকিসনি! ছেলেমানুষ, বেশি খেয়ে শেষে কি অসুখে পড়বি? নে, চুপচাপ ঘুমো—

ক্যাবলা ঘুমোলো কি না কে জানে, কিন্তু টেনিদার ঘুমোতে দু-মিনিটও লাগল না। স্বামীজীর নাক বললে, ঘুরুৎ—টেনিদার নাক সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে, ফুড়ুৎ! এই উত্তর-প্রত্যুত্তর কতক্ষণ চলল জানি না—মুখের ওপর থেকে দেওয়ালি পোকা তাড়াতে তাড়াতে আমিও ঘুমিয়ে পড়লুম।

তিন

কলার খোসা

মুরি। মুরি জংসন।

ধড়মড়িয়ে জেগে উঠতেই দেখি, বাইরে আবছা সকাল। ক্যাবলা কখন উঠে বসে এক ভাঁড় চায়ে মন দিয়েছে। হাবুল সেন দুটো হাই তুলে শোয়া অবস্থাতেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দিকে জ্বলজ্বল করে তাকালে। কিন্তু স্বামীজীর নাক তখন বাজছে—গোঁ-গোঁ—আর টেনিদার নাক জবাব দিচ্ছে—ভোঁ-ভোঁ—অর্থাৎ হাঁড়িতে আর কিছুই নেই।

হঠাৎ ক্যাবলা টেনিদার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিলে।

—অ্যাই—অ্যাই! কে সুড়সুড়ি দিচ্ছে র‍্যা?—বলে টেনিদা উঠে বসল।

ক্যাবলা বললে, গাড়ি যে মুরিতে প্রায় দশ মিনিট থেমে আছে! স্বামীজীকে জাগাবে না?

টেনিদা একবার হাঁড়ি, আর একবার স্বামীজীর দিকে তাকালো। তারপর বললে, গাড়িটা ছাড়তে আর কত দেরি রে?

—এখুনি ছাড়বে মনে হচ্ছে।

তা ছাড়ুক। গাড়ি নড়লে তারপর স্বামীজীকে নড়াবো। বুঝছিস না, এখন ওঠালে হাঁড়ির অবস্থা দেখে কি আর রক্ষে রাখবে! যা ষণ্ডামার্কা চেহারা—রসগোল্লার বদলে আমাদেরই জলযোগ করে ফেলবে! তার চেয়ে—

টেনিদা আরো কি বলতে যাচ্ছিল—ঠিক সেই মুহূর্তেই বাইরে থেকে বাজখাঁই গলায় বিটকেল হাঁক শোনা গেল : প্রভুজী,—কোন্ গাড়িতে আপনি যোগনিদ্রা দিচ্ছেন দেবতা?

সে তো হাঁক নয়—যেন মেঘনাদ! সারা ইস্টিশন কেঁপে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্বামী ঘুটঘুটানন্দ তড়াক করে উঠে বসলেন।

—প্রভুজী, জাগুন! গাড়ি যে ছাড়ল—

আঁ! এ যে আমারই শিষ্য গজেশ্বর!—জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে স্বামীজী ডাকলেন : গজ—বৎস গজেশ্বর! এই যে আমি এখানে!

গাড়ির দরজা খটাৎ করে খুলে গেল। আর ভেতরে যে ঢুকল, তার চেহারা দেখেই আমি এক লাফে বাঙ্কে চেপে বসলুম। হাবুল আর টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই শুয়ে পড়ল—আর ক্যাবলা কিছু করতে পারল না—তার হাত থেকে চায়ের ভাঁড়টা টপাৎ করে পড়ে গেল মেঝেতে।

—উঁহু হুঁ গেছি—পা পুড়ে গেল রে—স্বামীজী চেঁচিয়ে উঠলেন। উঃ—ছোঁড়াগুলো কী ত্যাঁদোড়? বলেছিলুম মুরিতে তুলে দিতে—তা দ্যাখো কাণ্ড? একটু হলেই তো ক্যারেড-ওভার হয়ে যেতুম!

গজেশ্বর একবার আমাদের দিকে তাকালো—সেই চাউনিতেই রক্ত জল হয়ে গেল আমাদের। গজেশ্বরের বিরাট চেহারার কাছে অমন দশাসই স্বামীজীও যেন মূর্তিমান প্যাঁকাটি। গায়ের রঙ যেন হাঁড়ির তলার মতো কালো—হাতির মতোই প্রকাণ্ড

www.boiRboi.blogspot.com

শরীর—মাথাটা ন্যাড়া, তার ওপর হাতখানেক একটা টিকি। গজেশ্বর কুতকুতে চোখে আমাদের দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে, আজকাল ছোঁড়াগুলো এমনি হয়েছে প্রভু—যেন কিষ্কিন্ধ্যা থেকে আমদানি হয়েছে সব! প্রভু যদি অনুমতি করেন, তাহলে এদের কানগুলো একবার পেঁচিয়ে দিই!

গজেশ্বর কান প্যাঁচাতে এলে আর দেখতে হবে না—কান উপড়ে আসবে সঙ্গে সঙ্গেই। আমরা চারজন ভয়ে তখন পান্তুয়া হয়ে আছি! কিন্তু বরাত ভালো—সঙ্গে সঙ্গে টিন-টিন করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

গজেশ্বর ব্যস্ত হয়ে বললে, নামুন—নামুন প্রভু! গাড়ি যে ছাড়ল! এদের কানের ব্যবস্থা এখন মুলতুবি রইল—সময় পেলে পরে দেখা যাবে এখন! নামুন—আর সময় নেই—

বাক্স-বিছানা, মায় স্বামীজীকে প্রায় ঘাড়ে তুলে গজেশ্বর নেমে গেল গাড়ি থেকে। সেই সঙ্গেই বাঁশি বাজিয়ে ট্রেন চলতে শুরু করে দিল।

আমরা তখনো ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছি—গজেশ্বরের হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড হাতটা তখনো আমাদের চোখের সামনে ভাসছে। মস্ত ফাঁড়া কাটল একটা!

কিন্তু ট্রেন হাতকয়েক এগোতেই স্বামীজী হঠাৎ হাঁউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠলেন : হাঁড়ি—আমার রসগোল্লার হাঁড়ি—

সঙ্গে সঙ্গেই টেনিদা হাঁড়িটা তুলে ধরল, বললে, ভুল বলছেন প্রভু, রসগোল্লা নয়, যোগসর্প! এই নিন—

বলেই হাঁড়িটা ছুঁড়ে দিলে প্ল্যাটফর্মের ওপর।

—আহা-আহা—করে দু-পা ছুটে এসেই স্বামীজী থমকে দাঁড়ালেন। হাঁড়ি ভেঙে চুরমার। কিন্তু আধখানা রসগোল্লাও তাতে নেই—সিকিখানা লেডিকেনি পর্যন্ত না।

—প্রভু, আপনার যোগসর্প সব পালিয়েছে—আমি চিৎকার করে বললুম। এখন আর ভয় কিসের!

কিন্তু একি—একি! হাতির মতো পা ফেলে গজেশ্বর যে দৌড়ে আসছে! তার কুতকুতে চোখ দিয়ে যেন আগুন-বৃষ্টি হচ্ছে! এ যেন ট্রেনের চাইতেও জোরে ছুটছে—কামরাটা প্রায় ধরে ফেললে!

আমি আবার বাঙ্কে উঠতে যাচ্ছি—টেনিদা ছুটেছে বাথরুমের দিকে—সেই মুহূর্তে—ভগবানের দান! একটা কলার খোসা!

হড়াৎ করে পা পিছলে সোজা প্ল্যাটফর্মে চিত হল গজেশ্বর। সে তো পড়া নয়—মহা পতন যেন! মণখানেক খোয়া বন্দুকের গুলির মতো ছিটকে পড়ল আশেপাশে।

—গেল—গেল—চিৎকার উঠল চারপাশে। কিন্তু গজেশ্বর কোথাও গেল না—প্ল্যাটফর্মের ওপর সেকেন্ড-পাঁচেক পড়ে থেকেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে উঠে দাঁড়ালো—

—খুব বেঁচে গেলি!—দূর থেকে গজেশ্বরের হতাশ হুংকার শোনা গেল।

গাড়ি তখন পুরো দমে ছুটতে শুরু করেছে। টেনিদা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, হরি হে, তুমিই সত্য!

www.boiRboi.blogspot.com

চার

ঝন্টিপাহাড়ির ঝন্টুরা

পথে আর বিশেষ কিছু ঘটেনি। গজেশ্বরের সেই আছাড় খাওয়া নিয়ে খুব হাসাহাসি করলুম আমরা। অত বড় হাতির মতো লোকটা পড়ে গেল একেবারে ঘটোৎকচের মতো! তবে আমাদের ওপর চেপে পড়লে কী যে হত, সেইটেই ভাববার কথা।

হাবুল বললে, আর একটু হইলেই প্রায় উইঠ্যা পড়ছিল গাড়িতে! মাইর্যা আমাগো ছাতু কইর্যা দিত!

টেনিদা নাক-টাক কুঁচকে হাবলাকে ভেংচে বললে, হঃ—হঃ—ছাতু কইর্যা দিত! বললেই হল আর-কি! আমিও পটলডাঙার টেনি মুখুজ্জে—অ্যায়সা একখানা জুজুৎসু হাঁকড়ে দিতুম যে মুরি তো মুরি—বাছাধন একেবারে মুড়ি হয়ে যেত! চ্যাপটাও হতে পারত চিঁড়ের মতো!

শুনে ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসল।

—অ্যাই ক্যাবলা, হাসছিস যে? টেনিদার সিংহনাদ শোনা গেল।

ক্যাবলা কী ঘুঘু! সঙ্গে সঙ্গেই বললে, আমি হাসিনি তো—প্যালা হাসছে!

—প্যালা—!

বা—আমি হাসতে যাব কেন? যোগসর্পের হাঁড়ির লেডিকেনি খেয়ে সেই তখন থেকে আমার পেট কামড়াচ্ছে। আমার পেটেও গোটাকয়েক ডেঁয়ো পিঁপড়ে ঢুকেছে কিনা কে জানে! মুখ ব্যাজার করে বললাম, আমি হাসব কেন—কী দায় পড়েছে আমার হাসতে!

টেনিদা বললে, খবরদার—মনে থাকে যেন! খামকা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মুলোর মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব!—ইস্-স্, ব্যাটা গজেশ্বর বড্ড বেঁচে গেল! একবার ট্রেনে উঠে এলেই বুঝতে পারত পটলডাঙার প্যাঁচ কাকে বলে। আবার যদি ওর সঙ্গে দেখা হয়—

কিন্তু সত্যিই যে দেখা হবে সে কথা কে জানত! আর আমি, পটলডাঙার প্যালারাম, অন্ততঃ সে দেখা না হলেই খুশি হতুম।

ট্রেন একটু পরেই রামগড়ে পৌঁছল।

ক্যাবলার মেসোমশাই বলে দিয়েছিলেন গোরুর গাড়ি চাপতে, কিন্তু কলকাতার ছেলে হয়ে আমরা গোরুর গাড়িতে চাপব! ছোঃ—ছোঃ!

টেনিদা বললে, ছ'-মাইল তো রাস্তা! চল—হেঁটেই মেরে দিই—

আমি বললুম, সে তো বটেই—সে তো বটেই! দিব্যি পাখির গান আর বনের ছায়া—

ক্যাবলা বললে, ফুলের গন্ধ আর দক্ষিণের বাতাস—

টেনিদা বললে, আর পথের ধারে পাকা পাকা আম আর কাঁঠাল ঝুলছে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের মালিক ঠ্যাঙা নিয়া তাইড়া আসছে—

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ইস, দিলে সব মাটি করে! হচ্ছিল আম-কাঁঠালের কথা, মেজাজটা বেশ জমে এসেছিল—কোত্থেকে আবার ঠ্যাঙা-ফ্যাঙা এসে হাজির করলে! এইজন্যেই তোদের মতো বেরসিকের সঙ্গে আসতে ইচ্ছে করে না! নে, এখন পা চালা—

সুটকেস কাঁধে, বিছানা ঘাড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলুম।

কিন্তু বিকেলে গড়ের মাঠে বেড়ানো আর সুটকেস বিছানা নিয়ে ছ-মাইল রাস্তা পাড়ি দেওয়া যে এক কথা নয় সেটা বুঝতে বেশি দেরি হল না। আধ মাইল হাঁটতে-না-হাঁটতেই আমার পালাজ্বরের পিলে টন-টন করে উঠল।

—টেনিদা, একটু জিরিয়ে নিলে হয় না?

টেনিদা তৎক্ষণাৎ রাজী।

—তা মন্দ বলিসনি। ক্ষিদেটাও বেশ চাঙা হয়ে উঠেছে। একটু জল-টল খেয়ে নিলে হয়—কী বলিস ক্যাবলা?—বলে টেনিদা ক্যাবলার সুটকেসের দিকে তাকাল। এর আগেই দেখে নিয়েছে, ক্যাবলার সুটকেসে নতুন বিস্কুটের টিন রয়েছে একটা।

ক্যাবলা সঙ্গে সঙ্গেই সুটকেসটাকে বগলে চেপে ধরল।

—জল-টল খাবে মানে? এক্ষুনি তো রামগড় স্টেশনে গোটা-আষ্টেক সিঙ্গাড়া খেয়ে এলে।

তা খেয়েছি তো কী হয়েছে!—একটানে ক্যাবলার বগল থেকে সুটকেসটা কেড়ে নিলে টেনিদা : ঐ খেয়েই ছ-মাইল রাস্তা চলবে নাকি! আমার বাবা ক্ষিদেটা একটু বেশি—সে তোমরা যাই বলো!

বলেই ধপ্ করে একটা গাছতলায় বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গেই খুলে ফেলল সুটকেস। চাবি ছিল না—পত্রপাঠ বেরিয়ে এল টিনটা।

একরাশ খাস্তা ক্রীম-ক্র্যাকার বিস্কুট। কী করি, আমরাও বসে পড়লুম। টেনিদা একাই প্রায় সব-ক'টা সাবাড় করলে—আমরা ছিটে-ফোঁটার বেশি পেলুম না। শুধু ক্যাবলাই কিছু খেল না, হাঁড়ির মতো মুখ করে বসে রইল।

ছ'-মাইল রাস্তা—সোজা কথা নয়। হাবুল সেন দু-খানা পাঁউরুটি রেখেছিল, এর পরে সেগুলোও গেল। কিন্তু টেনিদার ক্ষিদে আর মেটে না! রাস্তায় চিড়ে-মুড়ির দোকান দেখলেই বসে পড়ে আর হাঁক ছাড়ে : দু-আনা পয়সা বের কর, প্যালা—ক্ষিদেয় পেটটা ঝিম-ঝিম করছে!

মাইল-চারেক পেরুতেই পাহাড়ি পথ আরম্ভ হল। দু-ধারে শালের জঙ্গল, আর তার ভেতর দিয়ে রাঙামাটির পথ ঘুরপাক খেয়ে চলেছে। খানিকটা হাঁটতেই গা ছম-ছম করতে লাগল।

ক্যাবলা বলে বসল : টেনিদা—এ-সব জঙ্গলে বাঘ থাকে।

টেনিদার মুখ শুকিয়ে গেল, বললে, যাঃ—যাঃ—

হাবুল বললে, শুনছি ভালুকও থাকে।

টেনিদা বললে, হুম্!

বাঘ ভালুকের পরে আর কী আছে আমার মনে পড়ল না। আমি বললাম, বোধহয় হিপোপোটেমাসও থাকে।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে উঠল : থাম থাম প্যালা, বেশি পাকামো করিসনি! আমাকে ছাগল পেয়েছিস, না? হিপোপোটেমাস তো জলহস্তী। জঙ্গলে থাকে কী করে?

আমি বললুম, আচ্ছা যদি ভূত থাকে?

টেনিদা রেগে বললে, তুই একটা গো-ভূত! ভূত এখানে কেন থাকবে শুনি? মানুষই নেই, চাপবে কার ঘাড়ে?

ক্যাবলা ফস্ করে বলে বসল : যদি আমাদের ঘাড়েই চাপতে আসে? আর তুমি তো আমাদের লীডার—যদি তোমার ঘাড়টাই ভূতের বেশ পছন্দ হয়ে যায়?

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গেই ধাঁ করে ডান হাতটা লম্বা করে বাড়িয়ে দিলে ক্যাবলার কান পাকড়ে ধরার জন্যে। তৎক্ষণাৎ পট্ করে সরে গেল ক্যাবলা, আর টেনিদা খানিকটা গোবরে পা দিয়ে একেবারের গজেশ্বরের মতো—

ধপাস—ধাঁই!

আনন্দে আমার হাততালি দিয়ে উঠতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু ঠিক তৎক্ষণাৎ—জঙ্গলের মধ্য থেকে হঠাৎ প্রায় ছ-হাত লম্বা একটা মূর্তি বেরিয়ে এল। প্যাকাটির মতো রোগা—মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল—কটকটে কালো গায়ের রঙ। বিকট মুখে তার উৎকট হাসি। ভূতের নাম করতে করতেই জঙ্গল থেকে সোজা বেরিয়ে এসেছে।

—বাবা গো—বলে আমিই প্রথম ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগালুম। ক্যাবলা এক লাফে পাশের একটা গাছে উঠে পড়ল, টেনিদা উঠতে গিয়ে আবার গোবরের মধ্যে আছাড় খেল, আর হাবুল সেন দু-হাতে চোখ চেপে ধরে চ্যাঁচাতে লাগল : ভূত—ভূত—রাম-রাম—

সেই মূর্তিটা বাজখাঁই গলায় হা-হা করে হেসে উঠল।

—খোঁকাবাবু আপনারা মিছাই ভয় পাচ্ছেন! হামি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—বাবুর চিঠি পেয়ে আপনাদের আগ বাড়িয়ে নিতে এলাম। ভয় পাবেন না—ভয় পাবেন না—

আমি তখন আধ মাইল রাস্তা পার হয়ে গেছি—ক্যাবলা গাছের মগডালে। হাবুল সমানে বলে চলেছে : ভূত আমার পুত, শাকচুন্নি আমার ঝি! টেনিদা তখনো গোবরের মধ্যেই ঠায় বসে আছে। ভিরমিই গেছে কি না কে জানে।

মূর্তিটা আবার বললে, কুছ্ ডর নেই খোঁকাবাবু, কুছ্ ডর নেই! আমি হচ্ছি ঝণ্টিপাহাড়ির ঝণ্টুরাম—আপনাদের নোকর—

পাঁচ

চলমান জুতো

কী যে বিতিকিচ্ছিরি ঝামেলা! ভূত নয়—তবু কেমন ভূতের ভয় ধরিয়ে দিলে হতচ্ছাড়া ঝণ্টুরাম! আধ ঘণ্টা ধরে বুকের কাঁপুনি আর থামতেই চায় না!

www.boiRboi.blogspot.com

গোবর-টোবর মেখে টেনিদা উঠে দাঁড়াল। গোটাকয়েক অ্যায়সা অ্যায়সা কাঠ-পিঁপড়ের কামড় খেয়ে প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে নামল ক্যাবলা। হাবুলের হাঁটু দুটো থেকে-থেকে ধাক্কা খেতে লাগল। আর মাইলখানেক বাঁই-বাঁই করে দৌড়োনোর ফলে আমার পালা-জ্বরের পিলেটা পেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইল।

টেনিদাই সামলে নিলে সকলের আগে।

—ঝন্টুরাম? দাঁত খিঁচিয়ে টেনিদা বললে, তা অমন ভূতের মতো চেহারা কেন?

—কী করব খোঁকাবাবু, ভগবান বানিয়েছেন!

—ভগবান বানিয়েছেন—ছোঃ!—টেনিদা ভেংচি কাটল: ভগবানের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ ছিল না! ভগবানের হাতের কাজ এত বাজে নয়—তোকে ভূতে বানিয়েছে, বুঝলি?

—হাঁঃ!—ঝন্টুরাম আপত্তি করলে না।

এবার ক্যাবলা এগিয়ে এল: তা, এই ঝোপের মধ্যে ঢুকে বসেছিলি কেন?

ঝন্টুরাম কতকগুলো এলোমেলো দাঁত বের করে বললে, কী করব দাদাবাবু—ইস্টিশনে তো যাচ্ছিলম। তা, পথের মধ্যে ভারি নিদ এসে গেল, ভাবলম একটু ঘুমিয়ে নিই। তা ঘুমাচ্ছি তো ঘুমাচ্ছি, শেষে নাকের ভেতর দু-তিনটে মচ্ছর (মশা) ঘুসে গেল। উঠে দেখি, আপনারা আসছেন। আমি আপনাদের কাছে এলম তো আপনারা ডর খেয়ে অ্যায়সা কারবার করলেন—

বলেই, খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ খিঁক্-খিঁক্ করে লোকটা ভুতুড়ে হাসি হাসতে আরম্ভ করে দিলে।

ক্যাবলা বললে, খুব হয়েছে, আর হাসতে হবে না! দাঁত তো নয়—যেন মুলোর দোকান খুলে বসেছে মুখের ভেতর! চল্—চল্ এখন শীগ্‌গির, পথ দেখিয়ে নিয়ে চল্ ঝিন্টিপাহাড়িতে—

সত্যি, চমৎকার জায়গা এই ঝিন্টিপাহাড়ি!

নামটা যতই বিচ্ছিরি হোক—এখানে পা দিলেই গা যেন জুড়িয়ে যায়। তিনদিকে পাহাড়ের গায়ে শাল-পলাশের বন—পলাশ ফুল ফুটে তাতে যেন লাল আগুন জ্বলছে। নানারকমের পাখি উড়ে বেড়াচ্ছে—কত যে রঙের বাহার তাদের গায়ে! সামনে একটা ঝিল—তার নীল জল টলমল করছে, দুটো-চারটে কলমি-লতা কাঁপছে, তার ওপর আবার থেকে-থেকে কেউটে সাপের ফণার মতো গলা-তোলা পানকৌড়ি টপাটপ করে ডুব দিচ্ছে তার ভেতর।

ঝিলের কাছেই একটা টিলার ওপর তিনদিকে বনের মাঝখানে মেসোমশায়ের বাংলো। লাল ইঁটের গাঁথুনি—সবুজ দরজা জানালা—লাল টালির চাল। হঠাৎ মনে হয় এখানেও যেন একরাশ পলাশ ফুল জড়ো হয়ে রয়েছে আর দুটো-চারটে সবুজ পাতা উঁকি দিচ্ছে তাদের ভেতরে।

এমন সুন্দর জায়গা—এমন মিষ্টি হাওয়া—এমন ছবির মতো বাড়ি—এখানে ভূতের ভয়! রাম রাম! হতেই পারে না!

বাংলোর ঘরগুলোও চমৎকার সাজানো। টেবিল, চেয়ার, ডেক-চেয়ার, আয়না, আলনা—কত কী। খাটে মোটা জাজিম। আমরা পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝন্টুরাম দুখানা ঘরের চারখানা খাটে চমৎকার করে বিছানা পেতে দিলে। বাংলোর বারান্দায় বেতের চেয়ারে আমরা আরাম করে বসলুম। ঝন্টুরাম ডিমের ওমলেট আর চা এনে দিলে। তারপর জানতে চাইল: খোকাবাবুরা কী খাবেন দুপুরে? মাছ, না মুরগি?

—মুরগি—মুরগি!—আমরা কোরাসে চিৎকার করে উঠলুম।

টেনিদা একবার উস্ করে জিভের জল টানল: আর হ্যাঁ—চটপট পাকিয়ে ফেলো—বুঝলে? এখন বেলা বারোটা বাজে—পেটে ব্রহ্মা খাই-খাই করছেন। আর বেশি দেরি হলে চেয়ার-টেবিলই খেতে আরম্ভ করব বলে দিচ্ছি!

—হঃ, তুমি তা পারবা। হাবুল সেন ঠুকে দিলে।

—কী—কী বললি হাবুল?

—না না—আমি কিছু কই নাই।—হাবুল সামলে নিলে, কইতেছিলাম ঝন্টু খুব তাড়াতাড়ি রাঁধতে পারবে।

ঝন্টুরাম চলে গেল। টেনিদা বললে, চেহারাটা যাচ্ছেতাই হলে কী হয়—ঝন্টুরাম লোকটা খুব ভালো—না রে?

আমি বললাম, হ্যাঁ, যত্ন-আত্তি আছে। রোজ যদি মুরগি-টুরগি খাওয়ায়—সাত-দিনে আমরা লাল হয়ে উঠব।

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, আর লাল হয়ে কাজ নেই তোর! পালা-জ্বরে ভুগিস, বাসক পাতার রস দিয়ে কবরেজি বড়ি খাস. তোর এসব বেশি সইবে না। কাল থেকে তোর জন্যে কাঁচকলা আর গাঁদালের ঝোল বরাদ্দ করে দেব। বিদেশে-বিভূঁয়ে এসে যদি পটাৎ করে পটল তুলিস, তাহলে সে ম্যাও সামলাবে কে—শুনি?

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আচ্ছা আচ্ছা, সেজন্যে তোমায় ভাবতে হবে না! গাঁদালের ঝোল খেতে বয়ে গেছে আমার! মরি তো মুরগি খেয়েই মরব!

—আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, ক'র্—ক'র্—কোঁকোর—কোঁ—ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদ-রসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলাম।

খেতে খেতে দুটো বাজল। আহা, ঝন্টুর রান্না তো নয়—যেন অমৃত! পেটে পড়তে পড়তেই যেন ঘুম জড়িয়ে এল চোখে। রাত্রে ট্রেনের ধকলও লেগেছিল কম নয়—নরম বিছানায় এসে গা ঢালতেই আমাদের মাঝ-রাত্তির।

বিকেলের চা নিয়ে এসে ঝন্টুরাম যখন আমাদের ডেকে তুলল, পাহাড়ের ওপারে তখন সূর্য ডুবে গেছে। শাল-পলাশের বন কালো হয়ে এসেছে, শিসের মতো রঙ ধরেছে ঝিলের জলে। দুপুরবেলা চারিদিকের যে মন-মাতানো রূপ চোখ ভুলিয়ে-ছিল, এখন তা কেমন থমথমে হয়ে উঠেছে। ঝাঁ-ঝাঁ করে ঝিঁঝির ডাক উঠেছে ঝোপ-ঝাড় আর বাংলোর পেছনের বন থেকে।

প্ল্যান ছিল ঝিলের ধারে বিকেলে মন খুলে বেড়ানো যাবে, কিন্তু এখন যেন কেমন ছম-ছম করে উঠল শরীর। মনে পড়ে গেল, কলকাতার পথে পথে—বাড়িতে বাড়িতে এখন ঝলমলে আলো জ্বলে উঠেছে. ভিড় জমেছে সিনেমার সামনে। আর এখানে জমেছে কালো রাত—ক্রমাগত বেড়ে চলেছে ঝিঁঝির চিৎকার, একটা চাপা আতঙ্কের মতো কী যেন ছড়িয়ে যাচ্ছে আশেপাশে।

বারান্দায় বসে আমরা গল্প করার চেষ্টা করতে লাগলুম—কিন্তু ঠিক জমতে চাইল না। ঝন্টুরাম একটা লণ্ঠন জেবলে দিয়ে গেল সামনে, তাইতে চারিদিকের অন্ধকারটা কালো মনে হতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত টেনিদা বললে, আয়, আমরা গান গাই।

ক্যাবলা বললে, সেটা মন্দ নয়। এস—কোরাস ধরি।—বলেই চিৎকার করে আরম্ভ করলে—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা,
মানুষ আমরা নহি তো মেষ—

আর বলতে হল না। সঙ্গে সঙ্গেই আমরা তিনজনে জুড়ে দিলুম। সে কী গান!

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের চারজনের গলাই সমান চাঁছাছোলা—টেনিদার তো কথাই নেই। একবার টেনিদা নাকি অ্যায়সা কীর্তন ধরেছিল যে তার প্রথম কলি শুনেই চাটুজ্জেদের পোষা কোকিলটা হার্টফেল করে। আমরা এমনই গান আরম্ভ করে দিলুম যে ঝণ্টুরাম পর্যন্ত ভ্যাবাচাকা খেয়ে ছুটে এল।

আমরা সবাই বোধ হয় একটা কথাই ভাবছিলুম। ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোতে যদি ভূত থাকেও, তবুও এ-গান তাকে বেশিক্ষণ সইতে হবে না—আপনি ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাবে এখান থেকে।

কিন্তু সেই রাত্রে—

আমি আর ক্যাবলা এক ঘরে শুয়েছি—পাশের ঘরে হাবুল সেন আর টেনিদা। একটা লণ্ঠন আমাদের ঘরে মিটমিট করছে, ঘরের চেয়ার টেবিল আয়নাগুলো কেমন অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে যেন। ভয়টা আমার বুকের ভেতর চেপে বসল। অনেকক্ষণ বিছানায় আমি এপাশ-ওপাশ করতে লাগলুম—কান পেতে শুনলুম, টেনিদার নাকে—সা রে গা মা-র সাতটা সুর বাজছে। কাচের জানালা দিয়ে দেখলুম বাইরে কালো পাহাড়ের মাথায় একরাশ জ্বলজ্বলে তারা। তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে গেছি।

হঠাৎ খুট্—খুট্—খটাৎ—খটাৎ—

চমকে জেগে উঠলাম। কে যেন হাঁটছে।

কোথায়?

এই ঘরের মধ্যেই। যেন পায়ে বুট পরে কে চলে বেড়াচ্ছে ঘরের ভেতর।

হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা বাড়িয়ে দিলুম। না—ঘরে তো কিছু নেই! তবু সেই জুতোর আওয়াজ। কেউ হাঁটছে—নির্ঘাৎ হাঁটছে! ঘুট-ঘুট—খটাৎ-খটাৎ—

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম : ক্যাবলা!

ক্যাবলা লাফিয়ে উঠল : কী—কী হয়েছে?

—কে যেন হাঁটছে ঘরের ভেতর?

কী গোঁয়ার-গোবিন্দ এই পুঁচকে ক্যাবলা! তক্ষুনি তড়াক করে নেমে পড়ল মেঝেতে। আর সঙ্গে-সঙ্গেই একটা ইঁদুর দুড়দুড় করে দরজার চৌকাঠের গর্ত দিয়ে বাইরে দৌড়ে পালাল।

ক্যাবলা হেসে উঠল।

—তুই কী ভীতু রে প্যালা! একটা পুরোনো ছেঁড়া জুতোর মধ্যে ঢুকে ইঁদুরটা নড়ছিল—তাই এই আওয়াজ। এতেই এত ভয় পেলি!

শুনেই আমি রীরদর্পে বললুম—যাঃ—যাঃ—আমি সত্যিই ভয় পেয়েছি নাকি! —বেশ ডাঁটের মাথায় বললুম, ইঁদুর তো ছার—সাক্ষাত ব্রহ্মদত্যি যদি আসে—

কিন্তু মুখের কথা মুখেই থেকে গেল আমার। সেই মুহূর্তেই কোথা থেকে জেগে উঠল এক প্রচণ্ড অমানুষিক আর্তনাদ। সে গলা মানুষের নয়। তারপরেই আর-একটা বিকট অট্টহাসি। সে হাসির কোন তুলনা হয় না। মনে হল পাতালের অন্ধকার থেকে তা উঠে আসছে, আর তার শব্দে ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোটা থর-থর করে কেঁপে উঠছে!

ছয়

রোমাঞ্চকর রাত

সে ভয়ঙ্কর হাসির শব্দটা যখন থামল, তখনো মনে হতে লাগল, ঝণ্টিপাহাড়ির ডাকবাংলোটা ভয়ে একটানা কেঁপে চলেছে। আমি বিদ্যুৎবেগে আবার চাদরের তলায় ঢুকে পড়েছি, সাহসী ক্যাবলাও এক লাফে উঠে গেছে তার বিছানায়। আমার হাত পা হিম হয়ে এসেছে—দাঁতে-দাঁতে ঠকঠকানি শুরু হয়েছে। যতদূর বুঝতে পারছি, ক্যাবলার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়।

প্রায় দশ মিনিট।

তারপর ক্যাবলাই সাহস ফিরে পেল। শুকনো গলায় বললে, ব্যাপার কী রে প্যালা?

চাদরের তলা থেকেই আমি বললাম, ভূ—ভূ—ভূত!

ক্যাবলা উঠে বসেছে। আমি চাদরের তলা থেকে মিটমিট করে ওকে দেখতে লাগলাম।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু কথা হল, ভূত এখানে খামোকা হাসতে যাবে কেন?

ভূতুড়ে বাড়িতে ভূত হাসবে না তো হাসবে কোথায়? তারও তো হাসবার একটা জায়গা চাই।—আমি বলতে চেষ্টা করলুম।

ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, তাই বলে মাঝরাতে অমন করে হাসতে যাবে কেন? লোকের ঘুম নষ্ট করে অমন বিটকেল আওয়াজ ঝাড়বার মানে কী?

আমি বললুম, ভূত তো মাঝরাতেই হাসে। নইলে কি দুপুরবেলা কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে বসে হাসবে নাকি?

ক্যাবলা বললে, তাই তো উচিত! তাহলে অন্ততঃ ভূতের সঙ্গে একটা মোকাবিলা হয়ে যায়। তা নয়, সময় নেই অসময় নেই, যেন 'হাহা' শব্দরূপ আউড়ে গেল—হাহা-হাহো-হাহাঃ! আচ্ছা প্যালা, ভূতদের যখন-তখন এ-রকম যাচ্ছেতাই হাসি পায় কেন বল দিকি?

আমি চটে গিয়ে বললুম, তার আমি কী জানি! তোর ইচ্ছে হয় ভূতের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয় না।

ক্যাবলা আবার চুপ করে নেমে পড়ল খাট থেকে। বললে, তাই চল্ না প্যালা—ভূতের চেহারাটা একবার দেখেই আসিগে! সেইসঙ্গে এ-কথাও বলে আসি যে আপাততঃ এ বাড়িতে চারটি ভদ্রলোকের ছেলে এসে আস্তানা নিয়েছে। এখন রাত দুপুরে ও-রকম বিটকেলে হাসি হেসে তাদের ঘুমের ব্যাঘাত করা নিতান্ত অন্যায়।

বলে কী ক্যাবলা! আমার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

—ক্ষেপেছিস নাকি তুই?

—ক্ষেপব কেন? বুকের পাটা আছে বটে ক্যাবলার! একটুখানি হেসে বললে, আমার কী মনে হয় জানিস? ভূতও মানুষকে ভয় পায়।

—কী বকছিস যা-তা?

—ভয় পায় না তো কী! নইলে কলকাতায় ভূত আসে না কেন? দিনের বেলায়

www.boiRboi.blogspot.com

তাদের ভুতুড়ে টিকির একটা চুলও দেখা যায় না কেন? বাইরে বসে বসে হাসে কেন? ঘরে ঢুকতে ভূতের সাহস নেই কেন?

আমি আঁতকে উঠে বললুম, রাম—রাম! ও-সব কথা মুখেও আনিসনি ক্যাবলা! হাসির নমুনাটা একবার শুনলি তো? এখুনি হয়ত দুটো কাটা মুণ্ডু ঘরে ঢুকে নাচতে শুরু করে দেবে!

ক্যাবলাটা কী ডেঞ্জারাস ছেলে! পটাং করে বলে ফেলল—তা নাচুক না। কাটা মুণ্ডুর নাচ আমি কখনো দেখিনি, বেশ মজা লাগবে! আচ্ছা—আমি ওয়ান-টু-থ্রি বলছি। ভূতের যদি সাহস থাকে, তাহলে থ্রি বলবার মধ্যেই এই ঘরে ঢুকে নাচতে আরম্ভ করবে। আই চ্যালেঞ্জ ভূত! ওয়ান—টু—

কী সর্বনাশ? করছে কী ক্যাবলা! ভূতের সঙ্গে চালাকি। ওরা যে পেটের কথা শুনতে পায়! ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়ে আমি চাদরের তলায় মুখ লুকোলুম। এইবার এল—নির্ঘাৎ এল—

—ক্যাবলা বললে, থ্রি!

চাদরের তলায় আমি পাথর হয়ে পড়ে আছি। একেবারে নট-নড়ন-চড়ন ঠকাস মার্বেল। এক্ষুনি একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে যাবে! এল—এল—ঐ এসে পড়ল—

কিন্তু কিছুই হল না। ভূতেরা ক্যাবলার মতো নাবালককে গ্রাহ্যই করল না বোধহয়।

ক্যাবলা বললে, দেখলি তো! চ্যালেঞ্জ করলুম—তবু আসতে সাহস পেল না। চল—এক কাজ করি। টেনিদা আর হাবুল সেনও নিশ্চয়ই জেগেছে এতক্ষণে। আমরা চার-জনে মিলে ভূতেদের সঙ্গে দেখা করে আসি।

ভয়ে আমার দম আটকে গেল।

—ক্যাবলা, তুই নির্ঘাৎ মারা যাবি!

ক্যাবলা কর্ণপাত করল না। সোজা এসে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মারলে।

—ওঠ—

আমি প্রাণপণে চাদর টেনে বিছানা আঁকড়ে রইলুম!

—কী পাগলামি হচ্ছে ক্যাবলা! যা, শুয়ে পড়—

ক্যাবলা নাছোড়বান্দা। ওর ঘাড়ে ভূতই চেপে বসেছে না কি কে জানে! আমাকে হিড়-হিড় করে টানতে টানতে বললে, ওঠ্ বলছি! ভূতে মাঝরাতে আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেবে আর আমরা চুপটি করে সয়ে যাব! সে হতেই পারে না। ওঠ—ওঠ—শীগ্‌গির—

এমন করে টানতে লাগল যে চাদর-বিছানা শুদ্ধু আমাকে ধপাস্ করে মেঝেতে ফেলে দিলে।

—এই ক্যাবলা, কী হচ্ছে?

ক্যাবলা কোন কথা শোনবার পাত্রই নয়। টেনে আমাকে দাঁড় করিয়ে দিলে। বললে, চল দেখি, পাশের ঘরে টেনিদা আর হাবুল কী করছে!

বলে লণ্ঠনটা তুলে নিলে।

অগত্যা রাম-রাম দুর্গা-দুর্গা বলে আমি ক্যাবলার সঙ্গেই চললুম। ও যদি লণ্ঠন নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়—তাহলে এক সেকেণ্ডও আর আমি ঘরে থাকতে পারব না! দাঁতে দাঁতে লেগে যাবে, অজ্ঞান হয়ে যাব—হয়ত মরেও যেতে পারি। এমনিতেই তো আমার পালাজ্বরের পিলেটা থেকে-থেকে কেমন গুরগুরিয়ে উঠছে।

পাশের দরজাটা খোলাই ছিল। ওদের ঘরে ঢুকেই ক্যাবলা চেঁচিয়ে উঠল: একি, ওরা গেল কোথায়?

তাই তো—কেউ নেই! দুটো বিছানাই খালি! না টেনিদা—না হাবুল। অথচ

www.boiRboi.blogspot.com

দুটো ঘরের মাঝের দরজা ছাড়া আর সমস্ত জানালা-দরজাই বন্ধ। আমাদের ঘরের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওদের তো আর বেরুবার পথ নেই।

ক্যাবলা বললে, গেল কোথায় বল্ দিকি!

আমি কাঁপতে কাঁপতে বললুম, নির্ঘাৎ ভূতে ভ্যানিশ করে দিয়েছে! এতক্ষণে ঘাড় মটকে রক্ত খেয়ে ফেলেছে ওদের!

এতক্ষণে বোধহয় ক্যাবলার খটকা লেগে গিয়েছিল। এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললে, তাই তো রে, কেমন যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে সব! দু-দুটো জলজ্যান্ত মানুষ হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি!

আর ঠিক তক্ষুনি—

ক্যাঁক-ক্যাঁক করে একটা অদ্ভুত আওয়াজ। যেন ঘরের মধ্যে সাপে ব্যাঙ ধরেছে কোথায়। ক্যাবলা চমকে একটা লাফ মারল, একটুর জন্যে পড়তে-পড়তে বেঁচে গেল হাতের লণ্ঠনটা। আর আমিও তিড়িং করে একেবারে টেনিদার বিছানায় চড়ে বসলুম।

আবার সেই ক্যাঁক-ক্যাঁক-কোঁক!

নির্ঘাৎ ভূতের আওয়াজ! আমার পালাজ্বরের পিলেতে প্রায় ম্যালেরিয়ার কাঁপুনি শুরু হয়ে গেছে। চোখ বুজে ভাবছি এবার একটা যাচ্ছেতাই ভূতুড়ে কাণ্ড হয়ে যাবে, ঠিক এই সময় হঠাৎ বেখাপ্পাভাবে ক্যাবলা হা-হা করে হেসে উঠল।

চমকে তাকিয়ে দেখি, লণ্ঠনটা নিয়ে হাবুলের খাটের তলায় ঝুঁকে রয়েছে ক্যাবলা। তেমনি বেয়াড়াভাবে হাসতে হাসতে বললে, দ্যাখ প্যালা আমাদের লীডার টেনিদা আর হাবুলের কাণ্ড! ভূতের ভয়ে এ-ওকে জাপটে ধরে খাটের তলায় বসে আছে!

বলেই ক্যাবলা দস্তুরমত অট্টহাসি করতে শুরু করলে।

খাটের তলা থেকে টেনিদা আর হাবুল গুঁড়ি মেরে বেরিয়ে এল। দুজনেরই নাকে-মুখে ধুলো আর মাকড়সার ঝুল। টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে, আর হাবুল সেনের চোখ দুটো ছানাবড়ার মতো গোল গোল হয়ে প্রায় আকাশে চড়ে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, এই বীরত্ব তোমার! তুমি আমাদের দলপতি—আমাদের পটলডাঙার হীরো—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ান—

টেনিদা তখন সামলে নিয়েছে। নাক থেকে ঝুল ঝাড়তে ঝাড়তে বললে, থাম্ থাম্, মেলা ফ্যাচ-ফ্যাচ করিসনি! আমরা খাটের তলায় ঢুকেছিলুম একটা মতলব নিয়ে।

হাবুলের কাঁধের ওপর একটা আরশোলা হাঁটছিল। হাবুল টোকা মেরে সেটাকে দূরে ছিটকে ফেলে দিয়ে বলল, হ—হ, আমাগো একটা মতলব আছিল!

ক্যাবলা বললে, শুনি না—কেয়া মতলব সেটা! বাংলাও।—ক্যাবলা অনেকদিন পশ্চিমে ছিল, কথায় কথায় ওর রাষ্ট্রভাষা বেরিয়ে পড়ে দু-একটা।

টেনিদা তখন সাহস পেয়ে জুত করে বিছানার ওপর উঠে বসেছে। বেশ ডাঁটের মাথায় বললে, বুঝলি না? আমরা খাটের তলায় বসে ওয়াচ করছিলুম। যদি একটা ভূত-টুত ঘরের মধ্যে ঢোকে—

হাবুল টেনিদার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে, তখন দুইজনে মিল্যা ভূতের পা ধইর‍্যা একটা হ্যাঁচকা টান মারুম—আর ভূতে—

টেনিদা বললে, একদম ফ্ল্যাট!

ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগল।

টেনিদা চটে গিয়ে বললে, অমন করে হাসছিস যে ক্যাবলা? জানিস ওতে আমার ইনসাল্ট হচ্ছে? টেক্ কেয়ার! গুরুজনকে যদি অমন করে তুরুশ্চু করবি, তাহলে চটে

গিয়ে এমন একখানা মুগ্ধবোধ বসিয়ে দেব—

টেনিদা বোধহয় ক্যাবলার নাকে একটা মুগ্ধবোধ বসাবার কথাই ভাবছিল, সেই সময় আবার একটা ভীষণ কাণ্ড ঘটল।

পাশের জানালাটার কাঁচে ঝন্-ঝন্ করে শব্দ হল একটা। কতকগুলো ভাঙা কাঁচ ছিটকে পড়ল চারিদিকে আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের মধ্যে শাদা বলের মতো কী একটা ঠিক্‌রে পড়ল এসে—একেবারে ক্যাবলার পায়ের কাছে গড়িয়ে এল।

আর লণ্ঠনের আলোয় স্পষ্ট দেখলুম—ওটা আর কিছু নয়, স্রেফ মড়ার মাথার খুলি।

—ওরে দাদা!

আমি মেঝেতে ফ্ল্যাট হলুম সঙ্গে সঙ্গেই। হাবুল আর টেনিদা বিদ্যুৎবেগে আবার খাটের তলায় অদৃশ্য হল। শুধু লণ্ঠন হাতে করে ক্যাবলা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল—শুয়ে পড়ল না, বসেও পড়ল না।

সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই পৈশাচিক অট্টহাসি উঠল। সেই হাসির সঙ্গে থরথর করে কাঁপতে লাগল ঝণ্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলো।

গাত

কে তুমি হাস্যময়?

বাকি রাতটা যে আমাদের কী ভাবে কাটল, সে আর খুলে না বললেও চলে।

টেনিদা আর হাবুল সেনের কী হল জানি না—আমি তো ঠায় অজ্ঞান। তার মধ্যেই মনে হচ্ছিল, দুটো তালগাছের মতো পেল্লায় ভূত আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাচ্ছে। একজন যেন বলছে: এটাকে কালিয়া রান্না করে খাব, আর-একজন বলছে: দূর—দূর! এটা একেবারে শুটকো চামচিকের মতো—গায়ে একরত্তি মাংস নেই! বরং এটাকে তেজপাতার মতো ডাল সম্বরা দেওয়া যেতে পারে।

আমি বোধহয় ভেউ-ভেউ করে কাঁদছিলুম, হঠাৎ তিড়িক করে লাফিয়ে উঠতে হল। মুখের ওপর কে যেন আঁজলা-আঁজলা করে জল দিচ্ছে। আর, কী ঠাণ্ডা সে জল! বাঘের নাকে সে জল ছিটিয়ে দিলে বাঘ-শুদ্ধ অজ্ঞান হয়ে পড়বে!

বাঘ অজ্ঞান হোক—কিন্তু আমার জ্ঞান ফিরে এল, মানে, আসতেই হল তাকে।

আর কে? ক্যাবলা। করেছে কী—বাগানে জল দেবার একটা ঝাঁঝরি নিয়ে এসেছে, তাই দিয়ে আমাকে স্রেফ চান করিয়ে দিচ্ছে।

—ওরে থাম থাম—

ক্যাবলা কি থামে! আমার মুখের ওপর আবার একরাশ জল ছিটিয়ে দিয়ে বললে, কি রে, মাথা ঠাণ্ডা হয়েছে তো?

—ঠাণ্ডা মানে? সারা গা ঠাণ্ডা হবার জো হল—আমি তড়াক করে ঝাঁঝরির আক্রমণ থেকে পাশ কাটালুম।

কাঁচের জানালা দিয়ে বাইরে ভোরের আলো দেখা যাচ্ছে। ঝণ্টিপাহাড়ির ডাক-বাংলোয় একটা দুঃস্বপ্নের রাত শেষ হয়ে গেছে। সামনে লেকের নীল জলটার ওপর ভোরের লালচে রং। পাখির মিষ্টি ডাক শুরু হয়েছে চারদিকে—শিশিরে ভেজা শাল-পলাশের বন যেন ছবির মতো দেখাচ্ছে।

কোঁচার খুঁটে মুখটা মুছতে মুছতে আমার মনে হল, এমন সুন্দর জায়গায় এমন বিচ্ছিরি ভূতের ব্যাপার না থাকলে দুনিয়ায় কার কী ক্ষতি হত!

আমি তো এ-সব ভাবছি, ওদিকে ক্যাবলার ঝাঁঝরি সমানে কাজ করে চলেছে। খানিক পরে হাঁই-মাঁই কাঁই-কাঁই আওয়াজ শুনে তাকিয়ে দেখি, ঝাঁঝরির আক্রমণে জর্জরিত হয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসছে টেনিদা আর হাবুল।

ক্যাবলা হেসে বললে, তোমাদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনবার জন্যে কেমন দাওয়াইটি বের করেছি! দেখলে তো!

টেনিদা গাঁক-গাঁক করে বললে, থাক, বকিসনি! আমরা অজ্ঞান হয়েছিলাম কে বললে তোকে? দুজন চুপি-চুপি প্ল্যান আঁটছিলুম, আর তুই রাস্কেল ঠাণ্ডা জল দিয়ে—

বলেই টেনিদা ফ্যাঁচ করে হেঁচে ফেললে। বললে, ইঃ গেছি—গেছি! এই শীতের সকালে যেভাবে নাইয়ে দিয়েছিস, তাতে এখন ডবল-নিউমোনিয়া না হলে বাঁচি!

ঝণ্টুরামকে জিজ্ঞেস করে কোনো হদিশ পাওয়া গেল না।

সে ডাক-বাংলোয় থাকে না। এখান থেকে মাইলখানেক দূরে তার বাড়ি। আমাদের খাইয়ে-দাইয়ে নিজের বাড়িতে চলে গিয়েছিল। সকালবেলায় এসেছে।

টেনিদা বললে, ওটা কোনো কম্মের নয়—একেবারে গাড়োল! হাবুল সেন মাথা চুলকে বললে, ও নিজেই ভূত কি না সেই কথাটাই বা কেডা কইব? চেহারাখানা দেখতে আছ না? ব্যান তালগাছের থন নাইম্যা আসছে।

আমি আঁতকে উঠলাম: সত্যিই কি ভূত নাকি?

টেনিদা বললে, তোরা দুটোই হচ্ছিস্ গোভূত! জানিস্ নে, ভূত আগুন দেখলেই পালায়? ও ব্যাটা নিজে উনুন ধরিয়ে চা করে দিলে, রাত্তিরে ওর রান্না মুরগির ঝোল আর ভাত দু-হাতে সাঁটলি, সে কথা মনে নেই বুঝি?

আমরা আর সাঁটতে পেরেছি কই—মুরগির দু-এক টুকরো হাড় কেবল চুষতে পেরেছি, বাকি সবটাই টেনিদার পেটে গেছে। কিন্তু এখন আর সে কথা বলে কী হবে!

আমি বললুম, ঝণ্টুরাম ভূত হোক আর না-ই হোক তাতে কিছু আসে যায় না। সোজা কথা হচ্ছে, পটোল যদি তুলতেই হয়, তাহলে পটলডাঙ্গাতে গিয়েই তুলব। এখানে ভূতের হাতে মরতে আমি রাজী নই। আমি আজকেই কলকাতায় ফিরে যাব।

হাবুল উৎসাহিত হয়ে বললে, হ—হ, আমিও সেই কথাই কইতে আছিলাম।

টেনিদা থাঁড়ার মতো নাকটা চুলকোতে লাগল।

আমি বললুম, তোমাদের ইচ্ছে হয় থাক। ভূতেরা ধরে ধরে তোমাদের হাঁড়ি-কাবাব করে খাক—কাটলেট বানাক, রোস্ট করে ফেলুক—আমার কিছুই আপত্তি নেই। আজই আমি পালাব।

www.boiRboi.blogspot.com

টেনিদা বললে, তাই তো! কিন্তু জায়গাটা খাসা—বেশ প্রেমসে খাওয়া-দাওয়াও করা যাচ্ছিল, কিন্তু ভূতগুলোই সব মাটি করে দিলে!

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, হ, সইত্য কথা। এখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইক্যা ভূত-গুলানের কী যে সুখ হয়—তাও তো বুঝি না। আমাগো কইলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম। আর যদি বাইছ্যা বাইছ্যা হেড পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠ্যা বসত, তাহলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্থ করতে হইত না!

—সে তো বেশ ভালো কথা, কিন্তু ভূতগুলোকে সে-কথা বোঝায় কে!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : যেতে চাস তো চল্। কিন্তু সত্যি, ভারি মায়া লাগছে রে! এমন আরাম, এমন খাওয়া-দাওয়া, ঝণ্টেটা আবার রুটির সঙ্গে কতটা করে মাখন দিয়েছিল—দেখেছিস তো? এখানে দিনকয়েক থাকলে আমরা লাল হয়ে যেতুম।

আমি বললাম, তার আগে ভূতেরাই লাল হয়ে যাবে।

টেনিদা সামনে থেকে একটা প্লেট তুলে নিয়ে তার তলায় লেগে-থাকা একটুখানি মাখন চট করে চেটে নিলে। তারপরে আর একটা বুক-ভাঙা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—তাহলে আজই?

আমি আর হাবুল সমস্বরে বললাম, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আজই।

ক্যাবলার কথা এতক্ষণ আমাদের মনেই ছিল না। সেই যে ভোরবেলা ঝাঁঝরি-দাওয়াই দিয়ে আমাদের জ্ঞান ফিরিয়েছে, তারপর আর তার পাত্তা নেই। কোথায় গেল ক্যাবলা?

আমি বললাম, ক্যাবলা গেল কোথায়?

টেনিদা চমকে বললে, তাই তো! সকাল থেকে তো ক্যাবলাকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না!

হাবুল সেন জানতে চাইল : ভূতের সঙ্গে মস্করা করতে আছিল, ভূতে তারে লইয়া যায় নাই তো?

টেনিদা মুখ-টুক কুঁচকে বললে, বয়ে গেছে ভূতের! ওটা যা অখাদ্যি—ওকে ভূতেও হজম করতে পারবে না। কিন্তু গেল কোথায়? আমাদের ফেলেই চম্পট দিলে না তো?

ঠিক এই সময় হঠাৎ বাজখাঁই গলায় গান উঠল :

ছপ্পর পর কৌয়া নাচে, নাচে বগুলা—
আরে রামা হো—হো রামা—

গানটা এমন বেখাপ্পা যে আমি চেয়ারশুদ্ধ উল্টে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম। এ আবার কী রে বাবা! দিন-দুপুরে এসে হানা দিলে নাকি! কিন্তু ভূতে রাম নাম করতে যাবে কোন্ দুঃখে?

ভূত নয়—ক্যাবলা। কোত্থেকে একগাল হাসি নিয়ে বারান্দায় উঠে পড়ল।

—গিয়েছিলি কোথায়? অমন ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছিসই বা কেন?—টেনিদা জানতে চাইলে।

—বলছি—ক্যাবলা করুণ চোখে সামনের পেয়ালা-পিরিচগুলোর দিকে তাকালো : এর মধ্যেই ব্রেকফাস্ট শেষ? আমার জন্যেই কিছু নেই বুঝি?

—সে আমরা জানিনে, ঝণ্টুরাম বলতে পারে।—টেনিদা বললে, ব্রেকফাস্ট পরে করবি, কোথায় গিয়েছিলি তাই বল।

ক্যাবলা মিটমিট করে হেসে বললে, ভূতের খোঁজে গিয়েছিলুম। ভূত পাওয়া গেল না—পাওয়া গেল একঠোঙা চিনেবাদাম।

—চিনেবাদাম!

ক্যাবলা বললে, তাতে অর্ধেক খোসা, অর্ধেক বাদাম। মানে অর্ধেকটা খাওয়ার পরে আর সময় পায়নি।

—কে সময় পায়নি?—আমি বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করলুম।

—জানালার ওধারে ঝোপের ভেতরে বসে যারা মড়ার মাথা ছুঁড়েছিল, তারাই। যদি ভূতও হয়—তাহলে কিন্তু বেশ মডার্ন ভূত, টেনিদা! মানে—বাদাম খায়, মুড়ি খায়, তেলেভাজাও খায়। তেলেভাজার শালপাতা আর মুড়িও পাওয়া গেল-কিনা!

টেনিদা বললে, তার মানে—

ক্যাবলা বললে, তার মানে হল, এসব কোনো বদমাস আদমি কা কারসাজি! তারাই রাত্তিরে অমনি করে যাচ্ছেতাই রকম হেসেছে, ঘরের ভেতরে মড়ার মাথা ফেলেছে—অর্থাৎ আমাদের তাড়ানোর মতলব। তুমি পটলডাঙার টেনিদা—গড়ের মাঠে গোরা পিটিয়ে চ্যাম্পিয়ান—তুমি এ-সব বদমায়েসদের ভয়ে পালাবে এখান থেকে!

—ঠিক জানিস? ভূত নয়?

—ঠিক জানি।—ক্যাবলা বললে, ভূতে তেলেভাজা আর চিনেবাদাম খায়, একথা কে কবে শুনেছে? তার ওপর তারা বিড়িও খেয়েছে। দু-চারটে পোড়া বিড়ির টুকরোও ছিল।

—তাহলে বদমাস লোক!—পটলডাঙার টেনিদা হঠাৎ বুক ঠুকে সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল; মানুষ যদি হয়, তবে বাবাজিদের এবার ঘুঘু আর ফাঁদ দুই-ই দেখিয়ে ছাড়ব! চলে আয় সব—কুইক মার্চ—

বলে এমনিভাবে আমাকে একটা হ্যাঁচকা টান মারল যে আমি ছিটকে সামনের মেঝেয় গিয়ে পড়লুম।

হাবুল সেন প্যাঁচার মতো ব্যাজার মুখে বললে, কোথায় যেতে হবে?

—লোকগুলোর সঙ্গে একবার মোলাকাত করতে। আমরা কলকাতার ছেলে—আমাদের বক দেখিয়ে কেটে পড়বে—ইয়ার্কি নাকি! চল-চল, ভালো করে একবার চারদিকটা ঘুরে দেখি!

ক্যাবলা বললে, কিন্তু আমার ব্রেকফাস্ট—

—সেটা একেবারে লাঞ্চের সময়েই হবে। নে—চল—

হাবুল আর ক্যাবলা উঠে দাঁড়িয়েছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটল স্পষ্ট দিনের আলোয়—সেই বেলা আটটার সময়—ঠিক আমাদের মাথার ওপর কে যেন কর্কশ গলায় বলে উঠল : বাঃ—বেশ, বেশ!

তারপরেই হা-হা করে ঠাট্টার অট্টহাসি!

কে বললে? কে হাসল? কেউ না। মাথার ওপরে টালির চাল আর লাল ইঁটের ফাঁকা দেওয়াল—জন-মানুষের চিহ্নও নেই কোথাও। যেন হাওয়ার মধ্যে থেকে ভেসে এসেছে আশ্চর্য শব্দগুলো।

www.boiRboi.blogspot.com

আট

"ছপ্পর পর কৌয়া নাচে"

রাত নয়—অন্ধকার নয়—একেবারে ফুটফুটে দিনের আলো। দেওয়ালের ওপরে টালির চাল—একটা চড়ুই পাখি পর্যন্ত বসে নেই সেখানে। অথচ ঠিক মনে হল ঐ টালির চাল ফুঁড়েই হাসির আওয়াজটা বেরিয়ে এল।

কী করে হয়? কী করে এমন সম্ভব?

আমরা কি পাগল হয়ে গেছি? না কি ঝন্টুরাম চায়ের সঙ্গে সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়ে দিলে? তাই বা হবে কেমন করে? ক্যাবলা তো চা খায়নি আমাদের সঙ্গে! তবু সেও ওই অশরীরী হাসির আওয়াজটা ঠিক শুনতে পেয়েছে।

প্রায় চার মিনিট ধরে আমরা চার মূর্তি চারটে লাট্টুর মতো বসে রইলুম। আমরা অবশ্য লাট্টুর মতো ঘুরছিলুম না—কিন্তু মগজের সব ঘিলুগুলো ঝনর-ঝনর করে পাক খাচ্ছিল। খাসা ছিলুম পটলডাঙায়, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়ে দিব্যি দিন কাটছিল। কিন্তু টেনিদার প্যাঁচে পড়ে এই ঝন্টিপাহাড়ে এসে দেখছি ভূতের কিল খেয়েই প্রাণটা যাবে!

আরো তিন মিনিট পরে যখন আমার পিলের কাঁপুনি খানিক বন্ধ হল, আমি ক্যাবলাকে বললুম, এবার?

হাবুল সেন গোঁড়া লেবুর মতো চোখ দুটোকে একবার চালের দিকে বুলিয়ে এনে বললে, হ, অখন কও!

টেনিদার খাঁড়ার মতো নাকটা টিয়ার ঠোঁটের মতো সামনের দিকে ঝুলে পড়েছিল। জিভ দিয়ে একবার মুখ-টুখ চেটে টেনিদা বললে, মানে—ইয়ে হল, মানুষ-টানুষ সামনে পেলে চাঁটির চোটে তার নাক-টাক উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু ইয়ে—মানে, ভূতের সঙ্গে তো ঠিক পারা যাবে না—

আমি বললুম, তা ছাড়া ভূতেরা ঠিক বক্সিংয়ের নিয়ম-টিয়মও মানে না—

টেনিদা ধমক দিয়ে বললে, তুই থাম না পুঁটিমাছ!

পুঁটিমাছ বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। যদি ভূতের ভয় আমাকে বেজায় কাবু করে না ফেলত আর পালাজ্বরের পিলেটা টনটনিয়ে না উঠত, আমি ঠিক টেনিদাকে পোনামাছ নাম দিয়ে দিতুম।

ক্যাবলা কিন্তু ভাঙে তবু মচকায় না।

চট করে সে একেবারে সামনের লনে গিয়ে নামল। তারপর মাথা উঁচু করে সে দেখতে লাগল। তারও পরে সে বেজায় খুশি হয়ে বললে, ঠিক ধরেছি। ঐ যে বলছিলুম না?

'ছপ্পর পর কৌয়া নাচে
নাচে বগুলা—'

টেনিদা বলল—মানে?

ক্যাবলা বললে, মানে? মানে হল, চালের ওপর কাক নাচে—আর নাচে বক।

—রাখ তোর বক নিয়ে বকবকানি। কী হয়েছে বল দিকি?

—হবে আর কী। একেবারে ওয়াটারের মতো—মানে পানিকা মাফিক সোজা ব্যাপার। ঐ চালের ওপরে লোক বসেছিল কেউ! সে-ই ওরকম বিটকেল হাসি হেসে আমাদের ভয় দেখিয়েছে।

—সে লোক গেল কোথায়?

—আঃ, নেমে এস না—দেখাচ্ছি সব। আরে ভয় কী—না হয় রাম-রাম জপ করতে করতেই চলে এস এখানে।

—ভয়! ভয় আবার কে পেয়েছে?—টেনিদা শুকনো মুখে বললে, পায়ে ঝিঁ-ঝিঁ ধরেছে কিনা—

ক্যাবলা খিক্-খিক্ করে হাসতে লাগল।

—ভূতের ভয়ে বহুত আদমির অমন করে ঝিঁ-ঝিঁ ধরে। ও আমি অনেক দেখেছি।

এর পরে বসে থাকলে আর দলপতির মান থাকে না। টেনিদা ডিম-ভাজার মতো মুখ করে আস্তে-আস্তে লনে নেমে গেল। অগত্যা আমি আর হাবুলও গুটি-গুটি গেলাম টেনিদার পেছনে পেছনে।

ক্যাবলা বললে, পেছনে ঐ ঝাঁকড়া পিপুল গাছটা দেখছ? আর দেখছ—ওর একটা মোটা ডাল কেমনভাবে বাংলোর চালের ওপর নেমে এসেছে? ঐ ডাল ধরে একটা লোক চালের ওপর নেমে এসেছিল। টালিতে কান পেতে আমাদের কথাগুলো শুনেছে, আর হা-হা করে হেসে ভয় দেখিয়ে ডাল বেয়ে সটকে পড়েছে।

হাবুল আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল: হ, এইটা নেহাত মন্দ কথা কয় নাই। দ্যাখতে আছ না, চালের উপর কতকগুলি কাঁচা পাতা পইড়্যা রইছে? কেউ ঐ ডাল বাইয়া আসছিল ঠিকোই।

—আসছিল তো ঠিকোই—হাবুলের গলা নকল করে টেনিদা বললে, কিন্তু এর মধ্যেই সে গেল কোথায়!

ক্যাবলা বললে, কোথাও কাছাকাছি ওদের একটা আড্ডা আছে নিশ্চয়। মুড়ি আর চিনেবাদাম দেখেই আমি বুঝতে পেরেছি। সেই আড্ডাটাই খুঁজে বের করতে হবে। রাজী আছ?

টেনিদা নাক চুলকে বললে, মানে কথা হল—

ক্যাবলা আবার খিক্-খিক্ করে হেসে উঠল: মানে কথা হল, তোমার সাহস নেই—এই তো? বেশ, তোমরা না যাও আমি একাই যাচ্ছি।

দলপতির মান রাখতে প্রায় প্রাণ নিয়ে টান পড়বার জো! টেনিদা শুকনো হাসি হেসে বললে, যাঃ—যাঃ—বাজে ফ্যাচ-ফ্যাচ করিসনি! মানে, সঙ্গে দু-একটা বন্দুক-পিস্তল যদি থাকত—

আমি বলতে যাচ্ছিলুম, বন্দুক-পিস্তল থাকলেই বা কী হত! কখনো ছুঁড়েছি নাকি ওসব! আর টেনিদার হাতে বন্দুক থাকা মানেই আমরা স্রেফ খরচের খাতায়। ভূত-টুত মারবার আগে টেনিদা আমাদেরই শিকার করে বসত।

ক্যাবলা বলল, বন্দুক দিয়ে কী হবে? তুমি তো এক-এক চড়ে গড়ের মাঠের এক-একটা গোরাকে শুইয়ে দিয়েছ শুনতে পাই। বন্দুক তোমার মতো বীরপুরুষের কী দরকার?

অন্য সময় হলে টেনিদা খুশি হত, কিন্তু এখন ওর ডিম-ভাজার মতো মুখটা প্রায় আলু-কাবলির মতো হয়ে গেল। টেনিদা হতাশ হয়ে বললে, আচ্ছা—চল দেখি একবার!

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা ভরসা দিয়ে বললে, তুমি কিচ্ছু ভেবো না টেনিদা। এসব নিশ্চয় দুষ্টু লোকের কারসাজি। আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে এত ঘেবড়ে যাব? ওদের জারিজুরি ভেঙে দিয়ে তবে কলকাতায় ফিরব, এই বলে দিলাম।

হাবুল ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল : হ! কার জারিজুরি যে কেডা ভাঙবো, সেইটাই ভালো বোঝা যাইতে আছে না!

কিন্তু ক্যাবলা এর মধ্যেই বীরদর্পে পা বাড়িয়েছে। টেনিদা মানের দায়ে চলেছে পেছনে পেছনে। হাবুলও শেষ পর্যন্ত এগোল সুড়সুড় করে। আমি পালাজ্বরের রুগী প্যালারাম, আমার ওসব ধাষ্টামোর মধ্যে এগোনোর মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু একা-একা এই বাংলোয় বসে থাকব—ওরেঃ বাবা! আবার যদি সেই ঘর-ফাটানো হাসি শুনতে পাই—তাহলে আমাকে আর দেখতে হবে না! বাংলোতে হতভাগা ঝন্টুরামটা থাকলেও কথা ছিল, কিন্তু আমাদের খাওয়ার বহর দেখে চা খাইয়ে সামনের গাঁয়ে মুরগি কিনতে ছুটেছে। একা-একা এখানে ভূতের খপ্পরে বসে থাকব, এমন বান্দাই আমি নই।

কোথায় আর খুঁজব—কীই বা পাওয়া যাবে!

তবু চারজনে চলেছি। বাংলোর পেছনেই একটা জঙ্গল অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। জঙ্গলটা যে খুব উঁচু তা নয়—কোথাও মাথা-সমান কোথাও আর একটু বেশি। বেঁটে বেঁটে শাল-পলাশের গাছ—কখনো কখনো ঘেঁটু আর আকন্দের ঝোপ। মাঝখান দিয়ে বেশ একটা পায়ে-চলা পথ এঁকেবেঁকে চলে গেছে। এ-পথ দিয়ে কারা যে হাঁটে কে জানে। তাদের পায়ের পাতা সামনে না পেছন দিকে, তাই বা কে বলবে!

প্রথম-প্রথম বুক দুরু-দুরু করছিল। খালি মনে হচ্ছিল, এক্ষুনি ঝোপের ভেতর থেকে হয় একটা স্কন্ধকাটা, নইলে শাঁকচুন্নি বেরিয়ে আসবে। কিন্তু কিছুই হল না। দুটো-চারটে বুনো ফল—পাখির ডাক আর সূর্যের মিষ্টি নরম আলোয় খানিক পরেই ভয়-ভয় ভাবটা মন থেকে কোথায় মুছে গেল।

গোড়ার দিকে বেশ হুঁশিয়ার হয়েই হাঁটছিলুম—যাচ্ছিলুম ক্যাবলার পাশাপাশি। তারপর দেখি একটা বৈঁচি গাছ—ইয়া-ইয়া বৈঁচি পেকে কালো হয়ে রয়েছে। একটা ছিঁড়ে মুখে দিয়ে দেখি—অমৃত! তারপরে আরো একটা—তারপরে আরো একটা—

গোটা-পঞ্চাশেক খেয়ে খেয়াল হল, ওরা অনেকখানি এগিয়ে গেছে! তাড়াতাড়ি ওদের সঙ্গ ধরতে হবে—হঠাৎ দেখি আমার পাশেই ঝোপের মধ্যে—

লম্বা শাদা মতো কী ওটা? নির্ঘাৎ ল্যাজ! কাঠবেড়ালির ল্যাজ!

কাঠবেড়ালি বড় ভালো জিনিস। ডক্টার মামা কোত্থেকে একবার একটা এনেছিল, সেটা তার কাঁধের ওপর চড়ে বেড়াত, জামার পকেটে শুয়ে থাকত। ভারি পোষ মানে। সেই থেকে আমারও কাঠবেড়ালি ধরবার বড় শখ। ধরি না খপ করে ওর ল্যাজটা চেপে!

যেন ওদিকে তাকাচ্ছিই না—এমনিভাবে গুটি-গুটি এগিয়ে টক করে কাঠ-বেড়ালির ল্যাজটা আমি ধরে ফেললুম। তারপরেই হেঁইয়ো টান!

কিন্তু কোথায় কাঠবেড়ালি! যেই টান দিয়েছি, অমনি হাঁই-মাই করে একটা বিকট দানবীয় চিৎকার। সে চিৎকারে আমার কানে তালা লেগে গেল। তারপরেই কোথা থেকে আমার গালে এক বিরাশি সিক্কার চড়। ভৌতিক চড়।

সেই চড় খেয়ে আমি শুধু সর্ষের ফুলই দেখলুম না। সর্ষে, কলাই, মটর, মুগ পাট, আম, কাঁঠাল—সব-কিছুর ফুলই এক সঙ্গে দেখতে পেলুম। তারপরেই—

সেই ঝোপের ভেতরে সোজা চিত। একেবারে পতন ও মূর্ছা। মরেই গেলুম কি না কে জানে!

নয়

—'কাঠবেড়ালির ল্যাজ নয় রে ওটা কাহার দাড়ি?'

যখন জ্ঞান হল তখন দেখি, আমি ডাক-বাংলোর খাটে লম্বা হয়ে আছি। ঝাঁটু মাথার সামনে দাঁড়িয়ে আমায় হাওয়া করছে, ক্যাবলা পায়ের কাছে বসে মিটমিটে চোখে তাকিয়ে আছে আর পাশে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে টেনিদা ঘুঘুর মতো বসে রয়েছে।

ঝাঁটুর হাতের পাখাটা খটাস করে আমার নাকে এসে লাগতেই আমি বললুম, উফ্!

চেয়ার ছেড়ে টেনিদা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল : যাক, তাহলে এখনো তুই মারা যাসনি!

ক্যাবলা বললে, মারা যাবে কেন? থোড়াসে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল। আমি তো বলেইছিলুম টেনিদা, ওর নাকে একটুখানি লঙ্কা পুড়িয়ে ধোঁয়া দাও—এক্ষুনি চাঙা হয়ে উঠবে।

টেনিদা বললে, আর লঙ্কা-পোড়া! যেমনভাবে দাঁত ছরকুটে পড়েছিল, দেখে তো মনে হচ্ছিল, পটলডাঙা থেকে এখানে এসেই বুঝি শেষ পর্যন্ত পটোল তুলল।

মাঝখান থেকে ঝাঁটু বিচ্ছিরি রকমের আওয়াজ করে হেসে বললে, দাদাবাবু ডর খিয়েছিলেন!

ক্যাবলা বললে, যাঃ-যাঃ, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না! এখন শীগ্‌গির এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে আয় দেখি!

ঝাঁটু পাখা রেখে বেরিয়ে গেল।

আমি তখনো চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখছি। ডান চোয়ালে অসম্ভব ব্যথা। এমন চড় হাঁকড়েছে যে, গোটাদুয়েক দাঁত বোধহয় নড়িয়েই দিয়েছে একেবারে। চড়ের মতো চড় একখানা! অঙ্কের মাস্টারের বিরাশি সিক্কার চাঁটি পর্যন্ত এর কাছে একেবারে সুগন্ধি তিন নং পরিমল নস্যি। আমি পটলডাঙার রোগা ডিগডিগে প্যালারাম, পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই, এমন একখানা ভৌতিক

www.boiRboi.blogspot.com

চপেটাঘাতের পরেও আমার আত্মারাম কেন যে খাঁচাছাড়া হয়নি, সেইটেই আমি বুঝতে পারছিলুম না।

টেনিদা বললে, আচ্ছা পুঁটিমাছ, তুই হঠাৎ ডাক ছেড়ে অমন করে অজ্ঞান হয়ে গেলি কেন?

এ অবস্থাতেও পুঁটিমাছ শুনে আমার ভয়ানক রাগ হল, চোয়ালের ব্যথা-ট্যথা সব ভুলে গেলুম। ব্যাজার হয়ে বললুম, আমি পুঁটিমাছ আছি বেশ আছি, কিন্তু ওরকম একখানা বোম্বাই চড় খেলে তুমি ভেট্‌কিমাছ হয়ে যেতে! কিংবা ট্যাপামাছ!

ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, চাঁটি আবার তোকে কে মারলে?

—ভূত!

টেনিদা বললে, ভূত! ভূতের আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই। খামোকা তোকে চাঁটি মারতে গেল? তাও সকালবেলায়? পাগল না পেট-খারাপ?

ক্যাবলা বললে, পেট-খারাপ। এদিকে ঐ তো রোগা ডিগডিগে চেহারা, ওদিকে পেঁাছে অবধি সমানে মুরগি আর আন্ডা চালাচ্ছে। অত সইবে কেন? পেট-গরম হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। ভূত-টুত সব বোগাস।

টেনিদা সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলে, ঠিক। আমিও ওই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম।

ডান চোয়ালটা চেপে ধরে আমি এবার বিছানার ওপরে উঠে বসলুম।

—তোমরা বিশ্বাস করছ না?

টেনিদা বললে, একদম না। ভূতে আর চাঁটি মারবার লোক পেলে না!

ক্যাবলা মাথা নাড়ল; বটেই তো। আমাদের লীডার টেনিদার অ্যায়সা একখানা জুৎসই গাল থাকতে তোর গালেই কিনা চাঁটি হাঁকড়াবে? ওতে লীডারের অপমান হয়—তা জানিস?

শুনে টেনিদা কটমট করে ক্যাবলার দিকে তাকালো।

—ঠাট্টা করছিস?

ক্যাবলা তিড়িং করে হাত-পাঁচেক দূরে সরে গেল। জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ! তোমাকে ঠাট্টা! শেষে যে গাঁট্টা খেয়ে আমার গালপাট্টা উড়ে যাবে! আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যান্ডশেকই করুক আর বক্সিংই জুড়ে দিক, লেকিন ওটা দলপতির সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর।

টেনিদার কথাটা ভালো লাগল না। মুখটাকে হালুয়ার মতো করে বললে, যা-যাঃ, বেশি ক্যাঁচোর-ম্যাচোর করিসনি। কিন্তু তোকেও বলে দিচ্ছি প্যালা, এবেলা থেকে তোর ডিম খাওয়া একেবারে বন্ধ। স্রেফ কাঁচকলা দিয়ে গাঁদালের ঝোল, আর রাত্তিরে সাবু-বার্লি। আজকে মুচ্ছো গিয়েছিলি, দু-চারদিন পরে একেবারেই যে মারা যাবি!

আমি রেগে বললুম, ধ্যাত্তোর তোমার সাবু-বার্লির নিকুচি করেছে! বলছি সত্যিই ভূতে চাঁটি মেরেছে, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না!

ক্যাবলা বললে, বটে?

টেনিদা বললে, থাম, আর চালিয়াতি করতে হবে না।

আমি আরো রেগে বললুম, চালিয়াতি করছি নাকি? তাহলে এখনো আমার ডান গালটা টনটন করছে কেন?

টেনিদা বললে, অমন করে। খামোকাই তো লোকের দাঁত কন্‌কন্ করে, মাথা বন্‌বন্ করে, কান ভোঁ-ভোঁ করতে থাকে—তাই বলে তাদের সকলকে ধরেই কি ভূতে ঠ্যাঙায় নাকি?

আমি এবারে মনে ভীষণ ব্যথা পেলুম। এত কষ্টে-সৃষ্টে যদিই বা গালে একটা

ভূতুড়ে চড় খেয়েছি, কিন্তু এই হতভাগারা কিছুতেই তা বিশ্বাস করছে না। ওরা নিজেরা খেতে পায়নি কিনা, তাই বোধহয় ওদের মনে হিংসে হয়েছে।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললুম, কেন বিশ্বাস করছ না বলো তো? তোমরা তো গুটি-গুটি সামনে এগিয়ে গেলে। এর মধ্যে গোটাকয়েক বৈঁচি-টৈঁচি খেয়ে আমি দেখলুম, ঝোপের মধ্যে একটা কাঠবেড়ালির ল্যাজ নড়ছে। যেই সেটাকে খপ করে চেপে ধরেছি, অমনি—

—অমনি কাঠবেড়ালি তোকে চড় মেরেছে?—বলেই টেনিদা হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগল। আবার ক্যাবলার নাক-মুখ দিয়ে শেয়ালের ঝগড়ার মতো খিক্-খিক্ করে কেমন একটা আওয়াজ বেরোতে শুরু করল।

এই দারুণ অপমানে আমার পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলেটা নাচতে লাগল। আর সেই সঙ্গেই হঠাৎ নিজের ডানহাতের দিকে আমার চোখ পড়ল। আমার মুঠোর মধ্যে—

একরাশ শাদা শাদা রোঁয়া। সেই ল্যাজটারই খানিক ছিঁড়ে এসেছে নিশ্চয়।

সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে বললাম, এই দ্যাখো, এখনো কী লেগে রয়েছে আমার হাতে!

ক্যাবলা এক লাফে এগিয়ে এল সামনে। টেনিদা থাবা দিয়ে রোঁয়াগুলো তুলে নিলে আমার হাত থেকে।

তারপর টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : এ যে—এ যে—

ক্যাবলা আরো জোরে চেঁচিয়ে বললে, দাড়ি।

টেনিদা বললে, পাকা দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, তাতে আবার পাটকিলে রঙ। তামাক-খাওয়া দাড়ি!

টেনিদা বললে, ভূতের দাড়ি!

ক্যাবলা বললে, তামাকখেকো ভূতের দাড়ি!

ভূতের দাড়ি! শুনে আর একবার আমার হাত-পা পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে যাওয়ার জো হল। কী সর্বনাশ—করেছি কী! শেষে কি কাঠবেড়ালির ল্যাজ টানতে গিয়ে ভূতের দাড়ি ছিঁড়ে এনেছি? তাই অমন একখানা মোক্ষম চড় বসিয়েছে আমার গালে! কিন্তু একখানা চড়ের ওপর দিয়েই কি আমি পার পাব? হয়ত কত যত্নের দাড়ি, কত রাত-বিরেতে শ্যাওড়া গাছে বসে ওই দাড়ি চুমরে-চুমরে ভূতটা খাম্বাজ-রাগিণী গাইত! অবশ্য খাম্বাজ রাগিণী কাকে বলে আমার জানা নেই, তবে নাম শুনলেই মনে হয়, ও-সব রাগ-রাগিণী ভূতের গলাতেই খোলতাই হয় ভালো।—আমি সেই সাধের দাড়ি ছিঁড়ে নিয়েছি, এখন মাঝরাতে এসে আমার মাথার চুলগুলো উপড়ে নিয়ে না যায়! ক্যাবলা আর টেনিদা দাড়ি নিয়ে গবেষণা করুক—আমি হাত-পা ছেড়ে আবার বিছানার ওপর ধপাস্ করে শুয়ে পড়লুম।

ক্যাবলা দাড়িগুলো বেশ মন দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে বললে, কিন্তু টেনিদা—ভূতে কি তামাক খায়?

—কেন, খেতে দোষ কী?

—মানে ইয়ে কথা হল—ক্যাবলা মাথা চুলকে বললে, লেকিন বাত এহি হ্যায়, ভূতে তো শুনেছি আগুন-টাগুন ছুঁতে পারে না—তাহলে তামাক খায় কী করে? তাছাড়া আমার মনে হচ্ছে—এমনি পাকা, এমনি পাটকিলে-রঙ-মাখানো দাড়ি যেন আমার চেনা, যেন এ দাড়িটা কোথায় আমি দেখেছি—

ক্যাবলা আরো কী বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দু-পাটি জুতো হাতে করে ঘরের মধ্যে

www.boiRboi.blogspot.com

ঝাঁটু এসে ঢুকল। টেনিদার মুখের সামনে জুতো-জোড়া তুলে ধরে বললে, এই দেখুন দাদাবাবু—

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে, ব্যাটা কোথাকার গাড়োল রে! বলা হল প্যালার খাওয়ার জন্য দুধ আনতে, তুই আমার মুখের কাছে জুতোজোড়া এনে হাজির করলি? আমি কি ওদুটো চিবোব নাকি বসে বসে?

ঝাঁটু বললে, রাম-রাম! জুতো তো কুত্তা চিবোবে, আপনি কেন? আমি বলছিলাম, হাবুলবাবু কুথা গেল! জুতোটা বাহিরে পড়েছিল, হাবুলবাবুকে তো কোথাও দেখলম না। ফির জুতোর মধ্যে একটা চিঠি দেখলম, তাই নিয়ে এলম।

জুতোর মধ্যে চিঠি? আরে, তাই তো বটে। আমি জ্ঞান হওয়ার পরে তো সত্যিই এ ঘরে হাবুল সেনকে দেখতে পাইনি!

ক্যাবলা বললে, তাই তো! জুতোর ভেতরে চিঠির মতো একটা কী রয়েছে যে! ব্যাপার কী, টেনিদা? হাবুলটাই বা গেল কোথায়?

টেনিদা ভাঁজ-করা কাগজটা টেনে বের করে বললে, দাঁড়া না কাঁচকলা, আগে দেখি চিঠিটা।

কিন্তু চিঠির ওপর চোখ বুলোতেই—সে দুটো তড়াক করে একেবারে টেনিদার কপালে চড়ে গেল। বার-তিনেক খাবি খেয়ে টেনিদা বললে, ক্যাবলা রে, আমাদের বারোটা বেজে গেল!

—বারোটা বেজে গেল! মানে?

—মানে—হাবুল 'গন?'

—কোথায় 'গন?'—আমি আর ক্যাবলা একসঙ্গেই চেঁচিয়ে উঠলাম : চিঠিতে কি আছে টেনিদা? কী লেখা ওতে?

ভাঙা গলায় টেনিদা বললে, তবে শোন, পড়ি।

চিঠিতে লেখা ছিল :

'হাবুল সেনকে আমরা ভ্যানিশ করিলাম। যদি পত্রপাঠ চাঁটি-বাঁটি তুলিয়া আজই কলিকাতায় রওনা হও, তবে যাওয়ার আগে অক্ষত শরীরে হাবুলকে ফেরত পাইবে। নতুবা পরে তোমাদের চার মূর্তিকেই আমরা ভ্যানিশ করিব—এবং চিরতরেই তাহা করিব। আগে হইতেই সাবধান করিয়া দিলাম, পরে দোষ দিতে পারিবে না।

ইতি—ঘচাং ফুঃ। দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু।'

দশ

'দস্যু ঘচাং ফুঃ'

টেনিদা ধপাস্ করে মেঝের ওপর বসে পড়ল। ওর নাকের সামনে অনেকক্ষণ ধরে একটা পাহাড়ি মৌমাছি উড়ছিল, অত বড় নাকটা দেখে বোধহয় ভেবেছিল, ওখানে একটা জুৎসই চাক বাঁধা যায়। হঠাৎ টেনিদার নাক থেকে ঘড়াৎ-ঘড় করে এমনি একটা আওয়াজ বেরুলো যে—সেটা ঘাবড়ে গিয়ে হাত তিনেক দূরে ঠিক্‌রে পড়ল।

লীডারের অবস্থা তখন সঙীন। করুণ গলায় বললে, ওরে বাবা—গেলুম! শেষকালে কিনা চীনে দস্যুর পাল্লায়! এর চেয়ে যে ভূতও অনেক ভালো ছিল!

আমার হাত-পাগুলো তখন আমার পিলের ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছে। বললুম, তার নাম আবার ঘচাং ফুঃ! অর্থাৎ ঘচাং করে গলা কেটে দেয়...তারপর ফুঃ করে উড়িয়ে দেয়!

ঝাঁটু মিটমিট করে তাকাচ্ছিল। আমাদের অবস্থা দেখে আশ্চর্য হয়ে বললে, বেপার কী বটেক দাদাবাবু?

ক্যাবলা বললে, বেপার? বেপার সাঙ্ঘাতিক। হ্যাঁ রে ঝাঁটু, এখানে ডাকাত-ফাকাত আছে নাকি?

—ডাকাত?—ঝাঁটু বললে, ডাকাত ফির ইখানে কেনে মরতে আসবেক? ই তল্লাটে উসব নাই।

—নাঃ, নেই!—মুখখানাকে কচু-ঘণ্টর মতো করে টেনিদা খেঁকিয়ে উঠল : তবে ঘচাং ফুঃ কোত্থেকে এল? তাও আবার যে-সে নয়—একেবারে দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যু!

ক্যাবলা কী পাখোয়াজ ছেলে! কিছুতেই ঘাবড়ায় না। বললে, আরে দুত্তোর—রেখে দাও ওসব? দেখলে তো, তাহলে কিছু নয়, সব ধাপ্পা! ঘচাং ফুঃর তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই—এই হাজারিবাগের পাহাড়ি বাংলোয় এসে ভ্যারেণ্ডা ভাজবে! আসলে ব্যাপার কী জানো? স্রেফ বাংলা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস।

—বাংলা ডিটেক্‌টিভ উপন্যাস!—টেনিদা চোয়াল চুলকোতে চুলকোতে বললে : মানে?

—মানে? মানে আবার কী? ঐ এন্‌তার সব গোয়েন্দা গল্প—যে-সব গল্পে পুকুরে সাবমেরিন ভাসায়, আর যাতে করে বাঙালী গোয়েন্দা দুনিয়ার সব অসাধ্য সাধন করে—সেই সমস্ত বই পড়ে এদের মাথায় এগুলো ঢুকছে। আমার বড়মামা লালবাজারে চাকরি করে, তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম—এই গোয়েন্দারা কোথায় থাকে। বড়মামা রেগে গিয়ে যাচ্ছেতাই করে বললে, কি একটা কল্‌কেতে থাকে।

—চুলোয় যাক গোয়েন্দা। টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, তার সঙ্গে ঘচাং ফুঃর সম্পর্ক কী?

—আছে—আছে!—ক্যাবলা সবজান্তার মতো বললে, যারা এই চিঠি লিখেছে, তারা গোয়েন্দা-গল্প পড়ে। পড়ে-পড়ে আমাদের ওপরে একখানা চালিয়াতি খেলেছে।

www.boiRboi.blogspot.com

—কিন্তু এ-রকম চালিয়াতি করার মানে কী? আমাদের এখান থেকে তাড়াতেই বা চায় কেন? আর হাবুল সেনকেই বা কোথায় নিয়ে গেল?

ক্যাবলা বললে, সেইটেই তো রহস্য! সেটা ভেদ করতে হবে। কতকগুলো পাজি লোক নিশ্চয়ই আছে—আর কাছাকাছিই কোথাও আছে। কিন্তু এই চিঠিটা দিয়ে এরা মস্ত উপকার করেছে টেনিদা!

—উপকার?—টেনিদা বললে, কিসের উপকার?

—একটা জিনিস তো পরিষ্কার বোঝা গেল, জিন-টিন এখানে কিচ্ছু নেই—ওসব একদম ভোঁ-কাট্টা! কতকগুলো ছ্যাঁচড়া লোক কোথাও লুকিয়ে রয়েছে—এ বাড়িটায় তাদের দরকার। আমরা এসে পড়ায় তাদের অসুবিধে হয়েছে—তাই আমাদের তাড়াতে চায়।—ক্যাবলা বুক টান করে বললে, কিন্তু আমরা পটলডাঙার ছেলে হয়ে একদল ছিঁচকে লোকের ভয়ে পালাবো টেনিদা? ওদের টাকের ওপরে টেক্কা মেরে জানিয়ে দিয়ে যাব, ওরা যদি ঘচাং ফুঃ হয়—তাহলে আমরা হচ্ছি কচাং কুঃ!

—কচাং কুঃ!—আমি বললুম, সে আবার কী?

ক্যাবলা বললে, বাঘা চৈনিক দস্যু! দুর্ধর্ষের ওপর আর-এক কাঠি!

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, আমরা আবার চীনে হলুম কবে? দস্যুই বা হতে যাব কোন্ দুঃখে?

ক্যাবলা বললে, ওরা যদি চৈনিক হয়—আমাদেরই বা হতে দোষ কী? আমরাও ঘোরতর চৈনিক। ওরা যদি দস্যু হয়—আমরা নস্যু!

—নস্যু!—টেনিদার নাক-বরাবর আবার সেই মৌমাছিটা ফিরে আসছিল, সেটাকে তাড়াতে তাড়াতে টেনিদা বললে, নস্যু কাকে বলে?

—মানে, দস্যুদের যারা নস্যির মতো নাক দিয়ে টেনে ফেলে তারাই হল নস্যু।

টেনিদা উঠে দাঁড়িয়ে বললে, দ্যাখ ক্যাবলা, সব জিনিস নিয়ে ইয়ার্কি নয়! যদি সত্যিই ওরা ডাকাত-টাকাত হয়—

ডাকাত হলে অনেক আগেই ওদের মুরোদ বোঝা যেত। বসে-বসে ঝোপের মধ্যে চিনেবাদাম খেত না, কিংবা কাগজে জড়িয়ে মড়ার মাথা ছুঁড়ত না। ওরাও এক নম্বর কাওয়ার্ড!

—তাহলে হাবুল সেনকে নিয়ে গেল কী করে?

—নিশ্চয়ই কোনো কায়দা করেছে। কিন্তু সে কায়দাটা সমঝে ফেলতে বহুৎ সময় লাগবে না। টেনিদা—

—কী?

—আর দেরি নয়। রেডি?

টেনিদা বললে, কিসের রেডি?

—ঘচাং ফুঃ-দের কচাং কুঃ করতে হবে! আজই, এক্ষুনি!

টেনিদা তখনো সাহস পাচ্ছিল না। কুঁকড়ে গিয়ে বললে, সে কী করে হবে?

—হয়ে যাবে একরকম। এই বাংলোর কাছাকাছিই ওদের কোন গোপন আস্তানা আছে। হানা দিতে হবে সেখানে গিয়ে।

—ওরা যদি পিস্তল-টিস্তল ছোঁড়ে?

—আমরা ইঁট ছুঁড়ব!—ক্যাবলা ভেংচি কেটে বললে, রেখে দাও পিস্তল! গোয়েন্দা-গল্পে ওসব কথায় কথায় বেরিয়ে আসে, আসলে পিস্তল অত সস্তা নয়। হ্যাঁ—গোটাকয়েক লাঠি দরকার। এই ঝাঁটু—লাঠি আছে রে?

ঝাঁটু চুপচাপ সব শুনছিল। কী বুঝছিল কে জানে, মাথা নেড়ে বললে, দুটো

আছে। একটো বল্লমও আছে।

—তবে নিয়ে আয় চটপট।

—লাঠি-বল্লমে কি হবেক দাদাবাবু?—ঝাঁটুর বিস্মিত জিজ্ঞাসা।

—শেয়াল মারা হবেক।

—শেয়াল মারা? কেনে? মাংস খাবেন?

—অত খবরে তোর দরকার কী?—ক্যাবলা রেগে বললে, যা বলছি তোকে তাই কর। শীগ্‌গির নিয়ে আয় ওগুলো। চটপট।

ঝাঁটু লাঠি বল্লম আনতে গেল। টেনিদা শুকনো গলায় বললে, কিন্তু ক্যাবলা, এ বোধহয় ভালো হচ্ছে না। যদি সত্যিই বিপদ-আপদ হয়—

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, অঃ—তুম্‌হারা ডর লাগ গিয়া? বেশ, তুমি তাহলে বাংলোয় বসে থাকো। আমি তো যাবোই—এমনকি পালাজ্বরে-ভোগা এই প্যালাটাও আমার সঙ্গে যাবে। দেখবে, তোমার চাইতে ওরও বেশি সাহস আছে।

শুনে আমার বুক ফুলে উঠল বটে, কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে পালাজ্বরের পিলেটাও নড়-নড় করে উঠল—আমাকেও যেতে হবে! বেশ, তাই যাব! একবার ছাড়া তো দু'বার মরব না।

আর আমি মারা গেলে—হ্যাঁ, মা কাঁদবে, পিসিমা কাঁদবে, বোধহয় সেকেণ্ডারি বোর্ডও কাঁদবে—কারণ, বছর-বছর স্কুল-ফাইন্যালের ফি দেবে কে? আর বৈঠকখানা বাজারে দৈনিক আধপো পটোল আর চারটে শিঙিমাছ কম বিক্রি হবে—এক ছটাক বাসকপাতা বেঁচে যাবে রোজ। তা যাক! এমন বীরত্বপূর্ণ আত্মত্যাগের জন্যে সংসারের একটু-আধটু ক্ষতি নয় হলই বা!

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—তবে যাই! কিন্তু প্যালার সেই দাড়িটা—

বললুম, তামাকখেকো দাড়ি।

ক্যাবলা বললে, ঠিক। মনেই ছিল না। ওই দাড়ি থেকেই আরো প্রমাণ হয়—ওরা চৈনিক নয়। কলকাতায় তো এত চীনা মানুষ আছে—কারু দাড়ি দেখেছো কখনো?

তাই তো! দাড়িওলা চীনা মানুষ! না, আমরা কেউ তো দেখিনি। কখনো না।

এর মধ্যে ঝাঁটু লাঠি আর বল্লম এনে ফেলেছে। বল্লমটা ঝাঁটুই নিলে, একটা লাঠি নিলে ক্যাবলা—আর-একটা টেনিদা। আমি আর কী নিই? হাতের কাছে একটা চ্যালাকাঠ পড়েছিল, সেইটেই কুড়িয়ে নিলুম। যদি মরতেই হয়, তবু তো এক ঘা বসাতে পারব!

অতঃপর ঘচাং ফুঃ দস্যুর দলকে একহাত নেবার জন্যে দস্যু কচাং কুঃর দল আবার রওনা হল বীরদর্পে। আবার সেই বুনো রাস্তা। আমরা ঝোপ-ঝাপ ঠেঙিয়ে-ঠেঙিয়ে দেখছিলুম, কোথাও সেই তামাকখেকো লুকিয়ে আছে কি না।

কিন্তু আবার আমি বিপদে পড়ে গেলুম। এবার বেঁচি নয়—কামরাঙা।

বাংলোর ঠিক পেছন দিয়ে আমরা চলেছি। আমি যথানিয়মে পেছিয়ে পড়েছি—আর ঠিক আমারই চোখে পড়েছে কামরাঙার গাছটা। আঃ, ফলে-ফলে একেবারে আলো হয়ে রয়েছে!

নোলায় প্রায় সেরটাক জল এসে গেল। জ্বরে ভুগে-ভুগে টক খাবার জন্যে প্রাণ ছটফট করে। ঘচাং ফুঃ-টুঃ সব ভুলে গিয়ে গুটি-গুটি গেলুম কামরাঙা গাছের দিকে। কলকাতায় এসব কিছুই খেতে পাই না—চোখের সামনে অমন খোলতাই কামরাঙার বাহার দেখলে কার আর মাথা ঠিক থাকে!

যেই গাছতলায় পা দিয়েছি—

www.boiRboi.blogspot.com

সঙ্গে-সঙ্গেই—ইঃ! একতাল গোবরে পা পড়ল—আর তক্ষুনি এক আছাড়। কিন্তু একি! আছাড় খেয়ে আমি তো মাটিতে পড়লুম না! আমি যে মহাশূন্যের মধ্যে দিয়ে পাতালে চলেছি! কিন্তু পাতালেও নয়। আমি একেবারে সোজা কার মস্ত একটা ঘাড়ের ওপর অবতীর্ণ হলুম। 'অঁই দাদা রে—' বলে সে আমাকে নিয়ে একেবারে পপাত।

আমি আর একবার অজ্ঞান।

এগারো

গজেশ্বরের পাল্লায়

অজ্ঞান হয়ে থাকাটা মন্দ নয়—যতক্ষণ কাঠপিঁপড়েতে না কামড়ায়। আর যদি একসঙ্গে এক ঝাঁক পিঁপড়ে কামড়াতে শুরু করে—তখন? অজ্ঞান তো দূরের কথা, মরা মানুষ পর্যন্ত তিড়িং করে লাফিয়ে ওঠে!

আমিও লাফ মেরে উঠে বসলুম।

কেমন আবছা-আবছা অন্ধকার—গোড়াতে কিছু ভালো বোঝা গেল না! চোখে ধোঁয়া-ধোঁয়া ঠেকছিল। খামোকা বাঁ-কানের ওপর কটাৎ করে আর-একটা কাঠপিঁপড়ের কামড়।

—বাপ রে—বলে আমি কান থেকে পিঁপড়েটা টেনে নামালুম!

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ কটকটে ব্যাঙের মতো আওয়াজ করে কে যেন হেসে উঠল। তারপর, ঘোড়ার নাকের ভেতর থেকে যেমন শব্দ হয় তেমনি করে কে যেন বললে, কাঠপিঁপড়ের কামড় খেয়ে বাপ রে-বাপ রে বলছ, এর পরে যখন ভীমরুলে কামড়াবে, তখন যে মেসোমশাই-মেসোমশাই বলে ডাক ছাড়তে হবে!

তাকিয়ে দেখি—

ঠিক হাত দুয়েক দূরে একটা মুশকো জোয়ান ভাম-বেড়ালের মতো থাবা পেতে বসে আছে। কথাটা বলে সে আবার কটকটে ব্যাঙের মতো শব্দ করে হাসল।

আমার তখন সব কি-রকম গোলমাল ঠেকছিল। বললুম, আমি কোথায়?

—আমি কোথায়!—লোকটা একরাশ বিচ্ছিরি বড়-বড় দাঁত বের করে আমায় ভেংচে দিলে। তারপর ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, আহা-হা, ন্যাকা আর-কি! যেন ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না! হঠাৎ ওপর থেকে দুড়ুম

করে পাকা তালের মতো আমার পিঠের ওপর এসে নামলে, আর এখন সোনামুখ করে বলছ—আমি কোথায়! ইয়ার্কির আর জায়গা পাওনি?

আমার সব মনে পড়ে গেল। সেই পাকা কামরাঙা—গুটি গুটি পায়ে সেদিকে এগোনো, গোবরে পা পিছলে পড়া—তারপরে—

আমি হাঁউ-মাউ করে বললুম, তবে কি আমি দস্যু ঘচাং ফুঃর আস্তায় এসে পড়েছি?

—ঘচাং ফুঃ? সে আবার কী?—বলেই লোকটা সামলে নিল: হ্যাঁ—হ্যাঁ, ঠিক বটে। বাবাজি অমনি একটা কী লিখেছিল বটে চিঠিতে।

—বাবাজি? কে বাবাজি?

একটু পরেই টের পাবে!—লোকটা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চালাকি পেয়েছ? এত করে চলে যেতে বললুম—ভূতের ভয় দেখানো হল—সারা রাত মশার কামড় খেয়ে ঝোপের মধ্যে বসে মড়ার মাথা-ফাতা ছুঁড়লুম—অট্টহাসি হেসে-হেসে গলা ব্যথা হয়ে গেল—তবু তোমাদের গেরাহ্যি হয় না? দাঁড়াও এবার! একটাকে ভোগা দিয়ে এনেছি—তুমিও এসে ফাঁদে পড়েছ; এবার তোমায় শিককাবাব বানিয়ে খাব!

—অ্যাঁ—শিককাবাব!

—ইচ্ছে হলে আলু-কাবলিও বানাতে পারি। কিংবা ফাউল-কাটলেট। চপও করা যায় বোধহয়। কিন্তু লোকটা চিন্তিতভাবে একবার মাথা চুলকালো, কিন্তু তোমাদের কি খাওয়া যাবে? এ পর্যন্ত অনেক ছোকরা আমি দেখেছি, কিন্তু তোমাদের মতো অখাদ্য জীব কখনো দেখিনি!

শুনে আমার কেমন ভরসা হল। মরতেই তো বসেছি—তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি।

বললুম, সে-কথা ভালো! আমাদের খেয়ো না—অন্ততঃ আমাকে তো নয়ই! খেলেও হজম করতে পারবে না। কলেরা হতে পারে, গায়ে চুলকুনি হতে পারে, ডিপথিরিয়া হতে পারে—এমনকি সর্দি-গর্মি হওয়াও আশ্চর্য নয়!

লোকটা বললে, থামো ছোকরা—বেশি বকবক কোরো না! আপাততঃ তোমায় নিয়ে যাব ঠান্ডী গারদে—তোমার দোস্ত হাবুল সেনের কাছে! সেইখানেই থাকো এখন। ইতিমধ্যে বাবাজি ফিরে আসুন, তোমার বাকি দুটো দোস্তকেও পাকড়াও করি—তারপর ঠিক করা যাবে তোমাদের দিয়ে মোগলাই পরোটা বানানো হবে—না ডিমের হালুয়া।

আমি বললুম, দোহাই বাবা, আমাকে খেয়ো না! খেয়ে কিছু সুখ পাবে না—তা বলে দিচ্ছি। আমি পালাজ্বরে ভুগি আর পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খাই—কিচ্ছু রস-কস নেই। আমাদের অঙ্কের মাস্টার গোপীবাবু বলেন, আমি যমের অরুচি। আমাকে খেয়ে বেঘোরে মরা যাবে বাবা ঘচাং ফুঃ—

লোকটা রেগে বললে, আরে রেখে দাও তোমার ঘচাং ফুঃ—ঘচাং ফুঃর নিকুচি করেছে! কেন বাপু, রাঁচির গাড়িতে বসে গুরুদেবের রসগোল্লা আর মিহিদানা খাওয়ার সময় মনে ছিল না? তাঁর যোগসর্পের হাঁড়ি সাবাড় করার সময় বুঝি এ কথা খেয়াল ছিল না যে আমাদেরও দিন আসতে পারে? নেহাত মুরি স্টেশনে কলার খোসায় পা পিছলে পড়ে গিয়েছিলুম—নইলে—

আমি ততক্ষণে হাঁ হয়ে গেছি। আমার চোখ দুটো ছানাবড়া নয়—একেবারে ছানার ডালনা!

অ্যাঁ, তাহলে তুমি—

www.boiRboi.blogspot.com

—চিনেছ এতক্ষণে? আমি গুরুদেবের অধম শিষ্য গজেশ্বর গাড়ুই।

—অ্যাঁ!

গজেশ্বর মিটমিট করে হেসে বললে, ভেবেছিলে মুরি স্টেশন পার হয়ে গাড়ি চলে গেল, আর তোমরাও পার পেলে! আমরা যে তার পরের গাড়িতেই চলে এসেছি, সেটা তো আর টের পাওনি! এবারে বুঝবে কত ধানে কত চাল হয়!

ভয়ে আমার বুকের রক্ত জল হয়ে গেল। বেশ বুঝতে পারলুম, পটলডাঙার প্যালারামের এবার বারোটা বেজে গেছে—ওই গজেশ্বর ব্যাটা এবার আমায় নির্ঘাৎ 'সামী কাবাব' বানিয়ে খাবে। নেহাত যখন মরবই, তখন ভয় করে কী হবে? বরং গজেশ্বরের সঙ্গে একটু ভালো করে আলাপ করি।

—কিন্তু তোমরা এখানে কেন? ক্যাবলার মেসোমশাইয়ের বাংলোতে তোমাদের কী দরকার? এমন করে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছই বা কী জন্যে? আর যদি বসেই থাকো—গর্তের মধ্যে একতাল অত্যন্ত বাজে গোবর রেখে দিয়েছ কেন?

গজেশ্বর বিরক্ত হয়ে বললে, গোবর কি আমরা রেখেছি নাকি? রেখেছে গোরুতে। তোমাদের মত গোবর-গণেশ তাতে পা দিয়ে সুড়ুৎ করে পিছলে পড়বে—সেইজন্যেই বোধহয়।

—সে তো হল—কিন্তু আমাদের তাড়াতে চাও কেন? এ বাড়িতে তোমাদের কী দরকার?

—অত কথা দিয়ে তোমার কাজ কী হে চিংড়িমাছ? এখনো নাক টিপলে দুধ বেরোয়—ওসব খবরে তোমার কী হবে?—ব্যাজার মুখে গজেশ্বর একটা হাই তুলল।

আমাকে চিংড়িমাছ বলায় আমার ভীষণ রাগ হল। ডান কানের ওপর আর একটা কাঠপিঁপড়ে পটাস করে ইনজেকশন দিচ্ছিল, 'উঃ' করে সেটাকে টেনে ফেলে দিয়ে বললুম, আমাকে চপ-কাটলেট করে খেতে চাও খাও, কিন্তু খবরদার বলছি, চিংড়ি-মাছ বোলো না!

—কেন বলব না? চিংড়ির কাটলেট বলব!—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল।

—না, কক্ষনো বলবে না!—আমি আরও রেগে গিয়ে বললুম, তা ছাড়া এখন আমার নাক টিপলে আর দুধ বেরোয় না—আমি দু-দুবার স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছি।

—ইঃ—স্কুল-ফাইন্যাল দিয়েছে!—গজেশ্বর ট্যাঁক থেকে একটা বিড়ি বের করে ধরাল : আচ্ছা বল তো—'ক্যাটাক্লিজম' মানে কী?

—ক্যাটাক্লিজম? ক্যাটাক্লিজম? আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, বেড়ালের বাচ্চা হবে বোধহয়?

বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে গজেশ্বর বললে, তোমার মুণ্ডু! আচ্ছা বল তো—'সেনিগেম্বিয়া'র রাজধানী কী?

বললুম, নিশ্চয় হনোলুলু? নাকি, ম্যাডাগাস্কার?

—ভূগোলকে একেবারে গোলগপ্পার মতো খেয়ে নিয়েছ দেখছি!—গজেশ্বর নাক বেঁকিয়ে বললে, আচ্ছা বলো দেখি, 'জাড্যাপহ' মানে কী? অনিকেত কাকে বলে?

—কী বললে—অনিমেষ? অনিমেষ আমার মামাতো ভাই।

—হয়েছে, আর বিদ্যে ফলিয়ে কাজ নেই!—গজেশ্বর আবার ঝগড়াটে প্যাঁচার মতো খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, স্কুল-ফাইন্যাল কেন—তুমি ছাত্রবৃত্তিও ফেল করবে! নাঃ—সত্যিই দেখছি তুমি একদম অখাদ্য! বোধহয় শুন্তো করে এক-আধটু খাওয়া যেতে পারে। এখন উঠে পড়।

—কোথায় যেতে হবে?

—বললুম তো, ঠাণ্ডী গারদে। সেখানে তোমার ফ্রেন্ড হাবুল সেন রয়েছে—তার সঙ্গেও মোলাকাত হবে। ওদিকে আবার গুরুদেব গেছেন দলবল নিয়ে একটু-খানি বিষয়-কর্মে, তিনিও ফিরে আসুন—তারপর দেখা যাক—

ইতিমধ্যে আমি এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিলুম। বিপদে পড়ে পটলডাঙার প্যালা-রামের মগজও এক-আধটু সাফ হয়ে এসেছে। কোথায় এসে পড়েছি সেটাও একটু ভালো করে জানা দরকার।

যতটা বোঝা গেল, হাত সাত-আষ্টেক নিচে পাহাড়ের গর্তের মধ্যে পড়েছি। যদি গজেশ্বরের পিঠের ওপর সোজা ধপাস্ করে না পড়তুম, তাহলে হাত-পা নির্ঘাৎ ভেঙে থেঁতলে যেত। যেখানে বসে আছি, সেটা একটা সুড়ঙ্গের মতো সামনের দিকে চলে গেছে। কোথায় গেছে—কতটা গেছে বোঝা গেল না। তবে ওরই কোথাও ঠাণ্ডী গারদ আছে—সেইখানেই আপাততঃ বন্দী রয়েছে হাবুল সেন।

হাবুলের ব্যবস্থা পরে হবে—কিন্তু আমি কি এখান থেকে পালাতে পারি না? কোনমতেই না?

মাথার ওপর গোল কুয়ার মতো গর্তটা দেখা যাচ্ছে—যেখান দিয়ে আমি ভেতরে পড়েছি। লক্ষ্য করে আরো দেখলুম, গর্তের পাশ দিয়ে পাথরে পাথরে বেশ খাঁজকাটা মতো আছে। একটু চেষ্টা করলেই ঠকাৎ করে ওপরে—

এসব ভাবতে বোধহয় মিনিট দুই সময় লেগেছিল। এর মধ্যে বিড়িটা শেষ করেছে গজেশ্বর—মিটমিট করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

—বলি, মতলবটা কি হে? পালাবে? সে গুড়ে বালি চাঁদ—স্রেফ বালি! বাঘের হাত থেকে ছাড়ান পেতে পার কিন্তু এই গজেশ্বর গাড়ুইয়ের হাত থেকে তোমার আর নিস্তার নেই! তার ওপর তুমি আবার আমার গুরুদেবের দাড়ি ছিঁড়ে দিয়েছ—তোমার কপালে কী যে আছে—একটা যাচ্ছেতাই মুখ করে গজেশ্বর উঠে দাঁড়াল।

অ্যাঁ! তাহলে সেই তামাকখেকো ভূতুড়ে দাড়িটা স্বামী ঘুটঘুটানন্দের! স্বামীজীই তবে ঝোপের মধ্যে বসে আড়ি পাতছিলেন, আর আমি কাঠবেড়ালির ল্যাজ মনে করে সেই স্বর্গীয় দাড়ি—

আমি কাতর হয়ে বললুম, আমি কিন্তু ইচ্ছে করে দাড়ি ছিঁড়িনি! আমি ভেবে-ছিলুম—

—থাক—থাক! তুমি কী ভেবেছ তা আমার জেনে আর দরকার নেই। গালের ব্যথায় গুরুদেব দু-ঘণ্টা ছটফট করেছেন। তিনি ফিরে এলে—যাক সে কথা, ওঠ এখন—

গজেশ্বর হাতির শুঁড়ের মতো প্রকাণ্ড একটা হাত বাড়িয়ে আমায় পাকড়াও করতে যাচ্ছিল—হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল : বাপ রে গেলুম—আরে বাপ রে গেছি—

ততক্ষণে আমিও দেখেছি, কালো কটকটে একটা কাঁকড়া-বিছে, গজেশ্বরের পায়ের কাছে তখনো দাঁড়া উঁচু করে যমদূতের মতো খাড়া হয়ে আছে।

—গেলুম—গেলুম—ওরে বাবা—জ্বলে গেলুম—

বলতে বলতে সেই ষাঁড়ের মতো জোয়ানটা মেঝের ওপর কুমড়োর মতো গড়াতে লাগল : গেছি—গেছি—একদম মেরে ফেলেছে—

আর আমি? এমন সুযোগ আর কি পাব? তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পাহাড়ের খাঁজে পা লাগালুম—এইবার এসপার কি ওসপার!

www.boiRboi.blogspot.com

বারো

শেঠ চুন্নুরাম

ওঠ জোয়ান—হেঁইয়ো!

পাথরের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে দিয়ে যখন গর্তের মুখে উঠে পড়লুম, তখন আমার পালাজ্বরের পিলেটা পেটের মধ্যে কচ্ছপের মতো লাফাচ্ছে। অবশ্য কচ্ছপকে আমি কখনো লাফাতে দেখিনি—সুড়সুড় করে শুঁড় বের করতে দেখেছি কেবল। কিন্তু কচ্ছপ যদি কখনো লাফায়—আনন্দে হাত পা তুলে নাচতে থাকে—তাহলে যেমন হয়, আমার পিলেটা তেমন করেই নাচতে লাগল। একেবারে পুরো পাঁচ মিনিট।

পিলের নাচ-টাচ থামলে কামরাঙা গাছটার ডাল ধরে আমি চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। কোথাও কেউ নেই—ক্যাবলা আর টেনিদা কোথায় গেছে কে জানে! ওধারে একটা আমড়া গাছে বসে একটা বানর আমাকে ভেংচি কাটছিল—আমিও দাঁত-টাত বের করে সেটাকে খুব খারাপ করে ভেংচে দিলুম। বানরটা রেগে গিয়ে বললে, কিঁচ্—কিঁচ্—কিচ্ছু—বোধহয় বললে, তুমি একটা বিচ্ছু!—তারপর টুক্ করে পাতার আড়ালে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

পায়ের তলায় গর্তটার ভেতর থেকে গজেশ্বর গাড়ুইয়ের গোঙানি শোনা যাচ্ছে। আমার বেশ লাগছিল। আমাকে বলে কিনা কাটলেট করে খাবে! যাচ্ছেতাই সব ইংরিজি শব্দের মানে করতে বলে আর জানতে চায় হনোলুলুর রাজধানীর নাম কী! বেশ হয়েছে! পাহাড়ি কাঁকড়া-বিছের কামড়—পুরো তিনটি দিন সমানে গান গাইতে হবে গজেশ্বরকে!

এইবার আমার চোখ পড়ল সেই কালান্তক গোবরটার দিকে। এখনো তার ভিতর দিয়ে পেছলানোর দাগ—ঐ পাষণ্ড গোবরটাই তো আমায় পাতালে নিয়ে গিয়েছিল! ভারি রাগ হল, গোবরকে একটু শিক্ষা দেবার জন্যে ওটাকে আমি সজোরে পদাঘাত করলুম।

এহে-হে—এ কী হল! ভারি ছ্যাঁচড়া গোবর তো! একেবারে নাকে-মুখে ছিট্‌কে এল যে! দুত্তোর!

কিন্তু এখানে আর থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। গজেশ্বরকে বিশ্বাস নেই—হঠাৎ যদি উঠে পড়ে গর্তের ভেতর থেকে! সরে পড়া যাক এখান থেকে! পত্রপাঠ!

যাই কোন্ দিকে! ঝণ্টিপাহাড়ি বাংলোর ঠিক পেছন দিকে এসে পড়েছি সেটা বুঝতে পারছি—কিন্তু যাই কোন্ ধার দিয়ে! কীভাবে যে এসেছিলুম, ঐ মোক্ষম আছাড়টা খাওয়ার পর মাথার ভেতর সে সমস্ত হালুয়ার মত তালগোল পাকিয়ে গেছে। ডাইনে যাব, না বাঁয়ে? আমার আবার একটা বদ দোষ আছে। পটলডাঙার বাইরে এলেই আমি পুব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ কিছুই আর চিনতে পারিনে। একবার দেওঘরে গিয়ে আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদাকে বলেছিলুম : দেখ ফুচুদা, কী আশ্চর্য ব্যাপার! উত্তরদিক থেকে কী চমৎকার সূর্য উঠছে!—শুনে ফুচুদা কটাং করে আমার লম্বা কানে একটা মোচড় দিয়ে বলেছিল, ন্যাট এখান থেকে রাঁচি চলে যা প্যালা—

মানে, রাঁচির পাগলা গারদে!

কোন্ দিকে যাব ভাবতে ভাবতেই—আমার চোখ একেবারে ছানাবড়া! কিংবা একেবারে চমচম! ওদিকে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে গুটিসুটি মেরে ও কারা আসছে? কাঠবেড়ালির ল্যাজের মতো ও কার দাড়ি উড়ছে হাওয়াতে?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—নির্ঘাৎ! তাঁর পেছনে পেছনে আরো দুটো ষণ্ডা জোয়ান—তাদের হাতে দুটো মুখ-বাঁধা সন্দেহজনক হাঁড়ি! নির্ঘাৎ যোগসপের হাঁড়ি—মানে, দই আর রসগোল্লা-ফোল্লা থাকা সম্ভব! একা একা নিশ্চয় খাবে না, খুব সম্ভব হাবুল সেনও ভাগ পাবে!

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রসগোল্লার ব্যাপারে একটুখানি দুর্বলতা আমার আছে। কিন্তু সেই লোভে আবার আমি গজেশ্বর গাড়ুইয়ের পাল্লায় পড়তে চাই না—উঁহু—কিছুতেই না! বেঁচে কেটে পড়ি এখান থেকে!

সুট্ করে আমি বাঁ পাশের ঝোপে ঢুকে গেলুম। দৌড়োনো যাবে না—পায়ের আওয়াজ শুনতে পাবে ওরা। ঝোপের মধ্যে দিয়ে আমি সুড়সুড়িয়ে চললুম।

চলেছি তো চলেইছি। কোন্ দিকে চলেছি জানি না। ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে, নালা-ফালা টপকে, একটা শেয়ালের ঘাড়ের ওপর উলটে পড়তে পড়তে সামলে নিয়ে, চলেছি আর চলেইছি। আবার যদি দস্যু ঘচাং ফুঃর পাল্লায় পড়ি—তাহলেই গেছি! গজেশ্বর যে রকম চটে রয়েছে—আমাকে আবার পেলে আর দেখতে হবে না! সোজা শুক্তোই বানিয়ে ফেলবে!

প্রায় ঘণ্টাখানেক এলোপাথাড়ি হাঁটবার পর দেখি, সামনে একটা ছোট্ট নদী। ঝুরঝুরে মিহি বালির ভেতর দিয়ে তিরতির করে তার নীলচে জল বয়ে চলেছে। চারদিকে ছোট-বড় পাথর। আমার পা প্রায় ভেঙে আসবার জো—তেষ্টায় গলার ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

পাথরের ওপর বসে একটুখানি জিরিয়ে নিলুম! আকাশটা মেঘলা—বেশ ছায়া-ছায়া জায়গাটা। শরীর যেন জুড়িয়ে গেল! চারদিকে পলাশের বন—নদীর ওপারে আবার দুটো নীলকণ্ঠ পাখি।

একটুখানি জলও খেলুম নদী থেকে। যেমন ঠাণ্ডা—তেমনি মিষ্টি জল। খেয়ে একেবারে মেজাজ শরিফ হয়ে গেল। দস্যু ঘচাং ফুঃ, গজেশ্বর, টেনিদা, ক্যাবলা, হাবুল সেন—সব ভুলে গেলুম। মনে এত ফুর্তি হল যে আমার চা-রা-রা-রা-রা—রামা হো—রামা হো—বলে গান গাইতে ইচ্ছে করল।

কেবল চা-রা-রা-রা-রা—বলে তান ধরেছি—হঠাৎ পেছনে ভোঁপ-ভোঁপ-ভোঁপ!

দুত্তোর—একেবারে রসভঙ্গ! তার চাইতেও বড় কথা এখানে মোটর এল কোত্থেকে? এই ঝণ্টিপাহাড়ির জঙ্গলে?

তাকিয়ে দেখলুম, নদীর ধার দিয়ে একটা রাস্তা আছে বটে। আর-একটু দূরেই সেই রাস্তার ওপর পলাশ-বনের ছায়ায় একখানা নীল রঙের মোটর দাঁড়িয়ে।

কী সর্বনাশ—এরাও ঘচাং ফুঃর দল নয় তো? ডিটেক্‌টিভ গল্পে এইরকমই তো পড়া যায়! নিবিড় জঙ্গল—একখানা রহস্যজনক মোটর—তিনটে কালো-মুখোস-পরা লোক, তাদের হাতে পিস্তল—আর ডিটেক্‌টিভ হিমাদ্রি রায়ের চোখ একেবারে মনুমেন্টের চূড়ায়। ভাবতেই আমার পালাজ্বরের পিলেটা ধপাস্ করে লাফিয়ে উঠল। ফিরে কচ্ছপ-নৃত্য শুরু করে আর-কি!

উঠে একটা রাম-দৌড় লাগাব ভাবছি—এমন সময় আবার ভোঁপ, ভোঁপ! মোটরটার হর্ন বাজল। তারপরেই গাড়ি থেকে যে নেমে এল, তাকে দেখে আমি থম্‌কে গেলুম।

www.boiRboi.blogspot.com

না—কোনো দস্যুর দলে এমন লোক থাকতেই পারে না! কোনো গোয়েন্দা-কাহিনীতে তা লেখেনি।

প্রকাণ্ড থলথলে ভুঁড়ি—দেখলে মনে হয়, ক্রেনে করে তুলতে গেলে ক্রেন ছিঁড়ে পড়বে। গায়ের সিল্কের পাঞ্জাবিটা তৈরি করতে বোধহয় একখান কাপড় খরচ হয়েছে। প্রকাণ্ড একটা বেলুনের মতো মুখ—নাক-টাকগুলো প্রায় ভেতরে ঢুকে বসে আছে। মাথায় একটা বিরাট হলদে রঙের পাগড়ি। গলা-টলার বালাই নেই—পেটের ভেতর থেকে মাথাটা প্রায় ঠেলে বেরিয়ে এসেছে মনে হয়। ঠিক থুতনির তলাতেই একছড়া সোনার হার চিকচিক করছে। দু'হাতের দশ আঙুলে দশটা আংটি।

একখানা মোক্ষম শেঠজী।

নাঃ—এ কখনো দস্যু ঘচাং ফুঃর লোক নয়। বরং ঘচাং ফুঃদের নজর সচরাচর যাদের ওপর পড়ে—এ সেই দলের। কিন্তু এরকম একটি নিটোল শেঠজী থামাকা এই জঙ্গলে এসে ঢুকেছে কেন?

শেঠজী ডাকলেন : খোঁকা—এ খোঁকা—

আমাকেই ডাকছেন মনে হল। কারণ, আমি ছাড়া কাছাকাছি আর কোন খোঁকাকে আমি দেখতে পেলুম না। সাত-পাঁচ ভেবে আমি গুটি-গুটি এগোলুম তাঁর দিকে।

—নমস্তে শেঠজী।

—নমস্তে খোঁকা।—শেঠজী হাসলেন বলে মনে হল। বেলুনের ভেতর থেকে গোটাকতক দাঁত আর দুটো মিটমিটে চোখের ঝলক দেখতে পেলুম এবার। শেঠজী বললেন, তুমি কার লেড়কা আছেন? এখানে কী করতেছেন?

একবার ভাবলুম, সত্যি কথাটাই বলি। তারপরেই মনে হল কার পেটে যে কী মতলব আছে কিছুই বলা যায় না। এই ঝণ্টপাহাড়ি জায়গাটা মোটেই সুবিধের নয়। শেঠজীর অত বড় ভুঁড়ির আড়ালেও রহস্যের কোন খাসমহল লুকিয়ে আছে কি না কে বলবে!

তাই বোঁ করে বলে দিলুম, আমি হাজারিবাগের ইস্কুলে পড়তেছেন। এখানে পিকনিক করতে এসেছেন।

—হাঁ! পিকনিক করতে এসেছেন?—শেঠজীর চোখ দুটো বেলুনের ভেতর থেকে আবার মিটমিট করে উঠল : এতো দূরে? তা, দলের আউর সব লেড়কা কোথা আছেন?

—আছেন ওদিকে কোথাও।—আঙুল দিয়ে আন্দাজি যে-কোনো একটা দিক দেখিয়ে দিলুম। তারপর পাল্টা জিজ্ঞেস করলুম, আপনি কে আছেন, এই জঙ্গলে আপনিই বা কী করতে এসেছেন?

—হামি? শেঠজী বললেন, হামি শেঠ ঢুণ্ডুরাম আছি। কলকাতায় হামার দোকান আছেন—রাঁচিমে ভি আছেন। এখানে হামি এসেছেন জঙ্গল ইজারা লিবার জন্যে।

—ও—জঙ্গল—ইজারা লিবার জন্যে? আমার হঠাৎ কেমন রসিকতা করতে ইচ্ছে হল। কিন্তু জঙ্গলে বেশি ঘোরাফেরা করবেন না শেঠজী—এখানে আবার ভালুকের উৎপাত আছে।

—অ্যাঁ—ভালুক! শেঠ ঢুণ্ডুরামের বিরাট ভুঁড়িটা হঠাৎ লাফিয়ে উঠল : ভালুক মানুষকে কামড়াচ্ছেন?

—খুব কামড়াচ্ছেন! পেলেই কামড়াচ্ছেন!

—অ্যাঁঃ।

আমি শেঠজীকে ভরসা দিয়ে বললুম : ভুঁড়ি দেখলে আরো জোর কামড়াচ্ছেন!

www.boiRboi.blogspot.com

মানে ভালুকেরা ভুঁড়ি কামড়াতে ভালোবাসেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

—অ্যাঁঃ! রাম—রাম!

শেঠজী হঠাৎ লাফিয়ে উঠলেন। অত বড় শরীর নিয়ে কেউ যে অমন জোরে লাফাতে পারে সেটা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হত না।

তারপর মণ-চারেক ওজনের সিল্কের সেই প্রকাণ্ড বস্তাটা এক দৌড়ে গিয়ে মোটরে উঠল। উঠেই চেঁচিয়ে উঠল : এ ছগনলাল—আরে মোটরিয়া তো হাঁকাও! জলদি!

ভোঁপ—ভোঁপ! চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই ঢুণ্ডুরামের নীল মোটর জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে গেল! আর পুরো পাঁচ মিনিট দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে আমি পরমানন্দে হাসতে লাগলুম। বেড়ে রসিকতা হয়েছে একটা!

কিন্তু বেশিক্ষণ আমার মুখে হাসি রইল না। হঠাৎ ঠিক আমার পেছনে জঙ্গলের মধ্যে থেকে—

—হাল্লুম!

ভালুক নয়—ভালুকের বড়দা! অর্থাৎ বাঘ! রসিকতার ফল এমন যে হাতে-হাতে ফলে আগে কে জানত!

—বাপরে, গেছি!—বলে আমিও এক পেল্লায় লাফ! শেঠজীর চাইতেও জোরে!

আর লাফ দিয়ে ঝপাং করে একেবারে নদীর কনকনে ঠাণ্ডা জলের মধ্যে। পেছন থেকে সঙ্গে-সঙ্গে আবার জোর আওয়াজ : হাল্লুম!

তেরো

বাঘা কাণ্ড

বাপ্‌স্—কী ঠাণ্ডা জল! হাড়ে পর্যন্ত কাঁপুনি লেগে গেল! আর স্রোতও তেমনি! পড়েছি হাঁটু জলে—কিন্তু দেখতে দেখতে প্রায় তিরিশ হাত দূরে টেনে নিয়ে গেল।

কিন্তু জলসই না হলে যে বাঘসই—মানে, বাঘের জলযোগ হতে হবে এক্ষুনি! আঁকুপাঁকু করে নদী পার হতে গিয়ে একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলুম—খানিকটা ঠাণ্ডা জল ঢুকল নাক-মুখের মধ্যে। আর তক্ষুনি মনে হল, বাঘটা বুঝি এক্ষুনি পেছন থেকে আমার ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে!

আর সেই মুহূর্তেই—

পেছন থেকে বাঘের গর্জন নয়—অট্টহাসি শোনা গেল।

বাঘ হাসছে! বাঘ কি কখনো হাসতে পারে? চিড়িয়াখানায় আমি অনেক বাঘ দেখেছি। তারা হাম-হাম করে খায়, হুম-হুম করে ডাকে—নয় তো, ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোয়। আমি অনেকদিন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি বাঘের কখনো নাক ডাকে কি না। আর যদি ডাকেই, সেটা কেমন শোনায়। একদিন বাঘের হাঁচি শোনবার জন্যে এক ডিবে নস্যি বাঘের নাকে ছুঁড়ে দেব ভেবেছিলুম—কিন্তু আমার পিসতুতো ভাই ফুচুদা ডিবেটা কেড়ে নিয়ে আমার চাঁদির ওপর কটাং করে একটা গাঁট্টা মারল। কিন্তু বাঘের হাসি যে কোনদিন শুনতে পাওয়া যাবে—সেকথা স্বপ্নেও ভাবিনি।

পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখব ভাবছি, সঙ্গে সঙ্গে আর-একটা নুড়িতে হোঁচট খেয়ে জলের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়লুম। আবার সেই অট্টহাসি—আর কে যেন বললে—উঠে আয় প্যালা, খুব হয়েছে! এর পরে নির্ঘাৎ ডবল-নিউমোনিয়া হয়ে মারা যাবি।

এ তো বাঘের গলা নয়!

আর কে? নির্ঘাৎ ক্যাবলা! পাশে টেনিদাও দাঁড়িয়ে। দুজনে মিলে দন্তবিকাশ করে পরমানন্দে হাসছে—যেন পাশাপাশি একজোড়া শাঁকালুর দোকান খুলে বসেছে।

টেনিদা তার লম্বা নাকটাকে কুঁচকে বললে, পেছন থেকে একটা বাঘের ডাক ডাকলুম আর তাতেই অমন লাফিয়ে জলে পড়ে গেলি! ছোঃ-ছোঃ—তুই একটা কাপুরুষ!

অ! দুজনে মিলে বাঘের আওয়াজ করে আমার সঙ্গে বিটকেল রসিকতা হচ্ছিল! কী ছোটলোক দেখছ! মিছিমিছি ভিজিয়ে আমায় ভূত করে দিলে—কাঁপুনি ধরিয়ে দিলে সারা গায়ে!

রেগে আগুন হয়ে আমি নদী থেকে উঠে এলুম। বললুম, খামোকা এরকম ইয়ার্কির মানে কী?

ক্যাবলা বললে, তোরই বা এসব ইয়ার্কির মানে কী? দিব্যি আমাদের পেছনে শামুকের মতো গুঁড়ি মেরে আসছিলি—তারপরেই একেবারে নো-পাত্তা! যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলি! ওদিকে আমরা সারাদিন খুঁজে-খুঁজে হয়রান! শেষে দেখি—এখানে বসে মনের আনন্দে পাগলের মতো হাসা হচ্ছে। তাই তোর খরচায় আমরাও একটু হেসে নিলুম।

আমি বললুম, ইচ্ছে করে আমি হাওয়ায় মিলিয়েছিলুম নাকি? আমি তো পড়ে গিয়েছিলুম দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে!

—দস্যু ঘচাং ফুঃর গর্তে! সে আবার কী?—ওরা দুজনেই হাঁ করে চেয়ে রইল।

—কিংবা ঘুটঘুটানন্দের গর্তেও বলতে পার।

—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ! ক্যাবলা বারতিনেক খাবি খেল। টেনিদা তেমনি হাঁ করেই রইল—ঠিক একটা দাঁড়কাকের মতো।

—সেই সঙ্গে আছে গজেশ্বর গাড়ুই। সেই হাতির মতো লোকটা।

—অ্যাঁ!

—আর আছে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরগাড়ি।

—অ্যাঁ!

ওরা একদম বোকা হয়ে গেছে দেখে আমার ভারি মজা লাগছিল! ভাবলুম চ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা করে গানটা আবার আরম্ভ করে দিই—কিন্তু পেটের মধ্যে থেকে গুরে-গুরিয়ে ঠাণ্ডা উঠছে—এখন গাইতে গেলে গলা দিয়ে কেবল গিটকিরি বেরুবে।

www.boiRboi.blogspot.com

বললুম, বাংলোয় আগে ফিরে চল—তারপরে সব বলছি।

সব শুনে ওরা তো বিশ্বাসই করতে চায় না। স্বামী ঘুটঘুটানন্দই হচ্ছে ঘচাং ফুঃ! সঙ্গে সেই গজেশ্বর গাড়ুই! তারা আবার পাহাড়ের গর্তের মধ্যে থাকে! যা-যাঃ! বাজে গল্প করবার আর জায়গা পাসনি!

টেনিদা বললে, নিশ্চয় জঙ্গলের মধ্যে ঘুরতে-ঘুরতে প্যালার পালাজ্বর এসে-ছিল। আর জ্বরের ঘোরে ওই সমস্ত উষ্টুম-ধুষ্টুম খেয়াল দেখেছিল।

আমি বললুম, বেশ, খেয়ালই সই! কাঁকড়াবিছের কামড়ের জেরটা মিটে যাক না আগে, তারপরে আসবে ঐ গজেশ্বর গাড়ুই। তুমি আমাদের লীডার—তোমাকে ধরে ফাউল কাটলেট বানাবে!

ক্যাবলা বললে, ফাউল মানে হল মুরগি। টেনিদা মুরগি নয়—কারণ টেনিদার পাখা নেই; তবে পাঁঠা বলা যায় কি না জানিনে। মুশকিল হল, পাঁঠার আবার চারটে পা। আচ্ছা টেনিদা, তোমার হাত দুটোকে কি পা বলা যেতে পারে?

টেনিদা ক্যাবলাকে চাঁটি মারতে গেল। চাঁটিটা ক্যাবলার মাথায় লাগল না—লাগল চেয়ারের পিঠে। 'বাপ রে গেছি'—বলে টেনিদা নাচতে লাগল খানিকক্ষণ।

নাচ-টাচ থামলে বললে, তোদের মতো গোটাকয়েক গাড়োলকে সঙ্গে আনাই ভুল হয়েছে! ওদিকে হতচ্ছাড়া হাবলাটা যে কোথায় বসে আছে তার পাত্তা নেই। আমি একা কতদূর আর সামলাব!

—আহা-হা—কত সামলাচ্ছ! ক্যাবলা বললে, তুম কেইসা লীডার—উ মালুম হো গিয়া! তোমাকে যে কে সামলায় তার ঠিক নেই!

টেনিদা আবার চাঁটি তুলছিল—চেয়ার থেকে চট করে সট্‌কে গেল ক্যাবলা।

আমি রেগে বললুম, তোমরা এই কর বসে-বসে! ওদিকে গজেশ্বর ততক্ষণে হাবলাকে চপ করে ফেলুক!

ক্যাবলা বললে, মাটন চপ। হাবলাটা এক-নম্বরের ভেড়া! কিন্তু আপাততঃ ওঠা যাক টেনিদা। প্যালা সত্যি বলছে কি না একবার যাচাই করে দেখা যাক। চল প্যালা—কোথায় তোর ঘুটঘুটানন্দের গর্ত একবার দেখি। ওঠো টেনিদা—কুইক!

টেনিদা নাক চুলকে বললে, দাঁড়া, একবার ভেবে দেখি।

ক্যাবলা বললে, ভাববার আর কী আছে? রেডি—কুইক মার্চ। ওয়ান—টু—থ্রি—

টেনিদা কুইনিন-চিবোনোর মতো মুখ করে বললে, মানে, আমি ভাবছিলুম—ঠিক এভাবে পাহাড়ের গুহায় ঢোকাটা কি ঠিক হবে? আমাদের তো দু-এক গাছা লাঠি ছাড়া আর কিছু নেই—ওদের সঙ্গে হয়ত পিস্তল-বন্দুক আছে। তাছাড়া ওদের দলে হয়ত অনেকগুলো গুণ্ডা—আমরা মোটে তিনজন—ঝাঁটুটাও বাজার করতে গেছে—

ক্যাবলা বুক চিতিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

—কী আর হবে টেনিদা? বড়জোর মেরে ফেলবে—এই তো? কিন্তু কাপুরুষের মতো বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরে যাওয়া অনেক ভালো! নিজের বন্ধুকে বিপদের মধ্যে ফেলে রেখে কতকগুলো গুণ্ডার ভয়ে আমরা পালিয়ে যাব টেনিদা? পটলডাঙার ছেলে হয়ে?

বললে বিশ্বাস করবে না—ক্যাবলার জ্বলজ্বলে চোখের দিকে তাকিয়ে আমারও যেন কেমন তেজ এসে গেল! ঠিক কথা—করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা! পালাজ্বরে ভুগে-ভুগে এমনভাবে নেংটি ইঁদুরের মতো বেঁচে থাকার কোন মানেই হয় না! ছ্যা-ছ্যা! আরে—একবার বই তো দু'বার মরব না!

তাকিয়ে দেখি, আমাদের সর্দার টেনিদাও খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই ভীতু মানুষটা নয়—গড়ের মাঠের গোরা পিটিয়ে যে চ্যাম্পিয়ান—এ সেই লোক! বাঘের মতো গলায় বললে, ঠিক বলেছিস ক্যাবলা—তুই আজকে আমার আক্কেল-দাঁত গজিয়ে দিয়েছিস! একটা নয়—একজোড়া! হয় হাবুল সেনকে উদ্ধার করে কলকাতায় ফিরে যাব—নইলে এ পোড়া প্রাণ রাখব না!

—হ্যাঁ, একেই বলে লীডার! এই তো চাই!

তক্ষুনি বেরিয়ে পড়লুম তিনজনে। ওদের দুটো লাঠি তো ছিলই। আমার সেই ভাঙা ডালটা কোথায় পড়ে গিয়েছিল, অগত্যা একটা কাঠ কুড়িয়ে নিয়ে সঙ্গে চললুম!

এবার আর জায়গাটা চিনতে ভুল হল না। এই তো সেই কামরাঙা গাছ। এই তো সেই পাষণ্ড গোবরটা, যেটা আমাকে পিছলে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গর্তটা? গর্তটা গেল কোথায়?

গর্তের কোন চিহ্নই নেই। খালি একরাশ ঝোপঝাড়।

ক্যাবলা বললে, কই রে—তোর সে গহ্বর গেল কোথায়?

—তাই তো!—

টেনিদা বললে, আমি তক্ষুনি বলেছিলুম—প্যালা, জ্বরের ঘোরে তুই খোয়াব দেখেছিস! স্বামী ঘটঘটানন্দ হল কিনা দস্যু ঘচাং ফুঃ! পাগল না প্যাজিফুলুরি!

আমার মাথা ঘুরতে লাগল। সত্যিই কি জ্বরের ঘোরে আমি খোয়াব দেখেছি! তাহলে এখনো গায়ে টনটনে ব্যথা কেন? ঐ তো গোবরে আমার পা পেছলানোর দাগ। তাহলে?

ভুতুড়ে কান্ড নাকি? পাখি ওড়ে,—রসগোল্লা উড়ে যায়, চপ-কাটলেট হাওয়া হয়—মানে পেটের মধ্যে; কিন্তু অতবড় গর্তটা যে কখনো উড়ে যেতে পারে—সে তো কখনো শুনিনি!

টেনিদা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, তোর গর্ত আমাদের দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে—বুঝলি? এই বলেই বীরদর্পে ঝোপের ওপর এক পদাঘাত!

আর সঙ্গে সঙ্গেই ঝোপটায় যেন ভূমিকম্প জাগল! তার চাইতেও বেশি ভূমিকম্প জাগল টেনিদার গায়ে।—আরে আরে বলে চেঁচিয়ে উঠেই ঝোপঝাড়-শুদ্ধু টেনিদা মাটির তলায় অদৃশ্য হল। একেবারে সীতার পাতাল প্রবেশের মতো। তলা থেকে শব্দ উঠল—খচ্ খচ্, ধপাস!

ওগুলো তবে ঝোপ নয়? গাছের ডাল কেটে গর্তের মুখটা ঢেকে রেখেছিল?

আমি আর ক্যাবলা কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম। কী বলব—কী যে করব—কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সেই মুহূর্তেই গর্তের ভেতর থেকে টেনিদার চিৎকার শোনা গেল—ক্যাবলা—প্যালা—

আমরা চেঁচিয়ে জবাব দিলুম, খবর কী টেনিদা?

—একটু লেগেছে, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি হয়নি। তোরা শীগ্‌গির গর্তের খাঁজে খাঁজে পা দিয়ে ভেতরে নেমে আয়! ভীষণ ব্যাপার এখানে—লোমহর্ষণ কান্ড!

শুনে আমাদের লোম খাড়া হয়ে গেল। আমার মনে পড়ল করেঙ্গা ইয়া মরেঙ্গা! আমি তৎক্ষণাৎ গর্তের মুখে পা দিয়ে নামতে আরম্ভ করলুম—ক্যাবলাও আমার পেছনে।

চৌদ্দ

হাবুল সেনের মৃতদেহ

আমি আর ক্যাবলা টপাটপ নিচে নেমে পড়লুম। নেমেই দেখি, কোথাও কিছু নেই। টেনিদা নয়—গজেশ্বর নয়—স্বামী ঘটঘটানন্দের ছেঁড়া দাড়ির টুকরোটুকুও নয়।

ব্যাপার কী! ঘচাং ফুঃর দল টেনিদাকেও ভ্যানিশ করে দিয়েছে নাকি?

ক্যাবলা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, টেনিদা তো এখানেই এক্ষুনি পড়ল রে। গেল কোথায়?

আমি এতক্ষণে কিন্তু আবছা আবছা আলোয় সাবধানে তাকিয়ে তাকিয়ে সেই কাঁকড়াবিছেটাকে খুঁজছিলুম। সেটা আশেপাশে কোথাও ল্যাজ উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে কি না কে জানে! তার মোক্ষম ছোবল খেয়ে ওই গুন্ডা গজেশ্বর কোনমতে সামলেছে—কিন্তু আমাকে কামড়ালে আর দেখতে হচ্ছে না—পটলডাঙার পালাজ্বর-মার্কা প্যালারামের সঙ্গে সঙ্গেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি।

ক্যাবলা আমার মাথায় একটা থাবড়া মেরে বললে, এই টেনিদা গেল কোথায়?

—আমি কেমন করে জানব!

ক্যাবলা নাক চুলকে বললে, বড়ী তাজ্জব কী বাত! হাওয়ায় মিলিয়ে গেল নাকি?

কিন্তু পটলডাঙার টেনিদা—আমাদের জাঁদরেল লীডার—এত সহজেই হাওয়ায় মিলিয়ে যাওয়ার পাত্র? তৎক্ষণাৎ কোত্থেকে আবার টেনিদার অশরীরী চিৎকার: ক্যাবলা—প্যালা—চলে আয় শীগ্‌গির! ভীষণ ব্যাপার!

যাব কোথায়? কোন্‌খান থেকে ডাকছে? এ যে সত্যিই ভুতুড়ে ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি। আমার মাথার চুলগুলো সঙ্গে সঙ্গে কড়াং করে দাঁড়িয়ে উঠল।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে বললে, টেনিদা, তুমি কোথায়? তোমার টিকির ডগাও যে দেখা যাচ্ছে না!

আবার কোথা থেকে টেনিদার অশরীরী স্বর: আমি একতলায়।

—একতলায় মানে?

টেনিদা এবার দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কানা নাকি? সামনের দেওয়ালে গর্ত দেখতে পাচ্ছিসনে?

আরে—তাই তো! এদিকের পাথরের দেওয়ালে একটা গর্তই তো বটে! কাছে এগিয়ে দেখি, তার সঙ্গে একটা মই লাগানো ভেতর থেকে! যাকে বলে, রহস্যের খাসমহল!

টেনিদা বললে, বেয়ে নেমে আয়। এখানে ভয়াবহ কান্ড—লোমহর্ষণ ব্যাপার!

অ্যাঁ!

ক্যাবলাই আগে মই বেয়ে নেমে গেল—পেছনে আমি। সত্যিই তো—একতলাই বটে। যেখানে নামলুম, সেটা একটা লম্বা হলঘরের মতো—কোত্থেকে আলো আসছে জানি না—কিন্তু বেশ পরিষ্কার। তার একদিকে একটা ইঁটের উনুন—গোটা-দুস্তিন

www.boiRboi.blogspot.com

ভাঙা হাঁড়িকুঁড়ি—এক কোণায় একটা ছাইগাদা আর তার মাঝখানে—

টেনিদা হাঁ করে দাঁড়িয়ে। ওধারে হাবুল সেন পড়ে আছে—একেবারে ফ্ল্যাট।

টেনিদা হাবুলের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললে, ওই দ্যাখ!

ক্যাবলা বললে, হাবুল!

আমি বললাম, অমন করে আছে কেন?

টেনিদার গলা কাঁপতে লাগল : নিশ্চয় ওকে খুন করে রেখে গেছে!

আমার যে কী হল জানি না। খালি মনে হতে লাগল, ভয়ে একটা কচ্ছপ হয়ে যাচ্ছি! আমার হাত-পা একটু-একটু করে পেটের মধ্যে ঢোকবার চেষ্টা করছে। আমার পিঠের ওপর যেন শক্ত খোলা তৈরি হচ্ছে একটা। আর একটু পরে গুড়গুড়িয়ে হাঁটতে হাঁটতে আমি একেবারে জলের মধ্যে গিয়ে নামব।

আমি কোনমতে বলতে পারলাম : ওটা হাবুল সেনের মৃতদেহ!

কথা নেই—বার্তা নেই—টেনিদা হঠাৎ ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ফেললে : ওরে হাবলা রে! এ কী হল রে! তুই হঠাৎ খামোকা এমন করে বেঘোরে মারা গেলি কেন রে! ওরে কলকাতায় গিয়ে তোর দিদিমাকে আমি কী বলে বোঝাব রে! ওরে—কে আর আমাদের এমন করে আলুকাবলি আর ভীমনাগের সন্দেশ খাওয়াবে রে!

ক্যাবলা বললে, আরে জী, রোও মৎ। আগে দ্যাখো—জিন্দা আছে কি মুর্দা হয়ে গেছে।

আমারও খুব কান্না পাচ্ছিল। হাবুল প্রায়ই ওর দিদিমার ভাঁড়ার লুঠ করে আমের আচার আর কুলচুর এনে আমায় খাওয়াতো। সেই আমের আচারের কৃতজ্ঞতায় আমার বুকের ভেতরটা হায়-হায় করতে লাগল। আমি কোঁচা দিয়ে নাক-টাক মুছে ফেললুম। আমার আবার কী যে বিচ্ছিরি স্বভাব—কান্না পেলেই কেমন যেন সর্দি উর্দি হয়ে যায়।

বারতিনেক নাক টেনে আমি বললুম, আলবত মরে গেছে! নইলে অমন করে পড়ে থাকবে কেন?

ক্যাবলাটার সাহস আছে—সে গুটি-গুটি এগিয়ে গিয়ে হাবুলের মৃতদেহের পেটে একটা খোঁচা মারল। আর, কী আশ্চর্য ব্যাপার—অমনি মৃতদেহ উঠে বসল ধড়মড়িয়ে।

—বাপ রে—ভূত হয়েছে! বলেই আমি একটা লাফ মারলুম। আর লাফিয়ে উঠতেই টেনিদার খাঁড়ার মতো খাড়া নাকটার একটা ধাক্কা লাগল আমার মাথায়। কী শক্ত নাক—মনে হল যেন চাঁদিটা স্রেফ ফুটো হয়ে গেছে!—নাক গেল—নাক গেল—বলে টেনিদা একটা পেল্লায় হাঁক ছাড়ল, আর ধপাস করে মেঝেতে বসে পড়লুম আমি।

আর তক্ষুনি দিব্যি ভালো মানুষের মতো গলায় হাবুল বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা খাইয়া খাসা ঘুমাইতে আছিলাম, দিলি ঘুমটার দফা সাইর‍্যা!

তখন আমার খটকা লাগল। ভূতেরা তো চন্দ্রবিন্দু দিয়ে কথা বলে—এ তো বেশ ঝরঝরে বাংলা বলে যাচ্ছে। আর, পরিষ্কার ঢাকাই বাংলা!

টেনিদা খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে উঠল।

—আহা-হা—কী আমার রাজশয্যে পেয়েছেন রে—যে নবাবি চালে ঘুমোচ্ছেন! ইদিকে তখন থেকে আমরা খুঁজে মরছি—হতচ্ছাড়ার আক্কেলটা দ্যাখো একবার!

হাবুল আয়েস করে একটা হাই তুলে বললে, একহাঁড়ি রসগোল্লা সাঁইট্যা জব্বর ঘুমখানা আসছিল! তা, গজাদা কই? স্বামীজী কই গেলেন?

টেনিদা বললে, ইস, বেজায় যে খাতির দেখছি। স্বামীজী—গজাদা!

হাবুল বললে, খাতির হইব না ক্যান? কাইল বিকালে আইছি—সেই থিক্যা সমানে খাইত্যাছি। কী আদর-যত্ন করছে—মনে হইল য্যান ঠিক মামাবাড়ি আইছি। তা, তারা গেল কই?

ক্যাবলা বললে, তারা গেল কই—সে আমরা কী করে জানব? তা, তুই কী করে ওদের পাল্লায় পড়লি? এখানে এলিই বা কী করে?

—ক্যান আসুম না? একটা লোক আইস্যা আমারে কইল, খোকা—এইখানে পাহাড়ের তলায় গুপ্তধন আছে। নিবা তো আইস। বড়লোক হওনের অ্যামন সুযোগটা ছাড়ুম ক্যান? এইখানে চইল্যা আইছি। স্বামীজী—গজাদা—আমারে যে যত্ন করছে—কী কমু!

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, হ, কী আর কবা! এখানে বসে উনি রাজভোগ খাচ্ছেন, আর আমরা চোখে অন্ধকার দেখছি!

ক্যাবলা বললে, এসব কথা এখন থাক। এই গর্তের মধ্যে ওরা ক'জন থাকত রে?

—জনচারেক হইব।

—কী করত?

—কেমনে জানুম? একটা কলের মতো আছিল—সেইটা দিয়া খুটুর-খুটুর কইরা কী য্যান ছাপাইতো। সেই কলডাও তো দ্যাখতে আছি না। চইল্যা গেল নাকি? আহা হা, বড় ভালো খাইতে আছিলাম রে!—হাবুলের বুক ভেঙে দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরুল একটা।

—থাক তোর খাওয়া!—টেনিদা বললে, চল এবার বেরুনো যাক এখান থেকে। আমরা সময়মতো এসে পড়েছিলুম—নইলে খাইয়ে খাইয়েই তোকে মেরে ফেলত!

আমি বললুম, উঁহু, মোটা করে শেষে কাটলেট ভেজে খেত!

ক্যাবলা বললে, বাজে কথা বন্ধ কর। হ্যাঁ রে হাবুল—ওরা কী ছাপত রে?

ক্যামন কইরা কই? ছবির মতো কি সব ছাপাইত।

—ছবির মতো কি সব! ক্যাবলা নাক চুলকোতে লাগল : পাহাড়ের গর্তের মধ্যে চুপি চুপি! বাংলোতে লোক এলেই তাড়াতে চাইত! জঙ্গলের মধ্যে একটা নীল মোটর! শেঠ দুণ্ডুরাম!

টেনিদা বললে, চুলোয় যাক শেঠ দুণ্ডুরাম! হাবুলকে পাওয়া গেছে—আপদ মিটে গেছে। ওটা নয় হাঁড়িভর্তি রসগোল্লা সাবড়েছে—কিন্তু আমাদের পেটে যে ছুঁচোর দল সংকীর্তন গাইছে রে! চল বেরোই এখান থেকে—

আমি বললুম, আবার ওই মই বেয়ে?

হাবুল বললে, মই ক্যান্? এইখান দিয়াই তো যাওনের রাস্তা আছে।

—কোন্ দিকে রাস্তা?

—ঐ তো সামনেই।

হাবুলই দেখিয়ে দিলে। হলঘরের মতো সুড়ঙ্গটা পেরুতেই দেখি, বাঃ! একেবারে যে সামনেই পাহাড়ের একটা খোলা মুখ! আর কাছেই সেই নদীটা—সেই শালবন!

ক্যাবলা বললে, কী আশ্চর্য, তুই তো ইচ্ছে করলেই পালাতে পারতিস হাবলা!

হাবুল বললে, পালাইতে যামু ক্যান? অমন আরামের খাওন-দাওন! ভাবছিলাম—দুই-চাইরটা দিন থাইক্যা স্বাস্থ্যটারে এইটু ভালো কইর‍্যা লই।

টেনিদা চেঁচিয়ে বললে, ভালো কইরা! হতচ্ছাড়া—পেটুকদাস! তোকে যদি

www.boiRboi.blogspot.com

গজেশ্বর কাটলেট বানিয়ে খেত, তাহলেই উচিত শিক্ষা হত তোর!

কিন্তু বলতে বলতেই—

হঠাৎ মোটরের গর্জন।

মোটর! মোটর আবার কোত্থেকে? আবার কি শেঠ ঢুণ্ডুরাম?

হ্যাঁ—ঢুণ্ডুরামই বটে। সেই নীল মোটরটা। কিন্তু এদিকে আসছে না। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে দূরে চলে যাচ্ছে ক্রমশঃ—তারপর পাতার আড়ালে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। যেন আমাদের ভয়েই ঊর্ধ্বশ্বাসে পালালো ওটা।

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম—সেই মোটরে কার যেন একমুঠো দাড়ি উড়ছে হাওয়ায়। তামাক-খাওয়া লালচে পাকা দাড়ি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি?

পনেরো

'চিড়িয়া ভাগল বা'

দূরে শেঠ ঢুণ্ডুরামের নীল মোটরটাকে চলে যেতে দেখেই ক্যাবলা বললে, চুক-চুক-চ্ছু!

টেনিদা জিজ্ঞেস করলে, কী হল রে ক্যাবলা?

—কী আর হবে? চিড়িয়া ভাগল বা।

—চিড়িয়া ভাগল বা মানে?

আমি বললুম, বোধহয় চিঁড়ে-টিঁড়ের ভাগ হবে। চিঁড়ে কোথায় পেলি রে ক্যাবলা? দে না চাট্টি খাই! বড্ড খিদে পেয়েছে।

ক্যাবলা নাক কুঁচকে বললে, বহুৎ হুয়া, আর ওস্তাদি করতে হবে না! চিঁড়ে নয় রে বেকুব—চিঁড়ে নয়—চিড়িয়া ভাগল বা মানে হল, পাখি পালিয়েছে।

আমি বললুম, পাখি? নাঃ—পালায়নি তো! ওই তো দুটো কাক ওই গাছের ডালে বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, দুত্তোর! এই প্যালাটার মগজে খালি বাসক পাতার রস আর শিঙিমাছ ছাড়া আর কিছু নেই। শেঠ ঢুণ্ডুরামের মোটরে করে সব পালাল দেখছিস না? স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি দেখতে পাসনি?

—পালিয়েছে তো হয়েছে কী? টেনিদা বলল আপদ গেছে!

www.boiRboi.blogspot.com

হাবুল তখন দাঁড়িয়ে ঝিমোচ্ছিল। একহাঁড়ি রসগোল্লার নেশা ওর কাটেনি। হঠাৎ আলোর-খোঁচা-খাওয়া প্যাঁচার মতো চোখ মেলে বললে, আহা-হা, গজাদা চইল্যা গেল? বড় ভালো লোক আছিল গজাদা!

ক্যাবলা বললে, তুই থাম হাবুল, বেশি বকিসনি! গজাদা ভালো লোক! ভালো লোকই তো বটে! তাই তো বাংলো থেকে আমাদের তাড়াতে চায়—তাই পাহাড়ের গর্তের মধ্যে বসে কুটুর-কুটুর করে কী সব ছাপে! আর শেঠ ঢুণ্ডুরাম কী মনে করে একটা নীল মোটর নিয়ে জঙ্গলের ভেতর ঘুরে বেড়ায়?—ক্যাবলা পণ্ডিতের মতো মাথা নাড়তে লাগল, হুঁ-হুঁ-হুঁ! আমি বুঝতে পেরেছি।

টেনিদা বললে, খুব যে ডাঁটের মাথায় হুঁ-হুঁ করছিস! কী বুঝেছিস বল তো?

ক্যাবলা সে কথার জবাব না দিয়ে হঠাৎ চোখ পাকিয়ে আমাদের সকলের দিকে তাকাল। তারপর গলাটা ভীষণ গম্ভীর করে বললে, আমাদের দলে কাপুরুষ কে কে?

এমন করে বললে যে, আমার পালাজ্বরের পিলেটা একেবারে গুরগুর করে উঠল। একবার অঙ্কের পরীক্ষার দিনে পেট-ব্যথা হয়েছে বলে মটকা মেরে পড়ে-ছিলুম। মেজদা তখন ডাক্তারি পড়ে—আমার পেট-ব্যথা শুনে সে একটা আট হাত লম্বা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইনজেক্শন দিতে এসেছিল, আর তক্ষুনি পেটের ব্যথা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে পথ পায়নি। ক্যাবলার দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল সেও যেন এইরকম একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমায় তাড়া করছে।

আমি প্রায় বলেই ফেলেছিলুম—একমাত্র আমিই কাপুরুষ, কিন্তু সামলে গেলুম।

টেনিদা বললে, কাপুরুষ কে? আমরা সবাই বীরপুরুষ।

—তাহলে চল—যাওয়া যাক।

—কোথায়?

—ঐ নীল মোটরটাকে পাকড়াও করতে হবে।

বলে কী, পাগল না পাঁপড়-ভাজা! মাথা-খারাপ না পেট-খারাপ! মোটরটা কি ঘুটঘুটানন্দের লম্বা দাড়ি যে হাত বাড়িয়ে পাকড়াও করলেই হল!

হাবুল সেন বললে, পাকড়াও করবা কেমন কইর‍্যা? উইড়্যা যাবা নাকি?

ক্যাবলা বললে, চল—বড় রাস্তায় যাই। ওখান দিয়ে অনেক লরি যাওয়া-আসা করে, তাদের কিছু পয়সা দিলেই আমাদের তুলে নেবে।

—আর ততক্ষণ নীল মোটরটা বুঝি দাঁড়িয়ে থাকবে?

—নীল মোটর আর যাবে কোথায়—বড়-জোর রামগড়। আমরা রামগড়ে গেলেই ওদের ধরতে পারব।

—যদি না পাই? আমি জিজ্ঞাসা করলুম।

—আবার ফিরে আসব।

—কিন্তু মিথ্যে এ-সব দৌড়ঝাঁপের মানে কী? টেনিদা বললে, খামোকা ওদের পিছু-পিছু ধাওয়া করেই বা লাভ কী হবে? পালিয়েছে, আপদ গেছে। এবার বাংলোয় ফিরে প্রেমসে মুরগির ঠ্যাং চর্বণ করা যাবে। ওসব বিচ্ছিরি হাসিটাসিও আর শুনতে হবে না রাত্তিরে।

ক্যাবলা বুক থাবড়ে বললে, কভি নেহি। আমাদের বোকা বানিয়ে ওরা চলে যাবে—সারা পটলডাঙার যে বদনাম হবে তাতে। তারপর আর পটলডাঙায় থাকা যাবে না—সোজা গিয়ে আলু-পোস্তায় আস্তানা নিতে হবে। ওসব চলবে না, দোস্ত। তোমরা সঙ্গে যেতে না চাও, না গেলে। কিন্তু আমি যাবই।

টেনিদা বললে, একা?

—একা।

টেনিদা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, চল—আমরাও তাহলে বেরিয়ে পড়ি।

আমি শেষবারের মতো চাঁদির ওপরটা চুলকে নিলুম।

—কিন্তু ওদের সঙ্গে যে গজেশ্বর আছে। কাঁকড়াবিছের কামড়ে সেবার একটু জব্দ হয়েছিল বটে, কিন্তু আবার যদি হাতের মুঠোয় পায় তাহলে সকলকে কাটলেট বানিয়ে খাবে। পেঁয়াজ-চচ্চড়িও করতে পারে। কিংবা পোস্তর বড়া।

—কিংবা পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল!—ক্যাবলা তিনটে দাঁত বের করে দিয়ে আমাকে যাচ্ছেতাই রকম ভেংচে দিলে : তাহলে তুই একাই থাক এখানে—আমরা চললুম।

পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোলকে অপমান করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। পটোল নিয়ে ইয়ার্কি নয়, হুঁ-হুঁ! আমাদের পাড়া হচ্ছে কলকাতার সেরা পাড়া—তার নাম পটলডাঙা। মানুষ মরে গেলে তাকে পটোল তোলা বলে। আমার এক মাসতুতো ভাই আছে—তার নাম পটল : সে একসঙ্গে দেড়শো আলুর চপ আর দুশো বেগুনি খেতে পারে! ছোড়দির একটা পাঁঠা ছিল—সেটার নাম পটল—সে মেজদার একটা সখের শাদা নাগরাকে সাত মিনিট তের সেকেণ্ডের মধ্যে খেয়ে ফেলেছিল—ঘড়ি ধরে মিলিয়ে দেখেছিলুম আমি। আর, শিঙিমাছের কথা কে না জানে! আর কোন্ মাছের শিং আছে? মতান্তরে ওকে সিংহমাছও বলা যায়—মাছেদের রাজ্যে ও হল সিংহ। আর তোরা কী খাস বল! আলু, পোনা মাছ। আলু শুনলেই মনে পড়ে আলু প্রত্যয়। সেইসঙ্গে পণ্ডিতমশায়ের বিচ্ছিরি গাঁট্টা। আর পোনা! ছোঃ! লোকে কথায় বলে—ছানাপোনা—পুঁচকে এত্তোটুকু। কোথায় সিংহ, আর কোথায় পোনা! কোনো তুলনা হয়। রামচন্দ্র!

আমি যখন এইসব তত্ত্বকথা ভাবছি, আর ভাবতে ভাবতে উত্তেজনায় আমার কান কটকট করছে, তখন হঠাৎ দেখি ওরা দল বেঁধে এগিয়ে যাচ্ছে আমাকে ফেলেই।

অগত্যা পটোল আর শিঙিমাছের ভাবনা থামিয়ে আমাকে ওদেরই পিছু-পিছু ছুটতে হল।

বড় রাস্তাটা আমাদের বাংলো থেকে মাইল-দেড়েক দূরে। যেতে-যেতে কাঁচা রাস্তায় আমরা মোটরের চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছিলুম। এক জায়গায় দেখলুম একটা শালপাতার ঠোঙা পড়ে রয়েছে। নতুন—টাট্‌কা শালপাতার ঠোঙা। কেমন কৌতূহল হল—ওরা দেখতে না পায় এমনিভাবে চট করে তুলে নিয়ে শুঁকে ফেললুম। ইঃ—নির্ঘাত সিঙাড়া! এখনো তার খোস্‌বু বেরুচ্ছে!

কী ছোটলোক! সবগুলো খেয়ে গেছে! এক-আধটা রেখে গেলে কী এমন ক্ষেতিটা ছিল!

—এই প্যালা—মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়লি ক্যান র‍্যা?—টেনিদার হাঁক শোনা গেল।

এমনিতেই খিদে পেয়েছে—ঘ্রাণে অর্ধভোজন হচ্ছিল, সেটা ওদের সইল না। চটপট ঠোঙাটা ফেলে দিয়ে আবার আমি ওদের পিছু পিছু হাঁটতে লাগলুম। ভারি মন খারাপ হয়ে গেল। ঠোঙাটা আরো একটু শোঁকবার একটা গভীর বাসনা আমার ছিল।

বড় রাস্তায় যখন এসে পড়েছি—তখন, ভোঁক—ভোঁক। একটা লরি।

আমি হাত তুলে বলতে যাচ্ছিলুম—রোখ্‌কে—রোখ্‌কে—কিন্তু ক্যাবলা আমার হাত চেপে ধরলে। বললে, কী যে করিস গাড়োলের মতো তার ঠিক নেই! ওটা তো রামগড় থেকে আসছে!

—ওরা তো উল্টোদিকেও যেতে পারে!

—তুই একটা ছাগল! দেখছিস না কাঁচা রাস্তার ওপর ওদের মোটরের চাকা কিভাবে বাঁক নিয়েছে! অর্থাৎ ওরা নির্ঘাত রামগড়ের দিকেই গেছে। উল্টোদিকে হাজারিবাগ—সেদিকে যায়নি।

ইস্—ক্যাবলার কী বুদ্ধি! এই বুদ্ধির জন্যেই ও ফার্স্ট হয়ে প্রমোশন পায়—আর আমার কপালে জোটে লাড্ডু! তাও অঙ্কের খাতায়। আমার মনে হল লাড্ডু কিংবা গোল্লা দেবার ব্যবস্থাটা আরো নগদ করা ভালো। খাতায় পেন্‌সিল দিয়ে গোল্লা বসিয়ে কী লাভ হয়? যে গোল্লা খায় তাকে একভাঁড় রসগোল্লা দিলেই হয়! কিংবা গোটা-আষ্টেক বড়বাজারের লাড্ডু! কিন্তু তিলের নাড়ু নয়—একবার একটা খেয়ে সাতদিন আমার দাঁত ব্যথা করেছিল।

—ঘর্‌র্—ঘ্যাঁস।

পাশে একটা লরি এসে থামল। কাঠ-বোঝাই। ক্যাবলা হাত তুলে সেটাকে থামিয়েছে। লরি-ড্রাইভার গলা বের করে বললে, কী হয়েছে খোকাবাবু? তুমরা ইখানে কী করছেন?

—আমাদের একটু রামগড়ে পৌঁছে দিতে হবে ড্রাইভার সাহেব!

—পয়সা দিতে হবে যে! চার আনা।

—তাই দেব।

—তবে উঠে পড়। লেকিন কাঠকে উপর বসতে হোবে।

—ঠিক আছে। কাঠে আমাদের কোন অসুবিধে হবে না।

ক্যাবলা আমাদের তাড়া দিয়ে বললে, টেনিদা—ওঠো! হাবলা—আর দেরি করিস নি। তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস কেন প্যালা? উঠে পড় শীগ্‌গির—

ওরা তো উঠল। কিন্তু আমার ওঠা কি অত সহজ? টেনে-হিঁচড়ে কোনমতে যখন লরির ওপরে উঠে কাঠের আসনে গদিয়ান হলুম—তখন আমার পেটের খানিক নুন-ছাল উঠে গেছে। সারা গা চিড়-চিড় করে জ্বলছে।

আর তক্ষুনি—

ভোঁক-ভোঁক করে আরো গোটা-দুই হাঁক ছেড়ে গাড়ি ছুটল রামগড়ের রাস্তায়। এঃ—কী যাচ্ছেতাই ভাবে নড়ছে যে কাঠগুলো! কখন ধপাস করে উল্‌টে পড়ে যাই—তার ঠিক নেই! আমি সোজা উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে দু'হাতে মোটা কাঠের গুঁড়িটা জাপটে ধরলুম।

লরিটা পাঁই-পাঁই করে ছুটতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল, পেল্লায় ঝাঁকুনির চোটে আমার পেটের নাড়িভুঁড়িগুলো সব একসঙ্গে ক্যাঁ-ক্যাঁ করছে।

www.boiRboi.blogspot.com

ষোলো

'মোক্ষম লাড্ডু'

কাঠের লরির সে কী দৌড়! একে তো হৈ-হৈ করে ছুটছে, তায় ভেতরের কাঠ-গুলো যেন হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করেছে। যদিও মোটা দড়ি দিয়ে কাঠগুলো বেশ শক্ত করে বাঁধা, তবু মনে হচ্ছিল কখন যেন আমাদের নিয়ে ওরা চারদিকে ছিট্‌কে পড়ে যাবে।

জাম-ঝাঁকানো দেখেছ কখনো? সেই যে দুটো বাটির মধ্যে পুরে ঝকর-ঝকর করে ঝাঁকায়—আর জামের আঁটি-টাটিগুলো সব আলাদা হয়ে যায়? ঠিক তেমনি করে আমার জ্বরের পিলে-টিলে ঝাঁকিয়ে দিচ্ছিল। আমার সন্দেহ হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ পরে আমি আর পটলডাঙার প্যালারাম থাকব না—একেবারে শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীকচ্ছপ হয়ে যাব। মানে, সব মিলিয়ে একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে যাব।

এর মধ্যে—ঝড়াং—ঝড়াং! নাকের ওপর দিয়ে কে যেন চাবুক হাঁকড়ে দিলে! একটা গাছের ডাল।

টেনিদা বললে, ইঃ—হতভাগা ক্যাবলার বুদ্ধিতে পড়েই আজ মাঠে মারা যাব!

ক্যাবলা ইস্টুপিডটা এর মধ্যেও রসিকতার চেষ্টা করলে: মাঠে নয়—রাস্তায়। রামগড়ের রাস্তায়।

—রাস্তায়! টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, দাঁড়া না একবার, রামগড় পৌঁছে যাই। তারপর—

তারপর বললে—কোঁৎ!

মানে, ক্যাবলাকে কোঁৎ করে গিলে খাবে তা বললে না। একটা মোক্ষম ঝাঁকুনি খেয়ে ওটা বেরিয়ে এল মুখ দিয়ে।

হাবুল সেন ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল: ইস, কর্ম তো সারছে। প্যাটের মধ্যে গজাদার রসগোল্লা যে ছানা হইয়া গেল!

আমি বললুম, শুধু ছানা? এর পরে দুধ হয়ে যাবে।

টেনিদা শুরু করলে: দুধ? দুধেও কুলোবে না। একটু পরে পেট ফুঁড়ে শিং-টিং শুদ্ধু একটা গোরুও বেরিয়ে আসবে—দেখে নিস।

হাবুল আবার ঘ্যানঘ্যান করে বললে, হঃ—সত্য কইছ। প্যাট ফুইড়্যা গোরুই বাহির হইব অখনে।

ক্যাবলা চেঁচিয়ে গান ধরলে, প্রলয় নাচন নাচলে যখন আপন ভুলে হে নটরাজ!

টেনিদা রেগেমেগে কি একটা বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছিল, এমন সময় আবার সেই পেল্লায় ঝাঁকুনি। টেনিদা সংক্ষেপে বললে, ঘোঁ-ঘোঁ ঘোৎ!

কিন্তু সব দুঃখেরই শেষ আছে। শেষ পর্যন্ত লরি রামগড়ের বাজারে এসে পৌঁছল।

গাড়িটা এখন একটু আস্তে আস্তে যাচ্ছে—আমরা চারজন কোনমতে কাঠের ওপর উঠে বসেছি। হঠাৎ—

—আরে ভগলু, দেখ্ ভাইয়া! লরিকা উপর চার লেড়কা বান্দরকা মাফিক বৈঠল বা!

তিনটে কালো-কালো ছোকরা। আমাদের দেখে দাঁত বের করে হাসছে।

আমি ভীষণ রেগে বললুম, তুম্‌লোগ্ বান্দর হো! তুম্‌লোগ্ বুদ্ধু হো!

শুনে একজন অমনি বোঁ করে একটা ঢিল চালিয়ে দিলে—একটুর জন্যে আমার কানে লাগল না। আমাদের লরির ড্রাইভার চেঁচিয়ে বলল, মারকে টিক্কি উখাড় দেব—হঁ!

ছোকরাগুলোর অবশ্য টিকি ছিল না, তবু দাঁত বের করে ভেংচি কাটতে কাটতে কোথায় যেন হাওয়া হয়ে গেল।

লরিটা আর-একটু এগোতেই ক্যাবলা বললে,—টেনিদা, কুইক! ওই যে নীল মোটর!

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! আমাদের থেকে বেশ খানিকটা আগে একটা মিঠাইয়ের দোকানের সামনে শেঠ দুণ্ডুরামের নীল রঙের মোটরটা দাঁড়িয়ে আছে।

আমার বুকের ভেতর ধড়াস-ধড়াস করতে লাগল। আবার সেই গজেশ্বর! সেই ষণ্ডা জোয়ান ভয়ঙ্কর লোকটা! এর চাইতে লরির ওপরে কচ্ছপরাম হয়ে থাকলেই ভালো হত—অনেক বেশি আরাম পাওয়া যেত।

কিন্তু ক্যাবলা ছাড়বার পাত্র নয়। টেনে নামাল শেষ পর্যন্ত।

—শোন্ প্যালা! তুই আর হাবলা এই পিপুল গাছটার তলায় বসে থাক। বসে-বসে ওই নীল মোটরটাকে ওয়াচ কর। আমরা ততক্ষণে একটা কাজ সেরে আসি।

লরিটা ভাড়া বুঝে নিয়ে চলে গিয়েছিল। কাছে থাকলে আমি আবার তড়াক করে ওটার ওপরে উঠে বসতুম—তারপর যেদিকে হোক সরে পড়তুম। কিন্তু এ কী গেরো রে বাপু! এই পিপুল গাছতলায় বসে ওয়াচ করতে থাকি, আর এর মধ্যে গজেশ্বর এসে ক্যাঁক করে আমার ঘাড় চেপে ধরুক।

আমি নাক-টাক চুলকে বললুম, আমি তোমাদের সঙ্গেই যাই না? হাবুল এখানে একাই সব ম্যানেজ করতে পারবে।

ক্যাবলা বললে, বেশি ওস্তাদি করিসনি। যা বললুম তাই কর—বসে থাক ওখানে। গাড়িটার ওপরে বেশ করে লক্ষ্য রাখিস। আমরা দশ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। এস টেনিদা—

এই বলে, পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ওরা টুক করে যেন কোন্ দিকে চলে গেল।

আমি বললুম, হাবলা!

—উঁ?

—দেখলি কাণ্ডটা?

হাবলা তখন পিপুল গাছের গোড়ায় বসে পড়েছে। মস্ত একটা হাই তুলে বললে: হঃ সইত্য কইছ।

—এভাবে বোকার মতো এখানে বসে থাকবার কোনো মানে হয়?

হাবুল আর-একটা হাই তুলে বললে, নাঃ! তার চাইতে ঘুমানো ভালো। আমার কাঁচা ঘুমটা তোরা মাটি কইর‍্যা দিছস—তার উপর লরির ঝাঁকানি!—ইস্—শরীরটা ম্যাজম্যাজ করতে আছে।

এই বলেই হাবুল পিপুল গাছটায় ঠেসান দিলে। আর তখুনি চোখ বুজলো। বললে বিশ্বাস করবে না—আরো একটু পরে 'ফরর্ ফোঁ-ফোঁ' করে হাবুলের নাক ডাকতে লাগল।

www.boiRboi.blogspot.com

কাণ্ডটা দ্যাখ একবার!

আমি ডাকলুম, হাবলা—হাবলা—

নাকের ডাক নামিয়ে হাবুল বললে, উঁ?

—এই দিন-দুপুরে গাছতলায় বসে ঘুমুচ্ছিস কী বলে?

হাবুল ব্যাজার হয়ে বললে, বেশি চিল্লাচিল্লি করবি না প্যালা—কইয়া দিলাম। শান্তিতে একটু ঘুমাইতে দে। সঙ্গে-সঙ্গেই পরম শান্তিতে সে ঘুমিয়ে পড়ল। আর নাকের ভেতর থেকে ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ করে শব্দ হতে লাগল—যেন ঝাঁক বেঁধে চড়ুই উড়ে যাচ্ছে।

কী ছোটলোক—কী ভীষণ ছোটলোক! এখন আমি একা বসে ঠায় পাহারা দিই। কী যে রাগ হল বলবার নয়। ইচ্ছে করতে লাগল ওর কানে কটাং করে একটা চিমটি দিই। কিন্তু তক্ষুনি দেখলুম, তার চাইতেও ভালো জিনিস আছে। বেশ মোটা-মোটা একদল লাল পিঁপড়ে যাচ্ছে মার্চ করে। ওদের গোটাকয়েক ধরে ক্যাবলার নাকের ওপর ছেড়ে দিলে কেমন হয়?

একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে লাল পিঁপড়ে ধরতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

—আরে খোকা—তুমি এহিখানে?

তাকিয়ে দেখি, শেঠ ঢুণ্ডুরাম!

ভয়ে আমার পেটের মধ্যে এক ডজন পটোল আর দু-ডজন শিঙিমাছ একসঙ্গে লাফিয়ে উঠল। আমি একটা মস্ত হাঁ করলুম, শুধু বললুম, আ—আ—আ—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম হাসলেন: রামগড়ে বেড়াইতে এসেছো? তা বেশ, বেশ। কিন্তু এহিখানে গাছের তলায় বসিয়ে কেনো? লেকিন মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তোমার বহুৎ খিদে পেয়েছে।

খিদে? বলে কী! সেই শালপাতার ঠোঙাটা শোঁকার পর থেকে আমার সমস্ত মেজাজ বিগড়ে রয়েছে। মনে হচ্ছে—আকাশ খাই, পাতাল খাই। এমন অবস্থা হয়েছে যে শেঠ ঢুণ্ডুরামের ভুঁড়িটাতেই হয়ত কড়াৎ করে কামড় বসিয়ে দিতে পারি। কিন্তু সে কথা কি আর বলা যায়?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে খিদে পেয়েছে—তাতে লজ্জা কী? আইসো হামার সঙ্গে। ঐ দোকানে বহুৎ আচ্ছা লাড্ডু মিলে—গরমাগরম সিঙাড়া ভি আছে। খাবে? হামি খিলাবো—তোমাকে পয়সা দিতে হোবে না।

এই পটলডাঙার প্যালারামকে বাঘ-ভালুক কায়দা করতে পারে না—টেনিদার গাঁট্টা দেখেও সে বুক টান করে দাঁড়িয়ে থাকে, অঙ্কে গোল্লা খেলেও তার মন-মেজাজ বিগড়ে যায় না। কিন্তু খাবারের নাম করেছ কি, এমন দুর্ধর্ষ প্যালারাম একেবারে বিধ্বস্ত।

আমি আমতা আমতা করে বললুম,—লেকিন শেঠজী, গজেশ্বর—

ঢুণ্ডুরাম চোখ কপালে তুলে বললেন, গজেশ্বর? কোন্ গজেশ্বর?

আমি বললুম, সেই যে একটা প্রকাণ্ড জোয়ান—হাতির মতো চেহারা—আপনার গাড়িতে এসেছে—

ঢুণ্ডুরাম বললেন, রাম—রাম—সীতারাম! হামি কোনো গজেশ্বরকে জানে না। হামার গাড়িতে হামি ছাড়া আর কেউ আসেনি।

—তবে যে স্বামী ঘুটঘুটানন্দের দাড়ি—

ঘুটঘুটানন্দ? ঢুণ্ডুরাম ভেবে-চিন্তে বললেন, হাঁ—হাঁ—একঠো বুড্ঢা রাস্তায় হামার গাড়িতে উঠেছিল বটে। হামাকে বললে, শেঠজী, রামগড় বাজারে আমি

নামবে। হামি তাকে নামাইয়ে দিলম। সে ইস্টেশনের দিকে চলিয়ে গেল।

এর পরে আর অবিশ্বাসের কী থাকতে পারে?

ঢুণ্ডুরাম বললে, আইসো খোকা—আইসো। ভালো লাড্ডু আছে—গরম সিঙাড়া ভি আছে—

আর থাকা গেল না। পটলডাঙার প্যালারাম কাত হয়ে গেল। হাবলা তখনো নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে আর ওর নাকের ভেতর থেকে সমানে চড়ুই পাখি উড়ছে। একবার মনে হল ওকে জাগাই—তারপরেই ভাবলুম: না—থাক পড়ে। আমি একাই গুটি-গুটি ঢুণ্ডুরামের সঙ্গে গেলাম।

মস্ত খাবারের দোকান। থরে-থরে লাড্ডু আর মোতিচুর সাজানো। প্রকাণ্ড কড়াইয়ে গরম সিঙাড়া ভাজা হচ্ছে। গন্ধেই প্রাণ বেরিয়ে যেতে চায়!

শেঠজী বললেন, আইসো খোকা—ভিতরে আইসো।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখি, গজেশ্বর কিংবা ঘুটঘুটানন্দের টিকির ডগাটিও কোথাও নেই।

ঢুকে তো পড়ি।

দোকানের ভেতরে একটা ছোট্ট খাবারের ঘর। বসেই শেঠজী ফরমাস করলেন, স্পেশাল এক ডজন লাড্ডু আউর ছ-ঠো সিঙাড়া—

আমি বিনয় করে বললুম, আবার অত কেন শেঠজী?

ঢুণ্ডুরাম বললেন, আরে বাচ্চা খাও না! বহুৎ বড়িয়া চীজ আছে।

শালপাতায় করে বড়িয়া চীজ এল। একটা লাড্ডু খেয়ে দেখি—যেন অমৃত। সিঙাড়া তো নয়—যেন কচি পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল। আর বলতে হল না, আমি কাজে লেগে গেলুম।

গোটা চারেক লাড্ডু আর গোটা দুই সিঙাড়া খেয়েছি—এমন সময় হঠাৎ মাথাটা কেমন ঝিম-ঝিম করে উঠল। তারপর চোখে অন্ধকার দেখলুম। তারপর—

স্পষ্ট শুনলুম—গজেশ্বরের অট্টহাসি!

—পেয়েছি এটাকে। এক নম্বরের বিচ্ছু। আজই এটাকে আমি আলু-কাবলি বানিয়ে খাব।

ব্যস—দুনিয়া একেবারে অথই অন্ধকার! আমি চেয়ার-টেয়ার শুদ্ধু হুড়মুড় করে মাটিতে উলটে পড়ে গেলুম।

www.boiRboi.blogspot.com

সতেরো

'খেলা খতম!'

চটকা ভাঙতেই মনে হল, এ কোথায় এলুম?

কোথায় ঝাণ্টপাহাড়ের বাংলো—কোথায় রামগড়—কোথায় কী! চারিদিকে তাকিয়ে নিজের চোখকেই ভালো করে বিশ্বাস হল না।

দেখলুম মস্ত একটা পাহাড়ের চূড়ায় বসে আছি। ঠিক চূড়ায় নয়, তা থেকে একটু নিচে। আর চূড়ার মুখে একটা উনুনের মতো—তা থেকে লক-লক করে আগুন বেরুচ্ছে।

ভূগোলের বইয়ে পড়েছি...সিনেমার ছবিতেও দেখেছি। ঠিক চিনতে পারলুম আমি। বলে ফেললুম, এটা নিশ্চয় আগ্নেয়গিরি!

যেই বলা, সঙ্গে সঙ্গে কারা যেন হা-হা করে হেসে উঠল। সে কী হাসি! তার শব্দে পাহাড়টা থর-থর করে কেঁপে উঠল—আর আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে একটা প্রকাণ্ড আগুনের শিখা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল আকাশের দিকে।

চেয়ে দেখি—একটু দূরে বসে তিনটে লোক হেসে লুটোপুটি। একজন শেঠ চুন্ডুরাম—হাসির তালে-তালে শেঠজীর ভুঁড়িটা ঢেউয়ের মতো দুলে-দুলে উঠছে। তাঁর পাশেই বসে আছেন স্বামী ঘুটঘুটানন্দ—হাসতে হাসতে নিজের দাড়ি ধরেই টানাটানি করছেন। আর পাহাড়ের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দৈত্যের মতো গজেশ্বর আকাশ-জোড়া হাঁ মেলে অট্টহাসি হাসছে।

ওদের তিনজনকে দেখেই আমার আত্মারাম খাঁচাছাড়া! পেটের পিলেতে একেবারে ভূমিকম্প জেগে উঠল।

আমি ঘাবড়ে গিয়ে বললুম, এত হাসছ কেন তোমরা? হাসির কী হয়েছে?

শুনে আবার একপ্রস্থ হাসি। আর গজেশ্বর পেটে হাত দিয়ে ধপাস্ করে বসে পড়ল।

শেঠ চুন্ডুরাম বললেন, হোঃ—হোঃ! আগ্নেয়গিরিই হচ্ছেন বটে! এইটা কোন্ আগ্নেয়গিরি জানো খোঁকা?

—কী করে জানব? এর আগে তো কখনো দেখিনি!

—এইটা হচ্ছেন ভিসুভিয়াস।

—ভিসুভিয়াস?—শুনে আমার চোখ কপালে উঠল। ছিলুম রামগড়ে, সেখান থেকে ভিসুভিয়াস যে এত কাছে এ খবর তো আমার জানা ছিল না!

আমি বললুম, ভিসুভিয়াস তো জার্মানিতে! না কি, আফ্রিকায়?

শুনেই গজেশ্বর চোখ পাকিয়ে এক বিকট ভেংচি কাটল।

—ফুঃ, বিদ্যের নমুনাটা দ্যাখো একবার। এই বুদ্ধি নিয়েই উনি স্কুল-ফাইন্যাল পাশ করবেন। ভিসুভিয়াস জার্মানিতে—ভিসুভিয়াস আফ্রিকায়! ছোঃ ছোঃ!

আমি নাক চুলকে বললুম তাহলে বোধহয় আমেরিকায়?

শুনে গজেশ্বর বললে, এঃ, এর মগজে গোবরও নেই—একদম খটখটে ঘুঁটে! সাধে

কি পরীক্ষায় গোল্লা খায়। ভিসুভিয়াস তো ইটালিতে।

—ওহো—তাও হতে পারে। তা, ইটালি আর আমেরিকা একই কথা।

—একই কথা? গজেশ্বর বললে, তোমার মুখ আর ঠ্যাং একই কথা? পাঁঠার কালিয়া আর পলতার বড়া একই কথা?

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, ওর কথা ছেড়ে দাও। ওর পা-ও যা মুণ্ডুও তাই সে মুণ্ডুতে কিছু নেই—স্রেফ কচি পটোল আর শিঙিমাছের ঝোল।

শিঙিমাছ আর পটোলের বদনাম করলে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি চটে বললুম, থাকুক গে, তাতে তোমাদের কী? কিন্তু কথা হচ্ছে—রামগড় থেকে আমি ইটালিতে চলে এলুম কী করে? কখনই বা এলুম? টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা এরাই বা সব গেল কোথায়? কাউকেই তো দেখতে পাচ্ছি না।

—পাবেও না—গজেশ্বর মিটিমিটি হাসল : তারা সব হজম।

—হজম! তার মানে?

—মানে? পেটের মধ্যে, খেয়ে ফেলেছি।

—খেয়ে ফেলেছ! আমার পেটের পিলেটা একেবারে গলা-বরাবর হাইজাম্প মারল : সে কী কথা!

আবার তিনজনে মিলে বিকট অট্টহাসি। সে হাসির শব্দে ভিসুভিয়াসের চূড়ার ওপর লকলকে আগুন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে লাগল। আমি দু'হাতে কান চেপে ধরলুম।

হাসি থামলে স্বামী ঘুটঘুটানন্দ বললেন, বাপু হে, আমাদের সঙ্গে চালাকি! পুঁটিমাছ হয়ে লড়াই করতে এসেছ হুলো বেড়ালের সঙ্গে! পাঁঠা হয়ে ল্যাং মারতে গেছ রয়েল বেঙ্গল টাইগারকে! যোগবলে তোমাদের চারটেকে এখানে উড়িয়ে নিয়ে এসেছি! আর তারপরে—

শেঠজী বললেন, হাবুলকে রোস্ট পাকিয়েছি—

গজেশ্বর বললে, তোমাদের লীডার টেনিকে কাটলেট বানিয়েছি—

স্বামীজী বললেন, ঐ ফরফরে ছোকরা ক্যাবলাকে ফ্রাই করেছি—

শেঠজী বললেন, তারপর খেয়ে লিয়েছি।

আমার ঝাঁটার মতো চুল ব্রহ্মতালুর ওপরে কাঁটার মতো খাড়া হয়ে উঠল। বার-কয়েক খাবি খেয়ে বললুম, অ্যাঁ!

স্বামীজী বললেন, এবার তোমার পালা।

—অ্যাঁ!

—আর অ্যাঁ অ্যাঁ করতে হবে না, টের পাবে এখুনি।—স্বামীজী ডাকলেন, গজেশ্বর!

গজেশ্বর হাতজোড় করে বললে, জী মহারাজ!

—কড়াই চাপাও।

বলতে বলতে দেখি কোত্থেকে একটা কড়াই তুলে ধরেছে গজেশ্বর। সে কী কড়াই! একটা নৌকোর মত দেখতে। তার ভেতরে শুধু আমি কেন, আমাদের চার মূর্তিকেই একসঙ্গে ঘণ্ট বানিয়ে ফেলা যায়।

—উনুনে কড়াই বসাও, ঘুটঘুটানন্দ আবার হুকুম করলেন। গজেশ্বর তক্ষুনি সোজা গিয়ে উঠল ভিসুভিয়াসের চূড়ায়। তারপর ঠিক উনুনে যেমনি করে বসায়, তেমনি করে কড়াইটা আগ্নেয়গিরির মুখের ওপর চাপিয়ে দিলে।

স্বামীজী বললেন, তেল আছে তো?

www.boiRboi.blogspot.com

গজেশ্বর বললে, জী মহারাজ।

—খাঁটি তেল?

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হামার নিজের ঘানির তেল আছে মহারাজ। একদম খাঁটি। থোরাসে ভি ভেজাল নেহি।

স্বামী ঘুটঘুটানন্দ দাড়ি চুমরে বললেন, তবে ঠিক আছে। ভেজাল তেল খেয়ে ঠিক জুত হয় না—কেমন যেন অম্বল হয়ে যায়।

আমি আর থাকতে পারলুম না। হাউমাউ করে বললুম, খাঁটি তেল দিয়ে কী হবে?

—তোমাকে ভাজব। গজেশ্বর গাড়ুইয়ের জবাব এল।

স্বামীজী বললেন, তারপর গরম গরম মুড়ি দিয়ে—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, কুড়মুড় করে খাইয়ে লিবো।

পটলডাঙার প্যালারাম তাহলে গেল! চিরকালের মতোই বারোটা বেজে গেল তার! শেয়ালদার বাজারে আর কেউ তার জন্যে কচি পটোল কিনবে না—শিঙিমাছও না। এই তিন-তিনটে রাক্ষসের পেটে গিয়ে সে বিলকুল বেমালুম হজম হয়ে যাবে!

তখন হঠাৎ আমার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। কেমন স্বর্গীয় স্বর্গীয় মনের ভাব এসে দেখা দিলে। ব্যাপারটা কী রকম জান? মনে কর, তুমি অঙ্কের পরীক্ষা দিতে বসেছ। দেখলে, একটা অঙ্কও তোমার দ্বারা হবে না—মানে তোমার মাথায় কিচ্ছু ঢুকছে না। তখন প্রথমটায় খানিক দরদরিয়ে ঘাম বেরুল, মাথাটা গরম হয়ে গেল, কানের ভেতর ঝিঁঝি পোকা ডাকতে লাগল আর নাকের ওপরে যেন ফড়িং এসে ফড়াং ফড়াং করে উড়তে লাগল! তারপর আস্তে আস্তে প্রাণে একটা গভীর শান্তির ভাব এসে গেল। বেশ মন দিয়ে তুমি খাতায় একটা নারকোল গাছ আঁকতে শুরু করে দিলে। তার পেছনে পাহাড়—তার ওপর চাঁদ—অনেকগুলো পাখি উড়ছে, ইত্যাদি ইত্যাদি। মানে সব আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি তখন আর্টিস্ট হয়ে উঠলে।

এখানেও যখন দেখছি প্রাণের আশা আর নেই—তখন আমার ভারি গান পেল। মনে হল, আশ মিটিয়ে একবার গান গেয়ে নিই। বাড়িতে কখনো গাইতে পাইনে—মেজদা তার মোটা-মোটা ডাক্তারি বই নিয়ে তাড়া করে আসে। চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে দু'চারদিন গাইতে চেয়েছি—টেনিদা আমার চাঁদিতে চাঁটি বসিয়ে তক্ষুনি থামিয়ে দিয়েছে। এখানে একবার শেষ গান গেয়ে নেব। এর আগে কখনো গাইতে পাইনি—এর পরেও তো আর কখনো সুযোগ পাব না।

বললুম, প্রভু, স্বামীজী!

স্বামীজী বললেন, কী চাই বলো? কী হলে তুমি খুশি হও: তোমায় বেসম দিয়ে ভাজব—না এমনি নুন-হলুদ মাখিয়ে?

আমি বললুম, যেভাবে খুশি ভাজুন—আমার কোনো আপত্তি নেই। কেবল একটা নিবেদন আছে। একটুখানি গান গাইতে চাই। মরবার আগে শেষ গান।

গজেশ্বর গাঁ-গাঁ করে বললে, সেটা মন্দ হবে না প্রভু। খাওয়া-দাওয়ার আগে এক-আধটু গান-বাজনা হলে মন্দ হয় না। আফ্রিকার লোকেও মানুষ পুড়িয়ে খাওয়ার আগে বেশ নেচে নেয়। লাগাও হে ছোকরা—

শেঠ ঢুণ্ডুরাম বললেন, হাঁ হাঁ—প্রেমসে একঠো আচ্ছা গানা লগা দেও—

আমি চোখ বুজে গান ধরে দিলুম:

'একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায়
মস্ত একটি হাড় ফুটিল—

বাঘ বিস্তর চেষ্টা করিল—
হাড়টি বাহির না হইল।'

শেঠজী বিরক্ত হয়ে বললেন, ই কী হচ্ছেন? ই তো কথামালার গল্প আছেন।

স্বামীজী বললেন, না হে—এতেও বেশ ভাব আছে। আহা-হা—কী সুর, কী প্যাঁচামার্কা গলার আওয়াজ। গেয়ে যাও ছোকরা, গেয়ে যাও!

আমি তেমনি চোখ বুজেই গেয়ে চললুম:

'তখন গলার ব্যথায় নেকড়ে বাঘের
চোখ ফাটিয়ে জল আসিল,
ভ্যাঁও-ভ্যাঁও রবে কাঁদিতে-কাঁদিতে
সে এক সারসের কাছে গেল—'

এই পর্যন্ত গেয়েছি—হঠাৎ ঝুমুর-ঝুমুর করে ঘুঙুরের শব্দ যেন কানে এল। মনে হল কেউ যেন নাচছে। চোখ মেলে যেই তাকিয়েছি—দেখি—

গজেশ্বর নাচছে।

হ্যাঁ—গজেশ্বর ছাড়া আর কে? এর মধ্যে কখন একটা ঘাগরা পরেছে—নাকে একটা নথ লাগিয়েছে, পায়ে ঘুঙুর বেঁধেছে আর ঘুরে-ঘুরে ময়ূরের মতো নাচছে। সে কী নাচ! রামায়ণের তাড়কা রাক্ষসী কখনো ঘাগরা পরে নেচেছিল কি না জানি না, কিন্তু যদি নাচত তাহলেও যে সে গজেশ্বরের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, এ আমি হলফ করে বলতে পারি! আমি হাঁ করে তাকিয়ে আছি দেখে গজেশ্বর মিটমিট করে হাসল।

—বলি, কী দেখছ? অ্যাঁ—অমন করে দেখছ কী? এসব নাচ নাচতে পারে তোমাদের উদয়শঙ্কর? ছোঃ-ছোঃ! এই যে নাচছি—এর নাম হচ্ছে আদত কথাকলি।

স্বামীজী বললেন, মণিপুরীও বলা যায়।

শেঠজী বললেন, হাঁ—হাঁ—কত্থক ভি বলা যেতে পারে।

আমি বললুম, তাড়কা-নৃত্যও বলা যায়।

গজেশ্বর বললেন, কী বললে?

আমি তক্ষুনি সামলে নিয়ে বললুম, না না, বিশেষ কিছু বলিনি।

—তোমাকে বলতেও হবে না।—ঘাগরা ঘুরিয়ে আর-এক পাক নেচে গজেশ্বর বললে, কই, গান বন্ধ হল যে? ধর—গান ধর। প্রাণ খুলে একবার নেচে নিই।

কিন্তু গান গাইব কী! গজেশ্বরের নাচ দেখে আমার গান-টান তখন গলার ভেতরে হালুয়ার মতো তাল পাকিয়ে গেছে।

গজেশ্বর বললে, ছোঃ-ছোঃ—এই তোমার মুরোদ। তুমি ঘোড়ার ডিমের গান জানো। শোনো—আমি নেচে নেচে একখানা ক্ল্যাসিক্যাল গান শোনাচ্ছি তোমায়।

এই বলে গজেশ্বর গান জুড়ে দিলে:

'এবার কালী তোমায় খাব—
হুঁ—হুঁ—তোমায় খাব তোমায় খাব—
তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে—হুঁ—হুঁ—
মুড়িঘণ্ট রেঁধে খাব—'

আর সেই সঙ্গে আবার সেই নাচ। সে কী নাচ! মনে হল, গোটা ভিসুভিয়াস পাহাড়টাই গজেশ্বরের সঙ্গে থেই-থেই করে নাচছে! স্বামীজী তালে-তালে চোখ বুজে মাথা নাড়তে লাগলেন, শেঠজী বললেন, উ-হু-হু! কেইসা বঢ়িয়া নাচ! দিল্ একেবারে তর্ হোয়ে গেলো!

www.boiRboi.blogspot.com

ওদের তো দিল্ তর্ হচ্ছে—নাচে গানে একেবারে মশ্‌গুল। ঠিক সেই সময় আমার পালাজ্বরের পিলের ভেতর থেকে কে যেন বললে, পটলডাঙার প্যালারাম, এই তোমার সুযোগ! লাস্ট চান্স! যদি পালাতে চাও, তাহলে—।

ঠিক।

এসপার কি ওসপার। শেষ চেষ্টাই করি একবার।

আমি উঠে পড়লুম। তারপরেই ছুট লাগালুম প্রাণপণে।

কিন্তু ভিসুভিয়াস পাহাড়ের ওপর থেকে দৌড়ে পালানো কি এতই সোজা কাজ। তিন পা এগিয়ে যেতে-না-যেতেই পাথরের নুড়িতে হোঁচট খেয়ে উলটে পড়লুম ধপাস্ করে।

আর তক্ষুনি—

তক্ষুনি নাচ থেমে গেল গজেশ্বরের। আর পাহাড়ের মাথা থেকে হাত-কুড়ির মতো লম্বা হয়ে এগিয়ে এল গজেশ্বরের হাতটা। বললে, চালাকি! আমি নাচছি আর সেই ফাঁকে সরে পড়বার বুদ্ধি। বোঝ এইবার—বলেই, মস্ত একটা হাতির শুঁড়ের মতো হাত আমার গলাটাকে পাকড়ে ধরল, আর শূন্যে ঝুলোতে ঝুলোতে—

জয় গুরু ঘুটঘুটানন্দ! বলে আকাশ-ফাটানো একটা হুঙ্কার ছাড়ল। তারপরেই ছ্যাঁক—ঝপাস্!—সেই প্রকাণ্ড কড়াইয়ের ফুটন্ত তেলের মধ্যে—

ফুটন্ত তেলের মধ্যে নয়—একরাশ ঠাণ্ডা জলের ভেতর। আমি আঁকুপাঁকু করে উঠে বসলাম। তখনো ভাল করে কিছু বুঝতে পারছি না। চোখের সামনে ধোঁয়া-ধোঁয়া হয়ে ভাসছে ভিসুভিয়াস, গজেশ্বরের ঘাগরা পরে সেই উদ্দাম নৃত্য, সেই বিরাট কড়াই—সেই ফুটন্ত তেলের রাশ!

—সিদ্ধি-ফিদ্ধি কিছু খাইয়েছিল—ভরাট গম্ভীর গলায় কে বলল।

তাকিয়ে দেখি, একজন পুলিশের দারোগা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা দিচ্ছে। সঙ্গে পাঁচ-সাতজন পুলিশ, আর কোমরে দড়ি বাঁধা—স্বামী ঘুটঘুটানন্দ, শেঠ চুন্নুরাম আর মহাপ্রভু গজেশ্বর!

টেনিদা আমার মাথায় জল ঢালছে, হাবুল হাওয়া করছে। আর ক্যাবলা বলছে, উঠে পড় প্যালা, উঠে পড়। থানায় গিয়ে খবর দিয়েছিলুম, পুলিশ এসে ওদের দলবল-শুদ্ধু পাকড়াও করেছে। ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোর নিচে বসে এরা নোট জাল করত। স্বামীজী এদের লীডার। শেঠজী নোটগুলো পাচার করত। সব ধরা পড়েছে এদের। জাল নোট ছাপার কল সব। এদের মোটরের মধ্যেই সমস্ত কিছু পাওয়া গেছে। বুঝলি রে বোকারাম, ঝণ্টিপাহাড়ির বাংলোয় আর ভূতের ভয় রইল না এরপর থেকে।

দারোগা হেসে বললেন, সাবাস ছোকরার দল তোমরা বাহাদুর বটে। খুব ভালো কাজ করেছ। এই দলটাকে আমরা অনেকদিন ধরেই পাকড়াবার চেষ্টা করছিলুম, কিছুতেই হদিশ মিলছিল না। তোমাদের জন্যেই আজ এরা ধরা পড়ল। সরকার থেকে এজন্যে মোটা টাকা পুরস্কার পাবে তোমরা।

এর পরে আর কি বসে থাকা চলে? বসে থাকা চলে এক মুহূর্তও? আমি পটলডাঙার প্যালারাম তক্ষুনি লাফিয়ে উঠলুম। গলা ফাটিয়ে চেঁচিয়ে বললুম : পটলডাঙা—

টেনিদা, হাবুল সেন আর ক্যাবলা সমস্বরে সাড়া দিলে : জিন্দাবাদ।

চারমূর্তির অভিযান

www.boiRboi.blogspot.com

—এক—

বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘটনা

বললে বিশ্বাস করবে?

আমরা চার মূর্তি—পটলডাঙার সেই চারজন—টেনিদা, হাবুল সেন, ক্যাবলা আর আমি—স্বয়ং শ্রীপ্যালারাম, চারজনেই এবার স্কুল ফাইন্যাল পাশ করে ফেলেছি। টেনিদা আর আমি থার্ড ডিভিশন, হাবুল সেকেণ্ড ডিভিশন—আর হতচ্ছাড়া ক্যাবলাটা শুধু যে ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করেছে তা-ই নয়, আবার একটা স্টার পেয়ে বসে আছে। শুনছি ক্যাবলা নাকি স্কলারশিপও পাবে। ওর কথা বাদ দাও—ওটা চিরকাল বিশ্বাস-ঘাতক।

কলেজে ভর্তি হয়ে খুব ডাঁটের মাথায় চলাফেরা করছি আজকাল। কথায় কথায় বলি, আমরা কলেজ স্টুডেণ্ট! আমাদের সঙ্গে চালাকি চলবে না—হুঁ হুঁ!

সেদিন কেবল ছোট বোন আধুলিকে কায়দা করে বলেছি, কী যে ক্লাস নাইনে পড়িস—ছ্যা-ছ্যা! জানিস লজিক কাকে বলে?

অমনি আধুলি ফ্যাঁচ করে বললে, যাও যাও ছোড়দা—বেশি ওস্তাদি কোরো না। ভারি তো তিনবারের বার থার্ড ডিভিশনে পাশ করে—

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার। যেই আধুলির বিনুনি ধরে একটা টান দিয়েছি. অমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ বলে চেঁচিয়ে-মেচিয়ে একাকার। ঘরে বড়দা দাড়ি কামাচ্ছিল, ক্ষুর হাতে বেরিয়ে এসে বললে, ইস্টুপিড—গাধা! যেমন ছাগলের মতো লম্বা লম্বা কান, তেমনি বুদ্ধি! ফের যদি বাঁদরামো করবি—দেবো এই ক্ষুর দিয়ে কান দুটো কেটে!

দেখলে? ইস্টুপিড তো বললেই—সেই সঙ্গে গাধা-ছাগল-বাঁদর তিনটে জন্তুর নাম একসঙ্গে করে দিলে। আমি যে কলেজে পড়ছি—এখন আমার রীতিমত একটা প্রেসটিজ হয়েছে—সেটা গ্রাহ্যিই করলে না। আমার ভীষণ রাগ হল। মা বারান্দায় আমসত্ত্ব রোদে দিয়েছিল, এদিক-ওদিক তাকিয়ে তা থেকে খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে মনের দুঃখে বাইরে চলে এলুম।

আমাদের বাড়ির সামনে একটুখানি পাঁচিল-ঘেরা জায়গা। সেখানে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবি শুকুচ্ছে—নিজের হাতে কেচেছে বড়দা। আর একপাশে বাঁধা রয়েছে ছোড়দির আদরের ছাগল গঙ্গারাম। বেশ দাড়ি হয়েছে গঙ্গারামের। একমনে আমসত্ত্ব খেতে খেতে ভাবছি, এবার সরস্বতী পুজোয় থিয়েটারের সময় গঙ্গারামের দাড়িটা কেটে নিয়ে মোগল সেনাপতি সাজব—এমন সময় দেখি গঙ্গারাম গলার দড়ি খুলে ফেলেছে।

ছাগলের খালি দাড়ি হয় অথচ কান পর্যন্ত গোঁফ হয় না কেন, এই কথাটা খুব দরদ দিয়ে ভাবছিলুম। ঠিক তক্ষুনি চোখে পড়ল—গঙ্গারাম এগিয়ে এসে বড়দার সিল্কের পাঞ্জাবিতে মুখ দিয়েছে। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও সামলে নিলুম। একটু আগেই বড়দা আমাকে গাধা-ছাগল এইসব বলেছে। খেয়ে নিক সিল্কের পাঞ্জাবি—বেশ জব্দ হয়ে যাবে।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখলুম, কুর্-কুর্ করে দিব্যি খেয়ে নিচ্ছে গঙ্গারাম। দাড়িটা অল্প অল্প নড়ছে—চোখ বুজে এসেছে আরামে, কান দুটো লটর-পটর করছে। সিল্কের পাঞ্জাবি খেতে ওর বেশ ভালই লাগে দেখা যাচ্ছে। আমসত্ত্ব চিবোনো ভুলে গিয়ে আমি নিবিষ্ট চিত্তে লক্ষ্য করতে লাগলুম।

ইঞ্চি-দুয়েক খেয়েছে—এমন সময় গেটটা খুলে গেল। গলায় স্টেথিসকোপ ঝুলিয়ে হাসপাতালে নাইট ডিউটি সেরে ফিরছে মেজদা। সবে ডাক্তারি পাশ করেছে মেজদা—আর কী মেজাজ! আমাকে দেখলেই ইনজেকশন দিতে চায়।

ঢুকেই মেজদা চেঁচিয়ে উঠল : কী সর্বনাশ! ছাগল যে বড়দার জামাটা খেয়ে ফেললে! এই প্যালা—ইডিয়ট—হতভাগা—বসে বসে মজা দেখছিস নাকি?

বুঝলুম, গতিক সুবিধের নয়! এবার বড়দা এসে সত্যিই আমার কান কেটে নেবে। কান বাঁচাতে হলে আমারই কেটে পড়া দরকার। ঘাড়-টাড় চুলকে বললুম, লজিক পড়ছিলুম—মানে দেখতে পাইনি—মানে আমি ভেবেছিলুম—বলতে বলতে মেজদার পাশ কাটিয়ে এক লাফে সোজা সদর রাস্তায়।

আমাদের সিটি কলেজ পুব ভাল—খালি ছুটি দেয়। আজও চড়কষষ্ঠী না কোদালে অমাবস্যা—কিসের একটা বন্ধ ছিল। আমি সোজা চলে এলুম চাটুজ্জেদের রোয়াকে। দেখি, টেনিদা হাত-পা নেড়ে কী যেন সব বোঝাচ্ছে ক্যাবলা আর হাবুল সেনকে।

—সামনেই ক্রিসমাস! ব্যাস—বাঁই বাঁই করে প্লেনে চেপে চলে যাব! কুট্টিমামা তোদেরও নিয়ে যেতে বলেছে। যাবি তো চল—দিনকতক বেশ খেয়ে-দেয়ে ফিরে আসা যাবে।

ক্যাবলা বললে, কিন্তু প্লেনের ভাড়া দেবে কে?

—আরে মোটে কুড়ি টাকা। ড্যাম চীপ।

আমি বললুম, কোথায় যাবে প্লেনে চেপে? গোবরডাঙা?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, খেলে কচুপোড়া! এটার মাথাভর্তি কেবল গোবর—তাই জানে গোবরডাঙা আর ধ্যাধ্যেড়ে গোবিন্দপুর! ডুয়ার্সে যাচ্ছি—ডুয়ার্সে। এন্তার হরিণ, দেদার বন-মুরগি, ঘুঘু, হরিয়াল্—বলতে বলতেই আমার হাতের দিকে চোখ পড়ল : কী খাচ্ছিস র‍্যা?

লুকোতে যাচ্ছিলুম, তার আগেই খপ্ করে আমসত্ত্বটা কেড়ে নিলে। একেবারে সবটা মুখে পুরে দিয়ে বললে, বেড়ে মিষ্টি তো! আর আছে?

ব্যাজার হয়ে বললুম, না—আর নেই। কিন্তু ডুয়ার্সের জঙ্গলে যে যেতে চাইছ, শেষে বাঘের খপ্পরে নিয়ে ফেলবে না তো?

—বাঘ মারতেই তো যাচ্ছি!—আমসত্ত্ব চিবুতে চিবুতে টেনিদা একটু উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে 'হাইক্লাস'!

—অ্যাঁ!—আমি ধপাৎ করে রোয়াকের ওপর বসে পড়লুম : বাঘ! না—না—বাঘ-টাগের মধ্যে আমি নেই!

হাবুল বললে, হ, সত্য কইছস! এদিকে দন্তশূলে মরতে আছি—বাঘের হাতে পইড়্যা পরাণডা যাইবো গিয়া।

ক্যাবলা বললে, ভালই তো! দাঁতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিস—যদি মারা যাস দেখবি একটুও আর দাঁতের ব্যথা নেই।

টেনিদা আমসত্ত্ব শেষ করে বললে, থাম্—ইয়ার্কি করিসনি। আরে ডুয়ার্সের বাঘ-ভাল্লুক সবাই আমার কুট্টিমামাকে খাতির করে চলে। কুট্টিমামা ভাল্লুকের নাক

www.boiRboi.blogspot.com

পুড়িয়ে দিয়েছে—বাঘের বত্রিশটা দাঁত কালাঁসিঙির মহাভারতের এক ধারে উঁড়িয়ে দিয়েছে। শেষে সেই বাঘ কুট্টিমামার বাঁধানো দাঁত নিয়ে খেয়ে বাঁচে। সে বাঘটা আজকাল আর মাংস-টাংস খায় না—স্রেফ নিরিমিষি। লোকের বাগান থেকে লাউ-কুমড়ো চুরি করে খায়—সেদিন আবার টুক্ করে কুট্টিমামার একডিশ আলুর দম খেয়ে গেছে।

ক্যাবলা বললে, গুল!

টেনিদা চোখ পাকিয়ে বললে, কী বললি?

ক্যাবলা বললে, না—মানে, বলছিলুম—গুল্ বাঘ আর ডোরাদার বাঘ—দু'রকমের বাঘ হয়।

হাবুল বললে, আর-এক রকমের বাঘও হয়। বিছানায় থাকে আর কুটুস কইর‍্যা কামড় দেয়। তারে বাগ কয়।

আমিও ভেবে-চিন্তে বললুম, আর তাকে কিছুতেই বাগানো যায় না। কামড়েই সে হাওয়া হয়ে যায়।

টেনিদা রেগে-মেগে বললে, দুত্তোর—খালি বাজে কথা! এদের কাছে কিছু বলতে যাওয়াই ঝকমারি! এই তিনটের নাকে তিনখানা মুখবোধ বসিয়ে নাকভাঙা বুদ্ধদেব বানিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়। ফাজলামি নয়—সোজা জবাব দে—যাবি কি যাবি না? না যাস একাই যাচ্ছি প্লেনে চেপে—তোরা এখানে ভ্যারেণ্ডা ভাজ বসে বসে।

আমি বললুম, বাঘে কামড়াবে না?

—বললুম তো সে আজকাল ভেজিটেবল খায়। আলুর দম আর মুলো ছেঁচকি খেতে দারুণ ভালবাসে।

ক্যাবলা জিজ্ঞেস করলে, তার আত্মীয়স্বজন?

—তারা কুট্টিমামাকে দেখলেই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়বে। তখন আর শিকার করবারও দরকার নেই—স্রেফ গলায় দড়ি বেঁধে বাড়িতে নিয়ে এলেই হল।

আমি ভারি খুশি হয়ে বললুম, তাহলে তো যেতেই হয়! আমরা সবাই একটা করে বাঘ সঙ্গে করে বেঁধে আনব।

হাবুল বললে, সেই বাঘে দুধ দিবো।

ক্যাবলা বললে, আর সেই বাঘের দুধ বিক্রি করে আমরা বড়লোক হব।

টেনিদা চেঁচিয়ে উঠে বললে—ডি-লা-গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সবাই আরো জোরে চিৎকার করে বললুম—ইয়াক—ইয়াক!

বাবা অফিস যাওয়ার সময় বলে গেলেন, সাতদিনের মধ্যে ফিরে আসবি—এক-দিনও যেন কলেজ কামাই না হয়।

কোর্টে বেরুতে বেরুতে বড়দা মনে করিয়ে দিলে, দু-একখানা পড়ার বইও সঙ্গে-নিয়ে যাস—খালি ইয়ার্কি দিয়ে বেড়াসনি।

ছুটির ভিতরে পড়ার বই নিয়ে বসতে বয়ে গেছে আমার! আমি সুটকেসের ভেতর হেমেন রায় আর শিবরামের নতুন বই ভরে নিয়েছি খানকয়েক।

মা এসে বললে, যা-তা খাসনি। তুই যে-রকম পেটরোগা—বুঝে-সুঝে খাবি।

কোত্থেকে আধুলি এসে জুড়ে দিলে, দুটো কাঁচকলা নিয়ে যা ছোড়দা—আর হাঁড়ির ভেতরে গোটাকয়েক শিঙিমাছ।

আমি আধুলির বিনুনিটা চেপে ধরতে যাচ্ছি—সেই সময় মেজদা এসে হাজির। এসেই বলতে লাগল প্লেনে চেপে যদি কানে ধাপা লাগে তাহলে হাই তুলতে থাকবি। যদি বমি আসে তাহলে অ্যাভোমিন ট্যাবলেট দিচ্ছি—গোটা-কয়েক খাবি।

যদি—

উঃ, উপদেশের চোটে প্রাণ বেরিয়ে গেল! এর মধ্যে আবার ছোড়দি এসে বলতে আরম্ভ করল : দার্জিলিঙের কাছাকাছি তো যাচ্ছিস। যদি সস্তায় পাস—কয়েক ছড়া পাথরের মালা কিনে আনিস তো!

—দুত্তোর—বলে চেঁচিয়ে উঠতে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়েই বাইরে মোটরের হর্ন বেজে উঠল। আর টেনিদার হাঁক শোনা গেল : কি রে প্যালা—রেডি?

—রেডি। আসছি—

তক্ষুনি সুটকেস নিয়ে লাফিয়ে উঠলুম। হাবুলদের মোটরে চেপে ওরা সবাই এসে পড়েছে। মোটরে করে সোজা দমদমে গিয়ে আমরা প্লেনে উঠব। তারপর দু-ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাব ডুয়ার্সের জঙ্গলে। তখন আর পায় কে! কুট্টিমামার ওখানে মজাসে খাওয়া-দাওয়া—চা বাগান আর বনের মধ্যে বেড়ানো—দু-একদিন শিকারে বেরিয়ে গলায় দড়ি বেঁধে বাঘ-টাঘ নিয়ে আসা। ডি-লা-গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস!

সকলকে চটপট প্রণাম-ট্রণাম সেরে নিয়ে গেট খুলে বেরুতে যাচ্ছি, হঠাৎ—

পেছনে বিটকেল 'ব-ব-ব' আওয়াজ আর শার্টের কোনা ধরে এক হ্যাঁচকা টান। চমকে লাফিয়ে উঠলুম। তাকিয়ে দেখি, হতচ্ছাড়া গঙ্গারাম। দাড়ি নেড়ে নেড়ে আমার জামাটা খাওয়ার চেষ্টা করছে।

—তবে রে অযাত্রা! পেছু টান!

ধাঁই করে একটা চাঁটি বসিয়ে দিলুম গঙ্গারামের গালে। গঙ্গারাম ম্যা-আ-আ করে উঠল। আর আমার হাতে যা লাগল সে আর কী বলব! গঙ্গারামটার গাল যে এমন ভয়ানক শক্ত, সে কথা কে জানত!

মোটর থেকে টেনিদা আবার হাঁক ছাড়ল : কি রে প্যালা, দেরি করছিস কেন?

—আসছি—বলে এক ছুটে বেরিয়ে আমি গাড়িতে উঠে পড়লুম। তখনো গঙ্গারাম সমানে ডাকছে : ম্যা-আ-আ—ভ্যা-আ-আ! ভাবটা এই : খামোকা আমায় একটা রামচাঁটি লাগালে? আচ্ছা—যাও ডুয়ার্সের জঙ্গলে! এর ফল যদি হাতে-হাতে না পাও—তাহলে আমি ছাগলই নই!

হায় রে, তখন কি আর জানতুম—গঙ্গারামের ভাগনে যা দশগণ্ডা করে মারে, তারই পাল্লায় পড়ে আমার অদৃষ্টে অশেষ দুঃখ আছে এরপর!

গাড়ি দমদম এয়ারপোর্টের দিকে ছুটল।

—দুই—

বিমানে চৈনিক রহস্য

ভজহরি মুখার্জি—স্বর্ণেন্দু সেন—কুশল মিত্র—কমলেশ ব্যানার্জি—

নামগুলো শুনে চমকে চমকে উঠছ তো? ভাবছ—এ আবার কারা? হুঁ-হুঁ—ভাববার কথাই বটে। এ হল আমাদের চারমূর্তির ভাল নাম—আগে স্কুলের খাতায় ছিল। এখন কলেজের খাতায়। ভজহরি হচ্ছে আমাদের দুর্দান্ত টেনিদা, স্বর্ণেন্দু হল ঢাকাই হাবুল, কুশল হচ্ছে হতচ্ছাড়া ক্যাবলা আর কমলেশ? আন্দাজ করে নাও।

এ-সব নাম কি ছাই আমাদের মনে থাকে? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগল। আমরাও—এই যে—এই যে বলে টকাটক উঠে পড়লুম। হাবলা তো অভ্যাসে বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।'

আরে রামো—এ কী প্লেন!

এর আগে আমি কখনো প্লেনে চাপিনি—কিন্তু বড়দা ও মেজদার কাছে কত গল্পই যে শুনেছি! চমৎকার সব সোফার মত চেয়ার—থেকে-থেকে চা-কফি-লজেন্স-স্যান্ড-উইচ-সন্দেশ খেতে দিচ্ছে, উঠে বসলেই সে কী খাতির! কিন্তু একী! প্লেনের বারো আনা বোঝাই কেবল বস্তা আর কাপড়ের গাঁট, কাঠের বাক্স, আবার এক জায়গায় দড়ি দিয়ে বাঁধা কয়েকটা হুঁকোও রয়েছে।

শুধু দু'দিকে চারটে সীট কোনমতে রাখা আছে আমাদের জন্যে। তাতে গদি-টদি কিছু ছিল, কিন্তু এখন সব ছিঁড়েখুঁড়ে একাকার।

হাবুল সেন বললে, অ টেনিদা! মালগাড়িতে চাপাইলা নাকি?

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, যা—যা—মেলা বকিসনি! কুড়ি টাকা দিয়ে প্লেন চাপবি—কত আরাম পেতে চাস—শুনি? তবু তো ভাগ্যি যে প্লেনের চাকায় সঙ্গে তোদের বেঁধে দেয়নি!

বলতে বলতে জন-তিনেক কোট-প্যান্ট-পরা লোক তড়াক করে প্লেনে উঠে পড়ল। তারপর সার্কাসের খেলোয়াড়ের মতো অদ্ভুত কায়দায় টকাটক করে সেই বাক্স-বস্তার স্তূপ পেরিয়ে—একজন আবার হুঁকোগুলোতে একটা হোঁচট খেয়ে ওপাশের 'প্রবেশ নিষেধ' লেখা একটা কাচের দরজার ওপারে চলে গেল।

টেনিদা বললে, ওরা পাইলট। এখুনি ছাড়বে।

ক্যাবলা বললে, ইস, পাইলট হওয়া কী কষ্ট! বাক্স আর বস্তার উপর দিয়ে লাফাতে হয় কেবল।

যাত্রী আমরা মাত্র চারজন। দু'দিকের সীটগুলোতে চেপে বসতে-না-বসতে হঠাৎ ঘুরুর ঘুরুর করে আওয়াজ আরম্ভ হল। তারপরেই গুড়গুড়িয়ে চলতে আরম্ভ করল প্লেনটা।

আমরা তাহলে সত্যিই এবার আকাশে উড়ছি!—কী মজা! এবার মেঘের উপর দিয়ে—নদী গিরি কান্তার—মানে আরো কী সব যেন বলে—অটবী-টটবী পার হয়ে দূর-দূরান্তে চলে যাব। আমার পিসতুতো ভাই ফটুদা এখন থাকলে নিশ্চয় কবিতা

www.boiRboi.blogspot.com

লিখত :

পাখি হয়ে যাই গগনে উড়িয়া,
ফড়িং টড়িং খাই ধরিয়া—

কিন্তু ফড়িং খাওয়ার কথা কি লিখত? আমার একটু খটকা লাগল। কবিরা কি ফড়িং খায়? বলা যায় না—যারা কবি হয় তাদের অসাধ্য আর অখাদ্য কিছুই নেই!

এইসব দারুণ চিন্তা করছি, আর প্লেনটা সমানে গুড়-গুড় করে চলেছে। আমি ভাবছিলুম এতক্ষণে বুঝি মেঘের উপর দিয়ে কান্তার মরু দুস্তর পারাবার এইসব পাড়ি দিচ্ছে! দ্যুৎ—কোথায় কী! খালি ডাঙা দিয়ে চলছে তো চলছেই!

টেনিদার পাশ থেকে হাবুল বললে, কই টেনিদা—উড়তে আছে না তো?

ক্যাবলা একটা এলাচ বের করে চিবুচ্ছিল। আমি খপ্ করে নিতে গেলুম—পেলুম খোসাটা। রাগ করে বললুম, উড়বে না ছাই! মালগাড়ি কোনদিন ওড়ে নাকি?

ক্যাবলা বললে, যাচ্ছে তো গড়গড়িয়ে। কাল হোক, পরশু হোক,—ঠিক পৌঁছে যাবে।

হাবুল করুণ গলায় বললে, কয় কী—অ টেনিদা! এইটা উড়বো না? সগ্গে সগ্গে প্লেন দাঁড়িয়ে পড়ল। আর বেজায় জোরে ঘরর্ ঘরর্ করে আওয়াজ হতে লাগল।

আমি বললুম, যাঃ, থেমে গেল!

ক্যাবলা মাথা নেড়ে বললে, হুঁ—স্টেশনে থামল বোধহয়। ইঞ্জিনে জল-টল নেবে।

টেনিদা ভীষণ রেগে গেল এবার।

—টেক কেয়ার ক্যাবলা—আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন! খবরদার—অপমান করবিনি বলে দিচ্ছি!

—তবে ওড়ে না কেন! খালি আওয়াজ করে—মাথা ধরিয়ে দিচ্ছে!

বলতে বলতেই আবার ঘর্ ঘর্ করে ছুটতে আরম্ভ করল প্লেন। তারপরেই—ব্যস, টুক্ করে যেন ছোট্ট একটু লাফ দিলে, আর সব আমাদের পায়ের তলায় নেমে যাচ্ছে।

আমরা উড়েছি! সত্যিই উড়েছি!

টেনিদা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠে বললে, তবে যে বলছিলি উড়বে না? কেমন—দেখলি তো এখন? ডি-লা-গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস—

আমরা সগ্গে সগ্গে চিৎকার করে বললুম, ইয়াক—ইয়াক!

প্লেন উড়েছে। দেখতে দেখতে বাড়িঘরগুলো খেলনার মতো ছোট্ট ছোট্ট হয়ে গেল, গাছগুলোকে দেখাতে লাগল ঝোপের মতো, রাস্তাগুলো চুলের সিঁথির মতো সরু হয়ে গেল আর রুপোর সাপের মতো আঁকাবাঁকা নদীগুলো আমাদের অনেক নিচে লুকিয়ে রইল।

মেজদার কাছে আগেই শুনেছিলুম, প্লেনে চেপে সিনারি দেখতে হলে জানলার পাশে যেতে হয়। আমিও কায়দা করে আগেই বসে পড়েছি। ক্যাবলা মিনতি করে বললে, তুই আমার জায়গায় আয় না ক্যাবলা—আমিও ভাল করে একটুখানি দেখে নিই!

আমি বললুম, এখন কেন? এলাচের খোসা দেবার সময় মনে ছিল না?

—তোকে চকলেট দেবো।

—দে!

ঘাড় চুলকে ক্যাবলা বললে, এখন তো সগ্গে নেই, কলকাতায় ফিরে গিয়ে দেবো।

—তবে কলকাতায় ফিরেই সিনারি দেখিস।—আমি তক্ষুনি জবাব দিলুম।

ক্যাবলা ব্যাজার হয়ে বললে, না দিলি দেখতে—বয়ে গেল! কীই বা আছে দেখবার! ভারি তো বাঁশবন আর পচা ডোবা—ও তো পাড়াগাঁয়ে গিয়ে তালগাছের উপরে চাপলেই দেখা যায়।

—দ্রাক্ষাফল অতিশয় টক—শেয়াল বলেছিল।—আমি ক্যাবলাকে উপদেশ দিলুম : তবে যা—তালগাছের মাথাতেই চাপ গে।

ওদিকে টেনিদা আর হাবুলের মধ্যে দারুণ তর্ক চলছে।

হাবুল বললে, আমার মনে হয়, আমরা বিশ হাজার ফুট উপর দিয়া যাইত্যাছি।

টেনিদা নাকটাকে কুঁচকে বললে, ফুঃ! আমার কুট্টিমামার দেশের প্লেন অত তলা দিয়ে যায় না। আমরা কম-সে-কম পঞ্চাশ হাজার ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছি।

ক্যাবলা মিটমিট করে হাসল। তারপর বললে, কেইসা বাত বোল্‌তা তুমলোক! এ-সব ডাকোটা প্লেন, যেগুলো মাল টানে, কখনো ছ-সাত হাজার ফুটের উপর দিয়ে যায় না।

—এই ক্যাবলাটার সব সময় পণ্ডিতি করা চাই! টেনিদা মুখখানা হালুয়ার মতো করে বললে, থাম, ওস্তাদি করিসনি! এ-সব কুট্টিমামার দেশের প্লেন—পঞ্চাশ-ষাট হাজারের নিচে কথাই কয় না।

ক্যাবলা বললে, আমি জানি।

টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার আলু-চচ্চড়ির মতো হয়ে গেল : তুই জানিস? তবে আমিও জানি। এক্ষুনি তোর নাকে এমন একটা মুখবোধ বসিয়ে দেবো যে—

ক্যাবলা তাড়াতাড়ি বললে, না-না, আমারই ভুল হয়ে গিয়েছিল। এই প্লেনটা বোধহয় এখন একলাখ ফুট উপর দিয়ে যাচ্ছে।

—এক লাখ ফুট!—আমি হাঁ করে রইলুম। সেই ফাঁকে ক্যাবলা আমার মুখের ভেতরে আবার একটা এলাচের খোসা ফেলে দিলে।

হাবুল বললে, খাইছে! এক লাখ ফুট! অ টেনিদা—!

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, কী বলবি বল না! একেবারে শিবনেত্তর হয়ে বসে রইলি কেন?

—আমরা তো অনেক উপরে উইঠ্যা পড়ছি!

টেনিদা ভেংচে বললে, তা পড়ছি। তাতে হয়েছে কী?

—চাঁদের কাছাকাছি আসি নাই?

টেনিদা উঁচুদরের হাসি হাসল।

—হ্যাঁ, তা আর-একটু উঠলেই চাঁদে যাওয়া যেতে পারে।

—তা হইলে একটু কও না পাইলটেরে। চাঁদের থিক্যা একটু ঘুইর‍্যাই যাই। বেশ ব্যাড়ানোও হইব, রাশিয়ান স্পুটনিক আইস্যা পড়ছে কি না সেই খবরটাও নিতে পারুম!

ক্যাবলা বললে, হুঁ, চাঁদে সুধাও আছে শুনেছি। এক-এক ভাঁড় করে খেয়ে যাওয়া যাবে।

আমার শুনে কেমন খটকা লাগল। এত সহজেই কি চাঁদে যাওয়া যায়? কাগজে কি সব যেন পড়েছিলুম। চাঁদ, কী বলে—সেই যেন কত লক্ষ মাইল দূরে—মানে, যেতে-টেতে অনেক দেরি হয় বলেই শুনেছিলুম। এমন চট্ করে কি সেখানে যাওয়া যাবে? আরো বিশেষ করে এই মালগাড়িতে চেপে?

www.boiRboi.blogspot.com

কিন্তু টেনিদাকে সে কথা বলতে আমার ভরসা হল না। কুট্টিমামার দেশের প্লেন। সে প্লেন সব পারে। আর পারুক বা না-ই পারুক, মিথ্যে টেনিদাকে চটিয়ে আমার লাভ কী? এসে হয়ত টকাটক চাঁদির উপরে গোটা-কয়েক গাঁট্টাই মেরে দেবে। আমি দুনিয়ার সব খেতে ভালবাসি—কলা, মুলো, পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল, চপ-কাটলেট-কালিয়া—কিচ্ছুতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু ঐ চাঁটি-গাঁট্টাগুলো খেতে আমার ভাল লাগে না—একদম না।

হাবুল আবার মিনতি করে বললে, অ টেনিদা, একবার পাইলটেরে রিকোয়েস্ট কইর‍্যা—চল না চাঁদের থিক্যা একটুখানি ব্যাড়াইয়া আসি।

হাবুল সেন ইয়ার্কি করছে—নির্ঘাত! আমার দিকে তাকিয়ে একবার চোখ পিট-পিট করলে। কিন্তু টেনিদা কিছু বুঝতে পারল না। বুঝলে হাবলার কপালে দুঃখ ছিল।

টেনিদা আবার উঁচুদরের হাসি হাসল—যাকে বাংলায় বলে, 'হাইক্লাস'। তারপর বললে, আচ্ছা, নেক্স্ট্ টাইম। এখন একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে কিনা—মানে কুট্টিমামা আমাদের জন্যে এতক্ষণ হরিণের মাংসের ঝোল রেডি করে ফেলেছে। তা ছাড়া রাশিয়ান আর আমেরিকানরা যাওয়ার এত চেষ্টা করছে, ওদের মনে ব্যথা দিয়ে আগে চাঁদে যাওয়াটা উচিত হবে না। ভারি কষ্ট পাবে। আমার মনটা বড় কোমল রে—কাউকে দুঃখ দিতে ইচ্ছে করে না।

আমরা সবাই বললুম, সে তো বটেই!

টেনিদা বললে, যাক—চাঁদে পরে গেলেই হবে এখন। ও আর কী—গেলেই হয়। কিন্তু কথা হচ্ছে, কুট্টিমামার হরিণের ঝোল মনে পড়তে ভারি খিদে পেয়ে গেল রে! কী খাওয়া যায় বল দিকি?

—এই তো খেয়ে এলে—আমি বললুম, এক্ষুনি খিদে পেল?

টেনিদা বললে, পেল। যাই বল বাপু, আমার খিদে একটু বেশি। বামুনের পেট তো—প্রত্যেক দশ মিনিটেই একেবারে ব্রহ্মতেজে দাউ-দাউ করে ওঠে। কিন্তু কী খাই বল্ তো?

হাবুল বললে, ওই তো একটা বস্তা ফুটা হইয়া কী জ্যান পড়তে আছে! লবণ মনে হইত্যাছে। খাইবা?

আমরা একসঙ্গে তাকিয়ে দেখলুম। তাই বটে। একটা ছোট বস্তায় ছোট একটা ফুটো হয়েছে। সেখান থেকে সাদা গুঁড়ো-গুঁড়ো কি সব পড়ছে। লবণ? কিন্তু—কিন্তু কেমন সন্দেহজনক!

একলাফে দাঁড়িয়ে পড়ল টেনিদা। বললে, দেখি কী রকম লবণ!

বলেই বস্তা থেকে খানিকটা আঙুলের ডগায় তুলে নিলে। তারপর চেঁচিয়ে বললে, ডি-ল্যা-গ্র্যাণ্ড! ইউরেকা!

আমরা বললুম, মানে?

—বস্তার রহস্যভেদ। মানে বস্তার চৈনিক রহস্য।

—চৈনিক রহস্য! সে আবার কী?—আমি জানতে চাইলুম।

টেনিদা বললে, চিনি—চিনি—পিয়োর চিনি! যে চিনি দিয়ে সন্দেশ তৈরি হয়, যে চিনির রহস্যভরা রসের ভিতরে রসগোল্লা সাঁতার কাটে! যে চিনি—

আর বলতে হল না। চিনিকে আমরা সবাই চিনি—কে না চেনে?

পড়ে রইল চাঁদ, নদী-গিরি-কান্তারের শোভা। আমরা সবাই চিনির বস্তার ফুটোটাকে বাড়িয়ে ফেললুম।

তারপর—

তারপর বলাই বাহুল্য।

—তিন—

অতঃপর কুট্টিমামা

প্লেন এসে মাটিতে নামল।

ভালোই হল। চৈনিক রহস্য ভেদ করে এখন গলা একেবারে আঠা-আঠা হয়ে আছে—জিভটা যেন কাঁচাগোল্লা হয়ে আছে। জিভে কাঁচাগোল্লা চেপে বসলে ভালোই লাগে—কিন্তু জিভটাই কাঁচাগোল্লা হয়ে গেলে কেমন বিচ্ছিরি-বিচ্ছিরি মনে হতে থাকে। এর মধ্যে আবার থেকে-থেকে কেমন গা গুলিয়ে উঠছিল। শেষকালে ক্যাবলার গায়েই খানিকটা বমি করে ফেলব কি না ভাবতে ভাবতেই দেখি, প্লেনটা সোজা চিনির বস্তার রাহাজানি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার। টুপ্-টুপ্ করে থেমে গেল, আর বাইরে থেকে কারা টেনে দরজাটা খুলে দিলে।

www.boiRboi.blogspot.com

দেখি, দুজন কুলি একটা ছোট লোহার সিঁড়ি লাগিয়ে দিয়েছে। নিচে পাঁচ-সাত জন লোক দাঁড়িয়ে।

চিনির বস্তার রাহাজানি ধরা পড়বার আগেই সরে পড়া দরকার। টুপ্-টুপ্ করে নেমে পড়লুম আমরা।

বা—রে—কোথায় এলুম? সামনে একটা টিনের ঘর, একটুখানি মাঠ—তার ভেতরে প্লেনখানা এসে নেমেছে। মাঠের তিন দিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ঘন জঙ্গল—আর একদিকে মেঘের মতো মাথা তুলে আছে নীল পাহাড়। হাওয়ায় বড়-বড় ঘাস দুলছে আশেপাশে।

হাবুল বললে, তাইলে আইস্যা পড়লাম!

কিন্তু কুট্টিমামা? কোথায় কুট্টিমামা! যে ক'জন লোক দাঁড়িয়ে আছে—তার মধ্যে তো কুট্টিমামা নেই? সেই লম্বা তালগাছের মতো চেহারা, মিশমিশে কালো রং—মাথায় খেজুরপাতার মতে ঝাঁকড়া চুল—মানে টেনিদা আমাদের কাছে যেরকম বর্ণনা দিয়েছে আগে—সেরকম কাউকে তো দেখতে পাচ্ছি না?

বললুম, ও টেনিদা, কুট্টিমামা কোথায়?

টেনিদা বললে, ঘাবড়াসনি—ওই তো আসছে মামা।

চালাঘরটার পাশে একখানা জিপ গাড়ি এসে থেমেছে এক্ষুনি। তা থেকে নেমেছে বেঁটে-খাটো গোলগাল একটি ভালমানুষ লোক। গায়ে নীল শার্ট, পরনে পেন্টুলুন। টেনিদা দেখিয়ে বললে, ঐ তো কুট্টিমামা।

আমরা তিনজনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠলুম, ওই কুট্টিমামা! হতেই পারে না! ঝাঁকড়া চুল—তালগাছের মতো লম্বা—কালিগোলা রং—সে কী করে অমন ছোট-খাটো টাক-মাথা গোলগাল মানুষ হয়ে যাবে! আর গায়ের রংও তো বেশ ফর্সা।

ক্যাবলা কী বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই টেনিদা এগিয়ে গিয়ে ভদ্রলোককে একটা প্রণাম ঠুকে দিলে।

—মামা, আমরা সবাই এসে গেছি।

কী আর করা! কুট্টিমামার রহস্য পরে ভেদ করা যাবে—আপাতত আমরাও একটা করে প্রণাম করলুম।

ভদ্রলোক খুশি হয়ে হেসে বললেন, বেশ—বেশ, ভারি আনন্দ হল তোমাদের দেখে। তা পথে কোন কষ্ট হয়নি তো?

ফস্ করে বলে ফেললুম, না মামা—বেশি কষ্ট হয়নি! মানে, চিনির বস্তাটা ছিল—

টেনিদার চোখের দিকে তাকিয়েই সামলে গেছি সঙ্গে সঙ্গে। মামা বললেন, চিনির বস্তা! সে আবার কী?

টেনিদা বললে, না মামা, ওসব কিছু না। চিনির বস্তা-টস্তা আমরা চিনি না। মানে, প্যালা খুব চিনি খেতে ভালবাসে কিনা—তাই সারা রাস্তা স্বপ্ন দেখছিল।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তাই নাকি?

—হ্যাঁ মামা।—টেনিদা উৎসাহ পেয়ে বলতে আরম্ভ করলে, আমারও ওরকম হয়। তবে আমি আবার চপ-কাটলেটের স্বপ্ন দেখতে ভালবাসি। এই হাবুল সেন খালি রাবড়ি আর চমচমের স্বপ্ন দেখে। আর এই ক্যাবলা—মানে এই বাচ্চা ছেলেটা পরীক্ষায় স্কলারশিপ পায় আর চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে পছন্দ করে।

ক্যাবলা ভীষণভাবে প্রতিবাদ করে উঠল, কখনো না! চুয়িং গামের স্বপ্ন দেখতে আমি মোটেই ভালবাসি না। আমিও চপ-কাটলেট রাবড়ি চমচম—এইসবের স্বপ্ন দেখি।

কুট্টিমামা আবার অল্প একটু হেসে বললেন, দেখা যাক, স্বপ্নকে সফল করা যায় কি না। এখন চল। মালপত্র প্লেনে কিছু নেই তো? সব হাতে? ঠিক আছে।

—তোমাদের বাগান কতদূরে মামা?

—এই মাইল-ছয়েক। দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই চলে যাব। এস—

একটু পরেই আমরা জিপে উঠে পড়লুম। ড্রাইভারের পাশে বসে মামা বললেন, একটু তাড়াতাড়ি যেতে হবে দেওয়ান বাহাদুর। অনেক দূর থেকে আসছে এরা—এদের খিদে পেয়েছে।

টেনিদা বললে, তা যা বলেছ মামা! সকালে বলতে গেলে কিছুই খাইনি—পেট চুঁই-চুঁই করছে।

টেনিদা কিছু খায়নি! বাড়ি থেকে গলা পর্যন্ত ঠেসে বেরিয়েছে—প্লেনে এসে কম্‌সে কম একসের চিনি মেরে দিয়েছে। টেনিদা যদি কিছু না খেয়ে থাকে, আমি তো তিনদিন উপোস করে আছি!

জিপ ছুটল।

জঙ্গলের মধ্য দিয়ে কালো পিচের পথ পড়ে আছে মস্ত একটা ফিতের মতো।

www.boiRboi.blogspot.com

আমাদের জিপ চলেছে। ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা ছায়া ছড়িয়ে আছে পথের উপর—কেমন মিষ্টি গলায় নানারকমের পাখি ডাকছে।

টেনিদা বসেছে আমাদের পাশেই। ফাঁক পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলুম, তুমি যে-রকম বলেছিলে, তোমার কুট্টিমামার চেহারা তো একদম সে-রকম নয়! গুল দিয়েছিলে বুঝি?

টেনিদা বললে, চুপ-চুপ! কুট্টিমামা শুনলে এখুনি একটা ভীষণ কাণ্ড হয়ে যাবে!

—ভীষণ কাণ্ড! কেন?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার—বুঝলি! বললে পেত্যয় যাবি না—নেপালী বাবার একটা ছু-মন্তরেই কুট্টিমামার চেহারা বিলকুল পালটে গেছে।

—ছু-মন্তর! সে আবার কী?

—পরে বলব, এখন ক্যাচম্যাচ করিসনি। কুট্টিমামা শুনলে দারুণ রাগ করবে। বলতে বারণ আছে কিনা!

আমি চুপ করে গেলুম। একটা যা-তা গল্প বানিয়ে দেবে এর পরে। কিন্তু টেনিদার কথায় আর বিশ্বাস করি আমি? আমি কি পাগল না পেন্টুলুন?

এর মধ্যে হাবুল সেন কুট্টিমামার পাশে বসে বকবকানি জুড়ে দিয়েছে: আইচ্ছা মামা, এই জঙ্গলটার নাম কী?

মামা বললেন, এর নাম দইপুর ফরেস্ট।

—এই জঙ্গলে বুঝি খুব দই পাওয়া যায়?

মামা বললে, দই তো জানি না—তবে বাঘ পাওয়া যায় বিস্তর।

এতক্ষণ পরে ক্যাবলা বললে, সেই বাঘের দুধেই দই হয়।

কুট্টিমামা হেসে বললেন, তা হতে পারে। কখনো খেয়ে দেখিনি।

শুনে দু-চোখ কপালে তুলল হাবুল সেন: আরে মশয়, কন কী? আপনে বাঘের দই খান নাই? আপনার অসাধ্য কর্ম আছে নাকি? কালীসিঙ্গির মহাভারতের একখানা ঘাও দিয়া—বলেই হঠাৎ হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল হাবুল: গেছি—গেছি—খাইছে!

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, কী হল তোমার? কিসে খেলে তোমাকে?

কিসে খেয়েছে সে আমি দেখেছি। টেনিদা কটাং করে একটা রাম-চিমটি বসিয়েছে হাবুলের পিঠে।

—আমারে একখানা জব্বর চিমটি দিল!

কুট্টিমামা পেছন ফিরে তাকালেন: কে চিমটি দিয়েছে?

টেনিদা চটপট বললে, না মামা, কেউ চিমটি দেয়নি। এই হাবুলটার—মানে পিঠে বাত আছে কিনা, তাই যখন-তখন কড়াং করে চাগিয়ে ওঠে, আর অমনি ওর মনে হয় কেউ ওকে চিমটি কেটেছে।

হাবুল প্রতিবাদ করে বললে, কখনো না—কখনো না! আমার কোনো বাত নাই!

টেনিদা রেগে গিয়ে বললে, চুপ কর্ হাবলা, মুখে মুখে তর্কো করিসনি! বাত আছে মামা—ও জানে না। ওর পিঠে বাত আছে—কানে বাত আছে, নাকে বাত আছে—

কুট্টিমামা বললেন, কী সাঙ্ঘাতিক! এইটুকু বয়সেই এসব ব্যারাম!

—তাই তো বলছি মামা—টেনিদার মুখখানা করুণ হয়ে এল: এইজন্যেই তো

ওকে নিয়ে আমাদের এত ভাবনা! কতবার ওকে বলেছি—হাবলা, অত বাতাবিনেবু খাসনি—খাসনি। বাতাবি খেলেই বাত হয়। এ তো জানা কথা। কিন্তু ভালো কথা কি ওর কানে যায়? তার ওপর বাতাসা দেখলে তো কথাই নেই—তক্ষুনি খেতে শুরু করে দেবে। এতেও যদি বাত না হয়—

হাবুল আবার হাউমাউ করে কী সব বলতে যাচ্ছিল, কুট্টিমামা তাকে থামিয়ে দিলেন। বললেন, বাতাবিলেবু আর বাতাসা খেলে বাত হয়? তা তো কখনো শুনিনি!

—হচ্ছে মামা, আজকাল আকছার হচ্ছে! কলকাতায় আজকাল কী যে সব বিচ্ছিরি কাণ্ডকারখানা ঘটছে সে আর তোমায় কী বলব! এমনকি একটু বেশি করে জল খেয়েছ তো সঙ্গে-সঙ্গেই জলাতঙ্ক।

শুনে কুট্টিমামা চোখ কপালে তুলে বসে রইলেন খানিকক্ষণ। বললেন কী সর্বনাশ!

কথা বলে কিছু লাভ হবে না বুঝে হাবুল এমদম চুপ। আমি গ্যাঁট হয়ে বসে টেনিদার চালিয়াতি শুনছি। কিন্তু ক্যাবলাটা আর থাকতে পারল না, ফস্ করে বলে ফেলল, গুল!

টেনিদা চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী বললি?

ক্যাবলা দারুণ হুঁসিয়ার—সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়েছে। নইলে জিপ থেকে নেমেই নির্ঘাৎ টেনিদা ওকে পটাপট কয়েকটা চাঁটি বসিয়ে দিত চাঁদির ওপর। বললে, না-না, চারদিকে কী সুন্দর ফুল ফুটেছে!

আমি অবশ্যি কোথাও কোন ফুল-টুল দেখতে পেলুম না। কিন্তু ক্যাবলা বেশ ম্যানেজ করে নিয়েছে।

কুট্টিমামা খুশি হয়ে বললেন, হুঁ, ফুল এদিকে খুব ফোটে। কাল জঙ্গলে যখন বেড়াতে নিয়ে যাব, তখন দেখবে ফুলের বাহার!

হাবুলটা এক নম্বরের বোকা, এর মধ্যেই আবার বলে ফেলেছে, মামা আপনার পোষা বাঘটা—

মামা ভীষণ চমকে গেলেন।

—কী বললে! পোষা বাঘ! সে আবার কী?

কিন্তু টেনিদা তক্ষুনি উল্টে দিয়েছে কথাটা। হাঁ-হাঁ করে বললে, না-না মামা, বাঘ-টাঘ নয়। হাবুলের নাকেও বাত হয়েছে কিনা. তাই কথাগুলো ঐরকম শোনায়। ও বলছিল তোমার ধোসা রাগ্‌টা—মানে সেই ধুসো কম্বলটা—যেটা তুমি দার্জিলিঙে কিনেছিলে সেটা আছে তো?

হাবুল একবার হাঁ করেই মুখ বন্ধ করে ফেললে। কুট্টিমামা আবার দারুণ অবাক হয়ে বললেন, তা সে কম্বলটার কথা এরা জানলে কী করে?

—হেঁ—হেঁ—টেনিদা খুব কায়দা করে বললে, তোমার সব গপ্পই আমি এদের কাছে করি কিনা! এরা যে তোমাকে কী ভক্তি করে মামা, সে আর তোমায়—

কথাটা শেষ হল না। ঠিক তখুনি—

জিপের বাঁ দিকের জঙ্গলটা নড়ে উঠল। আর জিপের সামনে দিয়ে এক লাফে যে রাস্তার ওপারে গিয়ে পড়ল, তাকে দেখামাত্র চিনতে ভুল হয় না। তার হলদে রঙের মস্ত শরীরটার উপর কালো কালো ডোরা—ঠিক যেন রোদের আলোয় একটা সোনালি তীর ছুটে গেল সামনে দিয়ে।

আমি বললুম, বা—বা—বা—

'ঘ'-টা বেরুবার আগেই টেনিদা জাপটে ধরেছে ক্যাবলাকে—আবার ক্যাবলা পড়েছে আমার ঘাড়ের ওপর। আর হাবুল আর্তনাদ করে উঠেছে : খাইছে—খাইছে!

www.boiRboi.blogspot.com

—চার—

বনের বিভীষিকা

বনের বাঘ অবিশ্যি বনেই গেল, 'হালুম' করে আমাদের ঘাড়ে এসে পড়ল না। আর কুট্টিমামা হা হা করে হেসে উঠলেন।

—ঐ একটুখানি বাঘ দেখেই ভির্মি খেলে, তোমরা যাবে জঙ্গলে শিকার করতে!

ততক্ষণে গাড়ি এক মাইল রাস্তা পার হয়ে এসেছে। জঙ্গল ফাঁকা হয়ে আসছে দু'ধারে। আমরাও নড়েচড়ে বসেছি ঠিক হয়ে।

টেনিদা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাইনি। বাঘ দেখে ভারি ফুর্তি হয়েছিল কিনা, তাই বাঃ-বাঃ-বাঘ বলে আনন্দে চেঁচামেচি করছিলুম। শুধু প্যালাই যা ভয় পেয়েছিল। ও একটু ভিতু কিনা!

বাঃ—ভারি মজা তো! সবাই মিলে ভয় পেয়ে শেষে আমার ঘাড়ে চাপানো! আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না, আমিও ভয় পাইনি। এই ক্যাবলাটাই একটুতে নার্ভাস হয়ে যায়, তাই ওকে ভরসা দিচ্ছিলুম!

ক্যাবলা নাক-মুখ কুঁচকে বললে, ব্যাস্—থামোশ!

শুনে আমার ভারি রাগ হয়ে গেল।

—খা মোষ! কেন—আমি মোষ খেতে যাব কী জন্যে? তোর ইচ্ছে হয় তুই মোষ খা—গণ্ডার খা—হাতি খা! পারিস তো হিপোপটেমাস ধরে ধরে খা!

কুট্টিমামা মিটমিট করে হাসলেন।

—ও তোমাকে মোষ খেতে বলেনি—বলেছে 'থামোশ'—মানে, 'থামো'। ওটা হচ্ছে রাষ্ট্রভাষা।

বললুম, না, ওসব আমার ভালো লাগে না! চারদিকে বাঘ-টাঘ রয়েছে—এখন থামোখা রাষ্ট্রভাষা বলবার দরকার কী?

হাবুল সেন বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ল।

—বুঝছস নি প্যালা—বাঘেও রাষ্ট্রভাষা কয় : হাম্—হাম্। মানেডা কী? আমি —আমি—যে-সে পাত্তর না—সাইক্ষাৎ বাঘ। বিড়ালে ইন্দুররে ডাইক্যা কয় : মিঞা

আও—আইসো ইন্দুর মিঞা, তোমারে ধইর‍্যা চাবাইয়া খামু। আর কুত্তায় কয় : ভাগ্—ভাগ্—ভাগ্ হো—পলা—পলা, নইলে ঘ্যাঙর কইর‍্যা তর্ ঠ্যাঙে একখানা জব্বর কামড় দিমু—হঃ!

টেনিদা বললে, বাপ্‌রে, কী ভাষা! যেন বন্দুক ছুঁড়ছে!

হাবুল বুক চিতিয়ে বললে, বীর হইলেই বীরের মতো ভাষা কয়। বোঝলা!

জবাব দিলে কুট্টিমামা। বললেন, বোঝলাম। কে কেমন বীর, দু-একদিনের মধ্যেই পরীক্ষা হবে এখন। এসব আলোচনা এখন থাক। এই যে—এসে পড়েছি আমরা।

সত্যি, কী গ্র্যান্ড জায়গা!

তিনদিকে জঙ্গল—আর একদিকে চায়ের বাগান ঢেউ খেলে পাহাড়ের কোলে উঠে গেছে। তার উপরে কমলানেবুর বাগান—অসংখ্য নেবু ধরেছে, এখনো পাকেনি, হলদে হলদে রঙের ছোপ লেগেছে কেবল। চা-বাগানের পাশে ফ্যাক্টরি, তার পাশে সায়েবদের বাংলো। আর একদিকে বাঙালী কর্মচারীদের সব কোয়ার্টার—কুট্টিমামার ছোট্ট সুন্দর বাড়িটি। অনেকটা দূরে কুলি লাইন। ভেঁপু বাজলেই দলে দলে কুলি মেয়ে ঝুড়ি নিয়ে চায়ের পাতা তুলতে আসে, কেউ কেউ পিঠে আবার ছোট্ট বাচ্চাদেরও বেঁধে আনে—বেশ মজা লাগে দেখতে।

সায়েবরা কলকাতায় বেড়াতে গেছে—কুট্টিমামাই বাগানের ছোট ম্যানেজার। আমরা গিয়ে পৌঁছুবার পর কুট্টিমামাই বললেন, খেয়ে-দেয়ে একটু জিরিয়ে নাও, তারপর বাগান-টাগান দেখব'খন।

টেনিদা বললে, সেই কথাই ভালো মামা। খাওয়া-দাওয়াটা আগে দরকার। সে চিনি যে কখন—বলতে বলতেই সামলে নিলে : মানে সেই যে কখন থেকে পেট চিন্-চিন্ করছে!

মামা হেসে বললেন, চান করে নাও—সব রেডি।

চান করবার তর আর সয় না—আমরা সব হুটোপাটি করে টেবিলে গিয়ে বসলুম।

একটা চাকর নিয়ে কুট্টিমামা এ বাড়িতে থাকেন, কিন্তু বেশ পরিপাটি ব্যবস্থা চারদিকে। সব সাজানো গোছানো ফিটফাট। চাকরটার নাম ছোট্টুলাল। আমরা বসতে-না-বসতেই গরম ভাতের থালা নিয়ে এল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, টেনিদা, তুমি যে রামভরসার কথা বলছিলে, সে কোথায়?

টেনিদা আমার কানে-কানে বললে, চুপ—চুপ! রামভরসার নাম করিসনি! সে ভীষণ কান্ড হয়ে গেছে!

—কী ভীষণ কান্ড?

—ভাত দিয়েছে—খা না বাপু! টেনিদা দাঁত খিঁচুনি দিলে : অত কথা বলিস কেন? বক্‌বক্ করতে করতে একদিন তুই ঠিক বক হয়ে উড়ে যাবি, দেখে নিস!

—বক্‌বক্ করলে বুঝি বক হয়?

—হয় বৈকি! যারা হাঁস-ফাঁস করে তারা হাঁস হয়, যারা ফিস্-ফিস্ করে তারা 'ফিশ'—মানে মাছ হয়—

আরো কী সব বাজে কথা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু থেমে গেল। ফিশকে থামিয়ে দিয়ে 'ডিশ' এসে পড়েছে। মানে, মাংসের ডিশ!

—ইউরেকা!—বলেই টেনিদা মাংসের ডিশে হাত ডোবালো। একটা হাড় তুলে নিয়ে তক্ষুনি এক রাম-কামড়। ছোট্টুলাল ওর গ্লাসে জল দিতে যাচ্ছিল, একটু হলে তার হাতটাই কামড়ে দিত।

ক্যাবলা বললে, মামা—হরিণের মাংস বুঝি?

মামা বললেন, শিকারে না গেলে কি হরিণ পাওয়া যায়? আজকে পাঁঠাই খাও, দেখি কাল যদি একটা মারতে-টারতে পারি।

—আমরা সঙ্গে যাব তো?

—আমার আপত্তি নেই।—কুট্টিমামা হাসলেন : কিন্তু বাঘের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—

ক্যাবলা বললে, না মামা, আমরা ভয় পাব না। পটলডাঙার ছেলেরা কখনো ভয় পায় না। আমাদের লীডার টেনিদাকেই জিজ্ঞেস করে দেখুন না।...আচ্ছা টেনিদা, আমরা কি বাঘকে ভয় করি?

টেনিদা চোখ বুজে, গলা বাঁকিয়ে একমনে একটা হাড় চিবুচ্ছিল। হঠাৎ কেমন ভেবড়ে গেল।

বিচ্ছিরি রেগে, নাকটাকে আলুসেদ্ধর মতো করে বললে, দেখছিস মন দিয়ে একটা কাজ করছি, খামোকা কেন ডিসটার্ব করছিস র‍্যা? হাড়টাকে বেশ ম্যানেজ করে এনেছিলুম, দিলি মাটি করে!

হাবুল ফ্যাক-ফ্যাক করে হেসে উঠল : তার মানে ভয় পাইতাছে!

—হ্যাঁ, ভয় পাচ্ছে! তোকে বলেছে!

—কওনের কাম কী, মুখ দেইখ্যাই তো বোঝন যায়। অখনে পাঠার হাড় খাইতাছ, ভাবতাছ বাঘে তোমারে পাইলেও ছাইড়্যা কথা কইবো না—তখন তোমারে নি ধইর‍্যা—

বাঁ হাত দিয়ে দুম্ করে একটা কিল টেনিদা বসিয়ে দিলে হাবুলের পিঠে।

হাবুল হাউমাউ করে বললে, মামা দ্যাখেন—আমারে মারল!

মামা বললেন, ছিঃ ছিঃ মারামারি কেন! ওর যদি ভয় হয়, তবে ও বাড়িতে থাকবে। যাদের সাহস আছে, তাদেরই সঙ্গে করে নিয়ে যাব।

টেনিদার মেজাজ গরম হয়ে গেল।

—কী, আমি ভিতু!

ক্যাবলা বললে, না—না, কে বলেছে সে কথা! তবে কিনা তোমার সাহস নেই—এই আর কি!

—সাহস নেই!—এক কামড়ে পাঁঠার হাড় গুঁড়িয়ে ফেলল টেনিদা : আছে কি না দেখবি কাল! বাঘ-ভালুক-হাতি-গণ্ডার যে সামনে আসবে, এক ঘুষিতে তাকে ফ্ল্যাট করে দেব!

ক্যাবলা বললে, এই তো বাহাদুরকা বাৎ—আমাদের লীডারের মতো কথা!

মামা বললেন, শুনে খুশি হলাম। তবে যা ভাবছ তা নয়, বাঘ অমন ঝট্ করে গায়ের উপর এসে পড়ে না। তাকেই খোঁজবার জন্যে বরং অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তা ছাড়া সঙ্গে দুটো বন্দুকও থাকবে—ঘাবড়াবার কিছু নেই।

হাবুল সেন খুশি হয়ে বললে, হ, সেই কথাই ভালো। বাঘেরে ঘুষিঘাষি মাইর‍্যা লাভ নাই—বাঘে তো আর বক্সিং-এর নিয়ম জানে না! দিবো ঘচাং কইর‍্যা একখানা কামড়! বন্দুক লইয়া যাওনই ভালো।

টেনিদা বললে, আঃ, তোদের জ্বালায় ভালো করে একটু খাওয়া-দাওয়া করবারও জো নেই, খালি বাজে কথা! কই হে ছোট্টুলাল, আর-এক প্লেট মাংস আনো। বেড়ে রেঁধেছ বাপু, একটু বেশি করেই আনো।

বিকেলে আমরা চায়ের বাগানে বেশ মজা করেই বেড়ালুম, কারখানাও দেখা হল। তারপর হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলুম দূরের কমলানেবুর বন পর্যন্ত। জায়গাটা ভালো—সামনে একটা ছোট্ট নদী রয়েছে। আমাদের সঙ্গে ছোট্টুলাল গিয়েছিল, সে বললে,

www.boiRboi.blogspot.com

নদীটার নাম জংলি।

সবাই বেশ খুশি, কেবল আমার মেজাজটাই বিগড়ে ছিল একটু। মানে, ব্যাপারটা তেমন কিছু নয়। চা জিনিসটা খেতে ভালো, আমি ভেবেছিলুম চায়ের পাতা খেতেও বেশ খাসা লাগবে। বাগান থেকে একমুঠো কাঁচা পাতা ছিঁড়ে চুপি-চুপি মুখেও দিয়েছিলুম। মাগো—কী যাচ্ছেতাই খেতে! আর সেই থেকে মুখে এমন একটা বদ্‌খৎ স্বাদ লেগে ছিল যে নিজেকে কেমন ছাগল-ছাগল মনে হচ্ছিল—যেন একটু আগেই কতগুলো কচি ঘাস চিবিয়ে এসেছি!

তার মধ্যে আবার নদীর ধারে দাঁড়িয়ে টেনিদা বাজখাঁই গলায় গান ধরলে :

এমনি চাঁদিনি রাতে সাধ হয় উড়ে যাই,—
কিন্তু ভাই বড় দুঃখ আমার যে পাখা নাই—

বলতে যাচ্ছি—এই বিকেলে চাঁদের আলো এল কোত্থেকে, এমন সময় ফস্ করে ক্যাবলা সুর ধরে দিলে :

তোমার যে ল্যাজ আছে,
তাই দিয়ে ওড়ো ভাই—

টেনিদা ঘুষি পাকিয়ে বললে, তবে রে—

ক্যাবলা টেনে দৌড় লাগালো। টেনিদা তাড়া করল তাকে। আর পরমুহূর্তেই এক গগনভেদী আর্তনাদ।

হাবুল, ছোট্টুলাল আর আমি দেখতে পেলুম। স্বচক্ষেই দেখলুম।

ঘন ঝোপের মধ্য থেকে একখানা কদাকার লোমশ হাত বেরিয়ে এসে খপ্ করে টেনিদার কাঁধ চেপে ধরল। আর তারপর বেরিয়ে এল আরো কদাকার, আরো ভয়ঙ্কর একখানা মুখ। সে মুখ মানুষের নয়। ঘন লোমে সে মুখও ঢাকা—দুটো হিংস্র হলদে চোখ তার জ্বলজ্বল করছে—আর কী নিষ্ঠুর নির্মম হাসি ঝকঝক করছে তার দু-সারি ধারালো দাঁতে!

হাবুল বললে, অরণ্যের বি—বি—বি—

আর বলতে পারল না। আমি বললুম—ভীষিকা, তার পরেই ধপাস করে মাটিতে চোখ বুজে বসে পড়লুম। আর টেনিদার করুণ মর্মান্তিক আর্তনাদে চারদিক কেঁপে উঠল।

www.boiRboi.blogspot.com

—পাঁচ—

শাখামৃগ-কথা

অরণ্যের সেই করাল বিভীষিকার সামনে যখন হাবুল স্তম্ভিত, আমি প্রায় মূর্ছিত, ক্যাবলা খানিক দূরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আর টেনিদার গগনভেদী আর্তনাদ —তখন—

তখন আশ্চর্য সাহস ছোট্টুলালের। মাটি থেকে একটা শুকনো ডাল কুড়িয়ে নিয়ে সে ছুটল সেই ভীষণ জন্তুটার দিকে : ভাগ্—ভাগ্ জলদি!

টেনিদা তো গেছেই—বোধহয় ছোট্টুলালও গেল! আমি দু-চোখের পাতা আরো জোরে চেপে ধরেছি, এমনি সময় কিচ-কিচ কিচিং-কাচুং বলেই একটা অদ্ভুত আওয়াজ, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাবলার অট্টহাসি!

চমকে তাকিয়ে দেখি, বনের সেই বিভীষিকা টেনিদার ঘাড় ছেড়ে দিয়ে লাফে লাফে সামনের একটা উঁচু শিমুল ডালে উঠে যাচ্ছে। আর ছোট্টুলাল শুকনো ডালটা উঁচিয়ে তাকে ডেকে বলছে : আও—আও—ভাগ্‌তা কেঁও! মার্‌কে মার্‌কে তেরি হাড্ডি হাম পটক দেব—হুঁঃ!

কিন্তু হাড্ডি পটকাবার জন্যে সে আর গাছ থেকে নামবে বলে মনে হল না। বরং গাছের উপর থেকে তার দলের আরো পাঁচ-সাতজন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কিঁচ-কিঁচ-কাঁচালঙ্কা—কিঞ্চিৎ—

এখনো কি ব্যাপারটা বলে দিতে হবে? ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা আর কিছু নয়, একটা গোদা বানর।

ক্যাবলা তখনো হাসছে। বললে, টেনিদা—হ্যা-হ্যা! পটলডাঙার ছেলে হয়ে একটা বানরের ভয়ে তুমি ভিরমি গেলে!

টেনিদা মুখ ভেংচে বললে, থাম—থাম—বেশি চালিয়াতি করতে হবে না! কী করে বুঝব যে ওটা বানর? খামোকা জঙ্গলের মধ্যে থেকে বেরিয়ে বিচ্ছিরি মুখ করে অমন করে ঘাড়টা খিমচে দিলে কার ভালো লাগে বল্-দিকি?

আমি বেশ কায়দা করে বললুম, আমি আর হাবলা তো দেখেই বুঝতে পেরে-ছিলুম যে ওটা বানর। তাই আমরা হাসছিলুম।

হাবুল বললে, হ—হ। আমরা খুবই হাসতে আছিলাম।

ছোট্টুলালই গোলমাল করে দিলে। বললে, কাঁহা হাঁসতে ছিলেন? আপলোগ্ তো ডর খাকে একদম ভুঁইপর বৈঠে গেলেন!

টেনিদা বললে, মরুক-গে, আর ভাল লাগছে না। মেজাজ-টেজাজ সব খিঁচড়ে গেছে। দিব্যি বিকেল বেলায় গান-টান গাইছিলুম, কোত্থেকে বিটকেল একটা গোদা বানর এসে দিলে মাটি করে।

ছোট্টুলাল বললে, আপ অত চিল্লালেন কেন? বান্দরকে কষিয়ে এক থাপ্পড় লাগিয়ে দিতেন—উস্‌কো বদন বিগড়াইয়ে যেত—হুঁঃ!

—তার আগে ও আমারই বদন বিগড়ে দিত! বাপরে কী দাঁত! নে বাপু, এখন

বাড়ি চল। বাঁদরের পাল্লায় পড়ে পেটের খিদে বড্ড চাগিয়ে উঠেছে—কিছু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা যাক।

শিমুল গাছের উপর বানরগুলো তখনও কিচির-মিচির করছিল। ছোটুলাল শুকনো ডালটা তাদের দেখিয়ে বললে, আও—একদফা উতার আও! এইসা মারেগা কি—

উত্তরে পটাপট করে কয়েকটা শুকনো শিমুলের ফল ছুটে এল। আমি আঁই আঁই করে মাথাটা সরিয়ে না নিলে একটা ঠিক আমার নাকে এসে লাগত।

হাবুল সেন বললে, শূন্য থিক্যা গোলাবর্ষণ করতাছে—পাইর‍্যা উঠবা না! অখনি ধরাশায়ী কইর‍্যা দিব সক্কলরে।

বলতে বলতে—ঠকাস! ঠিক তাক-মাফিক একটা শিমুলের ফল এসে লেগেছে ছোটুলালের মাথায়! এ দাঃন্দা—বলে সে তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল—আর তক্ষুনি ফলটা ফেটে চৌচির হয়ে শিমুল তুলো উড়তে লাগল চারিদিকে।

ছোটুলালের সব বীরত্ব উবে গেছে তখন।—বহুৎ বদমাস বান্দর—বলেই সে প্রাণপণে ছুট লাগাল। বলা বাহুল্য, আমরাও কি আর দাঁড়াই? পাঁচজনে মিলে অ্যায়সা স্পীডে ছুটলাম যে অলিম্পিক রেকর্ড কোথায় লাগে তার কাছে! গাছের উপর থেকে বানরদের জয়ধ্বনি শোনা যেতে লাগল—পলাতক শত্রুদের ওরা যেন বলছে—দুয়ো, দুয়ো!

কুট্টিমামার কোয়ার্টারে ফিরে মন-মেজাজ যাচ্ছেতাই হয়ে গেল।

পটলডাঙার চারমূর্তি আমরা—কোন কিছু আমাদের দমাতে পারে না—শেষকালে কিনা একদল বানর আমাদের বিধ্বস্ত করে দিলে! ছ্যা-ছ্যা!

প্লেট-ভর্তি হালুয়ার একটা থাবলা বসিয়ে টেনিদা বললে, কি রকম খামোকা বাঁদরগুলো আমাদের ইনসাল্ট করলে বল্ দিকি!

ক্যাবলা বললে, অসহ্য অপমান!

আমি বললুম, এর প্রতিকার করতে হবে!

হাবুল বললে, হ, অবশ্যই প্রতিশোধ লইতে হইবো।

টেনিদা বললে, যা বলেছিস—নির্মম প্রতিশোধ নেওয়া দরকার।—বলেই আমার হালুয়ার প্লেট ধরে এক টান।

আমি হাঁ-হাঁ করে উঠলুম, তা আমার প্লেট ধরে টানাটানি কেন? আমার ওপর প্রতিশোধ নিতে চাও নাকি?

—মেলা বকিসনি। টেনিদা থাবা দিয়ে আমার প্লেটের অর্ধেক হালুয়া তুলে নিলে : তোর ভালোর জন্যেই নিচ্ছি। অত খেয়ে তুই হজম করতে পারবি না—যা পেটরোগা!

—আর তুমি পেটমোটা হয়েই বা কী কীর্তিটা করলে শুনি?—আমার রাগ হয়ে গেল—একটা বানরের ভয়ে একদম মূর্ছা যাচ্ছিলে!

—কী বললি?—বলে টেনিদা আমাকে একটা চাঁটি মারতে যাচ্ছিল, কিন্তু ক্যাবলা হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে এমন চেঁচিয়ে উঠল যে থমকে গেল টেনিদা।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, সর্বনাশ হয়ে গেল!

—কিসের সর্বনাশ রে?

—বানরটা তোমার ঘাড়ে আঁচড়ে দেয়নি তো?

—দিয়েছে বোধহয় একটু।—টেনিদা ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে বললে, সে কিছু না—সামান্য একটুখানি নখের আঁচড়। তা কী হয়েছে?

www.boiRboi.blogspot.com

ক্যাবলা মুখটাকে প্যাঁচার মতন করে বললে, দিয়েছে তো একটু আঁচড়! ব্যস—আর দেখতে হবে না।

টেনিদার গলায় হালুয়ার তাল আটকে গেল।

—কী দেখতে হবে না? অমন করছিস কেন?

ক্যাবলা মোটা গলায় জিজ্ঞেস করলে, কুকুরে কামড়ালে কী হয়?

হাবুল দারুণ উৎসাহে বললে, কী আবার হইবো? জলাতঙ্ক।

টেনিদা মুখখানা কুঁকড়ে-টুকড়ে কি রকম যেন হয়ে গেল। ঠিক একতাল হালুয়ার মতো হয়ে গেল বলা চলে।

—কিন্তু আমাকে তো কুকুরে কামড়ায়নি। আর, মাত্র একটু আঁচড়ে দিয়েছে—তাতে—

এইবার আমি কায়দা পেয়ে বললুম, যা হবার ওতেই হবে—দেখে নিয়ো।

—কী হবে? টেনিদার হালুয়ার মতো মুখটা এবার ডিমের ডালনার মতো হয়ে গেল।

ক্যাবলা খুব গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললে, কেন, প্রেমেন মিত্তিরের গল্প পড়োনি? হবে স্থলাতঙ্ক।

—অ্যাঁ!

—তারপর তুমি আর মাটিতে থাকতে পারবে না। বানরের মতো কিচমিচ আওয়াজ করবে—

আমি বললুম, এক লাফে গাছে উঠে পড়বে—

হাবুল সেন বললে, আর গাছের ডালে বইস্যা বইস্যা কচি-কচি পাতা ছিড়্যা ছিড়্যা খাইবা।

টেনিদা হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল : আর বলিসনি—সত্যি আর বলিসনি! আমি বেজায় নার্ভাস হয়ে যাচ্ছি! ঠিক কেঁদে ফেলব বলে দিলুম।

বোধহয় কেঁদেও ফেলত—হঠাৎ কুট্টিমামা এসে গেলেন।

—কী হয়েছে রে? এত গণ্ডগোল কেন?

—মামা, আমার স্থলাতঙ্ক হবে—টেনিদা আর্তনাদ করে উঠল।

—স্থলাতঙ্ক! তার মানে?—কুট্টিমামার চোখ কপালে চড়ে গেল।

আমরা সমস্বরে ব্যাপারটা যে কী তা বোঝাতে আরম্ভ করলুম। শুনে কুট্টিমামা হেসেই অস্থির। বললেন, ভয় নেই, কিছু হবে না। একটু আইডিন লাগিয়ে দিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

শুনে টেনিদার সে কী হাসি! বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে গেল যেন।

—তা কি আর আমি জানি না মামা! এই প্যালারামকেই একটু ঘাবড়ে দিচ্ছিলুম কেবল।

চালিয়াতিটা দেখলে একবার?

—ছয়—

বড় বেড়ালের আবির্ভাব

রাতের খাওয়া-দাওয়া শেষ হয়ে গেলে আমরা বারান্দায় এসে বসলুম। আকাশ আলো করে চাঁদ উঠেছে। চায়ের বাগান, দূরের শালবন, আরো দূরের পাহাড় যেন দুধে স্নান করছে। ঝিরঝিরে মিষ্টি হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর। খাওয়াটাও হয়েছে দারুণ। আমার ইচ্ছে করছিল গিয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ি। কিন্তু কুট্টিমামা গল্পের থলি খুলে বসেছেন—সে লোভও সামলানো শক্ত।

আমরা তিনজনে তিনটে চেয়ারে বসেছি। একখানা ছোট তক্তোপোষে আধশোয়া হয়ে আছেন কুট্টিমামা। সামনে গড়গড়া রয়েছে, গুড়গুড় করে টানছেন আর গল্প বলছেন।

সেই অনেক কাল আগের কথা। জঙ্গল কেটে সবে চায়ের বাগান হয়েছে। বড় বড় পাইথন, বাঘ আর ভালুকের রাজত্ব। কালাজ্বর, আমাশা, ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া এ সব লেগেই আছে। বাগানে কুলি রাখা শক্ত—দু'দিন পরে কে কোথায় পালিয়ে যায় তার আর ঠিক-ঠিকানা থাকে না। কুলিদের আর কী দোষ—প্রাণের মায়া তো সকলেরই আছে।

তখন কুট্টিমামার বাবা এই বাগানে কাজ করতেন। পাকা রাস্তা ছিল না—ষোলো মাইল দূরের রেল স্টেশন থেকে গোরুর গাড়ি করে আসতে হত। বাঘ-ভালুকের সঙ্গে দেখা হত হামেশা। কুট্টিমামা তখন খুব ছোট্ট—কত জন্তু-জানোয়ার দেখেছেন কতবার।

তারই একদিনের গল্প।

সেবার কুট্টিমামা আর ও'র বাবা নেমেছেন রেল থেকে—বিকেলের গাড়িতে। সময়টা শীতকাল। একটু পরেই অন্ধকার নেমে এল। কাঁচা রাস্তা দিয়ে গোরুর গাড়ি দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে। দু'পাশে ঘন অন্ধকার শাল-শিমুলের বন। কুট্টিমামা চুপচাপ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছেন, জঙ্গলের মধ্যে থোকা থোকা জোনাক জ্বলছে। অনেক দূরে পাহাড়ের গায়ে হাতির ডাক—হরিণ ডেকে উঠছে মধ্যে মধ্যে—গাড়ির সামনে দিয়ে ছুটে ছুটে পালিয়ে যাচ্ছে খরগোস। ঝিঁঝির আওয়াজ উঠছে একটানা—ঘুমের ভেতর গাছের ডালে কুঁক্-কুঁক্ করছে বনমুরগি।

দেখতে দেখতে আর শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন কুট্টিমামা। টুকটুক করে গাড়ি এগিয়ে চলেছে। হঠাৎ তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

গাড়ি থেমে দাঁড়িয়েছে। শালবনের ভেতর দিয়ে সেদিনও অনেকখানি চাঁদের আলো পড়েছে বনের রাস্তায়। সেই চাঁদের আলোয় আর বনের ছায়ায়—

কুট্টিমামা যা দেখলেন তাতে তাঁর দাঁত-কপাটি লেগে গেল।

গোরুর গাড়ি থেকে মাত্র হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে এক বিকট মূর্তি। কুচকুচে কালো লোমে তার শরীর ভরা—বুকে কলারের মতো একটা সাদা দাগ। হিংসায় তার চোখ দুটো আগুনের মতো জ্বলছে। মুখটা খোলা—দু'সারি দাঁত যেন সারি

সারি ছুরির ফলার মতো সাজানো। আলিঙ্গন করবার ভঙ্গিতে হাত দু'খানা দু'পাশে বাড়িয়ে অল্প টলতে টলতে এগিয়ে আসছে সে।

ভালুক!

ভালুক বলে কথা নয়। এদিকের জঙ্গলে ছোটখাটো ভালুক কিছু আছেই। কিন্তু মানুষ দেখলে তারা প্রায়ই বিশেষ কিছু বলে না—মানে মানে নিজেরাই সরে যায়। কিন্তু এ তো তা নয়! অদ্ভুত বড়—অস্বাভাবিক রকমের বিরাট! আর কী তার চোখ—কী দৃষ্টি সেই চোখে! সাক্ষাৎ নরখাদক দানবের চেহারা!

গোরু দুটোর গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে—একটা বিচিত্র আওয়াজ বেরুচ্ছে তাদের গলা দিয়ে।

কুট্টিমামার বাবাও দারুণ ভয় পেয়েছেন। সঙ্গে বন্দুক নেই। ফিসফিস করে বললেন, এখন কী হবে?

নেপালী গাড়োয়ান বীর বাহাদুর একটু চুপ করে থেকে বললে, কিছু ভাববেন না বাবু, আমি ব্যবস্থা করছি।

ফস্ করে গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল বীর বাহাদুর। ভালুক তখন পাঁচ-সাত হাতের মধ্যে এসে পড়েছে। কুট্টিমামা ভাবলেন, এইবার গেছে বীর বাহাদুর! ভালুক এখুনি দু'হাতে ওকে বুকে জাপটে ধরবে। আর যা চেহারা ভালুকের! একটি চাপে সমস্ত হাড়-পাঁজরা একেবারে গুঁড়ো করে দেবে। ভালুকরা অমনি করেই মানুষ মারে কিনা!

কিন্তু নেপালীর বাচ্চা বীর বাহাদুর—এ-সব জিনিসের অন্ধিসন্ধি সে জানে। চট্ করে গাড়ির তলা থেকে একরাশ খড় বের করে আনল, তারপর দেশলাই ধরিয়ে দিতেই খড়গুলো মশালের মতো দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠল।

আর সেই জ্বলন্ত খড়ের আঁটি নিয়ে সে এগিয়ে গেল ভালুকের দিকে।

আগুন দেখে ভালুক থমকে গেল। তারপর বীর বাহাদুর আর-এক পা সামনে বাড়াতেই সব বীরত্ব কোথায় উবে গেল তার! অতবড় পেল্লায় জানোয়ার চার পায়ে একেবারে চোঁ-চোঁ দৌড়—বোধহয় সোজা পাহাড়ে পৌঁছে তবে থামল।

কুট্টিমামার গল্প শুনে আমরা ভীষণ খুশি।

টোনিদা বললে, মামা, আমাদের কিন্তু শিকারে নিয়ে যেতে হবে।

কুট্টিমামা বললেন, যে-সব বীরপুরুষ, বাঘের ডাক শুনলেই—

হাবুল সেন বললে, না মামা, ভয় পামু না। আমরাও বাঘেরে ডাকতে থাকুম। ডাইক্যা কমু—আইসো বাঘচন্দর, তোমার লগে দুইটা গল্পসল্প করি।

ক্যাবলা বললে, আর বাঘও অমনি হাবুলের পাশে বসে গলা জড়িয়ে ধরে গল্প আরম্ভ করে দেবে।

তখন আমি বললুম, আর মধ্যে-মধ্যে হাবলাকে আলুকাবলি আর কাজুবাদাম খেতে দেবে।

টোনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, কী যে বাজে বকবক করিস তোরা—একদম ভালো লাগে না। হচ্ছে একটা দরকারী কথা—খামোকা ফাজলামি জুড়ে দিয়েছে!

কুট্টিমামা হাই তুলে বললেন, আচ্ছা, সে হবে-এখন। এখন যাও—শুয়ে পড় গে সবাই। কালকে ভাবা যাবে এ-সব।

টোনিদা, হাবুল আর কুট্টিমামা শুয়েছেন বড় ঘরে। এ পাশের ছোট ঘরটায় আমি

www.boiRboi.blogspot.com

আর ক্যাবলা।

বিছানায় শুয়েই কুর্-কুর্ করে ক্যাবলার নাক ডাকছে। কিন্তু অচেনা জায়গায় এত সহজেই আমার ঘুম আসে না। মাথার কাছে টিপয়ের উপর একটা ছোট্ট নীল টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। আমি ল্যাম্পটাকে একেবারে বালিশের পাশে টেনে আনলুম। তারপর সুটকেস খুলে শিবরামের নতুন হাসির বই 'জুতো নিয়ে জুতোজুতি' আরাম করে পড়তে লেগে গেলুম।

পড়ছি আর নিজের মনে হাসছি। পাশেই খোলা জানালা দিয়ে মিঠে হাওয়া আসছে। দুধের মতো জ্যোৎস্নায় স্নান করছে চায়ের বাগান আর পাহাড়ের বন। কতক্ষণ সময় কেটেছে জানি না। হাসতে হাসতে এক সময় মনে হল, জানালার গায়ে যেন খড়খড় করে আওয়াজ হচ্ছে।

তাকিয়ে দেখি, একটা বেশ বড়সড় বেড়াল। জানালার ওপর উঠে বসেছে—আর জ্বলজ্বল করে তাকাচ্ছে আমার দিকে।

বললুম, যাঃ—যাঃ—পালা—

পালালো না। বললে, গর্—র্—র্—

তখন আমার ভাল করে চোখে পড়ল।

শুধু একটা নয়—তার পাশে আর একটা বেড়াল। সেটার হাঁড়ির মতো প্রকাণ্ড মাথা—ভাঁটার মতো চোখ আর গায়ে ঘন হলদের ওপর কালো কালো ফোঁটা।

এত বড় বেড়াল! আর, এ কেমন বেড়াল!

সেই প্রকাণ্ড বেড়ালটাও বললে, গর্—র্—র্—ঘুঃ!

আর ঘুঃ! আমি তৎক্ষণাৎ আকাশ-ফাটানো চিৎকার করলুম একটা। তারপর ক্যাবলাকে জড়িয়ে ধরে সোজা আছড়ে পড়লুম বিছানা থেকে। টেবিল-ল্যাম্পটাও সেইসঙ্গে ভেঙে চুরমার।

আর সেই অথই অন্ধকারের ভেতর—

—রাত—

অন্ধকারে দুজনে কুমড়োর মতো গড়াগড়ি খেলুম কিছুক্ষণ। ক্যাবলা যতই বলে, ছাড়—ছাড়—আমি ততই গোঁ-গোঁ করতে থাকি : বা—বা—বা—

এর ভেতরে লণ্ঠন হাতে টেনিদা, হাবলা আর কুট্টিমামা এসে হাজির। ছোট্টু-লালও সেইসঙ্গে।

—কী হল? কী হল?

—আরে ই ক্যা ভৈল্ বা?

ক্যাবলা তড়াক করে উঠে পড়ে বললে, দেখুন না কুট্টিমামা. ঘুমের ঘোরে প্যালাটা আমাকে জাপটে ধরে খাট থেকে নিচে ফেলে দিলে। কিছুতেই ছাড়ে না। খালি বলছে : বা—বা—বা—

বা—বা—বা?—টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, তার মানে. ঘাঃ—বেশ মজার খেলা হচ্ছে! এই প্যালাটাকে নিয়ে সব সময় একটা কেলেঙ্কারি হবে! ওর গাধার মতো লম্বা লম্বা কান দুটোকে ইস্ক্রুপের মতো পেঁচিয়ে দিলে তবে ঠিক হয়! এই প্যালা, এই গাড়োলরাম—উঠে পড় বলছি—

আমি কি উঠি নাকি অত সহজে? ক্যাবলার পাশেই তো সেই একজোড়া বড়

বেড়াল বসে আছে!

চোখ বুজেই বলি, ওই জা—জা—জা—

হাবুল বললে, কারে যাইতে কস? কেডা যাইবো?

বললুম, জা—নালায়!

হাবুল বিচ্ছিরি চটে গেল। বললে, কী, আমি নালায় জামু? ক্যান্, আমি নালায় যামু ক্যান্? তর্ ইচ্ছা হইলে তুই যা—নালায় যা, নর্দমায় যা—গোবরের গাদায় যা—

আমি তেমনি চোখ বুজে বললুম, দুত্তোর! জানালায় তা—তাকিয়ে দ্যাখো না একবার! বা—বাঘ বসে আছে ওখানে!

—অ্যাঁ, জানালায় বাঘ!—বলেই টেনিদা লাফ দিয়ে প্রায় হাবুলের ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

হাবুল বললে, ইঃ—খাইছে, খাইছে!

কুট্টিমামা হেসে উঠলেন।

—জানালায় বাঘ? এই বাগানের ভেতর? ঘুমের ঘোরে তুমি স্বপ্ন দেখেছ প্যালারাম!

ক্যাবলা খিক-খিক করে হাসতে লাগল, হাবুল খ্যা-খ্যা করে হাসতে লাগল, টেনিদা খ্যাঁচর-খ্যাঁচর করে হেসে চলল। আর পেট চেপে ধরে খোঁ-খোঁ করে সবচেয়ে বেশি করে হাসতে লাগল ছোট্টুলাল।

—খোঁ—খোঁ—খোঁ! আরে খোঁ—খোঁ—বাঘ কাঁহাসে আসবে! বাঘের মাসি এসে-ছিল হোবে—খোঁ—খোঁ—খোঁ—! কী খুশি সবাই, আর কী হাসির ধুম! যেন আমাকে পাগল পেয়েছে ওরা!

রাগে গা জ্বলে গেল, আমি উঠে বসলুম।

—চলে গেছে কিনা, তাই সবাই হাসছে! যদি দেখতে—

টেনিদা বললে, আমিও তো দেখেছিলুম। এই একটু আগেই। দুটো গণ্ডার আর তিনটে জলহস্তী আমার দিকে তেড়ে আসছিল। আমি এক ঘুষিতে একটা গণ্ডারকে মেরে ফেললুম—দুই চড়ে দুটো জলহস্তী কাত হয়ে গেল। বাকি দুটো ল্যাজ তুলে পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে পালালো। অবিশ্যি স্বপ্নে।

আবার হাসি। ছোট্টুলাল তো প্রায় নাচতে লাগল। আমার এত রাগ হল যে ইচ্ছে করতে লাগল ছোট্টুলালের ঠ্যাঙে ল্যাং মেরে মাটিতে ফেলে দিই কিংবা ওর কানের ভেতরে কতগুলো লাল পিঁপড়ে ঢেলে দিই!

কুট্টিমামা বললেন, থামো—থামো। সবটা ওকে বলতে দাও। আচ্ছা প্যালারাম, তুমি তো ঘুমুচ্ছিলে?

—মোটেই না। আমি শুয়ে শুয়ে গল্পের বই পড়ছিলুম।

—তারপরে?

—জানালায় একটা গর্র্ আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি—

বলতে বলতে আমি থেমে গেলুম। বুকের ভেতর দুরুদুরু করে উঠল।

—কী দেখলে?

—প্রথমে একটা বাচ্চা—বড়সড় বেড়ালের মতো দেখতে। তারপরে আর একটা। জালার মতো মাথা—ভাঁটার মতো চোখ, ঝাঁটার মতো গোঁফ—

ক্যাবলা বললে, ধামার মতো পিলে—

টেনিদা বললে, শিঙিমাছের মতো শিং—

www.boiRboi.blogspot.com

হাবুল জুড়ে দিলে, আর পটোলের মতন দাঁত—

বুঝতে পারছ তো? আমার সেই পালা-জ্বরের পিলে আর পটোল দিয়ে শিঙ্গি-মাছের ঝোলকে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

শুনে কুট্টিমামা পর্যন্ত মুচকে মুচকে হাসলেন, আর খোঁয়া—খোঁ-খোঁ বলে আবার নাচতে শুরু করে দিলে ছোট্টুলাল।

ভাবছি ছোট্টুলালকে এবার সত্যিই ঘ্যাঁচ করে একখানা ল্যাং মেরে দেব যা থাকে কপালে, এমন সময় টেনিদা বললে, না কুটিমামা, প্যালাকে আর এখানে রাখতে ভরসা হচ্ছে না!

ক্যাবলা বললে, ঠিক। বাঘের কথা শুনেই যেমন করছে, তাতে তো—

হাবুল বললে, বাঘ একখান চক্ষের সামনে দেখলে ভয়েই মইর‍্যা যাইব নে।

টেনিদা বললে, কালই ওকে প্লেনে তুলে দেওয়া যাক।

ক্যাবলা বললে, বেয়ারিং পোস্টে।

হাবুল বললে, একটা বস্তার মইধ্যে কইর‍্যা তুইল্যা দিলেই হইবো—পয়সা লাগবো না।

অপমানে আমার কান কট্‌কট্‌ করতে লাগল, খালি মনে হতে লাগল নাকের ডগায় কতগুলো উচ্চিংড়ে লাফাচ্ছে। কিন্তু এদের কোন কথা বলে লাভ নেই—এরা বিশ্বাস করবে না। আমি রেগে গোঁজ হয়ে বসে রইলুম।

কুট্টিমামা বললেন, যাও—যাও, সব শুয়ে পড় এখন। আর রাত জেগে শরীর খারাপ করে লাভ নেই।

আমি শেষবার বলতে চেষ্টা করলুম : আপনারা বিশ্বাস করছেন না—

টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, যা—যা খুব হয়েছে! আর ওস্তাদি করতে হবে না তোকে! রাক্ষসের মতো খাবি আর শেষে পেট-গরম হয়ে উষ্টুম-ধুষ্টুম স্বপন দেখবি! দরজা-জানালা বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে পড়। কাল ভোরের প্লেনে যদি তোকে কলকাতায় চালান না করি তো—

দাঁত বের করে আরো কী সব বলতে যাচ্ছিল, ঠিক এমনি সময় একটা বিকট হৈ-হৈ চিৎকার। সেটা এল কুলি লাইনের দিক থেকে। তারপরেই জোর টিন-পেটানোর আওয়াজ।

আমরা সবাই ভীষণভাবে চমকে উঠলুম। সবচাইতে বেশি করে চমকালেন কুট্টিমামা।

—ও কি! ও আওয়াজ কেন?

চিৎকারটা আরো জোরালো হয়ে উঠল। আকাশ ফেটে যেতে লাগল টিন-পেটানোর শব্দে! তারপরেই কে একজন ছুটতে ছুটতে এসে বাইরে থেকে হাঁক পাড়ল : বাবু—ছোট ম্যানেজারবাবু—

ছোট্টুলাল দরজা খুলে দিলে। দেখা গেল, লণ্ঠন হাতে কুলিদের একজন সর্দার।

কুট্টিমামা বললেন, কী হয়েছে রে? অমন চেঁচামেচি করছিস কেন?

—কুলি-লাইনে বাঘ এসেছিল বাবু!

বাঘ!

ঘরে যেন বাজ পড়ল। আর দেখি—সবাই যেন হাঁ করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আর ছোট্টুলালের চোখ দুটো একেবারে গোল গোল হয়ে গেছে—টিকটা খাড়া হয়ে ওঠবার চেষ্টা করছে!

এইবারে জুত পেয়ে আমি বললুম, কেমন বাপু ছোট্টুলাল—আভি খোঁয়া-খোঁয়া

করকে হাসছ না কেন?

কুলি-সর্দার বললে, একটা চিতা, সঙ্গে বাচ্চাও ছিল। একটা গোরুকে করেছে আর একটা ছাগল মেরে নিয়ে পালিয়েছে।

কারো মুখে আর কথাটি নেই।

আর—তক্ষুনি আমি ঘর কাঁপিয়ে হাসতে শুরু করলুম। সেই হাসির আওয়াজে টেনিদা লাফিয়ে হাবুলের ঘাড়ের উপর পড়ল—হাবুল গিয়ে পড়ল ছোট্টুলালের গায়ে, আর—আঁই দাদা বলে চিৎকার ছেড়ে একেবারে চিৎপাত হল ছোট্টুলাল।

—আট—

কুট্টিমামা বললেন, তাই তো! আবার চিতাবাঘের উৎপাত শুরু হল!

সর্দার বললে, ওদিকের জঙ্গলে বাঘ বড় বেড়ে গেছে বাবু। মাসখানেক ধরেই আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছিল। এখন একেবারে বাগানে ঢুকে পড়েছে। আর আসতে যখন শুরু করেছে তখন সহজে ছাড়বে না!

কুট্টিমামা মাথা নেড়ে বললেন, দু-একটা না মারলে চলছে না। আচ্ছা এখন যাও। দেখি কাল সকালে কী করা যায়।

সর্দার চলে গেল। কুট্টিমামা বললেন, তোমরাও সব শুয়ে পড় গে। আর প্যালা-রাম—এবার ভালো করে জানালা বন্ধ করে দিয়ো।

আমরা সব চুপচাপ চলে এলুম। হাবুলের বকবকানি, টেনিদার চালিয়াতি আর ফুট-কাটা একদম বন্ধ। সব একেবারে স্পীক্‌টি নট। আর ছোট্টুলাল? সে তো তক্ষুনি—আঁই দাদা হো—বলে একটা কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

খড়খড়ি আর কাচের জানালা দুটোই বন্ধ করে দিতে যাচ্ছি, ক্যাবলা বললে, খড়খড়িটা খুলে রাখ না প্যালা! বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য বেশ দেখা যাবে! কী সুন্দর চাঁদ উঠেছে রে!

আমি দাঁত-মুখ খুব বিচ্ছিরি করে বললুম, থাক—আর পার্‌কিতিক দিরিশ্যি দেখে দরকার নেই! চাঁদের আলোয় খুশি হয়ে বাঘ এসে যদি জানালার বাইরে দাঁত খিঁচোয়?

—আমরাও বাঘকে ভেংচে দেব!

—আর যদি জানালা ভেঙে ঢোকে?

—আমরা দরজা ভেঙে পালিয়ে যাব!

দেখেছ ইয়ার্কিটা একবার! বাঘ যেন আমাদের পটলডাঙার একাদশী কুণ্ডু—পেছন থেকে 'হাঁড়ি ফাটল' 'হাঁড়ি ফাটল' বলে চেঁচিয়ে চটিয়ে দিলেই হল!

বললুম, বেশি ফেরেব্বাজি করিসনে ক্যাবলা, ঘুমো।—বলে আমি দুটো জানালাই শক্ত করে এঁটে দিলুম। ঘুমোতে চেষ্টা করছি—কিন্তু ঘুম কি ছাই আসে? খালি বন্ধ জানালায় চোখ পড়ছে। এই মনে হচ্ছে বাইরের খড়খড়ি কেউ কড়্‌কড়্‌ করে আঁচড়াচ্ছে, আবার যেন শুনছি ঘাসের উপর দিয়ে কি সব হাঁটছে—হুমহাম করে কি একটা ডেকেও উঠল। এদিকে আবার নাকের ডগায় দু-তিনটে মশা বিন্‌-বিন্‌ করছে। ক্যাবলাটা তো দেখতে-না-দেখতেই ঘুমিয়ে পড়ল। আমি কী করি? মশারি একটা আছে—ফেলে দেব? কিন্তু মশারির ভেতরে আমি একদম শুতে পারি না—কেমন দম আটকে আসে।

www.boiRboi.blogspot.com

তাহলে মশাই মারি—কী আর করা? কিন্তু চেষ্টা করে দেখলুম, কিছুতেই মারা যায় না। নাকের ওপর চাঁটি হাঁকড়েছি তো কানের কাছে গিয়ে পোঁ করে উঠল। আবার কর্ণাট প্রদেশ আক্রমণ করেছি তো শত্রুবাহিনী নাসিকে এসে উপস্থিত! কাঁহাতক পেরে ওঠা যায়? আধঘণ্টা ধরে নিজেকে সমানে চাঁটিয়ে এবং ঘুষিয়ে—শেষতক হাল ছেড়ে দিলুম। বললুম, যাও না বাপু—জঙ্গলে যাও না! বাঘ আছে—হাতি আছে, অনেক রক্ত আছে তাদের গায়ে। যত খুশি খাও গে! আমি পটলডাঙার প্যালারাম—সবে পালা-জ্বরের পিলেটা সেরেছে—আমার রক্তে আর কী পাবে? খানিক পটোল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল বই তো নয়!

যেই বলেছি—অমনি কী কাণ্ড!

হুড়মুড়িয়ে জানালাটা ভেঙে পড়ল। আর কী সর্বনাশ! বাইরে—বাইরে যে একটা হাতি! পাহাড়ের মতো প্রকাণ্ড—জমাট অন্ধকার দিয়ে তৈরি তার শরীর! দুটো কুতকুতে চোখে আমার দিকে খানিক তাকিয়েই কেমন যেন মিটমিট করে হাসল। তারপরেই করেছে কী—হাত-দশেক লম্বা একটা শুঁড় বাড়িয়ে কপাৎ করে আমার একটা লম্বা কান টেনে ধরেছে।

এতক্ষণ তো আমি ভয়ে পান্তুয়ার মতো পড়ে আছি—কিন্তু এবার আত্মারাম প্রায় খাঁচাছাড়া! 'বাপ-রে—মা-রে—মেজদা রে—পটলডাঙা রে'—বলে রাম-চিৎকার ছেড়েছি!

আর তক্ষুনি কানের কাছে ক্যাবলা বললে, কী আরম্ভ করেছিস প্যালা? ভীতুর ডিম কোথাকার!

বললুম, হা—হা—হাতি!

ক্যাবলা বললে, গোদা পায়ের লাথি!

চমকে চোখ মেলে চাইলুম। কোথায় হাতি—কোথায় কী! ঘরভর্তি ঝকঝকে সকালের আলো। আর ক্যাবলা কোত্থেকে একটা পাখির পালক কুড়িয়ে এনে আমার কানের ভেতর দিতে চেষ্টা করছে।

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। আর পালকটা আমার কানে ঢোকাতে না পেরে ভারি ব্যাজার হল ক্যাবলা। বললে, কোথায় রে তোর হা—হা—হাতি? স্বপ্ন দেখছিলি বুঝি?

—বকিসনি! আমার কানে পালক দিচ্ছিলি কেন?

—তোকে জাগাবার জন্যে। কিন্তু পারলুম কই? তার আগেই তো জেগে গেলি—ইস্টুপিড কোথাকার!

—মারব এক থাপ্পড়—বলে আমি রেগেমেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম।

সকালের চা এবং সেইসঙ্গে লুচি আলুভাজা রসগোল্লা 'টা' বেশ ভালোই হল। তারপর কুট্টিমামা চলে গেলেন ফ্যাক্টরিতে। আমাদের বলে গেলেন, তোমরা বাগানের ভেতর ঘুরে বেড়াও—ভয়ের কিছু নেই। তবে জঙ্গলের দিকে যেয়ো না। চিতাবাঘের উৎপাত যখন শুরু হয়েছে, তখন সাবধান থাকাই ভাল।

টেনিদা বললে, হেঃ—বাঘ! জানো কুট্টিমামা—রাত্তিরেই কেমন একটু বেকায়দা হয়ে যায়। কিন্তু দিনের বেলায় বাঘ একবার আসুক না সামনে! এমন একখানা আপারকাট বসিয়ে দেব—

হাবুল বললে, আপনার কালীসিঙ্গির মহাভারতের থিক্যাও জব্বর!

কুট্টিমামা অবাক হয়ে বললেন, আমার কালীসিঙ্গির মহাভারত! তার মানে?

হাবুল সবে বলতে যাচ্ছে : সেই যে মহাভারতের একখানা পেল্লায় ঘাও নি মাইর‍্যা—

আর বলতে পারল না। তার আগেই টেনিদা ওর পিঠে কটাং করে একটা জবরদস্ত চিমটি কেটে দিয়েছে।

হাবুল হাউ-মাউ করে উঠল : খাইসে, খাইসে!

কুট্টিমামা আরো অবাক হয়ে বললেন, খাইছে! কিসে খেল তোমাকে?

—টেনিদা!

টেনিদা তাড়াতাড়ি বললে, না মামা, আমি ওকে খাচ্ছি না! ওটা এত অখাদ্য যে বাঘে খেলেও বমি করে দেবে। ওর পিঠে একটা ডেঁয়ো পিঁপড়ে কামড়াচ্ছিল, সেটাকে ফেলে দিলুম কেবল। তুমি যাও—নিজের কাজে যাও।

খানিকক্ষণ কেবল বোকা-বোকা হয়ে তাকিয়ে দেখে কুট্টিমামা চলে গেলেন।

টেনিদা এবার হাবুলের মাথায় কুটুস্ করে একটা ছোট্ট গাঁট্টা দিলে। বললে, তোকে ওসব বলতে আমি বারণ করিনি? জানিসনে—নিজের বীরত্বের কথা বললে কুট্টিমামা লজ্জা পায়?

—আর তোমার সব চালিয়াতি ফাঁস হয়ে যায়! টুক করে কথাটা বলেই ক্যাবলা তিন হাত লাফিয়ে সরে গেল। টেনিদা একটা চাঁটি হাঁকিয়েছিল, সেটা হাওয়ায় ঘুরে এল।

যাই হোক, আমরা চার মূর্তি তো বাগানে বেরিয়ে পড়লুম। চমৎকার সকাল, মিঠে রোদ্দুর, প্রাণ-জুড়োনো হাওয়া। দোয়েল শিস দিচ্ছে, বুলবুলি নেচে বেড়াচ্ছে। মাথার ওপর শিরিস পাতার ঝিরিঝিরি। ঝুড়ি কাঁধে কুলি মেয়েরা টুকটুক করে পাতি তুলছে—বেশ লাগছে দেখতে।

পাতি তোলা দেখতে দেখতে কখন আমি দলছাড়া হয়ে অন্য দিকে চলে গেছি টেরই পাইনি। যখন খেয়াল হল, দেখি বাগানের বাইরে চলে এসেছি। সামনে মাঠ—তাতে কতগুলো এলোমেলো ঝোপ আর পাঁচ-সাতটা গাছ একসঙ্গে ঝাঁকড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। আরো তাকিয়ে দেখি—কাছাকাছি কেউ কোথাও নেই।

কী সর্বনাশ—বাঘের মুখে পড়ব নাকি?

কিন্তু এখানে বাঘ! এমন সুন্দর রোদ্দুরে! এমনি চমৎকার সকালে! ধেৎ!

আর গাছগুলো যে আমলকির! থরে-থরে আমলকি! কত বড়—কী সুন্দর দেখতে! গোছায় গোছায় যেন মণিমুক্তোর মতো ঝুলছে!

নোলায় জল এসে গেল। নিশ্চয় গাছতলায় আমলকি পড়েছে! যাই—গোটা-কয়েক কুড়িয়ে আনি। আমলকি দেখে বাঘের ভয়-টয় বেমালুম মুছে গেল মন থেকে।

গেলুম গাছতলায়। ধরেছি ঠিক। বড় বড় পাকা আমলকিতে ছেয়ে আছে মাটি।

বেছে বেছে কয়েকটা কুড়িয়ে নিলুম। তারপর পাশেই একটা সরু মতন লম্বা ডাল পড়ে আছে দেখে—বসলুম তার উপর।

কিন্তু একি! ডালটা যে কেমন রবারের মতো নরম!

আর তৎক্ষণাৎ ফোঁস্ করে একটা আওয়াজ। ডালটা নড়ে উঠল, বাঁকা হয়ে চলতে শুরু করে দিলে।

অ্যাঁ!

সাপ—অজগর!

বাপ—রে গেছি! তড়াক করে এক লাফে আমি গিয়ে একটা কাঁটা-ঝোপের উপর পড়লুম। আর তক্ষুনি দেখলুম বরফির মতো একটা অদ্ভুত মাথা—লক্‌লক্ করে উঠেছে লম্বা জিভ—আর নতুন নয়া পয়সার মতো দুটো জ্বলজ্বলে চোখ ঠায় তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকেই।

www.boiRboi.blogspot.com

—নয়—

এ কার কণ্ঠস্বর?

সেই নয়া পয়সার মতো চোখ দুটোর দিকে তাকিয়েই তো আমার হয়ে এসেছে! গল্প শুনেছি অজগর সাপ অমনিভাবে চোখের দৃষ্টি দিয়ে নাকি হিপ্‌নটাইজ করে ফেলে, তারপর ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে পাকে পাকে জড়িয়ে একেবারে কপাৎ! অতএব হিপ্‌নটাইজ করার আগেই ধড়মড়িয়ে উঠে আমি তো টেনে দৌড়। দৌড়ই আর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি তাড়া করে আসছে কি না পেছন-পেছন!

না—এল না। এঁকেবেঁকে, সুড়সুড়িয়ে, আস্তে আস্তে নেমে গেল পাশের একটা শুকনো নালার ভেতর।

আধ মাইল দৌড়ে বাগানের মধ্যে এসে যখন থামলুম, তখন আমি আর আমি নেই! এ কোথায় এলুম রে বাবা! কথা নেই বার্তা নেই—কোত্থেকে গোদা বাঁদর এসে খপ্ করে কাঁধ চেপে ধরে—রাত্তিরে জানালার কাছে এসে চিতাবাঘ দাঁত খিঁচিয়ে যায়, আমলকি গাছের তলায় ঘাপ্‌টি মেরে ময়াল সাপ বসে থাকে! আফ্রিকার মতো বিপজ্জনক জায়গায় বেড়াতে এলে এমনি দশাই হয়!

থুড়ি—আফ্রিকা নয়। এ নিতান্তই বাংলাদেশ। কিন্তু এমনভাবে রাতদিন প্যাঁচে পড়ে গেলে কারো কি আর কিছু খেয়াল থাকে—তোমরাই বলো? তখন মনে হয় আমার নাম প্যালারাম হতে পারে—গদাইচরণ হতে পারে, কেষ্টদাস হওয়াও অসম্ভব নয়। আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি সেটা গোবরডাঙা হতে পারে, জিব্রাল্টার হতে পারে—জাঞ্জিবার হলেই বা ঠেকাচ্ছে কে?

দুত্তোর, কিচ্ছুটি ভালো লাগছে না। কেমন উদাস-উদাস হয়ে যাচ্ছি। আর বাঁচব না বলে মনে হচ্ছে। এই আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, আফ্রিকা নয়, এই ম্যাডাগাস্কারের মরুভূমি—দুত্তোর, ম্যাডাগাস্কারও নয়—মানে, এই খুব বিচ্ছিরি জায়গায় আমি নির্ঘাৎ মারা যাব। বাঘেই খাক্—কি সাপেই ফলার করুক।

মারা যাব এ-কথা মনে হলেই আমার খুব করুণ সুরে গান গাইতে ইচ্ছে করে। বাগেশ্রী-টাগেশ্রী ওই রকম কোন একটা সুরে। আচ্ছা, বাগেশ্রী না বাঘেশ্রী? বেমক্কা বনের মধ্যে বাঘের ছিরি দেখলে গলা দিয়ে কুঁই-কুঁই করে যে গান বেরোয়—তাকেই বাঘেশ্রী বলে নাকি? খুব সম্ভব। আর বাঘ যখন গম্ভীর সুরে বলে—হালুম, খাম্—খাম্—তখন সেই সুরটার নাম বোধহয় খাম্বাজ। তাহলে মল্লার গান কি মল্লরা—মানে পালোয়ানরা কুস্তি করবার সময় গেয়ে থাকে?

কিন্তু মল্লার-ফল্লার চুলোয় যাক। সাপ-বাঘের ফলার হওয়ার আগে বরং মনের দুঃখে ঘরে যাওয়াই ভালো। টেনে দৌড় দেওয়ার ধুকপুকুনি একটু থামলে, আমি খুব মিহি গলায় গাইতে লাগলুম :

'এমন চাঁদের আলো মরি যদি সেও ভালো
সে মরণ স্বরগ সমান—

বেশ আবেগ দিয়ে গাইছি, চোখে জল আসব-আসব করছে, এমন সময় কানের

www.boiRboi.blogspot.com

কাছে কে যেন খ্যাঁক্-খ্যাঁক্ করে হেসে উঠল :

—আরে খেলে যা! এই ভরা রোদ্দুরে চাঁদের আলো পেলি কোথায়?

আর কে? বেয়াক্কেলে ক্যাবলাটা! খুব ভাব এসেছিল, একদম গুলিয়ে দিলে। সাধে কি টেনিদা যখন-তখন ওর চাঁদিতে চাঁটি হাঁকড়ে দেয়!

—গোলমাল করছিস কেন? আমি মারা যাব।

—যা না। কে বারণ করেছে তোকে? বেশ কায়দা করে—'যা-ই—বি-দায় বি-দায়' বলে মরে যা, আমরা তোর শোকসভা করব। কিন্তু খবরদার, ও-রকম যাচ্ছেতাই সুরে গান গাইবি না!

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, দ্যাখ্ ক্যাবলা, বেশি ঠাট্টা করিসনি। জানিস—এক্ষুনি একটা অজগর সাপ আমাকে প্রায় ধরে খাচ্ছিল?

ক্যাবলা বললে, খাচ্ছিল নাকি? তা খেলে না কেন? তোকে খেয়ে পাছে পালাজ্বর হয় এই ভয়েই ছেড়ে দিলে বুঝি?

—সত্যি বলছি, ইয়া পেল্লায় এক অজগর সাপ—

ক্যাবলা বাধা দিয়ে বললে, বটেই তো। ত্রিশ হাত লম্বা আর সাড়ে চার হাত চওড়া। জানিস আমাকেও এক্ষুনি একটা তিমি মাছ—তা প্রায় পঞ্চাশ হাত হবে—একটা ইঁদুরের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে কপাৎ করে চেপে ধরে আর-কি! কোন মতে পালিয়ে বেঁচেছি।

বলে মুখ-ভর্তি শাঁকালুর দোকান দেখিয়ে ক্যাবলার কী হাসি!

—বিশ্বাস হল না—না?

—কেন এলোমেলো বকছিস প্যালা? চালিয়াতি একটু বন্ধ কর্ এখন। কপাল-জোরে একটা বাঘ না-হয় দেখেই ফেলেছিস, তাই বলে অজগর-গণ্ডার-হিপোপটেমাস-উড়ুক্কু মাছ সব তুই একাই দেখবি? আমরা দুটো-একটাও দেখতে পাব না? গপ্প মারতে হয় পটলডাঙায় চাটুজ্জেদের রোয়াকে গিয়ে যা খুশি মারিস, এখানে ওসব ইয়ার্কি চলবে না। এখন চল্—ওরা সবাই তোকে গোরু-খোঁজা করছে।

বেশ, বলব না। কাউকেই কোন কথা বলব না আমি। এমনকি কুটিমামাকেও না। তারপর কালকে একটা মতলব করে সবাইকে ওই আমলকি গাছের দিকে পাঠিয়ে দেব। তখন বোঝা যাবে নালা থেকে অজগর বেরোয়, না ইঁদুরের গর্ত থেকে পঞ্চাশ হাত তিমি মাছই বেরিয়ে আসে।

সন্ধ্যেবেলায় কুটিমামা বললেন, এক-আধটা চিতাবাঘ না মারলে নয়। ভারি উৎপাত শুরু করেছে। আজও বিকেল নাগাদ একটা এসেছিল কুলি লাইনের দিকে। অবিশ্যি কিছু করতে পারেনি—কিন্তু এখন রোজ হাঙ্গামা বাধাবে মনে হচ্ছে।

টেনিদা খুব উৎসাহ করে বললে, তাই কর মামা। গোটা-কয়েক ধাঁ করে মেরে ফেলে দাও, আপদ চুকে যায়।

ক্যাবলা বললে, তারপর আমরা সবাই মিলে একটা করে বাঘের চামড়া নেব।

হাবুল বললে, আর সেই চামড়া দিয়া জুতা বানাইয়া মচ্‌মচাইয়া হাইট্যা যামু।

আমি চটেই ছিলুম। সেই অজগরকে নিয়ে ক্যাবলাটা ঠাট্টা করবার পর থেকে আমার মন-মেজাজ এমন খিঁচড়ে রয়েছে যে কী বলব! আমি বললুম, আর কলার খোসায় পা পড়ে ধপ্‌পাস্ করে আছাড় খামু।

কুটিমামা হেসে বললেন, আচ্ছা—আচ্ছা, আগে বাঘ তো মারা যাক, পরের কথা

পরে হবে। আজ কয়েকটা টোটা আনতে পাঠিয়েছি শহরে—নিয়ে আসুক, তারপর কাল বিকেলে বেরুব।

—আমরাও যাব তো সঙ্গে?—ফস্ করে জিজ্ঞেস করল ক্যাবলা।

শুনেই তো আমার পেটের মধ্যে গুরগুরিয়ে উঠেছে। আগে যেটুকু-বা সাহস ছিল, জানালার পাশে বাঘ এসে দাঁড়াবার পর থেকে সমানে ধুক্‌পুক্ করছে বুকের ভেতরটা। তারপর ওই বিচ্ছিরি সাপটা। নাঃ, শিকারে গেলে আমাকে আর দেখতে হবে না! পটলডাঙার প্যালারামের কেবল বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টা বেজে যাবে। বাঁচালেন কুট্টিমামাই।

—সে হরিণ শিকার হলে নিয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু চিতাবাঘ বড্ড শয়তান। কিচ্ছু বিশ্বাস নেই ওদের।

টেনিদাও বোধহয় মওকা খুঁজছিল। বললে, আমরা তো শিকার করবার জন্যেই এসেছিলুম। কিন্তু কুট্টিমামার অসুবিধে হলে কী আর করা যায়—মনে ব্যথা পেলেও বাংলোতেই বসে থাকব।

ক্যাবলা বললে, সমঝ গিয়া। তোমার ভয় ধরেছে, তাই না যেতে পারলে বাঁচো। ওরা থাকুক মামা—আমি সঙ্গে যাব।

হাবলা সঙ্গে সঙ্গেই পোঁ ধরলে : হুঃ—ক্যাবলা সাহস কইর‍্যা যাইতে পারবো—আর আমি পারুম না! আমারেও লইতে হইবো।

আমার যে কী বিচ্ছিরি স্বভাব—ওদের উৎসাহ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে আমারও দারুণ তেজ এসে যায়। তখন মনে হয় পালাজ্বর-ফালাজ্বর পিলে-টিলে কিচ্ছু না—আমি সাক্ষাৎ ভীম-ভবানী, এক্ষুনি গরিলার সঙ্গে দমাদম বক্‌সিং লড়তে পারি। মনে হয়, মনের দুঃখে মরে যাওয়ার কোন মানে হয় না—মরি তো একটা কিছু করেই মরব।

একটু আগেই ভয় ধরে গিয়েছিল, হঠাৎ বুক চিতিয়ে বলে ফেললুম, আমিও যাব—নিশ্চয় যাব!

টেনিদা কেমন করুণ চোখে আমাদের দিকে তাকালো। তারপর ঘাড়-টাড় চুলকে নিয়ে বললে, সবাই যদি যায়—তবে আমিই আর বাদ থাকি কেন?

ক্যাবলা বললে, কিন্তু তুমহারা ডর লাগ্ গিয়া।

—ডর? হেঁঃ! আমি পটলডাঙার টেনি শর্মা—আমি ভয় করি দুনিয়ায় এমন কোন—

কথাটা শেষ হতেও পেল না। হঠাৎ বাইরে চ্যাঁ-চ্যাঁ করে এক বিট্‌কেল আওয়াজ। টেনিদা তড়াং করে লাফিয়ে উঠল : ও কী—ও কী মামা?

কুট্টিমামা কি যেন বলতে গিয়েই হঠাৎ থমকে গেলেন। আমরা দেখলুম তাঁর মুখের চেহারা কেমন পালটে গেছে—দু'চোখে অমানুষিক ভয়ের ছাপ।

কুট্টিমামা কেবল ফিসফিস করে বললেন, সর্বনাশ—কী সর্বনাশ! তারপর এক হাতে গলাটা চেপে ধরলেন।

বাইরে আবার চ্যাঁ-চ্যাঁ করে সেই বীভৎস ধ্বনি। আর কুট্টিমামার আতঙ্কে স্তব্ধ মুখের দিকে তাকিয়ে আমরাও একটা রহস্যময় ভয়ের অতলে ডুবে যেতে লাগলুম।

বাইরে ও কী ডাকল? কোন্ অদ্ভুত আতঙ্ক—কোন্ ভয়াল ভয়ঙ্কর?

www.boiRboi.blogspot.com

—দশ—

টেনিদার বিদায়

খানিক পরে হাবুল সেনই সামলে নিলে। মামার কপালে-চোখ-তোলা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী হইল মামা? অমন কইর‍্যা চক্ষু আকাশে তুইল্যা রইস্যা আছেন ক্যান? কী ডাকল বাইরে? ভূত না রাইক্কস?

কুট্টিমামার মুখখানা এবার ভীষণ ব্যাজার হয়ে গেল।

—দূর, কী আর ডাকবে? ও তো প্যাঁচা।

—প্যাঁচা!—ক্যাবলা আশ্চর্য হয়ে বললে, তাতে আপনি ভয় পেলেন কেন?

—ভয় পেলুম কখন?

আমি বললুম, বা-রে, এই তো আপনি বললেন, কী সর্বনাশ—কী সর্বনাশ! তারপরেই ভীষণ ঘাবড়ে গেলেন।

—আরে, ঘাবড়ে গেছি সাধে?—কুট্টিমামার ব্যাজার মুখটা আরো ব্যাজার হয়ে গেল : একটা বাঁধানো দাঁত ছিল, সেটা গেল খুলে আর মনের ভুলে ক্লিপ-টিপ্‌সুদ্ধ সেটাকে টক্ করে গিলে ফেললুম! যাই—এক্ষুনি একটা জোলাপ খেয়ে ফেলি-গে।

কুট্টিমামা উঠে চলে গেলেন।

হাবুল বললে, দাঁতটা প্যাটে থাকলেই বা ক্ষতি কী। মামার তো সুবিধাই হইল। যা খাইবো তারে ডবল চাবান দিতে পারবো : একবার চাবাইবো মুখে, আর একবার কইস্যা প্যাটের মধ্যে চাবান দিতে পারবো।

টেনিদা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, চুপ কর্, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না! কাল আমি তোকে একটা দেশলাই, খানিক সর্ষের তেল আর আধসের বেগুন গিলিয়ে দেব। পেটের মধ্যে বেগুন ভাজা করে খাস!

ছোট্টুলাল এসে বললে, খানা তৈয়ার।

সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়লুম আমরা। টেনিদা বললে, কেয়া বানায়া আজ?

ছোট্টুলাল বললে, ডিমের কারি, মাছের ফ্রাই—

টেনিদা বললে, ট্রা-লা-লা-লা-লা! কাল তো শিকারে যাচ্ছি। আমরা বাঘের পেটে যাব, না হিপোপটেমাসেই গিলে খাবে কে জানে! চল্—আজ প্রাণ ভরে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিই!

ক্যাবলা বলতে যাচ্ছিল, ডুয়ার্সের জঙ্গলে কি হিপো—

কিন্তু বলবার সুযোগ পেলে না। তার আগে টেনিদা চেঁচিয়ে উঠল : ডি-লা গ্র্যান্ড মেফিস্টোফিলিস—

আমরা কোরাস তুলে বললুম, ইয়াক—ইয়াক!

আর ছোট্টুলাল চোখ দুটোকে আলুর দমের মতো করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সকালে উঠেই সাজ-সাজ রব।

দেখি, বেশ বড় একটা মোটর ভ্যান এসে গেছে। ওদিকে কুট্টিমামা বুট আর হাফপ্যান্ট পরে একেবারে তৈরি। গলায় টোটার মালা—হাতে বন্দুক। কুলিদের সর্দারও এসে হাজির—তারও হাতে একটা বন্দুক। সর্দারের নাম রোশনলাল।

মামা বললেন, রোশনলাল খুব পাকা শিকারী। ওর হাতের তাক ফস্কায় না।

আমরাও চটপট কাপড়-জামা পরে নিলুম। কিন্তু টেনিদার আর দেখা নেই।

কুট্টিমামা বললেন, টেনি কোথায়?

টেনিদা—ভদ্রভাষায় যাকে বলে বাথরুম—তার মধ্যে ঢুকে বসে আছে। আর বেরুতেই চায় না। শেষে দরজায় দমাদম ঘুষি চালাতে লাগল ক্যাবলা।

—শিকারে যাওয়ার আগেই কি অজ্ঞান হয়ে গেলে নাকি টেনিদা? যদি সত্যিই অজ্ঞান হয়ে থাকো, দরজা খুলে দাও। আমরা তোমার নাকে স্মেলিং সল্ট্ লাগিয়ে দিচ্ছি।

এর পরে কোন ভদ্রলোকই অজ্ঞান হয়ে থাকতে পারে না। রেগে-মেগে দরজা খুলে বেরিয়ে এল টেনিদা।

—টেক্ কেয়ার ক্যাবলা—কে বলে আমি অজ্ঞান হয়েছি? কেবল পেটটা একটু চিন্-চিন্ করছিল—

কুট্টিমামার হাঁক শোনা গেল : কী হল টেনি—রেডি?

হাবুল বললে, টেনিদার প্যাট্ চিন্-চিন্ করে।

আমি বললুম, মাথা ঝিন্-ঝিন্ করে—

ক্যাবলা বললে, বাঘ দেখার আগেই প্রাণ টিন্-টিন্ করে।

টেনিদা ঘুষি বাগিয়ে ক্যাবলাকে তাড়া করলে—ক্যাবলা পালিয়ে বাঁচল।

হাঁড়ির মতো মুখ করে টেনিদা বললে, ভাবছিস আমি ভীতু? আচ্ছা—চল্ শিকারে। পটলডাঙার এই টেনি শর্মা কাউকে কেয়ার করে না! বাঘ-ফাগ যা সামনে আসবে—স্রেফ হাঁড়িকাবাব করে খেয়ে নেব দেখে নিস!

টেনিদার মজাই এই। ঠিক হাওড়া স্টেশনের গাড়িগুলোর মতো। লিলুয়া পর্যন্ত যেন চলতেই চায় না—খালি ক্যাঁচ—খালি কোঁচ। তারপর একবার দৌড় মারল তো পাঁই-পাঁই শব্দে সোজা বর্ধমান—তখন আর কে তার পাত্তা পায়! এই গুণের জন্যেই তো টেনিদা আমাদের লীডার।

যাই হোক, আমরা বেরিয়ে পড়লুম। কুট্টিমামা আর রোশনলাল বসলেন ড্রাইভারের পাশে, আমরা বসলুম ভ্যানের ভিতর। একটু পরেই গাড়ি এসে জঙ্গলে ঢুকল।

দুদিকে বড় বড় শাল গাছ—তাদের তলায় নানা আগাছার জঙ্গল। এখানে ওখানে নানা রকমের ফুল ফুটেছে, মাথা তুলে আছে ডোরাকাটা বুনো ওলের ডগা। ছোট ছোট কাকের মতো কালো কালো একরকম পাখি রাস্তার উপর দিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে—ছোট ছোট নালা দিয়ে তিরতির করে বইছে পরিষ্কার নীলচে জল।

সামনে দিয়ে কয়েকবার কান খাড়া করে দৌড়ে পালালো খরগোস। মাথা নিচু করে তীরের গতিতে ছুটে গেল একটা হরিণ, সোনালি লোমের ওপর কী সুন্দর কালো কালো ছিট!

কুট্টিমামা বললেন, ইস্-ইস্! আর একটু হলেই মারতে পারা যেত হরিণটাকে!

কথাটা আমার ভালো লাগল না। এমন সুন্দর হরিণগুলোকে মানুষ কেন মারে! দুনিয়ায় তো খাবার জিনিসের অভাব নেই। দুম্‌দাম্ করে হরিণ না মারলে কী এমন ক্ষতিটা হয় লোকের?

পাশের শিমুল গাছের ডালে বড় একটা পাখি ডেকে উঠল।

ক্যাবলা হাততালি দিয়ে বললে, ময়ূর—ময়ূর!

ময়ূরই বটে। ঠিক চিনেছি আমরা। অনেক ময়ূর দেখেছি চিড়িয়াখানায়।

বাঘের কথা ভুলে গিয়ে আমার ভারি ভালো লাগছিল জঙ্গলটাকে। কী সুন্দর—কী ঠান্ডা ছায়ায় ভরা! কত ফুল—কত পাখির মিষ্টি ডাক—কত খরগোস—কত হরিণ! ইচ্ছে করছিল পাহাড়ি নালার ওই নীলচে ঝর্নার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্নান করি।

হঠাৎ চমক ভাঙল রোশনলালের গলার আওয়াজে।

—বাবু—বাবু!

কুট্টিমামা বললেন, হুঁ—দেখেছি।...বাহাদুর, গাড়ি রোখো!

গাড়িটা আস্তে আস্তে থেমে গেল। মামা আর রোশনলাল নামলেন গাড়ি থেকে।

মামা আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা চুপচাপ বসে থাক গাড়িতে। কাঁচ তুলে দাও। নেহাত দরকার না পড়লে নামবে না। আমরা আসছি একটু পরে।... বাহাদুর—তুম্ ভি আও—

মাটির দিকে তাকিয়ে কি যেন দেখতে দেখতে তিনজনে টুপ করে মিলিয়ে গেল বনের ভিতর।

আমরা চারমূর্তি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইলুম ভ্যানের ভিতর। কিন্তু কতক্ষণ আর এভাবে বোকার মতো বসে থাকতে ভালো লাগে? কাঁচ তুলে দেওয়াতে কেমন গরমও বোধ হচ্ছিল। অথচ বাইরে ঠান্ডা ছায়া—হাওয়া বইছে ঝির্‌ঝিরিয়ে, টুপ্-টুপিয়ে পড়ছে শালের পাতা। আমরা যেন জেলখানার মধ্যে আটকে আছি—এমনি মনে হচ্ছিল।

ক্যাবলা বললে, টেনিদা, একটু নেমে পায়চারি করলে কেমন হয়?

টেনিদা বললে, কুট্টিমামা বারণ করে গেল যে! কাছাকাছি যদি বাঘ-টাঘ থাকে—

হাবুল বললে, হুঃ। এমন দিনের ব্যালা—চাইরদিক এমন মনোরম—এইখানে বাঘ থাকবো ক্যান? আর বাঘ যদি এইখানেই থাকবো—তাইলে অরা বাঘের খোঁজে দূরে যাইবো ক্যান?

পাকা যুক্তি। শুনে টেনিদা একবার কান, আর একবার নাকটা চুলকে নিলে। বললে, তা বটে—তা বটে! তবে, মামা বারণ করে গেল কিনা—

ক্যাবলা বললে, মামারা বারণ করেই। সংস্কৃতে পড়োনি টেনিদা? 'মা'—'মা'—অর্থাৎ কিনা, না—না। ওটা মামা নামের গুণ—সবটাতেই 'মা—মা' বলবে।

টেনিদা বিরক্ত হয়ে বললে, ধ্যাত্তোর সংস্কৃত! ইস্কুলে পন্ডিতের চাঁটিতে চোখে অন্ধকার দেখতুম—কলেজে এসে সংস্কৃতের হাত থেকে বেঁচেছি! তুই আর পন্ডিত ফলাসনি ক্যাবলা—গা জ্বালা করে!

ক্যাবলা বললে, তা জ্বালা করুক। তো ম্যায় উতার যাঁউ?

—সে আবার কী? হাউ-মাউ করছিস কেন?

—হাউ-মাউ নয়—রাষ্ট্রভাষা। মানে, নামব?

—সোজা বাংলায় বললেই হয়!—টেনিদা ভেংচি কেটে বললে, অমন ভূতুড়ে আওয়াজ ছাড়ছিস কেন? আয়—নামা যাক। কিন্তু বেশি দূর যাওয়া চলবে না—কাছাকাছিই থাকতে হবে।

আমরা নেমে পড়লুম ভ্যান থেকে।

বেশি দূর আর যাব না ভেবেও হাঁটতে হাঁটতে বেশ খানিকটা এগিয়েছি। চার-

www.boiRboi.blogspot.com

দিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য-টিশ্য দেখে আমি বেশ কায়দা করে বলতে যাচ্ছি : 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—' ঠিক এমন সময়—

জঙ্গলের মধ্যে কেমন মড়্-মড়্ শব্দ! পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি—

হাতি! গুটি-গুটি পায়ে এগিয়ে আসছে আমাদের দিকেই!

আমি চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—বুনো হাতি!

বাপ্‌রে—মা-রে! কিন্তু ভ্যানের দিকে যাবার উপায় নেই—হাতি পথ জুড়ে এগিয়ে আসছে!

—ক্যাবলা, হাবুল, প্যালা—গাছে, গাছে—উঠে পড়্—কুইক্—টেনিদার আদেশ শোনা গেল।

কিন্তু তার আগেই আমরা সামনের একটা মোটা গাছে তর-তর করে উঠতে আরম্ভ করেছি। যেভাবে তিন লাফে আমরা গাছে চড়ে গেলুম, তা দেখে কে বলবে আমাদের পেছনে একটা করে লম্বা ল্যাজ নেই!

হাতিটা তখন ঠিক গাছটার তলায় এসে পড়েছে। আর সেই মুহূর্তেই অঘটন ঘটল একটা। মড়মড় করে ডাল ভাঙবার আওয়াজ এল, একটা চিৎকার শোনা গেল টেনিদার, তারপর—

তারপর রোমাঞ্চিত হয়ে আমরা দেখলুম, টেনিদা পড়েছে হাতির পিঠের ওপর। উপুড় হয়ে দু'হাতে চেপে ধরেছে হাতির গলার চামড়া। আর পিঠের উপর খামোকা এই উৎপাতটা ভাদ্রমাসের পাকা তালের মতো নেমে আসাতে হাতিটা ছুট লাগিয়েছে প্রাণপণে।

আমরা আকুল হয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম : টেনিদা—টেনিদা—

হাতি জঙ্গলের মধ্যে মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমরা শুনলুম টেনিদা ডেকে বলছে : তোদের পটলডাঙার টেনিদাকে তোরা এবার জন্মের মতো হারালি! বিদায়—বিদায়—

—এগারো—

অভিযানের আরম্ভ

গাছের উপর বসে আমরা তিন মূর্তি একসঙ্গে কেঁদে ফেললুম।

টেনিদা—আমাদের লীডার—পটলডাঙার চার মূর্তির সেরা মূর্তি—এমনি করে

বুনো হাতির পিঠে চেপে বিদায় নিলে! এ আমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছি না—কেউ না!

টেনিদা আমাদের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক মিষ্টি আর বিস্তর ডালমুট খেয়েছে। চাঁটি গাট্টা লাগিয়েছে যখন-তখন। কিন্তু টেনিদাকে নইলে আমাদের যে একটি দিনও চলে না। যেমন চওড়া বুক—তেমনি চওড়া মন! হাবুল সেবার যখন টাইফয়েড হয়ে মরো-মরো তখন সারারাত জেগে, নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে টেনিদাই তাকে নার্স করেছে—বাঁচিয়ে তুলেছে বলা চলে। পাড়ার কারো বিপদ-আপদ হলে টেনিদাই গিয়ে দাঁড়িয়েছে সকলের আগে। লোকের উপকারে এক মুহূর্তের জন্য তার ক্লান্তি নেই—মুখে হাসি তার লেগেই আছে। ফুটবলের মাঠে সেরা খেলোয়াড়, ক্রিকেটের ক্যাপ্টেন। আর গল্পের রাজা। এমন করে গল্প বলতে কেউ জানে না!

সেই টেনিদা আমাদের ছেড়ে চলে যাবে? এ হতেই পারে না! এ অসম্ভব!

ক্যাবলাই চোখের জল মুছে ফেলল সকলের আগে। ডাকলে, হাবল!

—কী কও?—ধরা গলায় হাবুল জবাব দিলে।

—কেঁদে লাভ নেই। টেনিদাকে খুঁজে বের করতে হবে।

—কোথায় পাবে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—যেখানেই হোক।

ফোঁস-ফোঁস করতে করতে হাবুল বললে, বুনা হাতি—কোথায় যে লইয়া গেছে—

ক্যাবলা ততক্ষণে নেমে পড়েছে গাছ থেকে। বললে, পৃথিবীর বাইরে তো কোথাও নিয়ে যায়নি! দরকার হলে দুনিয়ার শেষ পর্যন্ত খুঁজে দেখব। নেমে আয় তোরা।

আমরা নামলুম।

ক্যাবলা বললে, শোন বন্ধুগণ! আমরা পটলডাঙার ছেলে, ভয় কাকে বলে কোন-দিন জানিনি। তোমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে ভুলে যাওনি সেই ঝন্টিপাহাড়ির অভিযান-কাহিনী—নিশ্চয় ভুলে যাওনি, স্বামী ঘুটঘুটানন্দের চক্রান্ত আমরা কেমন করে ফাঁস করে দিয়েছিলুম! মানুষের শয়তানিকে ঠাণ্ডা করতে পেরেছি, আর বুনো জানোয়ারকে ভয়? জানোয়ার মানুষের চাইতে নিচুদরের জীব—তাকে হারিয়ে, হটিয়েই মানুষ এগিয়ে চলেছে। আমরাও টেনিদাকে ফিরিয়ে আনবই।

—যদি হাতি তাকে মেরে ফেলে থাকে?

—আমি তা বিশ্বাস করি না। সে আমাদের লীডার—বিপদে পড়লে যেমন বেপরোয়া তেমনি সাহসী হয়ে ওঠে—সে তো তোমরা জানোই। সে ঠিকই বেঁচে আছে। তবু আমাদের কর্তব্য আমরা করব। আর—আর যদি দেখি সত্যিই হাতি তাকে মেরে ফেলেছে, তাহলে আমরাও মরব। টেনিদাকে ফেলে আমরা কিছুতেই কলকাতায় ফিরে যাব না। কী বল তোমরা?

আমরা দু'জনে বুক চিতিয়ে উঠে দাঁড়ালুম।

—ঠিক। আমিও তাই কই!—হাবুল বললে।

—চারজন এসেছিলুম—তিনজন কিছুতেই ফিরে যাব না। মরলে চারজনেই মরব।—আমি বললুম।

ক্যাবলা বললে, তাহলে এখনি আমরা বেরিয়ে পড়ি।

—কিন্তু কুট্টিমামা আর রোশনলালকে খবর দিতে পারলে—

—কোথায় খবর দিবি, আর পাবিই বা কোথায়? তাছাড়া এক সেকেণ্ডও আমরা সময় নষ্ট করতে পারব না। চল্, এগোনো যাক—

—কোন্‌দিকে যাবি?—হাবুল জানতে চাইল।

www.boiRboi.blogspot.com

—হাতির পায়ের দাগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। তাই ধরেই এগোব।

আমি বললুম, একটা বন্দুক-টন্দুক যদি থাকত—

ক্যাবলা রাগ করে বললে, তুই আর এখন জ্বালাসনি প্যালা! বন্দুক থাকলেই বা কী হত—শুনি? কোনো জন্মে আমরা কেউ ছুঁড়েছি নাকি ও-সব বন্দুক আমাদের দরকার নেই, মনের জোরই হল সবচেয়ে বড় অস্ত্র। আয়—

—চল—

আমরা এগিয়ে চললুম। বুক এক-আধটু দুর-দুর না করছিল তা নয়, মনে হচ্ছিল পটলডাঙায় ফিরে গিয়ে বাবা-মা ভাইবোনদের মুখও হয়ত কোনদিন আর দেখতে পাব না। হয়ত এ জঙ্গলেই বাঘ ভালুক হাতির পাল্লায় আমার প্রাণ যাবে। যদি যায়—যাক। দুনিয়ায় ভীরু আর স্বার্থপরদের কোন জায়গা নেই! ও-ভাবে বাপ-মা'র কোলে আহ্লাদে পুতুল হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে বীরের মতো মরা ভাল। আর, একবার ছাড়া তো দু'বার মরব না!

ক্যাবলা ঠিকই বুঝেছিল। ডালপালা ভেঙে, গাছপালা মাড়িয়ে হাতিটা যেভাবে এগিয়ে গেছে আমরা তা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলুম। কোথাও কোথাও নরম মাটিতে তার পায়ের ছাপ স্পষ্ট ফুটে উঠেছে। প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আমরা বনের পথ বেয়ে চলতে লাগলুম। কিন্তু তখনো হাতির দেখা নেই, টেনিদারও চিহ্নমাত্রও না।

শেষে এক জায়গায় এসে আমাদের থমকে দাঁড়াতে হল।

চারধারে জঙ্গল কেমন তচনচ। চার পাশেই হাতির পায়ের দাগ। মনে হয়, পাঁচ-সাতটা হাতি জড়ো হয়েছিল এখানে, তারপর নানা দিকে যেন তারা ঘুরে বেড়িয়েছে। এর মধ্যে কোন্ হাতিটার পিঠে টেনিদা গদিয়ান হয়ে বসে আছে—সে কথা কে বলবে!

ক্যাবলা বললে, তাই তো! কোন্ দিকে যাই?

হাবুল ভেবেচিন্তে বললে, এইভাবে ঘুর‍্যা খুব সুবিধা হইবো না। চল্ ক্যাবলা, আবার ভ্যানের কাছে ফির‍্যা যাই। মামারে সঙ্গে কইর‍্যা—

ক্যাবলা বললে, না।

—কী করবি তাহলে?—আমি জিজ্ঞেস করলুম।

—তিনজনে তিনদিকে যাব।

—একা-একা?

—হ্যাঁ—একলা চল রে।

আমার পালাজ্বরের পিলেটা অবশ্য এতদিনে অনেক ছোট হয়ে গেছে, কিন্তু যেটুকু আছে তা-ও চড়াৎ করে লাফিয়ে উঠল।

—একা যাব?

ক্যাবলা দুটো জ্বলজ্বলে চোখ মেলে আমার দিকে চাইল।

—তুই ভ্যানে ফিরে যা প্যালা। আমি আর হাবুল চললুম খুঁজতে।

আমার রক্ত গরম হয়ে উঠল। আমি ভীরু! একা আমারই প্রাণের ভয়! কখনো না!

বললুম, তোর ইচ্ছে হয় তুই ফিরে যা। আমি টেনিদাকে খুঁজব।

ক্যাবলা আমার পিঠ চামড়ে দিলে। খুশি হয়ে বললে, ব্যস, ঠিক হ্যায়। হি হ্যায় মরদ্‌কা বাত! এবার তিনজন তিনমুখো। বন্ধুগণ, হয়ত আমাদের এই শেষ দেখা। হয়ত আমরা আর কেউ বেঁচে ফিরব না। তাই যাওয়ার আগে একবার বল—

—পটলডাঙা—

—জিন্দাবাদ!

—চার মূর্তি—

—জিন্দাবাদ!

তারপরেই দেখি, ওরা দু'জনে দু'দিকে বনের মধ্যে সুট্ করে কোথায় চলে গেল। আমি এখন একা। এই বাঘ-সাপ-হাতির জঙ্গলে একেবারে একা। নিজেকে বললুম, বুকে সাহস আন পটলডাঙার প্যালারাম! তুমি যে কেবল শিঙিমাছ দিয়েই পটোলের ঝোল খেতে এক্স্‌পার্ট তা নও, তার চাইতে আরো অনেক বেশি। আজ তোমার চরম পরীক্ষা। তৈরি হও সেজন্যে।

একটা শুকনো ডাল পড়ে ছিল সামনে। সেইটে কুড়িয়ে নিয়ে আমিও চলতে শুরু করলুম। মরবার আগে অন্তত কষে এক ঘা তো বসাতে পারব! সে হাতিই হোক আর বাঘই হোক।

কিন্তু বেশিদূর যেতে হল না আমাকে।

একটা ঝোপের ওপর যেই পা দিয়েছি, অমনি—

সড়াক্—ঝরঝরাৎ—

পায়ের তলার থেকে মাটি সরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারলুম, মহাশূন্য বেয়ে আমি কোথায় কোন্ পাতালের দিকে পড়ে যাচ্ছি।

—মা—

তারপরেই আমার চোখ বুজে এল।

www.boiRboi.blogspot.com

—বারো—

সজারু সঙ্গীত

গর্তে পড়ে মনে হয়েছিল—পটলডাঙার প্যালারাম এবার একদম ফিনিশ্—হাড়-গোড় কিছু বুঝি আর রইল না। 'মরে গেছি—মরে গেছি'—ভাবতে ভাবতে দেখি, আমি মোটেই মারা যাইনি। দিব্যি বহাল তবিয়তে একরাশ নরম কাদার ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছি—পিঠটা ঠেস দেওয়া রয়েছে মাটির দেওয়ালে।

কোমরটা কেবল একটু ঝন্‌ঝন্ করছে—মাথাতেও ঝাঁকুনি লেগেছে। সেটুকু সামলে নিয়ে চোখ মেলে তাকালুম। মাথার হাত-দশেক ওপরে একটা গোল আকাশ—আরো ওপরে একটা গাছের ডাল দুলছে। আশেপাশে চেয়ে দেখলুম অন্ধকার, গর্তটা কত বড় কিংবা আমি ছাড়া এর ভেতরে আর কী আছে, কিছু বুঝতে

পারলুম না।

এমন সময় খুব কাছেই যেন একটা ঝমঝম করে শব্দ শুনতে পেলুম। ঠিক মনে হল কেউ যেন হাতে করে টাকার তোড়া বাজাচ্ছে।

আমার খাড়া খাড়া কান দুটো আরো খাড়া হয়ে উঠল। ব্যাপারখানা কী?

গর্তে যখন পড়েছি তখন তো মারাই গেছি। কিন্তু মরবার আগে সব ভাল করে জেনেশুনে নেওয়া দরকার, কারণ বইতেই পড়েছি : 'মৃত্যুকাল পর্যন্ত জ্ঞান সঞ্চয় করিবে।' ওটা কিসের আওয়াজ?

মাথায় ঝাঁকুনি লাগবার জন্যেই বোধহয় চোখ এখনো ঝাপসা হয়ে রয়েছে। খুব লক্ষ্য করেও একদিকে ছোট একটা ছায়ার মতো ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেলুম না। কিন্তু আবার শুনলুম কে যেন ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছে, আর শব্দ উঠছে : ঝম্-ঝম্-ঝম্—

অ্যাঁ—যখের গর্ত নাকি?

ভাবতেই আমার কানের ভেতরে গুবরে পোকারা কুর্ কুর্ করতে লাগল, নাকের ওপর যেন উচ্চিংড়ে লাফাতে লাগল, পেটের মধ্যে ছোট-হয়ে-যাওয়া সেই পালাজ্বরের পিলেটা কচ্ছপের মতো শুঁড় বের করতে লাগল। শেষকালে কি পাতালে যখের রাজ্যে এসে পৌঁছে গেলুম? সেই কি অমন করে মোহরের থলি বাজিয়ে আওয়াজ করছে? একটু পরেই থলিটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলবে : বৎস প্যালারাম, অনেক কষ্ট করে তুমি এখানে এসে পৌঁছেছ দেখে ভারি খুশি হয়েছি, এবার এই মোহর নিয়ে তুমি দেশে চলে যাও—বিরাট অট্টালিকা বানাও—ঘোড়াশালে ঘোড়া, হাতিশালে হাতি—

হাতির কথা ভাবতেই মনে হল, আমাদের লীডার টেনিদা বুনো হাতির পিঠে চড়ে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আমরা তাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলুম। কিন্তু কোথায় টেনিদা—আমিই বা কোথায়? এই বিচ্ছিরি আফ্রিকার জঙ্গলে—না-না, ম্যাডাগাস্কারের অরণ্যে—দুত্তোর ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই বনের ভেতর, আমাদের চার মূর্তিরই বারোটা বেজে গেল!

সব ভুলে গিয়ে আমার এখন একটু একটু কান্না পেতে লাগল। মাকে মনে পড়ছে, বাবা, ছোড়দি, বড়দা, ছোট বোন দুটোকে মনে পড়ছে, এমনকি, যে মেজদা একবার পেট কামড়েছে বললেই দেড় হাত লম্বা একটা সিরিঞ্জ নিয়ে আমার পেটে ইন্‌জেক্‌শন দিতে আসে, তাকেও মনে পড়ে যাচ্ছে। খুব ছোট্টবেলায় বড়দা এক-বার আমায় বলেছিল ঘড়ি দেখে আসতে। ঘড়ি দেখে এসে আমি খুব গম্ভীর চালে বলেছিলুম, সাড়ে দেড়টা বেজেছে, আর শুনেই বড়দা আমার একটা লম্বা কানে তিড়িং করে চিড়িং মেরে দিয়েছিল। হায়—বড়দা আর কোন দিন অমন করে আমার কানে মোচড় দেবে না!

বারোটা নয়, এবার সত্যিই আমার সাড়ে দেড়টা বেজে গেল!

আবার সেই ঝম্‌ঝম্ শব্দ! চমকে উঠলুম।

চোখটা মুছে চাইতে এবার আমার জ্ঞান লাভ হয়। ধ্যেৎ—যখ-টখ কিচ্ছু না—সব বোগাস। এতক্ষণে গর্তের ভেতরকার অন্ধকারটা চোখে খানিকটা ফিকে হয়ে এসেছে। দেখলুম বেড়ালের চাইতে একটু বড় কি একটা জন্তু হাত-চারেক দূরে দাঁড়িয়ে সমানে ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ করছে। তার ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ দুটো অন্ধ-কারে চিকচিক করছে—আর তার সারা শরীরে মোটা মোটা ঝাঁটার কাঠির মতো কী সব খাড়া হয়ে রয়েছে।

আমি বলে ফেললুম, তুই আবার কে রে? ঝাঁটা-বাঁধা বেড়ালের মতো দেখতে?

শুনেই জন্তুটা গা-ঝাড়া দিলে। আর তক্ষুনি আওয়াজ হল : ঝম্-ঝম্—ঝুমুর্-ঝুমুর্!

আরে, তাই বল! এইবারে বুঝেছি। মিস্টার সজারু। ছেলেবেলায় মল্লিকা মাসিমার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলুম শক্তিগড়ে। ওঁদের বাড়ির পাশে আমবাগানে রাত্তির বেলা সজারু ঘুরে বেড়াত আর ভয় পেলেই কাঁটা বাজিয়ে আওয়াজ করত ঝুম্-ঝুম্! মল্লিকা মাসিমা বলতেন, সজারুর মাংস খেতে খুব ভাল। যখন কাঁটা উঁচিয়ে দাঁড়ায়, তখন দুম করে ওর পিঠের উপর একটা কলাগাছ ফেলে দিতে হয়। ব্যস্—জব্দ। কাঁটা কলাগাছে আটকে যায়—আর পালাতে পারে না।

বুঝতে পারলুম, আমি পড়বার আগে সজারু মশাইও কি করে গর্তে পড়েছেন। তাই আমি আসাতে খুব রাগ হয়েছে—ভাবছেন, আমিই বুঝি প্যাঁচ কষিয়ে ওঁকে ফেলে দিয়েছি। তাই খুব কাঁটা ফুলিয়ে আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে।

আমার খুব মজা লাগল। থাকত কলাগাছ—সম্ফঝম্ফ তোমার বেরিয়ে যেত! এখন দাপাদাপি কর—যত ইচ্ছে!

আরে, মারা যখন গেছিই, তখন আর ভাবনা কী! সজারুটার ফোঁসফোঁসানি দেখে আমার দস্তুরমতো গান পেয়ে গেল। তোমরা তো জানোই—দেখতে আমি রোগা-পট্‌কা হলে কী হয়—গান ধরলে আমার গলা থেকে এমনি হালুম্ব রাগিণী বেরুতে থাকে যে ক্যাবলাদের রামছাগলটা পর্যন্ত দারুণ ঘাবড়ে গিয়ে ম্যা-হা-হা বলে চিৎকার ছাড়ে। সজারুটা যাতে তেড়ে এসে আমাকে কয়েকটা খোঁচা-টোচা না লাগিয়ে দেয়, সেজন্যে ওকে ভেবড়ে দেবার জন্যে আমি হাউ-মাউ করে 'হ-য-ব-র-ল' থেকে গাইতে শুরু করলাম :

'বাদুড় বলে, ওরে ও ভাই সজারু,
আজকে রাতে হবে একটা মজারু—'

সেই বন্ধ গর্তের ভেতর আমার বেয়াড়া গলার বাজখাঁই গান যে কেমন খোলতাই হল—সে বোধহয় না বললেও চলে। এমন পিলে-কাঁপানো আওয়াজ বেরুল যে শুনে নিজেই আমি চমকে গেলুম। সজারুটা তিড়িক্ করে একটা লাফ মারল।

এই রে, তেড়ে আসে নাকি আমার দিকে! ওর গোটা-কয়েক কাঁটা গায়ে ফুটিয়ে দিলেই তো গেছি—একেবারে ভীষ্মের শরশয্যা! প্রাণের দায়ে জোর গলা-খাঁকারি দিয়ে আবার আরম্ভ করলুম :

'আসবে সেথায় প্যাঁচা এবং প্যাঁচানি—'

সজারুটা এবার কেমন একটা আওয়াজ করলে। তারপর আমার দিকে আর না এগিয়ে—সুড়সুড়িয়ে আরো পেছনে সরে গেল, কাঁটা ফুলিয়ে কোণে গোল হয়ে বসে রইল। আমার গানের গুতোয় আপাতত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে মনে হল—সহজে যে আর আক্রমণ করবে এমন বোধ হচ্ছে না।

ও থাক বসে। আমিও বসি।

কিন্তু আমিও বসব? বসে থেকে আমার কী লাভ? আমি তো এখনো মরিনি! উপর থেকে হাত-দশেক নিচে একটা গর্তের মধ্যে পড়েছি বটে, তাই বলে এখনো তো আমার পঞ্চত্ব পাওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। একটু চেষ্টা করলে হয়ত আরো কিছুদিন শেয়ালদা বাজারের শিঙিমাছ আর কচি পটোল সাবাড় করবার জন্যে আমি বেঁচে থাকতে পারি।

আর শুধু নিজের বাঁচাটাই কি বড় কথা? আমাদের বাংলার প্রফেসর একদিন

www.boiRboi.blogspot.com

পড়াতে পড়াতে বলেছিলেন, 'নিজের জন্যে বাঁচে জানোয়ারেরা, সকলের জন্য বাঁচে মানুষ!' আমি পটলডাঙার প্যালারাম—রোগা-পট্‌কা হতে পারি, ভীতু হতে পারি, কিন্তু আমি মানুষ। খালি আমার নিজের কথাই তো ভাবলে চলবে না! আমাদের লীডার টেনিদাকে যেমন করে হোক উদ্ধার করতে হবে, চার মূর্তির আর সবাই কোথাও যদি কেউ বিপদে পড়ে থাকে—তাদের বাঁচাতে হবে। আমি বাঁচব—সকলের জন্যেই বাঁচব!

গর্তের কোণায় গোল-হয়ে-বসে-থাকা সজারুটা কেমন ফ্যাঁচ্-ফ্যাঁচ্ করে উঠল। আমার মনে হল, যেন রাষ্ট্রভাষায় বললে, 'কেয়াবাৎ—কেয়াবাৎ!' অর্থাৎ কিনা—সাবাস, সাবাস!

আবার মাথা তুলে চাইলুম।

ওপরে গর্ত জুড়ে সেই গোল আকাশটুকু। একটা গাছের ডাল নেমে এসেছে, তার পাতা কাঁপছে ঝিরঝিরিয়ে। পারব না—একটু চেষ্টা করলে উঠে যেতে পারব না? তেনজিং এভারেস্টের চূড়ায় উঠতে পারলেন—আমি একটা গর্ত বেয়ে উঠে যেতে পারব না ওপরে? তেনজিংয়ের তো আমার মতো দু'খানা হাত আর দু'খানা পা-ই ছিল! তবে?

দেখিই না একবার চেষ্টা করে। সেই যে বইতে আছে না, 'যে মাটিতে পড়ে লোক, উঠে তাই ধরে'? মাটির ভেতর দিয়ে আছড়ে পড়েছি, মাটি ধরেই উঠে যাব।

যা থাকে কপালে বলে উঠতে যাচ্ছি, আর ঠিক তখন—

হঠাৎ কানে এল বন-বাদাড় ভেঙে কে যেন দুড়দাড় করে ছুটে আসছে। তার পরেই হুড়মুড়—সর্‌সর্—ঝর্‌ঝর্ করে আওয়াজ। ঠিক মনে হল, গোল আকাশটা তালগোল পাকিয়ে নিচে আছড়ে পড়ল। আমার মুখ-চোখে ধুলো-মাটি আর গাছের পাতার পুষ্পবৃষ্টি হল, আর কি একটা পেল্লায় জিনিস ধপ্-ধপ্‌াস করে নেমে এল গর্তে—প্রায় আমার গা ঘেঁষে। তার প্রকাণ্ড ল্যাজটা চাবুকের মতো আমার গায়ে ঘা মারল।

আর সেই বিরাট জন্তুটা গুরুর্—হুম্—বলে কান-ফাটানো এক চিৎকার ছাড়ল।

সে চিৎকারে আমার মাথা ঘুরে গেল। চোখের সামনে দেখলুম সারি সারি সর্ষে ফুলের শোভা। উৎকট দুর্গন্ধে যেন দম আটকে আসতে চাইল।

গর্তে যে পড়েছে—তাকে আমি দেখেছি।

সে বাঘ! বাঘ ছাড়া আর কেউ নয়।

আমার তাহলে বারোটা নয়—সাড়ে দেড়টাও নয়, পুরো সাড়ে আড়াইটে বেজে গেল। একবার আমি হাঁ করলুম, খুব সম্ভব গাঁ-গাঁ করে খানিক আওয়াজ বেরুল, তারপর—

তারপর থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে গর্তের মাটিতে একেবারে পপাত।

—তেরো—

বাঘ ভার্সাস যোগ

খুব সম্ভব মরেই গিয়েছিলুম। কিন্তু মরা মানুষকেও যে জাগিয়ে তুলতে পারে সে হল বাঘের ডাক। কানের পাশে যেন একসঙ্গে পঁচিশটা বাজ পড়ল এই-রকম মনে হল আমার, আর মুখের ওপর ফটাস করে মোটা কাছির মতো কিসের একটা ঘা লাগল। বুঝতে পারলুম, বাঘের ল্যাজ।

মাত্র একহাত দূরে আমার বাঘ পড়েছে—তারপরেও কি আমার বেঁচে থাকা সম্ভব? আমি—পটলডাঙার প্যালারাম—এ-যাত্রা নির্ঘাত তাহলে মারাই গেছি! আর যদি মরেই গিয়ে থাকি—তাহলে আর কিসের ভয় আমার? আমি তো এখন ভূত। ভূতকে কি কখনো বাঘে ধরে?

আবার বিশটা বাজের মতো আওয়াজ করে, গর্ত ফাটিয়ে বাঘ হাঁক ছাড়ল—তারপরেই একটা পেল্লায় লাফ। আমি ঝট্ করে একটু সরে গিয়েছিলুম বলে বাঘ আমার গায়ে পড়ল না, কিন্তু ল্যাজটার ঘায়ে আমার নাক প্রায় থেঁতলে গেল। আর বাঘের নখের আঁচড়ে গর্তের গা থেকে খানিক মাটি ঝুরঝুর করে চোখময় ছড়িয়ে গেল।

এ তো ভাল ল্যাঠা দেখছি! বাঘ যদি আমাকে না-ও ধরে—বাঘের দাপাদাপিতেই আমি—মানে আমার ভূতটা—মারা যাবে। কিংবা নাকে যখন ল্যাজের ঘা এসে এমন বেয়াড়াভাবে লেগেছে যে মনে হচ্ছে হয়ত আমি বেঁচেই আছি।

আবার বাঘের গর্জন। উঃ, কান দুটো তো ফেটে গেল! এস্‌পার কি ওস্‌পার!

এবার বাঘ লাফ মারবার আগেই আমি লাফ মারলুম। আর হাতে যা ঠেকল তা গোটাকয়েক গাছের শেকড়।

আমি পটলডাঙার প্যালারাম—জীবনে কোনদিন এক্সারসাইজ করিনি—পালা-জ্বরে ভুগেছি আর পটল দিয়ে শিঙিমাছের ঝোল খেয়েছি। দু-একবার খেলতে নেমেছিলুম, কিন্তু কী কাণ্ড যে করেছি—তোমাদের ভেতর যারা প্যালারামের কীর্তি-কাহিনী পড়েছ তারা তা সবই জান। সব্বাই আমাকে বলে—আমি রোগা-পটকা, আমি অপদার্থ। কিন্তু এখন দেখলুম—রোগা-টোগা ওসব কিছু না—স্রেফ বাজে কথা। মনে জোর এলে আপনি গায়ের জোর এসে যায়—দুনিয়ার কোন কাজ আর অসম্ভব বলে বোধ হয় না। আমি প্রাণপণে সেই শেকড় ধরে ঝুলতে লাগলুম। তাকিয়ে দেখি আরো শেকড় রয়েছে ওপরে। কাঁচা মাটির গর্তে পা দিয়ে দিয়ে শেকড় টেনে টেনে—

আরে—আরে—আমি যে ওপরে উঠে গেছি প্রায়! একটু—আর একটু—

নিচের গর্তে তখন যে কী দাপাদাপি চলছে ভাবাই যায় না। বাঘের চিৎকারে বিশটা নয়—পঁচিশটা নয়—একশোটা বাজ যেন ফেটে পড়ছে। বাঘ লাফিয়ে উঠছে থেকে থেকে—একবার একটা থাবা প্রায় আমার পা ছুঁয়ে গেল। শেষ শক্তি দিয়ে আমি সবচেয়ে ওপরের শিকড়টা টেনে ধরলুম, সেটা মট্‌মট্ করে উঠল, তারপর

www.boiRboi.blogspot.com

ছিঁড়ে পড়ার আগেই আমি গর্তের মুখে—আবার শক্ত মাটিতে উঠে পড়লুম।

আর তখন মনে হল, আমার বুকের ভেতরে হৃৎপিণ্ডটা যেন ফেটে যাচ্ছে। কাঁধ দুটোকে কে যেন আলাদা করে ছিঁড়ে নিচ্ছে দুদিকে। কপাল থেকে ঘাম চোখে নেমে এসে সব ঝাপসা করে দিচ্ছে, আগুন ছুটছে সারা গায়ে। ঘাসের ওপর দাঁড়াতে গিয়েও আমি দাঁড়াতে পারলুম না—সত্যিই বেঁচে আছি না মরে গেছি ভাল করে বোঝবার আগেই সব অন্ধকার হয়ে গেল।

তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা পরিষ্কার হতে লাগল। মুখের ওপর কি যেন সুড়সুড় করে হাঁটছে এমনি মনে হল। টোকা দিয়ে সেটাকে ফেলে দিয়ে দেখি, একটা বেশ মোটাসোটা গুবরে পোকা। চিত হয়ে পড়ে বোঁ-বোঁ করে হাত-পা ছুঁড়ছে।

আস্পর্ধা দ্যাখো একবার! আমার মুখখানাকে বোধহয় গোবরের তাল মনে করেছিল। এখন থাকো চিত হয়ে!

তক্ষুনি আবার যেন পাতাল থেকে কামানের ডাক এল। মাটিটা কেঁপে উঠল থরথরিয়ে।

দেখলুম, আমি মাটিতে পা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ে আছি। আমার মাথার সামনে ঠিক ছইঞ্চি দূরে কুয়োর মতো মস্ত একটা গর্তের মুখ। আমার হাতের মুঠোয় কতগুলো সরু-সরু ছেঁড়া শেকড়।

সব মনে পড়ে গেল। একটু আগেই গর্তটা থেকে আমি উঠে এসেছি। তারপর ভিরমি খেয়ে পড়ে গিয়েছিলুম।

কিন্তু গর্তের মধ্যে বাঘ কি এখনো আছে? নিশ্চয় আছে। নইলে সে উঠে এলে আমি আর মাটিতে থাকতুম না—আরো ভাল জায়গায় আমার থাকবার ব্যবস্থা হয়ে যেত—মানে বাঘের পেটের ভেতর। আর সেই সজারু? সে-ও নিশ্চয় যথা-স্থানেই রয়েছে—আর দুজনে মিলে জোর মজারু চলছে গর্তে।

মজা? বাঘের চিৎকার তো ঠিক সে-রকমটা মনে হচ্ছে না!

আমি চার পায়ে ভর দিয়ে উঠলুম—গলাটা একটু বাড়িয়ে দিলুম গর্তের দিকে। ভেতরে প্রথমটা খালি অন্ধকার মনে হল—আর বোধ হল, বিষম একটা দাপাদাপি চলছে। কিন্তু তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটু একটু করে আমি সব দেখতে পেলুম।

সজারুটা কেমন তালগোল পাকিয়ে পড়ে আছে—তার চারটে পা আর মাথাটা অল্প অল্প নড়ছে। তার পাশেই পড়ে আছে বাঘ—লাফাচ্ছে না, সমানে হাঁপাচ্ছে, আর কি একটা যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে একটানা।

এবারে ব্যাপারটা বুঝতে আর বাকি রইল না।

বাঘ পড়েছিল সোজা সজারুর ওপর। তার ধারালো কাঁটাগুলো বাঘের সর্বাঙ্গে বিঁধেছে শরশয্যার মতো। আর তারই যন্ত্রণায় বাঘ অমনভাবে লাফঝাঁপ করছে—আমি যে শেকড় ধরে ধরে গর্ত বেয়ে ওপরে উঠে এসেছি, সে তা দেখতেও পায়নি। ওই সজারুটা নিজের প্রাণ দিয়ে আমায় বাঁচিয়েছে।

সজারুটার জন্যে আমার ভারি কষ্ট হতে লাগল। আর কেন জানি না—বাঘের জন্যেও মায়ায় মনটা আমার ভরে উঠল। সর্বাঙ্গে সজারুর কাঁটা বিঁধে না-জানি কত যন্ত্রণাই পাচ্ছে বাঘটা। এর চাইতে যদি একেবারে মরে যেত, তাহলেও ঢের ভাল হত ওর পক্ষে।

একমনে দেখছি—হঠাৎ, টপাস্!

কি একটা ঢিলের মতো এসে পড়ল পিঠের ওপর।—আরে—আরে করে উঠে

বসলুম—আবার টপাস্! একেবারে চাঁদির ওপর। তাকিয়ে দেখি শুকনো সীমের মতো কি একরকম ফল।

ওপর থেকে আপনি পড়ছে নাকি?

না—না। যেই চোখ তুলে তাকিয়েছি, দেখি গাছের ডালে বসে কে যেন বিশ্রী রকমভাবে ভেংচি কাটছে আমাকে। ইয়া বড় একটা গোদা বাঁদর। এখানে আসা অবধিই দেখছি হাড়বজ্জাত বাঁদরগুলো পেছনে লেগেছে আমাদের। নাকটাকে ছারপোকার মতো করে গাছ থেকে কতগুলো শুকনো ফল ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে আমার পিঠ বরাবর তাক করছে, আর সমানে ভেংচি কেটে চলেছে।

আমি চেঁচিয়ে বললুম, এই!—তারপর বাঁদরটাকে আরো ঘাবড়ে দেবার জন্যে হিন্দী করে বললুম, ফের বদমায়েসী করেগা তো কান ধরকে এক থাপ্পড় মারেগা।

অবশ্য গাছের ওপর উঠে ওর কানটা হাতে পাওয়া মুশকিল—থাপ্পড় মারা আরো মুশকিল। কিন্তু যে করে হোক, বাঁদরটাকে নার্ভাস করে দেওয়া দরকার। আমি আবার বললুম, এক চাঁটিমে দাঁত উড়ায় দেখা। কেন ঢিল মারতা হ্যায়? হাম পটলডাঙার প্যালারাম হ্যায়—সমঝা?

বাঁদরটা দাঁত বের করে কী যেন বললে।—কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাঁচাগোল্লা কিংবা অমনি একটা কিছু হবে।

কাঁচাগোল্লা? আমার দারুণ মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। আচ্ছা—তাই সই! তোমায় কাঁচাগোল্লাই খাওয়াচ্ছি!

সামনেই কয়েকটা শুকনো মাটির ঢেলা পড়ে ছিল। তার দু-একটা তুলে নিয়ে বললুম, চলা আও—চলা আও—

সঙ্গে সঙ্গে নাকের ওপর আর-একটা ফল এসে পড়ল। বাঘের ল্যাজের ঘা খেয়ে নাকটা এমনিতেই বোঁচা হওয়ার জো—তার ওপর বাঁদরের এই বর্বর অত্যাচার! আমার শরীরে দস্তুরমতো ব্রহ্মতেজ এসে গেল।

চালাও ঢিল—লাগাও—

দমাদ্দম গাছের ওপর ঢিল চালাতে লেগে গেলুম। একেবারে মরিয়া হয়ে।

হঠাৎ বোঁ—ও°—ও° করে কেমন বেয়াড়া বিচ্ছিরি আওয়াজ।

এরোপ্লেন নাকি? আরে না-না—এরোপ্লেন কোথায়? গাছের একটা ডাল থেকে দল বেঁধে উড়ে আসছে ওরা কারা? চিনতে আমার একটুও কষ্ট হল না—ছেলে-বেলায় মধুপুরে ওদের একটার মোক্ষম কামড় আমি খেয়েছিলুম। সেই থেকে ওদের আমি হাড়ে হাড়ে চিনি।

ভীমরুল! আমার ঢিল বাঁদরের গায়ে লাগুক আর না লাগুক—ঠিক ভীমরুলের চাকে গিয়ে লক্ষ্যভেদ করেছে।

—মাঁরুচি—মাঁরুচি—খাউঙ্গি বলে বাঁদরটা এক লাফে কোথায় হাওয়া হল কে জানে! ওর মধ্যেই দেখতে পেলুম ওর নাকে মুখে ল্যাজে ভীমরুলেরা চেপে বসেছে। বোঝ—আমাকে ভ্যাংচানোর আর ঢিল মারবার মজাটা বোঝ!

কিন্তু একি! আমার দিকেও যে ছুটে আসছে ঝাঁক বেঁধে! এখন?

দৌড়—দৌড়—মার দৌড়!

তবু সঙ্গ ছাড়ে না যে! যত ছুটছি, ততই যে পেছনে পেছনে আসছে ঝাঁক বেঁধে! এল—এল—এই এসে পড়ল—! গেছি এবার! কামড়ে আমাকে আর আস্ত রাখবে না!

এখন কী করি? বাঘের হাত থেকে বেঁচে গিয়ে শেষে কি ভীমরুলের হাতে

www.boiRboi.blogspot.com

মারা যাব? আমি ঠিক এই সময়েই—

জয় গুরু! সামনে একটা পচা ডোবা!

ঝপাং করে আমি সেই ডোবাতেই সোজা ঝাঁপ মারলুম।

—চোদ্দ—

কী পচা পাঁক, আর কী বিচ্ছিরি গন্ধ! কতক্ষণ আর মাথা ডুবিয়ে থাকা যায় তার ভেতরে! একটু মাথা তুলি, আর বোঁ—ও°—ও°! সমানে চক্কর দিচ্ছে ভীমরুলেরা। এ কী ল্যাঠায় পড়া গেল!

ভাগ্যিস ডোবাটায় বেশি জল নেই, নইলে তো ডুবে মরতে হত! হাঁটু-সমান কাদা আর একটুখানি জলের ভেতর কোনমতে ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছি। চারিদিকে ব্যাঙ লাফাচ্ছে—নাকে-কানে পোকা ঢুকছে, ঠাণ্ডায় হাত-পা জমে যাচ্ছে। বাঘের গর্ত থেকে উঠে কি শেষতক পচা ডোবার মধ্যেই মারা যাব নাকি?

একবার মাথা ওঠাই—অমনি বোঁ-ও°-ও°! আবার ডুব! এমনি করে কতক্ষণ কাটল জানি না। তারপর যখন ভীমরুলেরা হতাশ হয়ে সরে পড়ল, তখন ভাল করে তাকিয়ে দেখে-টেখে আমি ডোবা থেকে উঠে এলুম।

ইঃ—কী খোল্‌তাই চেহারাখানাই হয়েছে! একটু আগে আমি ছিলুম পটল-ডাঙার প্যালারাম—ওজন ছিল সর্বসাকুল্যে এক মণ সাত সের। এখন আমি যে কে—ঠাহরই করতে পারলুম না। সারা গায়ে কাদার আস্তর পড়েছে, নিজের হাত-পা জামা-কাপড় কিছু দেখতে পাচ্ছি না—পা তো ফেলছি না, যেন হাতির মত পদক্ষেপ করছি! আমি এখন ওজনে অন্তত সাড়ে তিন মণ—মাথার ওপর আরো পোয়াটাক ব্যাঙাচি নাচানাচি করছে।

কিন্তু এমন কী করি! কোন্ দিকে যাই?

কাদা-টাদাগুলো খানিক পরিষ্কার করলুম, জামা জুতো ডোবার জলেই ধুয়ে নিলুম। কিন্তু এখন কোন্ দিকে যাই! শীতে সারা শরীর জমে যেতে চাইছে। চারিদিকে ঘন জঙ্গল—কোথায় যাব, কী করব কিছুই ঠিক করতে পারলুম না। টেনিদার কী হল—চারমূর্তির বাকি তিনজনই বা কোথায়—কুট্টিমামা তাঁর শিকারীদের নিয়েই বা কোন্ দিকে গেলেন?

সে ভাবনা পরে হবে। এখন এই শীতের হাত থেকে কেমন করে রেহাই পাই?

বনের পাতার ফাঁক দিয়ে এক জায়গায় ঝলমলে রোদ পড়েছে খানিকটা। বেলা এখন বোধহয় দুপুরের দিকে। আমি সেই রোদের মধ্যে এসে দাঁড়ালুম। বেশ ঝাঁঝালো রোদ—এতক্ষণে একটু আরাম পাচ্ছি।

কিন্তু ল্যাঠা কি আর একটা নাকি? এইবারে টের পেলুম—পেটের মধ্যে চুঁই চুঁই করে উঠেছে। মানে—জোর খিদে পেয়েছে।

সেই খিদেটা টের পেলুম অমনি মনে হল আমি যেন কতকাল খাইনি—নাড়ি-ভুঁড়িগুলো সব আবার ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে চাইছে। খিদের চোটে আর দাঁড়াতে পারছি না আমি। মনে পড়ল, আসবার সময় টিফিন-ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার আনা হয়েছিল—তাতে লুচি ছিল, আলুর দম ছিল, বেগুন ভাজা ছিল, সন্দেশ ছিল—

হায়, কোথায় ভ্যান—কোথায় লুচি আর আলুর দম! জীবনে কোন দিন কি

আর আলুর দমের মুখ দেখতে পাব আমি! কিছুক্ষণ পরে বনের ভেতরই পটল-ডাঙার প্যালারামের বারোটা বেজে যাবে। যদি বাঘ-ভালুকে না খায়, খিদেতেই মারা যাব।

নাঃ, আর পারা যায় না! কিছু একটা খাবার-দাবার জোগাড় করা দরকার।

যেই খাবার-দাবারের কথা ভাবলুম—অমনি শরীরে তেজ এসে গেল। আমি দেখেছি, আমার এই রকমই হয়। সেই একবার হাবুলের ছোট ভাই বাবুলের অন্ন-প্রাশনে নেমন্তন্ন ছিল। আগের দিন রাতে কোঁ-কোঁ করে জ্বর এসে গেল। ভাবলুম, পরদিন ওরা সবাই প্রেমসে মাংস-পোলাও সাঁটবে আর আমার বরাতে কেবল বার্লির জল! দারুণ মনের জোর নিয়ে এলুম। বললে বিশ্বাস করবে না, সকালেই জ্বর একদম রেমিশন। খেয়েছিলুমও ঠেসে। অবশ্য সেদিন রাত থেকে...কিন্তু সে কথা বলে আর কাজ নেই। মানে নেমন্তন্নটা তো আর ফসকাতে দিইনি!

আপাতত আমায় খেতেই হবে। শীত-ফীত চুলোয় যাক।

বনে তো অনেক রকম ফল-পাকড় থাকে শুনেছি। মুনি-ঋষিরা সেইসব খেয়েই তপস্যা করেন। আমি গাছের দিকে তাকাতে তাকাতে গুটি-গুটি এগোলুম। দুৎ—ফল কোথায়? কেবল পাতা আর পাতা! ছাগল হলে অবিশ্যি ভাবনা ছিল না। বড়দা আমাকে ছাগল বলে বটে, কিন্তু আমি তো সত্যি-সত্যিই ঘাস-পাতা খেতে পারি না! ফল পাই কোথায়!

একটা গাছের তলায় কালো কালো ক'টা কি যেন পড়ে রয়েছে। একটা তুলে কামড় দিয়ে দেখি—বাপরে! ইঁটের চাইতেও শক্ত—দাঁত বসবে না। একটু দূরেই লাল টুকটুকে গোটা-দুই ফল লতা থেকে ঝুলছিল—দৌড়ে গিয়ে একটা ছিঁড়ে নিলুম। কামড় দিতেই—আরে রামো-রামো! কী বিচ্ছিরি ভেতরটাতে, আর কী দারুণ বদ্ গন্ধ! থু-থু করে ফেলে দিতে পথ পাই না। তখন মনে পড়ল—আরে, এ তো মাকাল! এ তো আমি দেখেছি আগেই! ছ্যা! ছ্যা!

মুনি-ঋষিদের নিকুচি করেছে! বনে ফল থাকে, না ঘোড়ার ডিম থাকে! এখন বুঝতে পাচ্ছি সব গুলপট্টি! আমাকে লাখ টাকা দিলেও আমি কখনো সাধু-সন্নিসি হব না—প্রাণ গেলেও না।

কিন্তু খাই কী!

—ক্র্যাং!

পেছনে কেমন একটা বিটকেল আওয়াজ। আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম।

আবার সেই শব্দ : ক্র্যাং! ক্র্যাং!

এ আবার কী রে বাবা! কোথাও কিছু দেখছি না—অথচ থেকে থেকে অমন যাচ্ছেতাই আওয়াজ করছে কে!

—ক্র্যাং—কর্-র্-র্—

একটা দৌড় মারব কি না ভাবছি—এমন সময়—হুঁ হুঁ! ঠিক আবিষ্কার করেছি! আমার সঙ্গে ইয়ার্কি!

দেখি না, পাশেই একটা নালা। তার ভিতরে গোলগাল একটি ভদ্রলোক। ওই আওয়াজ তিনিই করছেন।

ভদ্রলোক? আরে হ্যাঁ—হ্যাঁ—ভদ্রলোক ছাড়া কী বলা যায় আর? একটি নধর নিটোল কোলা ব্যাঙ! পিঠের ওপর বড় বড় টোপ তোলা—মস্ত মস্ত চোখ দুটো কানের মতো খাড়া হয়ে রয়েছে। আমার দিকে ডাবডেবে চোখ তুলে চেয়ে রয়েছে, আর থেকে থেকে শব্দ করছে : ক্র্যাং-ক্র্যাং—কর্-র্ কুর্-র্—

www.boiRboi.blogspot.com

করছে কী জান? ফুটবলের ব্লাডারে হাওয়া দিলে যেমন করে ফোলে, তেমনিভাবে গলার দু'পাশে বাতাস ভরে নিচ্ছে, গলাটা মোটা হয়ে উঠছে। আর বাতাসটা যেমনি ছেড়ে দিচ্ছে অমনি শব্দ হচ্ছে : ক্র্যাং—কড়াং—

বটে! তাহলে এমনি করেই কোলা-ব্যাঙ ডাকে! সারা বর্ষা এইভাবে গ্যাঙর-গ্যাঙর করে!

আমি ব্যাঙটাকে বললুম, খুব যে মেজাজে বসে আছিস দেখছি!

ব্যাঙ একটা মস্ত লাল জিভ বের করে দেখালে।

—আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস বুঝি?

ব্যাঙ গলার দু'ধারে বাতাস জড়ো করতে লাগল।

—এক চাঁটিতে তোকে উড়িয়ে দিতে পারি তা জানিস?

ব্যাঙটা আওয়াজ করলে : ক্র্যাং—কুর্‌র্‌! মানে যেন বলতে চাইল : ঈস, ইয়ার্কি নাকি? চেষ্টা করেই দেখ না একবার!

—বটে!

—ক্রুং—ফুর্‌র্‌—

—জানিস, আমার বড্ড খিদে পেয়েছে? আমি ইচ্ছে করলে তোকে এক্ষুনি ভেজে খেতে পারি?

—তবে তাই খা—বলেই কে আমার পিঠে ঠাস্‌ করে একটা চাঁটি মারল।

—ব্যাপরে—ভূত নাকি?

আমি হাত-তিনেক লাফিয়ে উঠলুম। তারপর দেখি, একমুখ দাঁত বের করে হাবুল সেন।

—হাবলা—তুই?

হাবুল বললে, হ, আমি। কিন্তু তোর এ কী দশা হইছে প্যালা? কাদা মাইখ্যা, ভূত সাইজ্যা অ্যাক্‌টা ব্যাঙের লগে মশ্‌করা করতে আছস?

এই ফাঁকে ব্যাঙটা মস্ত লাফ দিয়ে ঝোপের মধ্যে কোথায় যেন চলে গেল।

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, খোশ-গল্প এখন থাক। কিছু খাবারের ব্যবস্থা করতে পারিস?

—আরে আমি খাবার পামু কই? সেই তখন থিক্যা জঙ্গলের মইধ্যে হারা উদ্দেশ্যে ঘুরতাছি। কে যে কোথায় চইলা গেল খুঁইজাই পাই না। শ্যাষে একটা গাছের নিচে শুইয়া ঘুম দিলাম।

—বনের মধ্যে ঘুমুলি?

—হ, ঘুমাইলাম।

—তোকে যদি বাঘে নিত?

হাবুল আবার একগাল হাসল : আমারে বাঘে খায় না।

—কী করে জানলি?

—আমি হাবুল স্যান না? উইঠ্যা বাঘেরে অ্যামন অ্যাক্‌টা চোপাড় দিমু যে—

বাকিটা হাবুল আর বলতে পারল না। হঠাৎ সমস্ত বন-জঙ্গল কাঁপিয়ে কে যেন বিকট গলায় হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ করে হেসে উঠল। একেবারে আমাদের কানের কাছেই।

—ওরে বাপরে—

হাবুল আর ডাইনে বাঁয়ে তাকালো না। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট লাগাল।

আবার সেই শব্দ : হ্যা-হ্যা-হ্যাঃ—

এবার সেই ভিজে কাপড়ে জামায় আমিও হাবুলের পেছনে দে ছুট্‌—দে ছুট্‌।

—ওরে হাবলা, দাঁড়া-দাঁড়া! যাসনি—আমাকে ফেলে যাসনি—

—পনের—

বেশি দূর দৌড়তে হল না। হাউ-মাউ করে খানিকটা ছুটেই একটা গাছের শেকড়ে পা লেগে হাবুল ধপাস্‌! সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার পিঠের ওপর কুমড়োর মতো গড়িয়ে পড়লুম।

খাইছে—খাইছে!—হাবলা হাহাকার করে উঠল।

তারপর দু'জনে মিলে জড়াজড়ি। ভাবছি পেছন থেকে এবার সেই অট্টহাসির ভূতটা এসে আমাদের দু'জনকে বুঝি ক্যাঁক্‌ করে গিলে ফেলল।

কিন্তু মিনিট পাঁচেক গড়াগড়ি করেও যখন কিছুই হল না—আর মনে হল আমরা তো এখন কলেজে পড়ছি—ছেলেমানুষ আর নই, অমনি তড়াক করে উঠে পড়েছি। দুত্তোর ভূত! বাঘের গর্তে পড়েই উঠে এলুম—ভূতকে কিসের ভয়!

হাবুল সেন তো বিধ্বস্তভাবে পড়ে আছে, আর চোখ বুজে সমানে 'রাম রাম' বলছে। বোধহয় ভাবছে ভূত ওর ঘাড়ের ওপর এসে চেপে বসেছে। থাক পড়ে। আমি উঠে জ্বল-জ্বল চোখে চারদিকে চেয়ে দেখলুম।

অমনি আবার সেই হাসির আওয়াজ : হ্যাঃ—হ্যাঃ—হ্যাঃ!

শুনেই আমি চিংড়ি মাছের মতো তিড়িং করে লাফ মেরেছি। হাবুল আবার বললে, খাইছে—খাইছে!

কিন্তু কথাটা হল, হাসছে কে! আর আমাদের মতো অখাদ্য জীবকে খেতেই বা চাচ্ছে কে!

আরে ছ্যা ছ্যা! মিথ্যেই দৌড় করালে! কাণ্ডটা দেখেছ একবার! ওই তো বকের মতো একটা পাখি, তার চাইতে গলাটা একটু লম্বা, কদমছাঁট চুলের মতো কেমন একটা মাথা, কালচে রং, কুতকুতে চোখ। আবার দুটো বড় বড় ঠোঁট ফাঁক করে ডেকে উঠল : হ্যাঃ—হ্যাঃ—

—ওরে হাবলা, উঠে পড়্‌! একটা পাখি!

হাবুল সেন কি সহজে ওঠে? ঠিক একটা জগদ্দল পাথরের মতো পড়ে আছে। চোখ বুজে, তিনটে কুইনাইন একসঙ্গে খাচ্ছে এইরকম ব্যাজার মুখ করে বললে, রাম-নাম কর প্যালা—রাম-নাম কর! এইদিকে ভূতে ফ্যাকর্‌ ফ্যাকর্‌ কইর‍্যা হাসতাছে আর অর অখন পাখি দেখনের শখ হইল!

কী জ্বালা! আমি কটাং করে হাবুলের কানে একটা চিমটি কেটে দিলুম। হাবুল চ্যাঁ করে উঠল। আমি বললুম, আরে হতচ্ছাড়া, একবার উঠেই দ্যাখ্‌ না! ভূত-টুত কোথাও নেই—একটা লম্বা-গলার পাখি অমনি আওয়াজ করে হাসছে।

—কী, পাখিতে ডাকতাছে!—বলেই বীরের মতো লাফিয়ে উঠল হাবুল। আর তক্ষুনি সেই বিচ্ছিরি চেহারার পাখিটা হাবুলের দিকে তাকিয়ে, গলাটা একটু বাঁকিয়ে, চোখ পিটপিট করে, ঠিক ভেংচি কাটার ভঙ্গিতে হ্যা-হ্যা করে ডেকে উঠল।

হাবুল বললে, আ্যাঁ—মস্‌করা করতে আছস আমাগো সঙ্গে? আরে আমার রসিক পাখি রে! অখনি তরে ধইর‍্যা রোস্ট বানাইয়া খামু!

আমার পেটের ভেতরে সেই খিদেটা আবার তিং পাং তিং পাং করে লাফিয়ে উঠল। আমি বললুম, রোস্ট বানাবি? তবে এক্ষুনি বানিয়ে ফ্যাল্‌ না ভাই! সত্যি

www.boiRboi.blogspot.com

বলছি, দারুণ খিদে পেয়েছে!

কিন্তু কোথায় রোস্ট—কোথায় কী! হাবলাটা এক নম্বরের জোচ্চোর! তখুনি দু-তিনটে মাটির চাঙড় তুলে নিয়ে ছুড়ে দিয়েছে পাখিটার দিকে। আর পাখিটা অমনি ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজ করে পাখা ঝাপটে বনের মধ্যে ভ্যানিশ।

—গেল-গেল—রোস্ট পালিয়ে গেল—বলে আমি পাখিটাকে ধরতে গেলুম। কিন্তু ও কি আর ধরা যায়!

ভীষণ ব্যাজার হয়ে আমি দাঁড়িয়ে রইলুম। পাখিদের ওই এক দোষ। হয় দুটো ঠ্যাং থাকে—সেই ঠ্যাং ফেলে পাঁই-পাঁই করে পালিয়ে যায়, নয় দুটো ডানা থাকে—সাঁই-সাঁই করে উড়ে যায়। মানে, দেখতে পেলেই ওদের রোস্ট করা যায় না! খুব খারাপ—পাখিদের এ-সব ভারি অন্যায়!

আমি বললুম, এখন কী করা যায় হাবুল?

হাবুল যেন আকাশজোড়া হাঁ করে হাই তুলল। বললে, কিছুই করন যায় না—বইস্যা থাক।

—কোথায় বসে থাকব?

—যেখানে খুশি। এইটা তো আর কইল্‌কাতার রাস্তা না যে ঘাড়ের উপর অ্যাকটা মটরগাড়ি আইস্যা পোড়ব!

—কিন্তু বাঘ তো এসে পড়তে পারে!

—আসুক না।—বেশ জুত করে বসে পড়ে হাবলা আর-একটা হাই তুলল: বাঘে আমারে খাইবো না। তোরে ধইরা খাইতে পারে। কিন্তু তোরে খাইয়া বাঘটা নিজেই ফ্যাচাঙে পইড়্যা যাইবো গা। বাঘের পেটের মধ্যে পালাজ্বরের পিলা হইবো।—বলেই মুখ-ভর্তি শাঁকালুর মতো দাঁত বের করে খ্যাঁক খ্যাঁক করে হাসল।

ভিজে ভূত হয়ে আছি—সারা গা-ভর্তি এখনো পাঁক। ওদিকে পেটের ভিতর খিদেটা সমানে তেরে-কেটে-তাক বাজাচ্ছে। এদিকে এই হনোলুলু—না মাদাগাস্কার—না-না সুন্দর বন—দুত্তোর, ডুয়ার্সের এই যাচ্ছেতাই জঙ্গলের মধ্যে পথ হারিয়ে ভ্যাবাচাকা হয়ে রয়েছি। তার ওপর একটু পরেই রাত নামবে—তখন হাতি, গণ্ডার, বাঘ, ভালুক সবাই মোকাবিলা করতে আসবে আমাদের সঙ্গে। এখন এইসব ফাজলামি ভালো লাগে? ইচ্ছে হল, হাবলার কান পেঁচিয়ে একটা পেল্লায় থাপ্পড় লাগিয়ে দিই।

কিন্তু হাবলাটা আবার বক্সিং শিখেছে। ওকে ঘাঁটিয়ে সুবিধে করতে পারব না। কাজেই মনের রাগ মনেই মেরে জিজ্ঞেস করলুম, তোকে বাঘে খাবে না কী করে জানলি?

হাবুল গম্ভীর হয়ে বললে, আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে আমারে ভোজন করবো না।

আমি রেগে বললুম, দুত্তোর কুষ্ঠীর নিকুচি করেছে! আমাদের পাড়ার যাদবদার কুষ্ঠীতে তো লেখা ছিল সে অতি উচ্চাসনে আরোহণ করবে। এখন যাদবদা রাইটার্স বিল্ডিংয়ের দশ তলার ঘরগুলো ঝাঁট দেয়।

হাবুল বললে তা উচ্চাসনই তো হইল।

আমি ভেংচে বললুম, তা তো হইল। কিন্তু ব্যাঘ্রে না-হয় ভোজন করবে না—ভালুক এসে যদি ভক্ষণ করে কিংবা হাতি এসে পায়ের তলায় চেপটে দেয়, তখন কী করবি?

এইবার হাবুল গম্ভীর হল।

—হ, এই কথাটা চিন্তা করন দরকার। ক্যাপ্টেন টেনিদা হাতির পিঠে উইঠ্যা কোথায় যে গেল—সব গোলমাল কইর‍্যা দিছে। অ্যাক্‌টা বুদ্ধি দে পালা। কোন্ দিকে যাওয়া যায়—ক দেখি?

—যাওয়ার কথা পরে হবে। সত্যি বলছি হাবুল, এখুনি কিছু খেতে না পেলে আমি বাঁচব না। কী খাওয়া যায় বল্ তো?

—হাতি-ফাতি ধইর‍্যা খা—আর কী খাবি?

ওর সঙ্গে কথ কওয়াই ধাষ্টামো। এদিকে এত ভূতের ভয়—ওদিকে দিব্যি আবার লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল। যেন নিজের মোলায়েম বিছানাটিতে নবাবি কেতায় গা এলিয়ে দিয়েছে। একটু পরেই হয়ত ঘুর-ঘুর করে খাসা নাক ডাকাতে শুরু করবে। ও হতচ্ছাড়াকে বিশ্বাস নেই—ও সব পারে।

কিন্তু আমায় কিছু খেতেই হবে। আমি খাবই।

চারদিকে ঘুর-ঘুর করছি। নাঃ—কোথাও একটা ফল নেই—খালি পাতা আর পাতা! বনে নাকি হরেক রকমের ফল থাকে আর মুনি-ঋষিরা তাই তরিবৎ করে খান। স্রেফ্ গুলপট্টি!

এমন সময়: কুঁক্-কুঁক্—কোঁর্-র্—

যেই একটা ঝোপের কাছাকাছি গেছি, অমনি একজোড়া বন-মুরগি বেরিয়ে ভোঁ-দৌড়। আমার আবার দীর্ঘশ্বাস পড়ল। ঈস্—পাখিদের কেন ঠ্যাং থাকে? বিশেষ করে মুরগিদের? কেন ওরা কারি কিংবা রোস্ট হয়ে জন্মায় না?

কিন্তু জয় গুরু! ঝোপের মধ্যে চারটে সাদা রঙের ও কী? অ্যাঁ—ডিম! মুরগির ডিম!

খপ্ করে দু'হাতে দুটো করে ডিম তুলে নিলুম। হাবুলের দিকে তাকিয়ে দেখি ঘুমুচ্ছে। ঘুমুক হতভাগা! ওকে আর ভাগ দিচ্ছি না। এ চারটে ডিম আমিই খাব। কাঁচাই খাব।

একটা ভেঙে যেই মুখে দিয়েছি—ব্যস! আমার চোয়াল সেইখানেই আটকে গেল! আমার সামনে কোত্থেকে এসে দাঁড়িয়েছে এক বিকট কালো মূর্তি—ঝোপের ভেতর মনে হল নির্ঘাৎ একটা মস্ত ভালুক!

এমনিতে গেছি—অমনিতেও গেছি! আমি একটা বিকট চিৎকার করে ডাকলুম: হাবুল! তারপর হাতের একটা ডিম সোজা ছুড়ে দিলুম ভালুকটার দিকে।

আর ভালুক তক্ষুনি ডিমটা লুফে নিয়ে স্পষ্ট মানুষের গলায় বললে, দে না! আর আছে?

www.boiRboi.blogspot.com

—ষোলো—

শেষ পর্যন্ত কুট্টিমামা

ভালুকে বাংলো বলে! এমন পরিষ্কার ভ যায়!

আমার মাথার চুলগুলো খাড়া হতে যাচ্ছিল, কিন্তু জলে-কাদায় মাখামাখি বলে খাড়া হতে পারল না। তার বদলে সারা গায়ে যেন পিঁপড়ে সুড়-সুড় করতে লাগল, কানের ভেতর কুটুং কুটুং করে আওয়াজ হতে লাগল। অজ্ঞান হব নাকি? উঁহু—কিছুতেই না! বারে বারে অজ্ঞান হওয়ার কোন মানে হয় না—ভারি বিচ্ছিরি লাগে!

ঠিক এই সময় পেছন থেকে হাবুল বিকট গলায় চেঁচিয়ে উঠল : পলা—পলাইয়া আয় প্যালা—তরে ভাল্লুকে খাইবো!

'ভাল্লুকে খাইবো' শুনেই আমি উল্লুকের মতো একটা লাফ দিয়েছি। আর ভালুকটা অমনি করেছে কী—তার চাইতেও জোরে লাফ দিয়ে এসে ক্যাঁক্ করে আমার ঘাড়টা চেপে ধরেছে।

আমি কাঁউ কাঁউ করে বললুম, গেছি—গেছি—

আর ভালুক ভেংচি কেটে বললে, গেছি—গেছি! যাবি আর কোথায়? কথা নেই, বার্তা নেই—গেলেই হল!

আরে রামঃ—এ যে ক্যাবলা! একটা ধুমসো কম্বল গায়ে!

—ক্যাবলা—তুই!

—আমি ছাড়া আর কে? পটলডাঙার শ্রীমান ক্যাবলা মিত্তির—অর্থাৎ শ্রীযুক্ত কুশলকুমার মিত্র। দাঁড়া—সব বলছি। তার আগে ডিমটা খেয়ে নিই—বলে ডিমটা ভেঙে পট্ করে মুখে ঢেলে দিলে।

কী যে ভীষণ রাগ হল সে আর কী বলব! ভালুক সেজে ঠাট্টা—তার ওপর আবার এত কষ্টের ডিম বেশ আমেজ করে খেয়ে নেওয়া! তাকিয়ে দেখি আমার হাতে একটাও ডিম নেই—সব মাটিতে পড়ে একেবারে গুঁড়ো। সেই যে লাফটা মেরেছিলুম—তাতেই ওগুলোর বারোটা বেজে গেছে।

এদিকে মজাসে ডিমটা খেয়ে ক্যাবলা গান জুড়ে দিয়েছে : হাম্‌টি ডাম্‌টি স্যাট্ অন্ এ ওয়াল—

আমি ক্যাবলার কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকুনি দিলুম। বললুম, রাখ তোর হাম্‌টি-ডাম্‌টি! কোন্ চুলোয় ছিলি সারাদিন? একটা মোটা ধুমসো কম্বল গায়ে চড়িয়ে এসে এসব ফাজলামো করবারই বা মানে কী?

ক্যাবলা বললে, আরে বলছি, বলছি—হড়বড়াতা কেঁউ? লেকিন হাবুল কিধর ভাগা?

তাই তো—হাবুল সেন কোথায় গেল? এই তো গাছতলায় শুয়ে নাক ডাকাচ্ছিল। তারপর আমাকে ডেকে বললে, পালা—পালা! কিন্তু পালিয়েছে দেখছি নিজেই। কোথায় পালালো?

দুজনে মিলে চেঁচিয়ে ডাক ছাড়লুম : ওরে হাবলা রে—ওরে হাবুল সেন রে—

হঠাৎ ওপর থেকে আওয়াজ এল : এই যে আমি এইখানে উঠেছি—

তাকিয়ে দেখি, ন্যাড়া-মুড়ো কেমন একটা গাছের ডালে উঠে হাবুল ঘুঘুর মতো বসে আছে।

ক্যাবলা বললে, উঠেছিস, বেশ করেছিস। নেমে আয় এখন। উতারো।

—নামতে তো পারতাছি না। তখন বেশ তড়াং কইর‍্যা তো উইঠ্যা বোসলাম। অখন দেখি লামন যায় না। কী ফ্যাচাঙে পইর‍্যা গেছি ক দেখি? এইদিকে আবার লাসায় কামড়াইয়া গা ছুইল্যা দিতে আছে!

আমি বললুম, লাসায় কামড়ে তোকে তিব্বতে পাঠাচ্ছে!

হাবুল খ্যাঁচখেঁচিয়ে বললে, ফালাইয়া রাখ তর মশ্‌করা। অখন লামি ক্যামন কইর‍্যা? বড় ল্যাঠায় পরছি তো!

ক্যাবলা বললে, লাফ দে।

—ঠ্যাং ভাঙবো।

—তাহলে ডাল ধরে ঝুলে পড়্। আমরা তোর পা ধরে টানি।

—ফালাইয়া দিবি না তো চালকুমড়ার মতন?

—আরে না—না!

—তাই করি! অখন যা থাকে কপালে—

বলেই হাবুল ডাল ধরে নিচে ঝুলে পড়ল। আমি আর ক্যাবলা তক্ষুনি ওপরে লাফিয়ে উঠে হাবুলের দু পা ধরে হেঁইয়ো বলে এক হ্যাঁচকা টান।

—সারছে—সারছে—কম্মো সারছে—বলতে বলতে হাবুল আমাদের ঘাড়ে পড়ল। তারপরে তিনজনেই একসঙ্গে গড়িয়ে গেলুম। আমার নাকটায় বেশ লাগল—কিন্তু কী আর করা—বন্ধুর জন্যে সকলকেই এক-আধটু কষ্ট সইতে হয়।

উঠে হাত-পা ঝেড়ে তিনজনে গোল হয়ে বসলুম। আমার গল্প শুনে ক্যাবলা তো হেসেই অস্থির।

—খুব যে হাসছিস? যদি বাঘের গর্তে গিয়ে পড়তিস, টের পেতিস তাহলে!

—বাঘের পাল্লায় আমিও পড়িনি বলতে চাস?

—তুইও?

হাবুল মাথা নেড়ে বললে, পড়বোই তো। ব্যাবাকে পড়বো। ক্যাবল আমি না। আমার কুষ্ঠীতে লেখা আছে : ব্যাঘ্রে আমারে কক্ষনো ভোজন কোরবো না।

আমি ধমকে বললুম, চুপ কর্ হাবলা—তোর কুষ্ঠীর গল্প বন্ধ কর্। তোর কী হয়েছিল রে ক্যাবলা?

—হবে আবার কী! হাতির পায়ের দাগ ধরে ধরে আমি তো এগোচ্ছি। এমন সময় হঠাৎ কানে এল ধুড়ুম্ করে এক বন্দুকের আওয়াজ।

—হ্, আওয়াজটা আমিও পাইছিলাম—হাবুল জানিয়ে দিলে।

—আঃ, থাম না হাবলা! বলে যা ক্যাবলা—

ক্যাবলা বলে চলল,—তারপরেই দেখি বনের মধ্যে দিয়ে একটা বাঘ পাঁই-পাঁই করে দৌড়ে আসছে। দেখে আমার চোখ একেবারে চড়াং করে চাঁদিতে উঠে গেল। আমিও বাপ-বাপ করে দৌড়—একেবারে মোটরটার কাছে চলে গেলুম। তারপর মোটরের কাচ-টাচ বন্ধ করে চুপ করে অনেকক্ষণ বসে রইলুম।

—সেই বাঘটাই বোধহয় আমার গর্তে গিয়ে পড়েছিল—আমি বললুম।

—হতে পারে, ক্যাবলা বললে; খুব সম্ভব সেটাই। যাই হোক, আমি তো মোটরের মধ্যে বসে আছি। ঘণ্টা-দুই পরে নেমে চৌনিদার খোঁজে বেরুব—এমন সময়, ওরে

www.boiRboi.blogspot.com

বাবা!

—কী—কী?—আমি আর হাবুল সেন একসঙ্গে জানতে চাইলুম।

—কী আর?—ভীমরুলের চাক! একেবারে বোঁ-বোঁ করে ছুটে আসছে।

আমি বললুম, হুঁ—আমার ঢিল খেয়ে।

ক্যাবলা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, উ তো মার সমঝ্ লিয়া! তোর মতো গর্দভ ছাড়া এমন ভাল কাজ আর কে করবে! দৌড়ে আবার গিয়ে মোটরে উঠলুম। ঠায় বসে থাকো আর-এক ঘণ্টা! তারপর দেখি, ড্রাইভারের সীটের পাশে কম্বল রয়েছে একটা। বুদ্ধি করে সেটা গায়ে জড়িয়ে নেমে এলুম—ভীমরুল যদি ফের তেড়ে আসে, তাহলে কাজে লাগবে। অনেকক্ষণ এদিকে ওদিকে খুঁজে শেষে আবিষ্কার করলুম, শ্রীমান প্যালারাম বনমুরগির ডিম হাতাচ্ছেন। তারপর—

আমি ব্যাজার হয়ে বললুম, তারপর আর বলতে হবে না—সব জানি। তুই তো তবু একটা ডিম খেলি—আর আমার হাত থেকে পড়ে সবগুলো গেল! ইস্—এমন খিদে পেয়েছে যে এখন তোকে ধরে আমার কামড়াতে ইচ্ছে হচ্ছে!

ক্যাবলা বললে, এই খবর্দার, কামড়াসনি। আমার জলাতঙ্ক হবে।

—জলাতঙ্ক হবে মানে? আমি কি খ্যাপা কুকুর নাকি?

হাবুল বললে,—কইবো কেডা?

আমি হাবুলকে চড় মারতে যাচ্ছিলুম, ক্যাবলা বাধা দিলে। বললে, বন্ধুগণ, এখন আত্মকলহের সময় নয়। মনে রেখো, আমাদের লীডার টেনিদা হাতির পিঠে চড়ে উধাও হয়েছে। তাকে এখনো খুঁজে পাওয়া যায়নি।

—সে কি আর আছে? হাতিতে তারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে!—বলেই হাবলা হঠাৎ কেঁদে ফেলল : ওরে টেনিদা রে—তুমি মইর‍্যা গেলা নাকি রে?

শুনেই আমারও বুকের ভেতর গুর্‌গুর্ করে উঠল। আমিও আর কান্না চাপতে পারলুম না।

—টেনিদা, ও টেনিদা—তুমি কোথায় গেলে গো—

এমন যে শক্ত, বেপরোয়া ক্যাবলা—তারও নাক দিয়ে ফোঁসফোঁস করে গোটা-কয়েক আওয়াজ বেরুলো। তারপর আরশোলার মতো খুব করুণ মুখ করে সেও ডুকরে কেঁদে উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন বললে, আরে—আরে—এই তো তিনজন বসে আছে!

চমকে তাকিয়ে দেখি, কুট্টিমামা, শিকারী আর বাহাদুর।

আমরা আর থাকতে পারলুম না। তিনজনে একসঙ্গে হাহাকার করে উঠলুম : কুট্টিমামা গো, টেনিদা আর নেই!

কুট্টিমামার মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—সেকি! কী হয়েছে তার?

হাবুল তারস্বরে ডুকরে উঠে বলল, তারে বুনা হাতিতে নিয়া গেছে কুট্টিমামা—তারে নিয়া গিয়া অ্যাক্কেবারে মাইর‍্যা ফ্যালাইছে!

কুট্টিমামার হাত থেকে বন্দুকটা ধপাৎ করে মাটিতে পড়ে গেল।

www.boiRboi.blogspot.com

—সতেরো—

হাতি থেকে কাটলেট

একটু সামলে-টামলে নিয়ে কুট্টিমামা বললেন, বুনো হাতিতে নিয়ে গেল!

আমরা সবাই কোরাসে গলা তুলে বললুম, হুঁ!

তাই শুনে কুট্টিমামা মাথার চাঁদির ওপর টাকটাকে কিছুক্ষণ কুর-কুর করে চুলকোলেন। শেষে অনেক ভেবে-চিন্তে বললেন, মানে, তা কী করে হয়? হাতিতে নেবে কেমন করে?

হাবুল বললে, হ, নিয়া গেল। হাতি আসতাছে দেইখ্যা আমরা গাছে উঠছিলাম। টেনিদা না—ডাল ভাইঙা একটা হাতির পিঠে গিয়া পড়ল। আর হাতিটাও গাছের পাতা চাবাইতে চাবাইতে তারে কোন্‌খানে য্যান নিয়া গেল।

—তারপর?

ক্যাবলা বললে, আমরা তিনজনে তাকে খুঁজতে বেরুলুম। আমি একটা বন্দুকের আওয়াজ পেলুম। তারপর দেখি একটা বাঘ ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে আসছে। আমি একেবারে এক লাফে গিয়ে মোটরে!

শিকারী বললে, হুঁ, সেই বাঘটা—যেটাকে আমরা গুলি করেছিলুম। পায়েও চোট লেগেছিল।

কুট্টিমামা বললেন, তারপর?

হাবুল বললে, মনের দুঃখে এক বৃক্ষতলে শয়ন কইর‍্যা আমি ঘুমাইয়া পড়লাম। আমার ভাবনা কী—কুষ্ঠীতে লেখা আছে ব্যাঘ্রে নি আমারে কক্ষনো ভক্ষণ করবো না। উইঠ্যা দেখি প্যালা সারা গায়ে কাদা মাইখ্যা ভূত সাইজ্যা একটা মস্ত কোলা ব্যাঙ ধইর‍্যা খাইতাছে।

কুট্টিমামা বললেন, কী সর্বনাশ! কোলা ব্যাঙ ধরে খাচ্ছে!

হাবুল সেনটা কী মিথ্যুক দেখেছ! আমি ভয়ঙ্কর আপত্তি করে বললুম, না মামা—আমি কোলা ব্যাঙ ধরে খাইনি। ওই হাবলাই তো পাখির ডাক শুনে দৌড়ে পালালো। আমি একটা গর্তের ভেতর পড়েছিলুম—আর বাঘটা গিয়ে সেই গর্তেই একটা সজারুর ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

মামা বললেন, অ্যাঁ! তবে কুলিরা যে গর্ত কেটেছে, বাঘটা তাতেই পড়েছে নাকি? কিন্তু প্যালারাম—তুমি উঠে এলে কী করে?

—স্রেফ্ ইচ্ছাশক্তির জোরে, কুট্টিমামা! নইলে বাঘটা যেভাবে দাপাদাপি করছিল, তাতে ওর ল্যাজের চোট খেয়েই আমার প্রাণটা বেরিয়ে যেত—থাবার ঘা খাওয়ার দরকার হত না।

কিছুক্ষণ কুট্টিমামা আমার মুখের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর আবার কুরকুরিয়ে টাকটাকে চুলকে নিয়ে বললেন, বাঘটা তাহলে সেই গর্তের মধ্যেই আছে বলছ?

—নির্ঘাত!

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না-না—এমনিতে জানতে চাইছিলুম।

কী করা যায়—চুপ করে বসে থাকতে হল। সত্যি কথা—লীডার টেনিদার জন্যে আমারও বুকের ভেতর তখন থেকে আঁকুর-পাঁকুর করছে। কিন্তু—খিদেটাও যে আর সইতে পারছি না। টেনিদা বেঁচে আছে কি না জানি না, কিন্তু আমিও যে আর বেশিক্ষণ বেঁচে থাকব, সে কথা আমার মনে হচ্ছে না।

কী আর করি—চুপ করে বসে আছি। গাড়িটা বনের ভেতর দিয়ে এগোচ্ছে। অন্ধকার দু'ধারে বেশ ঘন হয়ে এসেছে—নানা রকম পাখি ডাকছে। ঝিঁঝিরা ঝিঁ ঝিঁ করছে।

হঠাৎ হাবুল চেঁচিয়ে উঠল, বাঘ—বাঘ—

আবার বাঘ! এ কী বাঘা কাণ্ডে পড়া গেল রে বাবা!

কুট্টিমামা বললেন, কোথায় বাঘ?

আমি ততক্ষণে দেখেছি। বললুম, ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে! মোটরের আলোয় দুটো লাল চোখ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ওখানে!

কুট্টিমামা হেসে বললেন, বাঘ নয়, ও খরগোস।

—খরগোস! অতবড় চোখ! অমন জ্বলে?

—জানোয়ারদের চোখ অমনিই হয়। আলো পড়লে ওইভাবেই জ্বলে। দ্যাখো—দ্যাখো—

গাড়িটা তখন কাছে এসে পড়েছে। দেখি, সত্যিই তো একটা খরগোস! একেবারে গাড়ির সামনে দিয়ে লাফিয়ে পাশের ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল।

ক্যাবলা বললে, খরগোসের চোখই এই! বাঘের চোখ হলে—

—আগুনের মত দপ্-দপ্ করত। শিকারে স্পটিংয়ের সময় চোখ দেখেই জানোয়ার ঠাহর করা যায়।

—স্পটিং কাকে বলে?

—একটা সার্চলাইটের মতো আলো। স্পট-লাইট বলে তাকে। রাত্রে বনের মধ্যে সেইটে ফেলে শিকার খুঁজতে হয়। জানোয়ারের চোখে পড়লে থমকে দাঁড়িয়ে যায়—ধাঁধা লেগে যায় ওদের। তখন গুলি করে মারে।

কথাটা শুনে আমার ভাল লাগল না। এ অন্যায়। মারতে চাও তো মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মারো। চোখে আলো ফেলে, ধাঁধিয়ে দিয়ে গুলি করে মারা কাপুরুষের লক্ষণ। আমি পটলডাঙার প্যালারাম—জীবনে আমি হয়ত কখনো শিকারী হতে পারব না, কিন্তু যদি হই, এমন অন্যায় আমি কিছুতে করব না।

ঘ্যাস্—স্—

গাড়িটা থেমে গেল। আরে—এ কোথায় এসেছি!

বনের বাইরে কয়েকটা তাঁবু। পেট্রোম্যাক্স জ্বলছে। একদিকে তিন-চারটে হাতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কলাগাছ খাচ্ছে। আর তাঁবুর সামনে—

একটা টেবিলে জনতিনেক লোক বসে বসে তরিবত করে খাচ্ছে। তাদের একজন—

আমরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলুম: টেনিদা!!!

টেনিদা গম্ভীর গলায় বললে, কী, এসে গেছিস সব? এখন বিরক্ত করিসনি, আমি কাটলেট খাচ্ছি!

আর টেবিল থেকে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে উঠে কুট্টিমামাকে বললেন, এই যে গজগোবিন্দবাবু, আসুন—আসুন। আপনার ভাগ্নে আমাদের হাতির পিঠে সোয়ার হয়ে এসে উপস্থিত—ভয়ে হাফ ডেড্! আমরা অনেকটা চাঙা করে তুলেছি এতক্ষণে।

—যাক, বাঘের জন্যে তবে ভাবনা নেই। কাল তুলব বাছাধনকে। কিন্তু টেনি—

বলতেই আবার হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠল হাবুল: তারে হাতিতেই মাইর‍্যা ফেলছে কুট্টিমামা—এতক্ষণে হালুয়া বানাইয়া রাখছে!

শুনে আমিও ফোঁস্ফোঁস্ করে কাঁদতে লাগলুম, আর ক্যাবলা নাক-টাক কুঁচকে কেমন একটা কুঁ—কুঁ আওয়াজ করতে লাগল।

শিকারী মামার কানে-কানে কি বললে। মামা গম্ভীর হয়ে বললেন, আমারও তাই সন্দেহ হচ্ছে। নইলে এখানে বুনো হাতি কেমন করে আসবে! তা ছাড়া হাতি তো বটেই। যদি ভয়-টয় পেয়ে—

শিকারী মাথা নেড়ে বললে, তা ঠিক।

তখন কুট্টিমামা আমাদের দিকে তাকালেন। ডেকে বললেন, শোন, এখন আর কান্নাকাটি করে লাভ নেই। চল সব গাড়িতে। তোমাদের লীডারকে খুঁজতে যেতে হবে।

হাবুল ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললে, তারে কি আর পাওন যাইবো?

কুট্টিমামা বললেন, একটা জায়গা আগে দেখে আসি। সেখানে যদি হদিস না পাই, তাহলে বনের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করতে হবে। চল এখন গাড়িতে—কুইক!

গাড়িটা দূরে ছিল না। আমরা উঠে বসতে না বসতেই ড্রাইভার স্টার্ট দিলে। মামা তাকে কি একটা জায়গায় যেতে বলে দিলেন, ঠিক বুঝতে পারলুম না।

বনের ভেতর তখন অল্প-অল্প করে সন্ধ্যা নামছে। হেডলাইটের আলো জেবলে গাড়ি ছুটল।

হাবুল ফিস্ফিস্ করে আমাকে জিজ্ঞেস করলে, এই প্যালা, আমরা কোথায় যাইতাছি ক'দেখি?

বিরক্ত হয়ে বললুম, কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস কর, আমাকে কেন?

—না, খুব ক্ষুধা পাইছে কিনা! গাড়িতে টিফিন ক্যারিয়ার-ভর্তি খাবার তো উঠেছিল! সেইগুলি গেল কোথায়?

ঠিক আমার মনের কথা বলে দিয়েছে! এতক্ষণ ভুলে গিয়েছিলুম, এইবার টের পেলুম, পেটের ভেতর তিরিশটা ছুঁচো যেন একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলছে। টিফিন ক্যারিয়ারটা পেলে সত্যি খুব কাজ হত। ওতে লুচি, আলুর দম, ডিমসেদ্ধ এইসব ছিল।

ইস্—কতদিন যে আমি আলুর দম খাইনি! আর লুচি যে কী রকম সে তো বলতে গেলে ভুলেই গেছি। লুচি কী দিয়ে বানায়—সুজি না পোস্ত দিয়ে? লুচি কি হাতখানেক করে লম্বা হয়?

আর থাকতে না পেরে আমি ক্যাবলাকে একটা খোঁচা দিলুম।

ক্যাবলা মুখটাকে ঠিক চামচিকের মতো করে বসে ছিল। আমার খোঁচা খেয়ে খ্যাঁচখ্যাঁচিয়ে উঠল।

—ক্যা হুয়া? জ্বালাচ্ছিস কেন?

আমি চুপি চুপি বললুম, আঃ চ্যাঁচাসনি। কুট্টিমামা শুনতে পাবে। বলছিলুম, বড্ড খিদে পেয়েছে। সেই যে টিফিন ক্যারিয়ারটা সঙ্গে এসেছিল, সেটা কোথায় বল্ দিকি?

ক্যাবলা হঠাৎ ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেল।

—ছিঃ প্যালা, তোর লজ্জা হওয়া উচিত! টেনিদার এখনো দেখা নেই—কোথায় হাতির পিঠে চেপে সে চলে গেল, আর তুই এখন খেতে চাইছিস?

www.boiRboi.blogspot.com

আসুন—আসুন—চা খান—

আমরা গাড়ি থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লুম। অরু তাই দেখে টেনিদা গোগ্রাসে কাটলেটটা মুখে পুরে দিলে।

সেই ভদ্রলোক বললেন, এস—এস। তোমরা আসবে আন্দাজ করেছিলুম, তোমাদের জন্যেও কাটলেট ভাজা হচ্ছে।

ব্যাপারটা বুঝেছ তো এতক্ষণে? না, না—ওরা বুনো হাতি নয়, ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্টের পোষা হাতি। মাসখানেক হল ও'রা কি কাজে এখানে ক্যাম্প করেছেন। ও'দেরই হাতি চরতে চরতে এদিকে এসেছিল, আর টেনিদা তারই একটার পিঠে চড়াও হয়ে—

কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!

কাটলেট ভাজা হচ্ছে হোক—কিন্তু আমার যে প্রাণ যায়! ক্যাবলাকে বললুম, ক্যাবলা, সেই টিফিন ক্যারিয়ারটা—

ক্যাবলা বললে, দি আইডিয়া! তারপর এক হ্যাঁচকা টানে কোত্থেকে সেটাকে টেনে নামালো।

তারপর?

তারও পর? উহুঁ, আর নয়। অনেকখানি গল্প আমি তোমাদের শুনিয়েছি, এর পরেরটুকু যদি নিজেরা ভেবে নিতে না পারো, তাহলে মিথ্যেই তোমরা চারমূর্তির অভিধান পড়েছ।

—

www.boiRboi.blogspot.com

কবিতা, ছড়া ও প্রবন্ধ

হারিয়ে-যাওয়া মা

সন্ধ্যাবেলায় তারায় তারায় আকাশ যখন ছাওয়া,
নিমের পাতা শিরশিরিয়ে
আমলকি বন ঝিরঝিরিয়ে
হাসনুহানার গন্ধ মেখে যখন আসে হাওয়া,
হাতিম গাছের আঁধার কোলে যখন প্যাঁচা ডাকে,
সেই তো তখন মনে পড়ে হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

বৃষ্টি আসে মাঠ পেরিয়ে হাজার ঘোড়ায় চড়ে
খ্যাপা ধুলোর ঘূর্ণি ছোটে,
কদম-কেয়া শিউরে ওঠে—
মাটির বুকে উজল-তরল তীরগুলো সব পড়ে
খুশির নেশায় বেড়ায় উড়ে চাতক ঝাঁকে ঝাঁকে,
সেই তো তখন ভাবি বসে হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

চৈত্র দুপুর জ্বলছে ঝাঁ ঝাঁ, উতল চাঁপার বন।
শুকনো-গলা কাকের স্বরে
সারাটা মন উদাস করে,
টুপ্‌টুপিয়ে আমের গুটি ঝরছে সারাক্ষণ,
ছায়ার মতো কী যায় নেচে ধূসর পথের বাঁকে,
একলা বসে তখন ভাবি হারিয়ে-যাওয়া মাকে।

কুয়াশাতে দিক ছেয়েছে নিথর শীতের রাত :
চাঁদ-ডোবা এক নিতল কালো
দূর শ্মশানে চিতার আলো
মরণ-বুড়ি বাড়ায় যেন শীতল দুটো হাত
ঘুম-ভাঙা সেই ভয়ের মাঝে তখন খুঁজি কাকে?
ছোট্টবেলায় হারিয়ে-যাওয়া সেই যে আমার মাকে॥

ছোট্ট অরিজিৎকে

বালুচরে নামে ঘুরে ঘুরে বুনো হাঁস
হাওয়ায় দুলছে কাশ ফুল এক রাশ
কাঞ্চন নদী রাঙা রোদে ঝলমল;
ছুটির দিনের একমুঠো খুশি নিয়ে
রঙিন বেলুন হাওয়ায় ভাসিয়ে দিয়ে
ফিরে এল সেই ছেলেবেলা চঞ্চল॥

www.boiRboi.blogspot.com

পাতাল-কন্যা

পাতাল-কন্যা, ঝড়ের কান্না তুমি কি শুনতে পাও,
প্রবাল-পুরীর বিজন প্রাসাদে মানিকের বিছানায়?
তোমার দু-চোখে অতল জলের স্বপ্নেরা আসে যায়
তুমি কি জানো না, তুফানের মুখে টলমল করে দোলে
রাজকুমারের ময়ূরপঙ্খী নাও?
পাতাল-কন্যা, দুয়ারে তোমার জাগে ড্যাগনের দল—
হাজারো জিভেতে লকলক করে আগুনের শিখা ছোটে—
গহীন রাতের উতরোল ঢেউয়ে তারই বিষজ্বালা ফোটে!
তুমি কি জানো না, রাজার কুমার তোমাকে পাবার তরে
পাড়ি দিল সেই মরণ-সাগর জল?
পাতাল-কন্যা, ঘুমের মায়ায় রবে তুমি কত আর?
আলো-পাখি-ফুল-সবুজ বনের শতনরী মালা বয়ে
রাজার কুমার এসেছে তো আজ তোমারি দিগ্বিজয়ে!
ভাঙো ঘুমঘোর, পরো সেই মালা—এই পৃথিবীর বুকে
অরুণ আলোয় জাগো তুমি এইবার॥

প্যালারামের ছড়া

১

শখ করে এনে দাদা পুঁতেছিনু ওল
গিন্নি দিয়েছে রেঁধে তাই দিয়ে ঝোল
এক গ্রাস খাওয়া যেই—
আমি আর আমি নেই,
চক্ষের নিমেষেই গাল-গলা ঢোল!

২

'টাকের ওষুধ করব আবিষ্কার,'
পণ করেছে বিরিঞ্চি ডাক্তার।
ভেবে ভেবে মগজ গেল তেতে
মাথায় বিরাট পড়েছে টাক তার।

৩

রেগে আগুন চণ্ডী খুড়ো
ছিঁড়ছে নিজের দাড়ি,
গিন্নি এসে মাথায় তাহার
চাপায় ভাতের হাঁড়ি।

খুড়ো যতই চেঁচিয়ে ওঠে—
খুড়ীর মুখে হাস্য ফোটে—
চটবে যত ভাতটা তত
ফুটবে তাড়াতাড়ি।

৪

হাতে নিয়ে তলোয়ার
'কাট্—কাট্—মার্—মার্—
ছাড়ে ঘোর হুঙ্কার,
বীররসে মত্ত,
কী হল যে তারপর
খট্—খট্—মড়্—মড়্—
স্টেজ ভেঙে চিৎপাত
হারাধন দত্ত।

৫

রামদাস ডেকে বলে,
'শ্যামাদাস ভাইরে—
প্রাণীদের দশা দেখে
দুখে মরে যাইরে
পাঁঠা ওই ঘোরে মাঠে,
কচি কচি ঘাস চাটে,
জলে ভেজে, রোদে পোড়ে—
দেখে ব্যথা পাইরে
অবোলা অবোধ আহা
পায় কত কষ্ট,
প্রাণে আর সয়নাকো,
বলি তোকে পষ্ট।
ঘরে ওকে নিয়ে আয়,
তেলে নুনে মশলায়
পরম আদরে ওকে
পেটে দিই ঠাঁইরে।'

৬

এক যে ছিল গিন্নি ইঁদুর,
পরত শাঁখা পরত সিঁদুর।
কর্তা যখন স্বর্গে গেল
ডাণ্ডা খেয়ে বিধুর,

www.boiRboi.blogspot.com

গিন্নি গেলেন সহমরণ
নিয়ম-মাফিক হিঁদুর।

৭

আগ্রায় গিয়ে আমি হয়ে যাই তাগড়া,
তাড়াতাড়ি কিনে ফেলি ইয়া এক নাগ্‌রা!
খুশি হয়ে দিয়ে পায়,
শেষে করি হায় হায় :
ভিতরে কাঁকড়া-বিছে—কী দারুণ বাগ্‌ড়া!

নববর্ষা

(রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে)

হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয় নাচে রে।
মগজ হইতে কবিতার রাশ
কণ্ঠে আসিয়া করে হাঁসফাঁস,
আকুল পরাণ রহিয়া রহিয়া
চায়ের পেয়ালা যাচে রে।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয় নাচে রে!
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে, গরজে গগনে।
ধেয়ে চলে আসে মাসী-পিসিমারা,
আমসত্ত্ব কি ভিজে হলো সারা?
পুচ্ছ তুলিয়া ভিজা বিড়ালেরা
উনুনে খুঁজিছে সঘনে।
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।
কাপড়ে আমার ট্যাকসি হইতে
কাদা ছিটকিয়ে লেগেছে, কাপড়ে লেগেছে।
বরষার ধারা ভিজে ফুটপাত
পিছলিয়ে জুতা—আমি চিৎপাত!
সে রাম-আছাড়ে পিঠে ও কোমরে
বিষম বেদনা জেগেছে।
কাপড়ে আমার ট্যাকসি হইতে
কাদা ছিটকিয়ে লেগেছে।
ওগো, দোতলায় পুঁটিকে বুঝি বা
খেঁদিটা দিয়েছে চড়ায়ে, দিয়েছে চড়ায়ে।

ভ্যাঁ ভ্যাঁ রব তাই তুলিয়াছে পুঁটি
ত্বরায় জননী আসিয়াছে ছুটি,
খেঁদির ঝুঁটিতে কষে মেরে টান
দিয়েছে শ্রাদ্ধ গড়ায়ে।
ওগো দোতলায় পুঁটিকে বুঝিবা
খেঁদিটা দিয়েছে চড়ায়ে।
ওগো, পাশের বাড়ীর মেসেতে কাহারা
বেঁধেছে গানের তরণী, সুরের তরণী?
প্যাঁ প্যাঁ করে বাজে হারমোনিয়াম,
কানের পোকারা বলে—থাম্, থাম্!
তবলা চাঁটায়ে বাদল রাগিণী
গাহিছে বধির-করণী।
ওগো, পাশের বাড়ীর মেসেতে কাহারা
বেঁধেছে গানের তরণী।
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে, হৃদয় নাচে রে
হিং-এর খিচুড়ি রাঁধিছে গৃহিণী
হাতা-বোকনোয় বাজে ঠিনিঠিনি
খিচুড়ির সাথে সোনায় সোহাগা
ইলিশের ভাজা আছে রে!
হৃদয় আমার নাচে রে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচে রে।

অটোগ্রাফ

আমার অটোগ্রাফ?
হয়তো বা তুমি কখনো দেখিবে
ব্যাঙেতে ধরেছে সাপ।
(নিরঞ্জন চক্রবর্তীর সৌজন্যে প্রাপ্ত)

আমার কবিতা চাহিছ বন্ধু
আমি তো লেখক নই
চিনি মাখা যত লেখকের পাতে
আমি শুধু টক দই।

—

www.boiRboi.blogspot.com

বড়দিন

নিশীথ রাত্রে সরাইখানায় জায়গা ছিল না। আগন্তুকদের শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হল ঘোড়ার আস্তাবলে। সেই রাত্রে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র মেষপালকদের বেথেলহেমের পথ দেখালো। সে নক্ষত্রের আলো পড়ল একটি নবজাতকের মুখে। জননী মেরীর কোলে শিশু খৃষ্টের সে অপরূপ আবির্ভাব শিল্প-সৌন্দর্যে অমর হয়ে রইল দেবশিল্পী র‍্যাফেলের তুলিতে, দা ভিঞ্চির বর্ণলেপে।

খৃষ্ট কবে পৃথিবীতে এসেছিলেন ইতিহাস তার সন্ধান জানে না। তাঁর আবির্ভাব-উৎসব প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল অ্যালেকজান্ড্রিয়ায়—তাঁর তিরোধানের দুশো বছর পরে। সেদিন ছিল মে মাসের ২০শে তারিখ। তারপর এই স্মরণোৎসব সরে এল এপ্রিলে, এপ্রিল থেকে জানুয়ারী, সর্বশেষ ২৫শে ডিসেম্বর।

পণ্ডিতেরা বলেন, ২৫শে ডিসেম্বর খৃষ্টের জন্মদিন হতেই পারে না। কারণ, এসময়ে প্যালেস্টাইন অঞ্চলে নিরবচ্ছিন্ন বর্ষণ চলতে থাকে। এই অশ্রান্ত বৃষ্টিধারার মধ্যে—নিশীথের অন্ধকারে পাহাড়ের ওপর মেষপালকেরা ভেড়া চড়াবে—এ অসম্ভব।

কিন্তু তারিখে কি আসে যায়? খৃষ্টের আবির্ভাবটাই প্রধান কথা—তার সব তারিখের প্রসঙ্গ অবান্তর। যিনি সর্বকালজয়ী, কোন বিশেষ কালের বন্ধনে তিনি বাঁধা পড়েন না।

বেথেলহেমের উজ্জ্বল নক্ষত্রের মধ্যে যাঁর আবির্ভাব—গোলগোথার ক্রুশকাঠ কি কখনো তাঁর ওপর সমাপ্তির যবনিকা টেনে দিতে পারে? মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তিনি বারাঙ্গনাকেও দীক্ষা দিয়ে যান—তেরো জন শিষ্য পৃথিবী জুড়ে বিশাল খৃষ্টসমাজ গড়ে তোলে। ভক্ত খৃষ্টান বিশ্বাস করেন, আবার খৃষ্টের পুনরাবির্ভাব ঘটবে—পৃথিবীর পাপ-তাপ মুছে যাবে, দরিদ্রের বন্ধু গড়ে তুলবেন এক অখণ্ড অমর ধর্মরাজ্য।

ধর্মবিশ্বাসের কথা থাক। কিন্তু শোষণহীন সমাজের সেই অনাগত রূপটি আজকের দিনের প্রত্যেক মানুষেরই কাম্য। সংসারের যে নিপীড়িত লাঞ্ছিতদের জন্য খৃষ্ট নিজের রক্ত ঢেলে দিয়ে গেছেন, সেই লাঞ্ছিতেরাই ভবিষ্যতের সেই মিলেনিয়ামের ভিত্তি রচনা করে চলছে।

তাই খৃষ্টের আবির্ভাব-তিথি সারা পৃথিবীর খৃষ্টান সমাজের কাছে পরম আনন্দের দিন। ২৫শে ডিসেম্বর থেকে এপিফ্যানি পর্যন্ত এই বারো দিন অনাগত ধর্মরাজ্যের প্রত্যাশায় দ্বাদশী যাপন। সমস্ত পৃথিবীতে উৎসব আর উল্লাসের কলধ্বনি। দরিদ্রের বন্ধু মানবপুত্রের সঙ্গে সঙ্গে এই দিনে আসেন শিশুর পরম বন্ধু সেণ্ট্ নিকোলাস—সান্টা ক্লজ। ডিসেম্বরের শীতল রাত্রে ক্রিস্‌মাস্ ট্রী-র পাতায় পল্লবে যখন তুষার বিস্তীর্ণ হয়ে থাকে, সোনালি তারায় আর ঝলমল আলোতে তুষারাকীর্ণ পল্লবগুলি যখন ঝিলমিল করে, তখন শিশুর মন আকুল প্রত্যাশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে তাকিয়ে থাকে দরজার দিকে। কল্পনার চোখ মেলে শিশুরা দেখতে পায় উত্তর-মেরুর দিগন্ত বিস্তার হিমানীর অসীম পথ পার হয়ে ছুটে আসছে স্লেজ গাড়ি—দ্রুতগামী পায়ে তুষারকে ধুলোর মত উড়িয়ে সে গাড়ি টেনে আনছে বল্‌গা হরিণের দল। সে গাড়িতে

বসে আছে সান্টা ক্লজ—শীতল বাতাসে উড়ছে তার শাদা লম্বা দাড়ি—হাসিতে চোখমুখ ঝকমক করছে তার। তার পিঠে একটা প্রকাণ্ড থলি—সে থলিতে বোঝাই করা রকমারী উপহার। চিমনির ফাঁক দিয়ে—খোলা দরজার মধ্য দিয়ে সে অকৃপণ হাতে শিশুদের দিয়ে যাবে খাবার আর খেলনা—তার স্নিগ্ধ হাসি আর রুপালি দাড়ির ঝলক ক্রিস্‌মাসের উজ্জ্বল রাতটিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবে!

সেই প্রত্যাশায় এই শুভ রাত্রিটি সুরে ছন্দে মুখর হয়ে ওঠে। ইংলণ্ডের ঘরে ঘরে "ওয়েট্‌স" গান—ফ্রান্সের প্রান্তে প্রান্তে "নোয়েল" সঙ্গীত, জার্মানীর আকাশে বাতাসে উচ্চকিত "ক্রিস্‌লিডের"। পৃথিবীর মানুষের মর্মবাণী যেন রূপ পায় রবীন্দ্রনাথের ভাষায়:

"ঐ মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ
নরলোকে বাজে জয় ডঙ্ক
এলো মহাজন্মের লগ্ন,
আজি অমারাত্রির দুর্গ তোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।"

ক্রিস্‌মাসের ধর্মগত তাৎপর্য যাই থাক, এর সামাজিক তাৎপর্য বিরাট। পৃথিবীতে যেভাবে আজ যুদ্ধবাদী চক্রান্তের হিংস্রতা চলেছে, চলেছে মারণাস্ত্রের যে নিষ্ঠুর প্রতিযোগিতা—তার ভেতরে খৃষ্টের জন্মদিন শান্তি আর সৌহার্দের অমরবাণী বহন করে আনে। কোটি কোটি মানুষের মন খৃষ্টের কল্যাণ-বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়। আজকের ধনসাম্যবাদ যে খৃষ্টের মানবিক সত্যের মধ্যে নিজের যথাস্থান খুঁজে পেতে পারে, তা উপলব্ধি করেছেন ডীন অব্ ক্যাণ্টারবেরি হিউলেট্ জনসনের মতো যথার্থ ক্রীশ্চানেরা। ইয়োরোপের শোষণপন্থী সাম্রাজ্যবাদীদের লক্ষ্য করে তাঁদের খৃষ্টভক্তিকে ধিক্কার দিয়ে বাংলার কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছিলেন:

"মাড়িয়ে মানুষ, উড়িয়ে ধুলো, অন্ধবেগে কবন্ধ রথ চলে
ওষ্ঠবাসী খৃষ্টভক্তি ডুবছে নিতি নীট্‌শেবাদের তলে—।"

এই উক্তির সার্থকতা আজ ইউরোমেরিকায় কী ভাবে সত্য হয়ে উঠছে তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। কোরিয়ার যুদ্ধ থেকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে যে রক্ত ঝরছে তা খৃষ্টেরই। ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী নিষ্ঠুরতার এই পরম দুর্দিনে তাই খৃষ্টের জন্মোৎসব একটা পরম স্মরণীয় তিথি। মৈত্রী আর কল্যাণ, প্রীতি আর শুভেচ্ছা, আনন্দ আর শুভবোধের মধ্য দিয়ে এই দিনটি আমাদের মানবতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করুক। ঘরে ঘরে শিশুর কণ্ঠে আজ যে 'ক্রিস্‌মাস ক্যারোল' ভেসে আসছে—ক্রিস্‌মাস নক্ষত্রের সোনালি উজ্জ্বল তারাটি আজ যে পবিত্র প্রতিশ্রুতিতে দীপ্ত হয়ে আছে—আগামী দিনের মানুষের মনে তার প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী হোক।

আমরা যেন কখনো না ভুলি: খৃষ্টের সাধনা, তাঁর আত্মত্যাগ—তা মানুষেরই জন্য। শোষিত দরিদ্রের জন্যে ধর্মসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রথম দ্রষ্টা তিনিই। খৃষ্টান থেকে অখৃষ্টান, ইংরাজ থেকে কাফ্রী, ধার্মিক থেকে নাস্তিক—তাঁর জন্মতিথিতে প্রত্যেকের কণ্ঠ থেকে এই প্রার্থনাই উচ্চকিত হোক: পৃথিবীতে গড়ে উঠুক শোষণহীন মানুষের সমাজ, নিজের অন্ন অন্যকে ভাগ করে দিয়ে প্রত্যেকের অন্তরের মৈত্রীকে প্রসারিত করুক; ক্রিস্‌মাস নক্ষত্রের আলোয় দীপিত লক্ষ লক্ষ শিশুর মুখের ওপর যেন

www.boiRboi.blogspot.com

অ্যাটম বোমা কখনো আর বিভীষিকার ছায়া না ফেলে, তাদের জীবনের প্রতিটি বছর যেন আঙ্কল ক্রিস্মাসের অফুরন্ত দানে সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথ

সেই কবেকার এক বাইশে শ্রাবণ মুছে গেছে অনেক বর্ষার জলধারায়, সেদিনের ব্যক্তি-বিয়োগের দুঃখ আজ ইতিহাসের অক্ষর। তবু রবীন্দ্রনাথকে আমরা হারাই নি, কখনও হারাতে পারি না।

শান্তিনিকেতনে 'উত্তরায়ণে'র সামনে দাঁড়িয়ে মনে হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ নেই। কী অবিশ্বাস্য এই না-থাকা! কী শূন্য এই শান্তিনিকেতন! ভারাতুর মন নিয়ে ফিরে এলাম গেস্ট-হাউসে। আর বিষণ্ণ সন্ধ্যার আকাশকে কালো করে নেমে এল অশ্রান্ত বৃষ্টি।

ইলেকট্রিকের আবছায়া আলো নিঃশেষে মুছে গেল সেই বৃষ্টিতে। দূরে মাঠের পারে বিদ্যুতের আলোয় ঝলকে উঠতে লাগল শাল-তমালের চঞ্চলতা। আর তখনই আমি দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে। দেখলাম 'বরষণ মুখরিত অন্ধকারে' কোন্ দিগন্তের পার থেকে তিনি আসছেন—'সজল সন্ধ্যায় একটি কেতকী' তাঁর হাতে—'মেঘে মেঘে তড়িৎ-শিখার ভুজঙ্গ-প্রয়াতে' শুনতে পেলাম তাঁর কলকণ্ঠ।

আর-একদিন। উদয়াস্ত দম-চাপা কাজের ভিড়। জীবিকার অসহ্য তাড়না। যখন একটুখানি মুক্তির নিশ্বাস ফেলতে পেলাম, তখন রাত বারোটার কাছাকাছি।

ছাতে উঠে এলাম। খানিক দূরে চারতলা মেস-বাড়িটা ছাড়া কোন জানলায় আর আলো জ্বলছে না—এখন 'ঘরে ঘরে রুদ্ধ দুয়ার'। শান্ত, স্তব্ধ আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে যখন সারাদিনের হিসেব তলিয়ে নিতে চাইছি, তখন কানে এল বহু দূর থেকে কে যেন সেতার বাজাচ্ছে। বেহাগের সুর।

আমি চমকে উঠলাম। তাকালাম আকাশের দিকে। চন্দ্রহীন আকাশে নক্ষত্রের জ্যোতির্বাসর। ঐ সেতারের সুরটা আমাকে তুলে নিল আমিত্বের আবরণ থেকে—ছাড়িয়ে গেল এই কলকাতা, এই পৃথিবী : আমি দেখলাম আমার সমস্ত চেতনা ঐ সুরের মধ্যে একাকার হয়ে গেছে। ঐ সুর মাটিতে বাজছে না, মানুষের হাতে একটা যন্ত্রেও নয়—সমস্ত আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেছে—ঐ অগণিত নক্ষত্র তারই অগ্নিবিন্দু।

আর তখনই অনুভব করলাম রবীন্দ্রনাথকে :

'বাঁধলে যে সুর তারায় তারায়
অন্তবিহীন অগ্নিধারায়
আজকে আমার তারে তারে বাজাও সে বারতা—।'

—

www.boiRboi.blogspot.com

গ্রন্থ-পরিচয়

সপ্তকাণ্ড—প্রকাশক—বৃন্দাবন ধর অ্যান্ড সন্স (প্রাঃ) লিমিটেড, ৫ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট—কলিকাতা ১২

এটি সাতটি গল্পের সংকলন : মৎস্য-পুরাণ; অথ নিমন্ত্রণ ভোজন; দধীচি, পোকা ও বিশ্বকর্মা; সভাপতি; খট্টাঙ্গ ও পলান্ন; ভূতুড়ে; ক্যামোফ্লেজ।

ছোটদের শ্রেষ্ঠগল্প—প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। এতে মোট এগারটি গল্প আছে। ভালোয় ভালোয়, বনভোজনের ব্যাপার, প্যাঁচা ও পাঁচুগোপাল, পরের উপকার করিও না, সেই বইটি, চরণামৃত, একটি ফুটবল ম্যাচ, দুরন্ত নৌকা ভ্রমণ, দুর্ধর্ষ মোটর সাইকেল, ক্যামোফ্লেজ (সপ্তকাণ্ডেও গল্পটি আছে), কুটিমামার হাতের কাজ। পুনর্মুদ্রণ সাল—(দ্বিতীয়বার) ১৯৫৭, পৃষ্ঠা—১৩৪, ভূমিকা—৪, মূল্য ২ টাকা। বর্তমানে অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত। মূল্য—৬ টাকা।

অন্ধকারের আগন্তুক—১৩৫২র অগ্রহায়ণ মাস থেকে বিখ্যাত শিশু পত্রিকা "মৌচাকে" ধারাবাহিকভাবে বেরুতে থাকে। তখন এর নাম ছিল "একখানি কালো হাত"। পরে বই হয়ে যখন বেরোয় তখন এর নামটি নিজের পছন্দ না হওয়ায় পরিবর্তন করে নাম রাখেন "অন্ধকারের আগন্তুক"। এটি পরে "কিশোর-সঞ্চয়নে" সংকলিত হয়।

চারমূর্তি—"ছোটদের একটুখানি খুশি করবার খুশি নিয়ে "চারমূর্তি" ধারাবাহিকভাবে "শিশুসাথী"তে লিখেছিলাম। ছোটরা আশাতীতভাবে সাড়া দিয়েছে। সেই ভরসাতেই বইয়ের আকারে প্রকাশ করা গেল"—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রথম বই আকারে অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির থেকে প্রকাশিত হয়। ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। প্রথম থেকে পঞ্চম সংস্করণ দ্রুত নিঃশেষিত হবার পর নব পর্যায়ে শৈব্যা পুস্তকালয় থেকে প্রকাশিত হয়। ৮/১সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—৫ টাকা।

প্রথম প্রকাশ—১৯৫৭ ও পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২৩। ভূমিকা ইত্যাদি ছয় পৃষ্ঠা, মূল্য ছিল—২·৫০।

খুশির হাওয়া—প্রথম প্রকাশ—ইস্ট লাইট বুক হাউস, ২০ স্ট্র্যান্ড রোড, কলি-১। নব সংস্করণে প্রকাশ অন্নপূর্ণা পাবলিশিং হাউস, ৭-ই লিণ্ডসে স্ট্রীট, কলি-৭০০০১৬; মূল্য পাঁচ টাকা, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১—৯২। এতে মোট আটটি গল্প সংকলিত হয়েছে—পুলিশের কারবারই আলাদা, ঢাউস, রোমাঞ্চকর বন্দুক, কুটিমামার হাতের কাজ, থলে রহস্য দৈত্য সংগীত, সাংঘাতিক, পেশোয়ার কী আমীর।

চারমূর্তির অভিযান—প্রথম প্রকাশ—আষাঢ় ১৩৬৭, জুলাই ১৯৬০; দ্বিতীয় মুদ্রণ—শ্রাবণ, ১৩৭৫, আগস্ট ১৯৬৮; প্রকাশক—অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির, ৬ নং বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলি-১২, মূল্য—২·৫০।

'চার মূর্তির অভিযান'-এর ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

ছোট-ছোট বন্ধুরা,

পটলডাঙার 'চার মূর্তি' এখন বড় হয়েছে, তারা কলেজে পড়ছে। তাই সেদিন

টেনিদা এসে শাসিয়ে বললে, 'দ্যাখ্ প্যালা, আমাদের কীর্তি-কাহিনী নিয়েই যে সব উপন্যাস লিখছিস, তাতে লোকের কাছে আর মান থাকবে না। ফের যদি তুই আমাদের নিয়ে উপন্যাস লিখবি তাহলে এক চড়ে তোর নাক নাসিকে পাঠিয়ে দেব।' হাবুল সেন সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'হ, সত্য কইছ।' আর ক্যাবলা দয়া করে বললে, 'মধ্যে মধ্যে দু-একটা গল্প লিখতে পারিস—নইলে অভ্যুদয়ের অমিয় চক্রবর্তী আবার রাগ করবে।' মাথা চুলকে বললুম, 'তথাস্তু।'

তোমরা তো টেনিদাকে জানোই। আমি রোগা-পটকা প্যালারাম—তাকে চটাতে পারি? তার 'চার মূর্তি'কে নিয়ে আর উপন্যাস নয়, কখনো কখনো গল্প তোমাদের নিশ্চয় শোনাবো। কী করি বলো? প্রাণের মায়া আছে তো একটা!

—তোমাদের
প্যালারাম

www.boiRboi.blogspot.com

www.boiRboi.blogspot.com

আমার কিছু কথা

আমার একটা স্বপ্নের বাস্তবায়ন হলো এই ওয়েবসাইটের মধ্য দিয়ে ।
ছোটবেলা থেকেই আমার বইপড়া অভ্যাস । আমার পড়া প্রথম উপন্যাস শ্রী শরৎ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী',তখন আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও ভর্তি হইনি ।তারপর থেকে প্রায় ২০ বছর ধরে অসংখ্য বই আমি পড়েছি,সংগ্রহের ইচ্ছা থাকলেও আর্থিক অবস্থা আমাকে সেই সুযোগ দেয় নি । ইন্টারনেটের সাথে পরিচিত হওয়ার পর থেকেই আমি বাংলা বই ডাউনলোডের সুযোগ খুঁজতাম,কিন্তু এক মূর্চ্ছনা ছাড়া আর তেমন কোন সাইট আমি পাইনি । মূর্চ্ছনাতেও নিয়মিত বই আপডেট হয়না বলে আমি নিজেই আমার অতিক্ষুদ্র সামর্থ্যের (এতই ক্ষুদ্র যে গ্রামীনের ইন্টারনেট চার্জ টা আমাকে টিউশনি করে জোগাড় করতে হয় ।

তবু আমি আমার চেষ্টা অব্যাহত রাখব, নতুন পুরাতন সমস্ত (বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার লেখকদের বই) লেখাই আমি এখানে দেওয়ার আশা রাখি ।

আপনাদের কাছে একটা ছোট্ট অনুরোধ, আমাকে একটু সাহায্য করুন,তবে টাকা দিয়ে নয় । আমার এই ওয়েবসাইটে কিছু Google এর বিজ্ঞাপন আছে,যে কোনো একটা বিজ্ঞাপন মাসে একবার (হ্যাঁ,মাসে একবারই,তার বেশী নয়) যদি একটু ১০ মিনিট ব্রাউজ করেন,তাহলে আমি একটু উপকৃত হই । আপনাদের পছন্দের বইগুলো যদি ডাউনলোড চান তাহলে মেসেজবক্সে আমাকে মেসেজ দেবেন । আমি চেষ্টা করব বইটা দেওয়ার ।
যদি সফটওয়্যার দরকার হয়,তাহলে যান http://www.download-at-now.blogspot.com/ এই ঠিকানায় । সব সফটওয়্যার সিরিয়াল/ক্রাক/কিজেন যুক্ত ।
কোন সফটওয়্যার তৈরী করার দরকার হলেও আমাকে বলতে পারেন,আমি একজন সফটওয়্যার ডেভেলপার ।

মোবাইল: ০১৭৩৪৫৫৫৪১
ইমেইল: ayan.00.84@gmail.com